# প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

**অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার**

উপাচার্য

পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ : অগাস্ট, 2012

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

# পরিচিতি

**বিষয় ঃ ভূগোল** **সাম্মানিক স্তর**

**পাঠক্রম : পর্যায় : EGR 10 : 01**

| | **রচনা** | **সম্পাদনা** |
|---|---|---|
| **একক** 1—3 | ড. জ্যোতির্ময় সেন | শ্রীমতী টিঙ্কি কর |

**পাঠক্রম : পর্যায় : EGR 10 : 02**

| | **রচনা** | **সম্পাদনা** |
|---|---|---|
| **একক** 4—6 | ড. জ্যোতির্ময় সেন | ড. শুক্লা ভাদুড়ী |

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

**ঘোষণা**

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

**অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়**
নিবন্ধক

# নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

## EGR–10

জনসংখ্যা ভূগোল
(স্নাতক পাঠক্রম)

**পর্যায়**
**1**


| | | |
|---|---|---|
| **একক 1** | ❑ জনসংখ্যা ভূগোল : উৎপত্তি, সংজ্ঞা ও তথ্য | 1-19 |
| **একক 2** | ❑ জনবৃদ্ধি ও জনবণ্টন | 20-117 |
| **একক 3** | ❑ জনসংখ্যা তত্ত্ব ও জনসংখ্যা নীতি | 118-168 |


**পর্যায়**
**2**


| | | |
|---|---|---|
| **একক 4** | ❑ জনসংখ্যা গঠন | 171-222 |
| **একক 5** | ❑ পরিযান | 223-257 |
| **একক 6** | ❑ ভারতের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও বণ্টন | 258-294 |

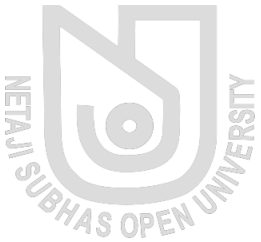
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

# একক 1 ❑ জনসংখ্যা ভূগোল ঃ উৎপত্তি, সংজ্ঞা ও তথ্য

গঠন


**1.0** প্রস্তাবনা

**1.1** উদ্দেশ্য

**1.2** ভূগোল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও জনসংখ্যা ভূগোল

**1.3** জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু

**1.4** অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সাথে জনসংখ্যা ভূগোলের সম্পর্ক

**1.5** জনসংখ্যা ভূগোল পাঠের গুরুত্ব

**1.6** উপকল্প ও পদ্ধতি

**1.7** পদ্ধতিগত সমস্যা

**1.8** ভারতে জনসংখ্যা ভূগোল

**1.9** জনসংখ্যা তথ্য


NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

## 1.0 প্রস্তাবনা

প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অবস্থান নির্ণয় করার মধ্য দিয়ে মানবীয় ভূগোলের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে ভূগোলের এই উপশাখার কলেবর আরো বাড়ল। মানবীয় ভূগোলের এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল জনসংখ্যা ভূগোল। এই ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে যে মানুষ সেই মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে এই ভূগোল।

মনে রাখতে হবে জনতার গঠন, বন্টন, পরিযান এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিভাবে কোন স্থানের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ স্থানিক পার্থক্য নির্ণয় হল জনসংখ্যা ভূগোল। এ প্রসঙ্গে বলা চলে ডেমোগ্রাফারেরা (Demographer) বা জনমিতবিদরা জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেন আর ভৌগলিকরা স্থানিক পার্থক্যের উপর গুরুত্ব দেন। বিভিন্ন ভৌগলিকরা জনসংখ্যা ভূগোলের নানা সংজ্ঞা দিলেও মোটের উপর একটি জিনিস পরিষ্কার। তা হল ধরা পৃষ্ঠে যে বিভিন্ন ভৌগলিক উপাদানগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ভূগোলের এই শাখাটি বয়সে নবীন। তাই এই বিষয়টির ওপর গবেষণামূলক কাজ হয়েছে কম। ভারতেও এই ভূগোলের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল 1960-র দশক থেকে এবং কিছু গবেষণামূলক কাজও হয়েছে।

## 1.1 উদ্দেশ্য

আপনারা এই এককটি পড়ে জানতে পারবেন—

- জনসংখ্যা ভূগোলের উৎপত্তি কিভাবে ঘটল ?

- জনসংখ্যা ভূগোলের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু।
- অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সাথে এই ভূগোলের সম্পর্ক।
- এই ভূগোল পাঠের গুরুত্ব।
- আমাদের দেশে জনসংখ্যা ভূগোলের সূচনা।
- জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য, এই তথ্য ব্যবহারে অসুবিধা।

## 1.2 ভূগোল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও জনসংখ্যা ভূগোল (Origin of Geography and Population Geography)

পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ। মানবজাতির ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জীবনযাপনের তাগিদেই সে প্রথম থেকে সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। প্রকৃতির ভয়াল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে সে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। ফলে যে প্রকৃতি এক সময় তার কাছে বিভীষিকা ছিল, কালক্রমে সে তাকে তার আয়ত্তে এনে তাতে ক্রমাগত পরিবর্তন করে চলেছে। অনুকূল পরিবেশের বদান্যতা নিয়ে মানুষ বন-জঙ্গল কেটে বসত বানিয়েছে। ক্ষেত খামার গড়ে তুলেছে। যাতায়াতকে সহজসাধ্য করার জন্য রাস্তা-ঘাট বানিয়েছে। মানুষের এই সব কান্ডকারখানা প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যকে (Natural Landscape) ক্রমশ সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যে (Cultural Landscape) পরিবর্ত করে চলেছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ কখনো কখনো প্রকৃতির দানকে উদারভাবে গ্রহণ করেছে। কখনো সে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ফলে প্রকৃতিতে নেমে এসেছে এক ধরণের ভারসাম্যহীনতা। প্রকৃতির এই পরিবর্তনকে বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে আজ পর্যন্ত যত শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে ভূগোল সবার ওপরে রয়েছে। এই শাস্ত্রের উৎপত্তির সময় ও স্থান কোথায় আজ নিশ্চিত করে বলা না গেলেও Dicken and Pitts (1963) বলেছেন যে অতীতে মানুষ যেদিন তার সাথী বা সঙ্গীকে মাটিতে বা বালিতে দাগ কেটে নতুন শিক্ষারক্ষেত্রের সম্ভাব্য অবস্থান সম্বন্ধে বুঝিয়েছিল, তখন থেকেই খুব সম্ভবত এই শাস্ত্রের সূচনা হয়েছিল। প্রথমদিকে সাধারণ বর্ণনামূলক বিষয় হিসেবে এর যাত্রা শুরু হলেও, পরবর্তীকালে এর কলেবর বহু ব্যাপক ও জটিল আকার ধারণ করে। বর্তমানের অনেকগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় আগে এই শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ভূগোল শাস্ত্রকে শুধুমাত্র প্রকৃতি সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা ও পঠন-বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করলে এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সামান্যই বলা হয়। সেই সঙ্গে এর ঐতিহাসিক মূল্যবোধের প্রতিও অবজ্ঞা করা হবে। কারণ হল, এককভাবে আজ পর্যন্ত এই শাস্ত্রে যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, অন্য কোন শাস্ত্রের তা সম্ভব হয়নি (বাকী 1994)। Wegner (1964) এই শাস্ত্রের ব্যাপকতা ও গভীরতা লক্ষ্য করে বলেছেন যে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভূগোল-বিষয় সবচেয়ে বেশি তথ্য সমৃদ্ধ। ব্যাপক অর্থে ভূগোল ও ইতিহাস শাস্ত্রের মধ্যে এক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে সম্ভবত ইতিহাস রচিত হয়েছে। আরও বিস্তারিতভাবে বলতে ইচ্ছা করে যে বিভিন্ন ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করাই হচ্ছে ইতিহাসের প্রধান আলোচনার বিষয়। সিরাজুল চৌধুরী (1988) যথার্থই লিখেছেন যে ঠিক একই ভাবে যদি গোটা বিশ্বজুড়ে একই ভূমিভাগ থাকতো, যদি সর্বত্র একই ধরণের মানুষ বাস করতো, আর তারা একই ধরণের জীবিকায় নিয়োজিত থাকতো, তবে

ভৌগলিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হত না। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে ঐক্যর চেয়ে অনৈক্যই চোখে পড়ে। তাই ভূগোলবিদ্‌রা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। ক্ষেত্রীয় বিভেদন (Areal differentiation) ও আঞ্চলিক সমধর্মিতা বিশ্লেষণ ভূগোলের প্রধান উপাদান হলেও এদের মধ্যে বিরাজমান কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধানও হচ্ছে এই শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আরও বিস্তারিতভাবে বলতে হয় যে ইতিহাস ছাড়া ভৌগলিক অনুসন্ধান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কারণ, সবকিছুই সময়ের বিবর্তনে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। তাই বর্তমানকে জানতে হলে অতীতকেও জানতে হবে। ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে অতীত ও বর্তমানের এক সমন্বয়ী উপলব্ধি চাই। তাই Perpillou (1966) মন্তব্য করেছেন যে ভূগোল-শাস্ত্র সেইদিক দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস অনুশীলনের অনুরূপ। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ইতিহাস ছাড়া অন্যান্য বিষয় থেকে সংগৃহীত চিন্তাধারা এই শাস্ত্রের উৎকর্ষতা আরো বাড়িয়েছে। সেই সঙ্গে এই শাস্ত্র বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে, তবে, এই শাস্ত্র যখন প্রাকৃতিক (Physical) ও মানব (Human) শাখায় বিভক্ত হল, তখন থেকে এর নতুন করে পথ চলা শুরু হল। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অবস্থান নির্ণয় করার মধ্যে দিয়ে মানবীয় ভূগোলের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে ভূগোলের এই উপশাখার কলেবর আরও বাড়ল। এই উপশাখার বিভিন্ন বিষয়গুলো একে অপরের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত যে এগুলোর মধ্যে অনেক সময় বিভাজনকারী সীমারেখা টানা সম্ভবপর হয় না। মানবীয় ভূগোলের এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল "জনসংখ্যা ভূগোল।" এই ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে যে মানুষ, সেই মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে এই ভূগোল।

মনে রাখতে হবে জনসংখ্যা বিষয়ক অধ্যায়ন বহুদিন সমাজ বিজ্ঞানী (ভৌগোলিক সহ) আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এর বিষয়সূচী ও পদ্ধতিগত সমস্যা অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাঠ করা হয়। ভূগোল শাস্ত্রে জনসংখ্যার বণ্টন বহুদিন যাবৎ সনাতন মানবীয় ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও ঐতিহ্যগতভাবে ভূগোলকে প্রাকৃতিক ও মানবীয় ভূগোল এই দুই শাখায় ভাগ করা হয়, তবু ভূগোলশাস্ত্রে মানুষের স্থান নিয়েই ভৌগলিকদের নিজেদের মধ্যেই বিষয়গত বিতর্ক (academic dispute) রয়ে গেছে। (Clarke, 1965)

এই ধরণের প্রশ্নের পেছনে রয়েছে পূর্ববর্তী ভৌগলিকদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া। সাধারণভাবে ভূগোলকে দীর্ঘদিন যাবৎ ভূ-বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে পৃথিবীর বাসিন্দাদের চেয়ে পৃথিবীর (ভূ-পৃষ্ঠের) বিশ্লেষণে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়। যাই হোক, ভূগোল যে সমাজ বিজ্ঞানের একটি বিষয় এই ধারণা বেশী করে আমাদের মনে বদ্ধমূল হবার পর ভৌগলিকরা জনসংখ্যা ও তার সাথে সমস্যাবলী প্রকাশনার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন।

পরিবেশ অধ্যয়ন থেকে মনুষ্যকূলের দিকে ভৌগলিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর এই যে পরিবর্তন তা ধীরে ধীরে হয়েছে। ফরাসী দেশে ভিদাল্-দি-লা ব্লাঁ, জি ব্রুনস এবং ম্যাক্রিমিলেন সরি-ব অবদান এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের আর্থার গেডেস ভৌগলিকদের মধ্যে জনসংখ্যা অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টিপাত করেন। যুক্তরাষ্ট্রে বার্কার (Barker), ম্যাককার্টি (Mccarty) প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা জনসংখ্যার অর্থনৈতিক বিষয় গুরুত্ব দিলেন। অরোসু (Aurousseau) জেফারসন (Jefferson) ভূগোলের এই শাখার প্রতি বেশী করে দৃষ্টি দেবার জন্য কিছু প্রবন্ধও প্রকাশ করেছেন।

১৯৫৩ সালকে ভূগোলের এই শাখার বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলা যেতে পারে। এই বছরই Trewartha 'Association of American Geographers'-র অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ভূগোলশাস্ত্রে 'জনসংখ্যা' নামক উপবিষয় খোলার জন্য বক্তব্য রাখলেন। ঐ অধিবেশনে তিনি A Case for Population Geography নামক প্রবন্ধে ভূগোলের একটি শাখা হিসাবে জনসংখ্যা ভূগোলের উন্নয়ন সাধনের জন্য চেষ্টা করেন। ভৌগলিক এলাকার

বিভিন্নতা এবং বৈশিষ্ট্যের আলোকে জনসংখ্যার স্বতন্ত্র পর্যালোচনা ভৌগলিকদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি তিন স্তর বিশিষ্ট মূল কাঠামোর প্রস্তাব করেন ঃ

1. জনসংখ্যার অধ্যয়ন ভূগোলের একটি প্রাণবন্ত বিষয়। তাই জনসংখ্যার পর্যালোচনা করার সময় মানুষকে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে গণ্য করা উচিত, কারণ মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের রূপান্তর ঘটিয়ে উৎপাদন এবং ভোগ করে।

2. মানুষের ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক জগৎ বিভিন্ন সম্পদের যোগান এবং

3. সংস্কৃতি হচ্ছে মূলতঃ প্রাকৃতিক বস্তু থেকে মানুষের সৃষ্ট এক জগৎ।

উপরোক্ত ত্রিমুখী শ্রেণীবিন্যাসে তিনি জনসংখ্যাকে ঐক্যবদ্ধ ভৌগলিক কাঠামোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট স্থান করে দেন। ইতিপূর্বে প্রচলিত ভূগোলের দ্বিমুখী শ্রেণীবিন্যাসে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির স্বীকৃতি ছিল (দে, ২০০৪)। Trewatha-র পর জনসংখ্যা ভূগোলের ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে আসেন জেলেস্কি (Zelinsky)।

A Prologue to Population Geography তে তিনি বলেছেন জনসংখ্যা ভূগোল প্রধানতঃ বৃহত্তর ভূগোলের একটি শাখা। তাঁর মতে জনসংখ্যা ভূগোল নিজের পূর্ণতার জন্যই জনবিজ্ঞানের (Demography) বিভিন্ন বিষয়ের সহায়তা গ্রহণ করে। তিনি বলেছেন জনসংখ্যা ভূগোলের অধ্যায়ন তিনটি পদ্ধতিতে হতে পারে।

(ক) অঞ্চলভেদে মানুষের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের সাধারণ বর্ণনা।

(খ) মোট জনসংখ্যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও বাহ্যিক গঠনের বর্ণনা।

(গ) জনসংখ্যার অপরাপর আনুষঙ্গিক কারণের ভৌগলিক বিশ্লেষণ।

জেলেনস্কি-এর মতে জনসংখ্যার বিভিন্ন নির্ধারকগুলি স্থান ও কাল ভেদে আলাদা হতে পারে। আবার কোন অঞ্চলের মানুষের বৃদ্ধি চারিত্রিক নিয়মে গঠিত হয়। তিন সুপারিশ করেন যে জনসংখ্যা ভূগোলবিদ্‌রা নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় জাতিসমূহের বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা প্রয়োজনে গ্রহণ করতে পারে।

জেলেনস্কি মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

(ক) প্রয়োজনীয় জৈবিক কার্যাবলী।

(খ) আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী।

(গ) জনসংখ্যার পরিবর্তন এবং গতিশীলতা।

মূলতঃ Trerwartha ও Zelinsky-র আলোচনা এবং গবেষণার পথ ধরেই পরবর্তীতে ভৌগলিকরা এগিয়ে আসেন এবং জনসংখ্যা ভূগোলকে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শাখা হিসাবে গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে Beaujeu Garnier, Ackeman Griffen-এর নাম করা যায়। Garnier তাঁর আলোচনায় জনসংখ্যার পৃথিবীব্যাপী বণ্টন, মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশ ও মানুষের অর্জিত সাফল্যের মাত্রা ইত্যাদি বিষয়গুলি এই ভূগোলের মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশ ও মানুষ্যের অর্জিত সাফল্যের মাত্রা ইত্যাদি বিষয়গুলি এই ভূগোলের মধ্যে অন্তর্ভূক্তিকে সুপারিশ করেন। তাঁর মতে জনসংখ্যা ভৌগলিক প্রদত্ত পরিবেশে বিভিন্ন জনতাত্ত্বিক উপাদানের নিয়ামক ও তাদের কার্য কারণের পর্যালোচনা পাশাপাশি মূল বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাব্য পরিণতি বর্ণনা করবেন। পক্ষান্তরে, এ্যকারম্যান বিভিন্ন পর্যায়ে জনসংখ্যা ভূগোলের সমস্যাদির সীমা নির্দেশসহ ভূগোল শাস্ত্রে জনসংখ্যার গবেষণার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সুচকের কথা বলেছেন। তিন জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু আরও বিস্তৃত করতে সক্রিয় চেষ্টা করেন।

জনসংখ্যার ভূগোলে Griffen জনসংখ্যার পরিমাণগত ও গুণগত নিয়ামকসমূহ স্থান দিয়ে তাদের সংখ্যাতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দেন।

এইভাবে জনসংখ্যা ভূগোলের ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই গোটা বিশ্বে ভূগোল শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলাদা শাখা হিসাবে এই উপবিষয় স্বীকৃতি লাভ করেছে।

### 1.2.1 জনসংখ্যা ভূগোলের সংজ্ঞা (Definition of Population Geography)

The Dictionary of Human Geography (ed. by R. J. Johnston) এর মতে জনসংখ্যা ভূগোল হল—''The study of the ways in which spatial variations and growth of population are related to the nature of place.'' সোজা কথায় জনতার গঠন, বণ্টন, পরিযান এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিভাবে কোন স্থানের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ স্থানিক পার্থক্য নির্ণয়ই হল জনসংখ্যা ভূগোল। এ বিষয়ে ভৌগলিকদের সাথে জনমিতবিদদের (Demographers) পার্থক্য হল প্রথমোক্তরা স্থানিক পার্থক্যের ওপর জোর দেন আর শেষোক্তরা ব্যাক্তির জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জোর দেন। তাঁরা পরিযানের এবং সাধারণভাবে স্থানিক পার্থক্যের প্রভাব বাদ দেন। অতএব আমরা দেখলাম মানুষ-ই হল এই ভূগোলের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

Trewartha তাঁর Geography of Population গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, ''Population serves as the point of reference from which all other geographic elements are observed and from which they all singly and collectively desire significance and meaning.'' Trewartha আরো বলেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে মনুষ্যবসতির যে পার্থক্য রয়েছে তাও এই ভূগোলের অন্তর্ভূক্ত। ক্ষেত্রীয় বিভাজন (areal differentiation) যেমন ভূগোলের আলোচ্য বিষয় তেমনি মানুষও হল এই ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দু। মানুষ শুধুমাত্র প্রকৃতির পার্থিব সম্পদ ভোগকারী নয়, সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যের স্রষ্টা।

**American Geography :** Inventory and Prospects-এর সম্পাদকদ্বয় Preston E. James এবং C. F. Jones-এর মতে ''The Geography of Population is concerned with area differentiation of a peculiar kind ..... Geographers always deal with phenomena which are so distributed over the curved surface of the earth that the patterns of distribution cannot be seen in one glimpse'' অর্থাৎ জনসংখ্যা ভূগোল একটি বিশেষ ধরণের আঞ্চলিক পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করে। পৃথিবীর বক্রপৃষ্ঠে জনসংখ্যা বণ্টনে যে অসাম্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করা ভৌগলিকদের কাজ। James and Jones আরো বলেছেন যে জনসংখ্যা ভূগোলের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হল মানুষের সঙ্গে অন্যান্য সম্পর্ক নষ্ট না করে জনসংখ্যা বণ্টনের একটি সাধারণ সূত্র বার করা। (In the field of population geography the need is to find a way to generalize the distribution of people without observing the relationships of man to the phenomena with which he is really associated.'')

Clarke **(Population Geography)**-এর মতে জনসংখ্যা ভূগোল হল কোন স্থানের প্রাকৃতিক পার্থক্যের মধ্যে জনসংখ্যার বন্টন, গঠন, পরিযান এবং জনবৃদ্ধির স্থানিক পার্থক্যের সম্পর্ক। Clarke আরো বলেছেন যে, জনসংখ্যা ভূগোলের মূল কথা হল— প্রাকৃতিক এবং মানবীয় পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ। উপরোক্ত লেখকদের (Clarke ও Trewartha) জনসংখ্যা ভূগোলের সংজ্ঞা নিয়ে মত পার্থক্য নেই বললেই চলে। তবে Clarke জনসংখ্যা ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির বন্টনের ওপর জোর দিয়েছেন।

Zelinsky **(A Prologue to Population Geography)**-এর মতে জনসংখ্যা ভূগোল হল—''The Science that deals with the ways in which the geographic character of places is formed by and in turn,

reacts upon, a set of population phenomena that vary within it through both space and time.'' সোজা ভাষায় জনসংখ্যা ভূগোল হল এক বিজ্ঞান যার আওতায় রয়েছে কোন স্থানের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি এবং ভৌগলিক বিষয়সমূহের ওপর প্রভাব। স্থান ও কালের সঙ্গে সঙ্গে এসব প্রভাবের পার্থক্যের রূপরেখা নিয়েও এই ভূগোল আলোচনা করে।

Beaujeu Garnier তাঁর **Geography of Population** -এ ভূগোলের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল বর্তমান পরিবেশের প্রেক্ষাপটে জনমিতিক বিষয়গুলির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণ। বিজু-র মতে এই ভূগোলের the most elementary fact is the distribution of population.

Population Geography : A Reader-এর লেখকত্রয়ের (Demko, Rose, Schnell) মতে মানুষের জনমিতিক (Demographic) এবং অ-জনমিতিক (Non-Demographic) বৈশিষ্ট্যের স্থানিক পার্থক্য এবং কোন স্থানে কিছু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা এই ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

R. C. Chandna ও M. S. Sidhu (Introduction to Population Geography)-এ বলেছেন যে, এই ভূগোল হল জনতার স্থান ও কালের ব্যাখ্যা তথা অভিব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। Chandna আরো বলেছেন যে, স্থানিক বন্টন ও তা সৃষ্টিকারী পদ্ধতিগুলোর অনুসন্ধান আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের রূপরেখাকে আরো অর্থবহ করে তোলে।

রাশিয়ান ভূগোলবিদ Melezin-এর মতে জনসংখ্যা ভূগোল হল জনতার বন্টন এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উৎপাদনের সম্পর্কের আলোচনা।

Ackerman-র মতে মানুষের নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক, স্থানগত বন্টনের গতিশীল উৎপাদন এবং তাদের পারস্পরিক পরিবর্তন সম্পর্ক নিয়ে সাধারণ ভূগোলের যে অংশ পর্যালোচনা করে তাকে জনসংখ্যা ভূগোল বলে।

P.F. Griffin-এর মতে জনসংখ্যার পরিমাণগত ও গুণগত বিষয়ের পাশাপাশি ভৌগোলিক এলাকার প্রকৃতি অনুযায়ী জনসংখ্যার কাঠামো, বন্টন, অভিগমন এবং পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনাই হল জনসংখ্যা ভূগোল। জনসংখ্যা ভূগোলের এ রকম অনেক সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। তবে উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে কোন স্থানের জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বন্টন, পরিবর্তন, পরিযান ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির আলোচনাই হচ্ছে জনসংখ্যা ভূগোল। বিশদভাবে বললে বলতে হয় যে সব অবস্থার কারণে জনসংখ্যা পরিবর্তন ঘটে এবং ভৌগলিক পরিবেশের তারতম্য হেতু জনসংখ্যার কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে তার এলাকাভিত্তিক গুণগত এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণকে জনসংখ্যা ভূগোল বলা হয়।

## 1.3 জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু (Scope and Content of Population Geography)

**জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধি ঃ** সাধারণভাবে বলতে গেলে কোন ভৌগলিক এলাকার বিরাজমান বিভিন্ন উপাদান অক্ষুণ্ণ রেখে জনসংখ্যা বিন্যাসের সাধারণীকরণের পদ্ধতি এবং পন্থাই হচ্ছে জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধি। এই নিয়ে দুই ধরণের ব্যাখ্যা রয়েছে ঃ

**পুঁজিবাদী ভূগোলবিদ্‌দের ব্যাখ্যা** — Clarke, Zelinsky, Trewartha, Ackerman, Beaujeu Garnier প্রমুখ

ভৌগলিক জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধি সম্পর্কে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন। Clarke মতে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধি বিস্তৃত অর্থে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(i) মানুষের আপেক্ষিক সংখ্যা।

(ii) জনসংখ্যার সামাজিক প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য।

(iii) জনসংখ্যার গতিশীলতা।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ থেকে জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত, মানুষের বয়স কাঠামো, পরিবার, বাসস্থান, শিক্ষা, ধর্ম, ভাষা, কর্মধারা ইত্যাদি বিষয় আসে। এক কথায় জনসংখ্যার বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, মানুষের পরিমাণগত ও গুণগত দিক এবং তার গতিশীলতা এই ভূগোলের আওতার মধ্যে আসে।

পক্ষান্তরে জেলিনিস্কি বলেছেন, কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বসবাসরত জনতার সংখ্যা, তার বৃদ্ধি এবং কারণসমূহের বিশ্লেষণই এই ভূগোলের পরিধি। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তিনি (i) জৈবিক, (ii) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং (iii) গতিশীল ইত্যাদি উপাদানগুলিকে দায়ী করেছেন।

ট্রিওয়ার্থা (Trewartha)-র মতে মানুষের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে পর্যালোচনাই হল জনসংখ্যা ভূগোল। তাই এর পরিধির মধ্যে জনসংখ্যার বন্টন, ঘনত্ব, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়গুলি আসবে।

প্রখ্যাত ভৌগলিক বিজু গার্নিয়ারের মতে জনসংখ্যার মূল বৈশিষ্ট্য এবং তার পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণসমূহ এই ভূগোলের পরিধি হওয়া উচিত। তাঁর মতে ভূগোলের এই শাখার বিশ্লেষণ তিনটি কারণের উপর নির্ভর করে—

(ক) বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার অঞ্চলগত বন্টন।

(খ) ভৌগলিক ভিত্তিতে সমাজের বিবর্তন

(গ) বিভিন্ন কাজের সাফল্য।

তাঁর আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধির বিভিন্ন দিকগুলি হল—

(i) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরণ এবং কারণ। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিবাহ, জন্ম-মৃত্যুর হার, স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত, বয়স কাঠামো ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গণ্য করতে হবে।

(ii) জনসংখ্যার ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক ধরন।

(iii) জনসংখ্যার কাঠামো, তার পরিবর্তন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড। এক্ষেত্রে বাড়িঘর, চাষাবাদযোগ্য জমি, বয়স ও স্থানভেদে নারী-পুরুষের গঠন কাঠামো, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলি গণ্য করতে হবে।

**সমাজতন্ত্রী লেখকদের ব্যাখ্যা ঃ** জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধি সম্পর্কে মার্কসীয় ভৌগলিকরা কিছু আলাদা চিন্তাভাবনা করেন। তাঁরা মনে করেন মানুষের উৎপাদনশীল দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জনসংখ্যার বন্টন মূলতঃ নির্ভর করে। এজন্য তাঁরা অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিধির মধ্যে এই ভূগোলের স্থান নির্ধারণ করেছেন। এই ভূগোলের পরিধি সম্পর্কে তাঁরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মার্কসীয় ভৌগলিকরা শহর ও গ্রামীণ বসতি ভূগোল, ঐতিহাসিক ভূগোল, নৃতাত্ত্বিক ভূগোল এবং সম্পদের ভূগোলকে জনসংখ্যা ভূগোলের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন। সোভিয়েত ভূগোলবিদ Pokshishevskii জনসংখ্যার ভূগোল সম্পর্কে বেশ কিছু সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যা পরবর্তীকালে Melezin নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

(i) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ধরণ জনবসতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

(ii) প্রাকৃতিক অবস্থা দ্বারা ধরণের ভৌগলিক উৎপাদন নির্ধারিত হয় এবং তার প্রভাব বসতি ও তার আকৃতির উপর পরিলক্ষিত হয়।

(iii) কোন নতুন এলাকায় আগমনকারী জনসংখ্যার মানিয়ে নেওয়া ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট এলাকার পূর্বে বিরাজমান উৎপাদন পদ্ধতি এবং দক্ষতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে উৎপাদন পদ্ধতি ও দক্ষতা ও দক্ষতার বিকাশের সাথে সাথে এই নিয়ামকের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে কমে আসে। (দে, ২০০৪)।

(iv) কর্মকাণ্ডের পরিধি এবং শিল্পসংগঠনের জটিলতার উপর নির্ভর করে শহর ও নগরগুলিতে জনসংখ্যার আকার প্রভাবিত হয়।

মার্কসীয় ভৌগলিকদের বিভিন্ন আলোচনা থেকে দেখা যায় জনসংখ্যার বন্টন এবং এর বিভিন্ন দলের উৎপাদনশীল পারস্পরিক সম্পর্ক, জনবসতী বিন্যাস এবং সমন্বয় সাধন ইত্যাদি বিষয়গুলি জনসংখ্যা ভূগোলের পরিধির মধ্যে আসে।

**বিষববস্তু ঃ**

জনসংখ্যা ভূগোলের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভৌগলিকদের লেখনীতে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। যেমন Trewartha-এর মতে জনসংখ্যা ভূগোলের বিষয়বস্তু হল— (i) অতীতের জনসংখ্যার বন্টন, (ii) জাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যেমন—বন্টন, পরিযান, জনবৃদ্ধি ইত্যাদি এবং (iii) জনতার গুণাগুণ।

পরবর্তীকালে অবশ্য Trewartha জনতার জৈবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে এই ভূগোলের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

**American Geography : Inventory and Prospects-**এর লেখকদ্বয়-এর মত মৌখিক গবেষণার ক্ষেত্রে মানবীয় ভূগোলের মতো এখানেও কিছু কিছু সুবিধে আছে। যেমন—i) জনসংখ্যা বণ্টনের মানচিত্রে আরও সন্তোষজনক পদ্ধতির উদ্ভাবন। (ii) অতীতের জনসংখ্যা বন্টনের ধাঁচ। (iii) জনসংখ্যা পরিবর্তনের ধারা। (iv) অন্যান্য ভৌগলিক বিষয়ের সাথে জনসংখ্যার সাংস্কৃতিক সম্পর্কের যোগসূত্র সম্পর্কে আলোচনা।

পরিযানের (migration) অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকটাও তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। কি কি কারণে পরিযান ঘটে থাকে বা পরিযানের প্রকারভেদ যেমন আন্তঃশহর পরিযান (Intra-urban migration), গ্রাম থেকে শহরে পরিযান কিংবা শহর থেকে শহরে পরিযান ইত্যাদি বিষয়গুলোও ভৌগলিকেরা আলোচনা করে থাকেন। মোট কথা জনসংখ্যা ভূগোলের প্রধান বক্তব্য হল—জন্ম, মৃত্যু ও পরিযান সম্পর্কিত আলোচনা এবং তাদের ব্যাখ্যা।

Clarke তাঁর Population Geography-তে এ বিষয়ে তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেমন—(i) জনতার মোট সংখ্যা। (ii) জনতার বাহ্যিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (iii) জনতার পরিবর্তনশীলতা, যথা—জন্ম, মৃত্যু ও পরিযান।

Zelinsky-র মতে এই ভূগোলের বিষয়বস্তু মূলতঃ দুটি—

(i) জনতার বন্টন সম্পর্কে সহজ ব্যাখ্যা। (ii) জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ভৌগলিক বিশ্লেষণ। Beaujeu-Garnier বলেছেন, জনসংখ্যা ভূগোলের বিষয়বস্তু তিনটি আলোচনাতে সীমাবদ্ধ যেমন—

(i) ভূ-পৃষ্ঠে জনসংখ্যার বন্টন।

(ii) মনুষ্য সমাজের বিবর্তন।

(iii) মানুষের অর্জিত সাফল্যের মাত্রা।

Demko-এর মতে, এই ভূগোলের বিষয়বস্তু হল—

(i) অতীতের জনসংখ্যা বন্টন।

(ii) জাতির সংখ্যা।

(iii) জনতার বিভিন্ন গুণ, যেমন— জনতার শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং জনতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের আঞ্চলিক বন্টন।

Peters and Larkin-র মতে, জনসংখ্যা ভূগোলের বিষয়বস্তু বহুবিধ—

(i) জনসংখ্যা বন্টন,

(ii) জনসংখ্যার গঠন,

(iii) জনতার পরিবর্তন,

(iv) জনতার জন্ম, মৃত্যু, পরিযান,

(v) জনতার বাসস্থান,

(vi) জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিধি,

(vii) জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহ।

অপর এক ভৌগোলিক Woods (Population Analysis in Geography)-র মতে এই ভূগোলের বিষয়বস্তু গতানুগতিক, যেমন— জন্ম, মৃত্যু ও পরিযান। তবে এই ভূগোলের ক্ষেত্রে তাঁর একটি বড় অবদান হল—মডেল (Model)-র ব্যবহার।

R. C. Chandna-র ম'তে এই ভূগোলের প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু হল—

(i) জনতা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব,

(ii) জনবৃদ্ধি ও পরিযান,

(iii) জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের তারতম্য,

(iv) জাতি গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের সমীক্ষা,

(v) সাক্ষরতা,

(vi) নগরায়ণ,

(vii) জনসংখ্যায়-উপকরণ (Resource) সমীক্ষা,

(viii) জনসংখ্যা অঞ্চল,

(ix) কর্মরত জনসংখ্যা এবং

(x) জীবিকাগত গঠন (occupational structure)।

Pokshishevskii-র মতে জনসংখ্যা ভূগোলের মৌলিক লক্ষ্য কিছু নিয়মের প্রবর্তন যা (1) জনতার বন্টন, (2) বসতির নেটওয়ার্কের গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া এবং (3) বসতি বিকাশ ও তাদের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে।

রাশিয়ায় জনসংখ্যা ভূগোল বিষয়টি বিকাশ লাভ করতে পারেনি। কারণ রুশরা পরিবেশগতবাদের (environmental determinism) বিষয়টি স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে মানুষই হল অর্থনৈতিক স্রষ্টা। এই আলোকে রাশিয়ায় জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা অর্থনৈতিক ভূগোলের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। এঁদের জনসংখ্যা ভূগোলের আলোচনায় জনবসতি ভূগোল, বসতির ইতিহাস, শ্রমিক সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান পায়।

উপরের আলোচিত বিভিন্ন লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জনসংখ্যা ভূগোলের বিষয়বস্তুকে পাঁচটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। যথা—

**১. জনসংখ্যা ও পরিবেশ ঃ** মানুষ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি দ্বারা তাদের পরিবেশের প্রাকৃতিক অবয়ব পর্যবেক্ষণ করে। যেমন—

**(ক) পারিপার্শ্বিক প্রভাব ঃ** এর কারণে কোন স্থানের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি, আবার কোথাও কম হয়। এর পেছনে কতগুলো উপাদান আছে। যেমন ভূমি ভাগ, জলবায়ু, মৃত্তিকা, সাগরের অবস্থান, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নিরক্ষীয় আমাজান আবহিক অপেক্ষা আন্দিজ পার্বত্য এলাকায় মানুষের বসবাস অধিক।

(খ) **পরিবেশের প্রত্যক্ষরূপ ও জনসংখ্যা বন্টন ঃ** জনসংখ্যা বন্টনের বিভিন্নতা নির্ভর করে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী দ্বারা পরিবেশকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করার ওপর।

(গ) **জনসংখ্যার ঘনত্ব ও পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন ঃ** জনসংখ্যার ঘনত্ব সেই এলাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলশ্রুতিতে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে।

**২. সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য এবং বসতির ধরণ (Cultural Landscape and Residential Pattern) ঃ** সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য জনসংখ্যা বন্টনে স্পষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং এক সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে কৃষি খামার লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ঘরবাড়ি তৈরী করে।

**৩. জনসংখ্যার সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি ঃ** সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি বলতে কোন স্থানে জনসংখ্যার উপস্থিতির ফলে ঐ স্থানের জনসংখ্যার সংস্কৃতিকগত উপাদানের বিস্তারকে বোঝায়। সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি দুই ধরণের। যথা—

**(ক) অভিগমন ঃ** বিভিন্ন কারণের জন্য মানুষ যখন চিন্তা করে অবস্থানের চেয়ে গমন করাই শ্রেয় তখনই অভিগমন ঘটে থাকে। অভিগমন হল পুনঃ অবস্থানিক পরিব্যাপ্তি।

(খ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিব্যাপ্তিঃ ভিন্ন সংস্কৃতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ধারণা ও বাধাসমূহ নানা প্রকারের থাকে। এ কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন প্রকার পার্থক্য ও নীতি সৃষ্টি হয়।

**৪. ভৌগলিক অঞ্চল** (Geographical region) ঃ ভূগোলবিদ্‌রা অঞ্চলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে এক একটি অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব, বৃদ্ধি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহের স্থানিক প্রভেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়। জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে ভৌগলিকরা কয়েক প্রকার অঞ্চলের কথা বলে থাকেন। যথা—

**(ক) জনঘনত্ব বহুল অঞ্চল ঃ** মহাদেশ ও একক হিসাবে জনসংখ্যার ঘনত্বকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(i) প্রায় জনশূন্য অঞ্চল—প্রতি বর্গমাইলে ০-২৫ জন লোক বাস করে।

(ii) মধ্যম বসতি অঞ্চল—প্রতি বর্গমাইলে ২৬-১২৫ জন লোক বাস করে।

(iii) পরিমিত জনবসতি অঞ্চল—প্রতি বর্গমাইলে ১২৬--২৫০ জন লোক বাস করে।

(iv) ঘন বসতি অঞ্চল—প্রতি বর্গমাইলে ২৫০ জনের বেশী লোক বাস করে।

**(খ) প্রজননশীলতার ধরন ঃ** অবস্থান ও অর্থনীতি ভেদে প্রজননশীলতার তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। যথা—

(i) নিম্ন অক্ষাংশের দেশসমূহে জন্মহার বেশী। যেমন আরব এবং আফ্রিকার দেশসমূহ।

(ii) মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশের দেশসমূহে জন্মহার কম।

(iii) উন্নয়নশীল দেশের জন্মহার বেশী কিন্তু উন্নত বিশ্বের জন্মহার কম।

(গ) **মরণশীলতার ধরন ঃ** স্থানভেদে মরণশীলতার ব্যবধানও আছে। যেমন—

(i) উন্নত ও উন্নতশীল দেশসমূহের মৃত্যুহার কম।

(ii) অনুন্নত দেশগুলোতে মৃত্যুহার বেশী।

(iii) জটিল রোগসমূহের জন্য ক্রান্তিয় আফ্রিকাতে মৃত্যুহার পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী।

(ঘ) **বয়স ও নারী-পুরুষ বন্টন ঃ** যে সব দেশে প্রথমদিকে শিল্পায়ন সম্পন্ন হয়েছে সেখানে ১৫-১৯ বৎসর বয়সের লোকসংখ্যা বেশী। শহরে কাজের সুযোগ থাকায় বহু পুরুষ শহরে চলে আসেন। ফলে গ্রামে পুরুষের অভাব আর এর বিপরীতে শহরে নারীর অভাব অনুভূত হয়।

৫. **সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ ও জনসংখ্যার ধরণ ঃ** বংশ গতিধারা, খাদ্যদ্রব্য, পছন্দের অগ্রাধিকার, রাজনীতি, অভিগমনের প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় জনসংখ্যা বন্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। একে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) চাষাবাদ, অভিগমনের দৃষ্টিভঙ্গী, বিবাহ ইত্যাদি অনেক বিষয় জনসংখ্যা বন্টনে প্রভাব বিস্তার করে।

(খ) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ সরকারের কার্য এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বন্টিত হয়ে থাকে।

## 1.4 অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সাথে জনসংখ্যা ভূগোলের সম্পর্ক (Relationship of Population Geography with other Social Sciences)

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জনসংখ্যার বিভিন্ন সমস্যা সমাজবিজ্ঞানীদের মনে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি করে। জনসংখ্যা বিজ্ঞান কেবলমাত্র সমাজবিজ্ঞানের একক আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। ভূগোল ছাড়া জনমিতি বিজ্ঞান (Demography), সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়েরও জনসংখ্যা বিদায় নিজস্ব অবদান রয়েছে। জনসংখ্যা ভূগোল ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়।

জনমিতি বিজ্ঞান ও জনসংখ্যা ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়ের একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ার মতন, ঐতিহ্য অনুসারে জনমিতি বিজ্ঞান জনসংখ্যার বিভিন্ন জীবনগত (Vital) পরিসংখ্যার বিশ্লেষণ করে। জনমিতিবিদরা জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের পরিসংখ্যান নিয়ে বেশী মাথা ঘামান। (Boungeois-Richat)-র মতে তাঁরা পরিযানের প্রভাব এবং স্থানিক পার্থক্যের ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। Kirk-র মতে জনমিতি বিজ্ঞান মানুষের জন্ম, মৃত্যু, পরিযান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। জনমিতিবিদরা পরিসংখ্যানের উৎস, তাদের মান ও প্রাপ্ততা এবং বিশ্লেষণের ধারা নিয়ে বেশি মাথা ঘামান। এ জন্য মনে হয় জনমিতিবিদদের মুখ্য দৃষ্টি জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যতে সীমাবদ্ধ। স্থান, কাল তাঁদের ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।

1979 সালে প্রকাশিত Woods-র **Population Analysis in Geography** গ্রন্থটি জনসংখ্যা ভূগোলের আলোচনায় এক নূতন দিগন্তের উন্মোচন করল। যদিও বইটির শুরু হয়েছে জনসংখ্যা ভূগোল ও গণতত্ত্বের (Demography) মধ্যে পার্থক্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছে দেশের ভবিষ্যত উন্নতিতে জনসংখ্যার আলোচনা ও জনসংখ্যা ভূগোলের স্থান নিয়ে, তবুও বইটির বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে **আচার-বিশ্লেষণ** (behavioural

analysis) মডেলের ব্যবহার। জনতার নানান বৈশিষ্ট্য যেমন প্রজনন, মৃত্যু, পরিযান ইত্যাদি এ বইটিতে স্থান পেয়েছে যা বইটির নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই বইটির জনসংখ্যার গঠন ও পরিবর্তন নামক পরিচ্ছেদটি আগামী দিনের ভৌগোলিকদের কাছে জনসংখ্যা-সংক্রান্ত গবেষণায় প্রেরণা জোগাবে। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলো তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যার বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করে। তাই, একদিকে জনসংখ্যা ভূগোল ও অপরদিকে জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনাকারী সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা শক্ত, বিশেষ করে জনসংখ্যা ভূগোল ও জনমিতির মধ্যে। কারণ উভয়ের পাঠক্রমের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সচরাচর জনমিতি বিষয়টি জীবনগত পরিসংখ্যানের (vital statistics) সঙ্গে সম্পর্কিত। Kirk-এর মতে জনমিতি বিষয়ের পাঠ্যসূচির বেশির ভাগই হল জনতার পরিমাত্রিক (quantitative) বিশ্লেষণ। জনমিতিবিদ (Demographer) জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদি পরিসংখ্যান নিয়ে বেশি মাথা ঘামান। পরিযানের প্রভাব ও স্থানিক পার্থক্যের ব্যাপারটা তাঁর ধর্তব্যের মধ্যে অনেন না। জনমিতবিদরা পরিসংখ্যানের (data) উৎস, তাদের গুণগত মান (Quality) ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপর বেশি জোর দেন। Clarke তাঁর **Population Geography** তে (P-2) জনমিতি ও জনসংখ্যা ভূগোলের মধ্যে পার্থক্যটি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ''Like demography, population geography is basically quantitive, it is largely dependent upon statistical data. But both have a qualitative approach; demographers examine various physical, intellectual character, qualities of populations to se their connections with quantitative aspects while population geographers endeavour to unravel the complex interrelationships between physical and human environment on the one hand and population on the other.'' তবে এটা ধারণা করা খুব ভাল হবে যে জনমিতিবিদরা শুধুমাত্র জনসংখ্যা পরিসংখ্যাবিদ এবং এদের স্থানিক বোধ ব্যাপারটা নেই। সাম্প্রতিককালে জনমিতিবিদরা আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে অনেক অবদান রেখেছেন। জন্ম, মৃত্যু বা পরিযানকে একত্রিত করে তাঁরা অন্ত-আঞ্চলিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির (model) মডেল তৈরি করেছেন। বস্তুতপক্ষে, জনমিতির ও জনসংখ্যা ভূগোল পরস্পরের সঙ্গে এত নিবিড় সম্পর্কিত যে এই দুটি বিষয়কে একত্রিত করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে জনসংখ্যা ভৌগোলিকদের জনমিতিবিদদের উচ্চমানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। বিনিময়ে, জনমিতিবিদরা ভৌগোলিকদের স্থানিক ধারণাটিকে জনমিতি আলোচনায় বেশি গুরুত্ব দেবেন।

সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে জনসংখ্যা ভূগোলের সম্পর্ক আছে। তবে এই সম্পর্ক মূলত তাদের বিষয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করে। যেমন সমাজতত্ত্ববিদ জনসংখ্যা বিষয়টিকে "সামাজিক গোষ্ঠীর" দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করেন। পক্ষান্তরে নৃতত্ত্ববিদদের প্রধান বিষয় তিনটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে—(1) মানুষের বিবর্তন, (2) মানুষের বংশপরাম্পরা, (3) মনুষ্য জাতির শ্রেণিবিভাগ। আবার ঐতিহাসিকরা সময়ের সাথে জনসংখ্যা বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেন। অর্থাৎ জনসংখ্যা সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের আলোচ্য বিষয় হল কালের বিবর্তনে জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি। অর্থনীতিবিদদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনার বিষয় হল ''Incidential and economic implications of any demographical pattern.''

তাই বলা চলে, সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ভূগোল শাস্ত্র অভূতপূর্ব, যেহেতু তারা স্থানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জনসংখ্যা বিষয় আলোচনা করেন। ভূগোলের এই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী তাকে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান থেকে আলাদা করেছে।

শুধু সমাজবিজ্ঞান নয়, ভূগোলের অন্যান্য নবীন শাখা সম্পর্কেও জনসংখ্যা ভূগোলে আলোচনা করতে হবে। ধরা যাক, সমাজ ভূগোল (Social Geography)-র কথা। এর অনেকগুলো বিষয়ের সঙ্গে ভূগোলের বিষয়ের মিল আছে। তবে, জনসংখ্যার আলোচনায় সমাজ ভূগোলের চেয়ে জনসংখ্যা ভূগোলের অবদান অনেক বেশি, কারণ

সমাজ ভূগোলে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই স্থান পায়। কিন্তু জনসংখ্যা ভূগোলে জনতার বহুবিধ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

## 1.5 জনসংখ্যা ভূগোল পাঠের গুরুত্ব (Importance of the Study of Population Geography)

বর্তমান সময়ে জানবার ক্ষেত্র এত ব্যাপক হচ্ছে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাত্রায় (degree) ও দৃষ্টিভঙ্গীতে (outlook) প্রতিটি বিষয়েই অভিনবত্ব এসেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে তাদের কার্যকারিতা (Functionability)। বয়সে নবীন হলেও জনসংখ্যা ভূগোল ইতিমধ্যেই পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। কারণ আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। আদিম কাল থেকে প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে নিজ আয়ত্তে আনবার, মেরু বিজয়ের কেতন শূন্যে তুলে ধরবার কিংবা দেশের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের হোতা মানুষের আচার-আচরণ, পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। আর এই দিকটির কথা মনে রেখেই Trewartha 1953 সালে ভূগোলের এই শাখার সূচনা করেন।

## 1.6 উপকল্প ও পদ্ধতি (Approaches and Methodology)

1953 সালে Association of American Geographers নামক সমিতিতে Trewartha-র সভাপতির ভাষণের (Presidential Address) আগে পর্যন্ত জনসংখ্যা আলোচনা ছিল আঞ্চলিক ভূগোলের (Regional Geography) অংশবিশেষ। অঞ্চলের সব বৈশিষ্ট্যই এই ভূগোলের আওতায় আসে। জনসংখ্যাও এই ভূগোলের আলোচনার একটি উপাদান। Trewartha-র মতে স্থানিক ধারণা (space concept) বিষয়টি ভূগোলের যে কোন শাখার গবেষণার লক্ষ্য হতে পারে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে ক্রমবদ্ধ উপকল্পের (Systematic approach) সাহায্য নিতে হবে। এতে কোন বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে (i) পরিসংখ্যান সংগ্রহ, (ii) বিভিন্ন বন্টনের সম্পর্কের অনুসন্ধান, (iii) উপযুক্ত পরিসংখ্যান নির্বাচন, (iv) পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ, (v) এর পর সেগুলোকে মানচিত্রে প্রকাশ করা ও (vi) ঐ নকশার বিশ্লেষণ ইত্যাদি ছয়টি ধাপের সাহায্য নেওয়া হয়।

এই ধরনের উপকল্পের প্রধান সুবিধাগুলো হল এই যে কোন ছোপ বা বড় স্থানের ওপর গবেষণা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের পঠন-পাঠনে স্থানিক (areal) ব্যাপারটা প্রাধান্য পায়। তৃতীয়ত, এতে ভূগোলের চিরাচরিত উপাদান বা হাতিয়ার মানচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। জনসংখ্যা ভূগোলে ক্রমবদ্ধ উপকল্প অনুসরণ করতে গিয়ে ভূগোলের চিরাচরিত উপাদানের সর্বত্র প্রয়োগ এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্যতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই পদ্ধতির ত্রুটি হল এই যে এতে ভবিষ্যৎবাণী স্থান পায় না। তাই বলা চলে যে 1953 সাল ছিল ভৌগোলিকদের কাছে এক সন্ধিক্ষণ। কারণ, এই সময় জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনা আঞ্চলিক ভূগোলের সীমানা পেরিয়ে ভূগোলের এক স্বতন্ত্র বিষয়ভিত্তিক শাখায় উন্নীত হল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বহুদিন ধরে জনসংখ্যা ভূগোলের ব্যাখ্যা অর্থনৈতিক ও পরিবেশবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে. যেমন, রাশিয়ায় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism) এত প্রবল ছিল যে সেখানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত জনসংখ্যা ভূগোল অর্থনৈতিক

ভূগোলের অংশ হিসেবে বিবেচিত হত। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রে Zelinsky (**A Prologue to Population Geography**) জনসংখ্যা ভূগোলের ব্যাখ্যায় সাংস্কৃতিক উপাদানের ওপর জোর দিয়েছেন। 1970-র দশক **আচরণ বিপ্লব** (Behavioural Revolution) ভূগোলের ব্যাখ্যায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। ভূগোলের যে কোন বিষয়ে আচরণ—বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় গুণগত পরিবর্তন এনেছে। এই পদ্ধতিতে মানুষের আচরণ কিভাবে তাদের পরিযান, প্রজনন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার ওপর জোর দেওয়া হয়।

## 1.7 পদ্ধতিগত সমস্যা (Methodological Problems)

খুব সহজ ভাষায় পদ্ধতি (Methodology) বলতে বোঝায় কোন বিষয়ে সমস্যা সমাধানের কলাকৌশলকে। এতে প্রথমেই কোন বিষয়ের সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান (Philosophy) পাল্টায়। ফলে, ঐ বিষয়ের সমস্যা সমাধানের কলাকৌশলও পাল্টায়, যাতে করে ঐ বিষয়ের পরিবর্তিত বিস্তৃত দিকগুলোর প্রয়োজন মেটাতে পারা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে যে 1960-র দশক পর্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষবাদ (Logical Positivism) ভূগোলসহ সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একাধিপত্য বিস্তার করেছিল। সেই সময় **পরিমাত্রিক মডেল** (Quantification Model) তৈরি, কল্পিত বিষয় বিচার ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হত 1970 ও 1980-র দশকে মানবীয় ভূগোলে আর্থনীতিক (economic) মডেলের ওপর গুরুত্ব দেবার প্রবণতা দেখা দিল। ফলস্বরূপ, letting date speek for themselves বা পরিসংখ্যানের স্বকীয় ব্যাখ্যার ওপর জোর দেওয়া হল। সাম্প্রতিককালে, জনসংখ্যা ভূগোলের পদ্ধতিগত ব্যাপারে **স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধি ও বিষয়ানুগ বিশ্লেষণের** (topical analysis) ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

তবে জনসংখ্যা ভূগোলে পদ্ধতিগত কয়েকটি সমস্যা আছে—(i) পরিসংখ্যান প্রাপ্তি ও তার গুণগত মান (Quality) ও পরিসংখ্যানের ধারাবাহিকতার অভাব এই বিষয়টির সীমাবদ্ধতাকে ফুটিয়ে তোলে। এখনও কিছু কিছু দেশে জনতার জীবনগত (vital) পরিসংখ্যান নেই। বিশ্বের এক পঞ্চমাংশে জনতার দেশ চীন এখনও পর্যন্ত সীমিত জনগণনা পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারত নিয়মিতভাবে (10 বছর অন্তর) উন্নত মানের জনগণনা পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। ছোট ছোট গরীব দেশগুলো লোকগণনার বিশাল খরচ এবং বিশেষজ্ঞ কর্মীর অভাবে পরিসংখ্যান সংগ্রহ-সমস্যায় ভোগেন।

যদিও 1980 -র দশক থেকে পরিসংখ্যানে ধারাবাহিকতার অভাব ব্যাপারটা আস্তে আস্তে কমে আসছে। তবুও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। যেমন, ভুল তথ্য দেওয়া, বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মধ্যে তুলনার জন্য তথ্যের অভাব, জনগণনার প্রতি মানুষের সন্দেহপ্রবণতা ইত্যাদি। এছাড়া, কোন স্থানে যাতায়াতের অসুবিধে, স্থানান্তরী জনতা (floating population), গৃহহীন ব্যক্তি, অবৈধ অভিবাসন (immigration), জনগণনার উদ্দেশ্য ও মূল্য সম্পর্কে লোকের অজ্ঞতা, বয়স, বৃত্তি সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য দেওয়া ধর্ম, জাতীয়তা, ভাষা বিষয় সম্পর্কে মানুষের স্পর্শকাতরতা (sensitivity) ইত্যাদির জন্য অনেক সময় পরিসংখ্যান তথ্যে ভুল থাকে। তাছাড়া, শহর বসতি, সাক্ষর ব্যক্তি, কর্মী ইত্যাদি সংজ্ঞার যে পরিবর্তন মাঝে মাঝে ঘটে থাকে তার দরুন দুটো জনগণনার মধ্যে অনেক সময় তুলনা করা যায় না। যাহোক, সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যা ভূগোলে সম্পূর্ণভাবে জনগণনা পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভরশীলতা প্রবণতা কমে আসছে। তার বদলে প্রাথমিক (primary) পরিসংখ্যান ব্যবহারের দিকে বেশি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এ ফলে এই ভূগোলের বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে। সমাজতত্ত্ব, মনোতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণার কলাকৌশল জনসংখ্যা ভূগোলেও গৃহীত হচ্ছে।

জনসংখ্যা ভূগোলের বেশির ভাগ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে ধার করা। কিন্তু ছোট অঞ্চল হোক বা বড় অঞ্চল হোক তার নিজস্ব স্থানিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকে। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোরও নিজস্ব বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিকাশ ঘটানো উচিত যাতে করে এই সব দেশ প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দিতে পারে। সবশেষে বলতে হয় জনসংখ্যা ভূগোলবিদ্‌দের আরও বেশি সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। আমাদের এখন গবেষণার বিষয়বস্তু এমন হওয়া উচিত যা কোন সামাজিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

## 1.8 ভারতে জনসংখ্যা ভূগোল (Population Geography in India)

1960-র দশক থেকে এদেশে জনসংখ্যা ভূগোলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। গত 40 বছরে ভূগোলের এই নতুন শাখায় যথেষ্ট কাজকর্ম হয়েছে। প্রফেসর গুরুদেব সিং গোসালের (Gurudev Singh Ghosal) গবেষণাপত্র (1956) দিয়ে এদেশে জনসংখ্যা ভূগোলের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে অধ্যাপক গোসালের তত্ত্বাবধানে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো কয়েকটি গবেষণা হয়েছিল। যেমন, S. Mehta-র **Some Aspects of Changes in the Demographic Characteristics of Bist Doab, 1952-61.** G. Krishan-র **Changes in the Demographic Character of Pubjab's Border Districts of Amritsar and Gurudaspur, 1951-61,** R. C. Chandna-র **Changes in the Demographic Characteristics of Rohtak and Gurgaon Districts, 1951-61** গবেষণার বিষয়গুলো একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে উপরোক্ত সব ক'টি গবেষণার ক্ষেত্র হল পাঞ্জাবের জেলা বা অঞ্চলভিত্তিক। বস্তুতপক্ষে, আমাদের দেশে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোলের এই শাখায় গবেষণা ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

এদেশে জনসংখ্যা ভূগোলের শৈশবস্থায় প্রত্যক্ষজ্ঞানের (empirical) প্রয়োগের দিকে ঝোঁক ছিল। আমাদের দেশে জনসংখ্যার অসম বন্টনকে ব্যাখ্যা করতে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুব কমই হয়েছে। যেহেতু ভূগোলের অনুসন্ধানের প্রধান ভিত্তি হল স্থানিক পটভূমি, তাই ভারতে জনসংখ্যা ভৌগোলিকেরা সর্বদা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। যে কোন জনমিতিক ব্যাপারে এই ভূগোল স্থানিক বন্টন, স্থানিক সম্পর্ক, পরস্পরের ওপর স্থানিক প্রক্রিয়ার প্রভাবের ওপর জোর দিয়েছে। স্থানিক বন্টনের সামাজিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্যকে জনসংখ্যা ভৌগোলিকরা কম গুরুত্ব দিয়েছেন। জনসংখ্যা ভূগোলের বিকাশে তত্ত্বগত (Theoretical) ও প্রয়োগগত (Applied) ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখনও অনেক ফাঁক আছে। পরিমাত্রিক কলাকৌশল ব্যবহার সম্বন্ধে জনসংখ্যা ভৌগোলিকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে ভূগোলের এই শাখায় তাত্ত্বিক দিকটির ব্যবহার সম্ভব হতে পারে। আগামী দিনে "মডেল" তৈরি, মতবাদ পরীক্ষা (hypothesis testing) ও তত্ত্ব রচনা জনসংখ্যা ভৌগোলিকদের কাছে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র। ভারতীয় জনসংখ্যা ভৌগোলিকরা একদিক দিয়ে খুব সৌভাগ্যবান। কারণ, স্থানীয় জনমিতিক প্রেক্ষাপট খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল। এই প্রেক্ষাপটই তাকে উন্নতমানের পরিমাত্রিক কলাকৌশল ব্যবহার ও তত্ত্বগঠনে প্রেরণা জোগাবে। ভূগোলের এই শাখায় যে সব তত্ত্ব এখনো পর্যন্ত চালু আছে, তার সব ক'টি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে খাপ খায় না। ভারতীয় জনমিতিক প্রেক্ষাপট হল এক সমৃদ্ধশালী পরীক্ষাগার। সুতরাং, ভারতীয় ভৌগোলিকরা যদি তত্ত্ব ও মডেল তৈরি করেন, তবে তা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে প্রযোজ্য হবে বলে আশা করা যায়। ভারতে জনসংখ্যা ভূগোলের অগ্রগতিতে জনগণনা (Census) দপ্তরের অবদান অনস্বীকার্য। এই দপ্তরের উন্নতমানের পরিসংখ্যান ভৌগোলিকরা ক্ষুদ্র

পরিসরে প্রকৃত জনমিতিক অবস্থার চিত্রটি ফুটিয়ে তোলেন (Chandna, 1992)। জনগণনার দপ্তরের বহুবিধ ও বিশাল পরিসংখ্যানের ব্যবহার ভৌগোলিকদের প্রাথমিক পরিসংখ্যান ও ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু, যে কোন বিষয়ের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করতে ক্ষেত্রসমীক্ষা যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। অবশ্য ইদানিং কিছু কিছু নবীন জনসংখ্যা ভৌগোলিকদের মধ্যে জনগণনা দপ্তরের পরিসংখ্যান ছাড়াই ছোট ছোট স্থান নিয়ে গবেষণা করার একটা রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে।

এবার এদেশে জনসংখ্যা ভূগোলের বিষয়গুলোর দিকে তাকানো যায়। এই ভূগোলের প্রধান বিষয়গুলো হল—(i) জনসংখ্যা বন্টন ও গঠন, জন্ম, মৃত্যু, পরিযান, (ii) স্থান ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেন এই সব উপাদান বদলায়, (iii) কিভাবে এই সব উপাদানগুলো অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলোকে প্রভাবিত করে। অন্যান্য বিষয়গুলো প্রধান বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন নগরায়ণ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। যে সব বিষয়গুলোর ওপর জনগণনা পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাতেই ভারতীয় জনসংখ্যা ভৌগোলিকরা তাদের গবেষণা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এদেশের ভৌগোলিকদের কাছে গবেষণার প্রিয় বিষয়গুলো হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সাক্ষরতা, লিঙ্গ গঠন (Sex composition), নগরায়ণ, শ্রমশক্তি ইত্যাদি। সেই তুলনায় জনসংখ্যা বন্টন ও ঘনত্ব ব্যাপারটা জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে ভৌগোলিকদের দৃষ্টি খুব একটা আকৃষ্ট করেনি। এই প্রসঙ্গে এ যাবৎ প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করতে হয়। একটি National Atlas Organisation কর্তৃক 1962 সালে প্রকাশিত Population Sheets যা প্রফেসর শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জীর অধীনে প্রকাশিত হয়। প্রফেসর চ্যাটার্জীর রচনাটি Regional Pattern of Diversity and Distribution of Population in India নামে **Geographical Review of India** (Vol. 24) তে 1962 সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি R.C. Chandna and Surya Kanta-র Asian Profile (Vol. 13. No. 4)-তে প্রকাশিত Distribution and Density of Population in India নামক রচনা। বর্তমান লেখক এই গ্রন্থে **"জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রাম্য আয়তনের বন্টন"** নামে একটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন। এখানে তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে (1981 সালের) ভারতের জেলাগুলোকে ছোট (500-র কম), মধ্যম মাঝারি (500-1, 999), মাঝারি (2,000 - 4,999), বড় (5,000 – 9,999) ও খুব বড় গ্রামের (10,000 ও তার বেশি জনসংখ্যা) ভিত্তিতে ভাগ করেছেন। (প্রথম অধ্যায়, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ভারতীয় জনসংখ্যা ভূগোলে আর একটি অবহেলিত দিক হল জীবনগত পরিসংখ্যান বিষয়টি। পরিসংখ্যানের অভাবে জন্ম মৃত্যু বিষয়টি এই ভূগোলে তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। তবে ভারতীয় সমাজে অবহেলিত তপশীলি জাতি ও উপজাতির বন্টন ভৌগোলিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কোন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা সেই বিষয়ের গুরুত্বকে তুলে ধরে। ভারত এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। 1980 সালে Chandna and Sidhu-র লিখিত **''Introduction to Population Geography''** দিয়ে এর যাত্রা শুরু। এরপর 1984 সালে R.P. Ojha-র হিন্দীতে লিখিত **জনসংখ্যা ভূগোল,** 1985 সালে Gopal Krishan-র **Spatial Dimensions of Unemployment and Underemployment,** 1986 সালে R. Bala-র **Trends in Urbanisation in India.** H. Lal-র হিন্দীতে লিখিত **জনসংকলীন ভূগোল,** R.C. Chandna (1986)-র **A. Geography of Population : Concepts Determinants and Pattern** ও 1987 সালে হিন্দীতে লিখিত **জনসংখ্যা ভূগোল** S. Metha (1990)-র Migration : **A Spatial, Perspective** নিঃসন্দেহে এদেশে জনসংখ্যা ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকের ভাণ্ডার কিছুটা ভরিয়ে তুলেছে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে অবস্থিত **Association of Population Geographers in India** নামক সমিতি এদেশে ভৌগোলিকদের জনসংখ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়ে তুলেছে। এই সমিতি থেকে নামে

**Population Journal** একটা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। এতে দেশ-বিদেশের ভৌগোলিকদের জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ভূগোলের ব্যাপ্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

## 1.9 জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য (Population-related Information)

**ভূমিকা (Introduction)**

কোনো একটি জায়গায় যতজন লোক বাস করেন, তা হল ঐ অঞ্চলের জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যা জন হতে পারে, আবার 7 লাখও হতে পারে। ঐ জনতা কৃষিনির্ভর হতে পারে, আবার শিল্পাশ্রয়ীও হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা জনসংখ্যা বিশ্লেষণ তিনটি উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করতে পারি, যেমন—

(ক) জনসংখ্যার গঠন ও বিন্যাস, তার পরিবর্তন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা (বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে জনসমগ্রকের গঠন, নির্ভরশীলতার হার, প্রব্রজন, জন্ম ও মৃত্যু-হার (স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রভৃতি) ;

(খ) উপরোক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা ;

(গ) কি ধরনের পরিবর্তন আগামী দিনে হতে চলেছে ও জনজীবনে তার সম্ভাব্য প্রভাবে কি হতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বাভাষ।

এই প্রশ্ন হল জনসংখ্যা সংক্রান্ত এই সব পরিসংখ্যান আমরা কিভাবে পেতে পারি ?

**জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য (Population-related information)**

পৃথিবীর অনেক দেশ জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের (বিভিন্ন মানেরও বটে) তথ্য রাখে। আর সেগুলোকে কাজে লাগানো এক সমস্যা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় উন্নত দেশগুলো সঠিক ও বহু ধরনের পরিসংখ্যান রাখে। U.N.O. বর্তমানে অনেক দেশকেই জনসংখ্যা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহে সাহায্য করেছে। U.N.O. ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান— যেমন, F.A.O., U.N.E.S.C.O. ও W.H.O.-র প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা সংক্রান্ত অনেক টুকরো টুকরো তথ্য জানতে পারি (Beaujeu-Garnier, 1978)।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যের প্রধান উৎস চারটি—

A. আদমসুমারী বা লোকগণনা (Census),

B. নমুনা সমীক্ষা (Sample Survey),

C. রেজিস্ট্রেশন বা নথিবদ্ধ করা (Registration),

D. রেকর্ড সংরক্ষণ (Recording of Basic Data)।

**(A) আদমসুমারী বা লোকগণনা (Census) :** Census কথাটি ল্যাটিন শব্দ Censre থেকে এসেছে। এর মানে হল 'মূল্য নির্ধারণ করা' বা 'কর নির্ধারণ করা' (to value or tax)। অতীতের আদমসুমারীর উদ্দেশ্য কখনই জনসংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ছিল না। সেই সময় আদমসুমারী প্রধানত দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি যাচাই করার জন্য ব্যবহার করা হত। রোমে লোকগণনা করা হত একটি বিশেষ বয়সের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী পুরুষদের। স্বভাবতই উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রতিরক্ষার জন্য কতজন সুস্থ নাগরিককে পাওয়া যেতে পারে তার হিসেব করা। চীনদেশে জনগণনা করা হত কর বসানোর জন্য। আমেরিকাতে প্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্ণয়ে। পরর্বতীকালে প্রায় প্রতিটি দেশই

আদমসুমারীকে আরো অনেক বিষয়ের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্ধারণে ব্যবহার করে আসছে। ভারতবর্ষেও সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (270-230 B.C) এবং পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (1556-1605) A.D) লোকগণনা হত, তার প্রমাণ আছে।

আদমসুমারীর মাধ্যমে আমরা কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দেশের বা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনগণের জন্ম-মৃত্যু হার এবং তাদের আর্থিক ও সামাজিক পরিসংখ্যান পাই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় অন্তর লোকগণনা করা হয়। সাধারণত পাঁচ/দশ বছর অন্তর লোকগণনা করা হয়। আমাদের দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর লোকগণনা করা হয়। বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে দুটি পদ্ধতিতে লোকগণনা করা হয়—Defactor Census ও Dejure Census। অবশ্য প্রথমটি বেশি চালু। এতে গণনা চলাকালে কোনো ব্যক্তি যেখানে থাকেন, সেটি যদি তার বাড়ি নাও হয়, তবুও সেখানেই তাকে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (Dejure Census) কোনো ব্যক্তির গণনা যেখানেই হোক না কেন, গণনার পরবর্তীকালে তাকে তার বাসস্থান, সেখানেই দেখানো হয় (মজুমদার, 1991)।

**(B) নমুনা পরীক্ষা (Sample Survey)** ঃ আদমসুমারীতে সচরাচর সেইসব প্রশ্নই করা হয় যা যে কোনো সাবালক ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দি তে সক্ষম। অল্প সময়ের মধ্যে জনগণনার কাজ শেষ করতে হয় বলে আদমসুমারীতে খুব বেশি প্রশ্ন রাখা হয় না। বহুকর্মীকে একই সঙ্গে লোকগণনার কাজে লাগাতে হয়। এদের প্রায় কারোরই জনসংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা থাকে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাধারণ সরকারি কর্মচারি ও সাধারণ শিক্ষিত বেকার যুবকরা এই কাজ করে থাকেন। সমান্য কয়েক 'দিন' প্রশিক্ষণ দিয়ে এই গণনাকর্মীদের কেমন করে লোকগণনা করতে হয় তা শিখিয়ে দেওয়া হয়। স্বভাবতই এঁদের সাহায্যে জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর অনুসন্ধান সম্ভব হয় না। জমির পরিমাণ, উচ্চ ফলনশীল চাষাবাদে ব্যবহৃত জমি, উপার্জন ও খরচ, জন্মশাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো সাধারণ লোকগণনার আওতার বাইরে রাখা হয়। জনগণনা শেষ হয়ে গেলে বা গণনা চলাকালীন অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের সাহায্যে গোটা দেশজুড়ে এই সব জটিল তথ্য জোগাড় করার জন্য নমুনা বেছে নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। সাধারণত এই ধরনের সমীক্ষা 1-20% লোকের ওপর করা হয়। অনেক সময় বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে দুই লোকগণনার মধ্যবর্তী সময়ে নানা ধরনের নমুনা সমীক্ষা চালানো হয়। ভারতবর্ষে Indian Statistical Institute, Registrar General of India, Indian Population Council, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় এই সব নমুনা সমীক্ষা করে থাকেন। লোক গণনার পর নমুনা সমীক্ষাই জনসংখ্যাতত্ত্বের উপাদান সংগ্রহের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য উৎস। নমুনা সমীক্ষার গুরুত্ব অনেক সময় লোকগণনা থেকেও বেশি। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে এমন সব জটিল বিষয়ের ওপর সূক্ষ্ম ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন হয় যা সংগ্রহ করা একমাত্র বিশেষজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে নমুনা সমীক্ষা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই (মজুমদার, 1991)।

**(C) নথিভুক্তকরণ বা রেজিস্ট্রিভুক্ত করা (Registration)** ঃ রেজিস্ট্রেশন করার অর্থ নথিভুক্ত করা। জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করা বা রেজিস্ট্রেশন করার ব্যবস্থা সব দেশেই প্রচলিত। লোকগণনার কাজ চালু হওয়ার বহু আগে থেকেই এ ব্যবস্থা চালু আছে। সম্ভবত প্রাচীন চীনদেশে এই ব্যবস্থা প্রথম চালু হয়। চীন থেকে জাপান এবং পরে ক্রমশ সব দেশে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আধুনিক রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থায় শুধু জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করা হয় তা নয়, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দত্তক গ্রহণ প্রভৃতি সবকিছুই নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা প্রচলিত। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজে এগুলি বয়স অনুসারে জনসংখ্যার বিভাজন, কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ, পরিবারগত অবস্থা প্রভৃতি তথ্য পরিবেশন করে বিশেষ সহায়তা করে (পাল, 2000)।

### 1.9.1 জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহারে কয়েকটি অসুবিধা (Some Difficulties in using Population Statistics)

অনেক সময় আমাদের মনে আসে যে আদমসুমারী পরিসংখ্যান কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথার্থ নাও হতে পারে। আবার পরিসংখ্যানের ব্যাপক ব্যবহারেরও একটা সীমা আছে। অনেক ক্ষেত্রে একই তথ্যের দুবার ব্যবহার ও কিছু তথ্য আমাদের নজর এড়িয়ে যাওয়ায় এটা হয়ে থাকে। জাতীয় নথিপত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য, তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল থেকে যায়। ধরা যাক বহু দূরবর্তী গ্রামের এক শিশু নথিভুক্ত হবার আগেই মারা গেল। এখন এ বিষয়টি গণনাকারীরা না জানলে তথ্যে ভুল থেকে গেল। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও শতকরা 2 ভাগ শিশুর জন্ম নথিভুক্ত হয় না। এছাড়া প্রশ্নের উত্তরে ত্রুটি, ইচ্ছে করে ভুল তথ্য সরবরাহ করা এবং লিপিবদ্ধ ও সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করার সময়েও ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে।

আদমসুমারীর পরিসংখ্যানে ধারাবাহিকতার (continuity) অভাব অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন গ্রেট বৃটেনে সালে কোন আদমসুমারী নেওয়া হয়নি। ফরাসী দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে 5 বছর অন্তর লোকগণনা হত, যুদ্ধের পর তা প্রথম প্রথম 8 বছর, পরে 6 বছর অন্তর নেওয়া হতে লাগল, যেমন 1946, 1954, 1962, 1968, 1974 সাল। অন্যান্য দেশও নিয়মিত জনগণনা করে না। যেমন রাশিয়ায় 1879, 1926, 1939, 1959 ও 1970 সালে জনগণনা হয়েছিল। চীনদেশে 1953 সালে প্রথম আদমসুমারী নেওয়া হয়। স্বভাবতই পৃথিবীভিত্তিক আদমসুমারী পরিসংখ্যানের তুলনা করা খুব অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়।

এটা আরও মনে রাখা দরকার যে এক এক দেশ এক এক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে। যেমন গ্রেট বৃটেনে আদমসুমারীর সময় কোন ব্যক্তি যে স্থানে থাকেন, তাকে সেই স্থানের বাসিন্দা বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির যেখানে বাসভূমি, তাকে সেই স্থানের বাসিন্দা বলে ধরা হয়। একটা বড় ধরনের সমস্যা হল যে ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তার শ্রেণিভুক্তকরণ (Classification) সব সময় একই রকম থাকে না। যেমন বয়োগোষ্ঠীকে (age group) বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। দেশে দেশে শহর ও গ্রামীণ জনসংখ্যার সংজ্ঞারও হেরফের আছে। কর্মীর শ্রেণিবিভাগের (classification of workers) সংজ্ঞারও রকমফের আছে। অস্থায়ী ও স্থায়ী প্রবহমান (migrant population) জনতার সংজ্ঞা সবদেশে সমান নয়। এছাড়া পরিব্রাজনের পরিসংখ্যানও অনেক দেশেই নির্ভরযোগ্য নয়। তাই দিয়ে আন্তর্জাতিক তুলনা করা চলে না।

কয়েক বছর যাবৎ জাতিপুঞ্জের পরিসংখ্যান দপ্তর এই অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য একই বছরে জনগণনা করতে ও সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একই রকম পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে বহু দেশকে উৎসাহিত করছে। সে যাই হোক, সমস্যা রয়েই গেছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই নির্ভরযোগ্য জনসংখ্যা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

# একক 2 ❑ জনবৃদ্ধি ও জনবন্টন

গঠন


**2.0** প্রস্তাবনা

**2.1** উদ্দেশ্য

**2.2** পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন ঃ অতীত, মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগ

**2.3** ভারতের জনসংখ্যা ঃ গতিপ্রকৃতি

**2.4** জনসংখ্যার পরিবর্তন ঃ তত্ত্ব ও পর্যায়

**2.5** জীবনগত পরিসংখ্যান ও পরিমাপ ঃ প্রজনন ও মরণশীলতা

**2.6** জনঘনত্ব ও জনবন্টন

**2.7** মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যা ও ঘনত্ব

**2.8** ভারতের জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব


## 2.0 প্রস্তাবনা

অতীতে মানুষের সংখ্যা কত ছিল, তারা কোথায় বাস করতো, কী করতো, জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার কী রকম ছিল, কী কী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটল এসব সম্বন্ধে কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ সম্বন্ধে কৌতূহল মেটানো হয়েছে।

## 2.1 উদ্দেশ্য

বর্তমান পরিচ্ছেদটি পাঠ করে আপনারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন ঃ অতীত থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত।
- ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১৯০১-২০০১ সাল পর্যন্ত।
- জনসংখ্যার বিবর্তন বিভিন্ন পর্যায় ও পর্যায় গঠনের কারণ।
- জীবনগত পরিসংখ্যান ও পরিমাণ, জন্মহার ও মৃত্যুহার।
- জন্মহারের পার্থক্যের কারণসমূহ।
- মৃত্যুহারের আঞ্চলিক ও জাতিগত পার্থক্য।
- উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে মৃত্যুহারের পার্থক্য।
- মৃত্যুহারের বন্টন।

- ভারতে মৃত্যুহার।
- জনঘনত্ব পরিমাপ।
- জনবন্টনের তারতম্যের কারণ।
- পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন।
- ভারতের জনঘনত্ব।

## 2.2 ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth in Historical Perspective)

**ভূমিকা (Introduction)**

অতীতে মানুষের সংখ্যা কত ছিল, তারা কোথায় বাস করতো, তারা কী করতো, তাদের আচার-আচরণ কী রকম ছিল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কী রকম ছিল, কী কী পরির্তনের মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল, গ্রাম কিভাবে শহর পরিণত হলো, এসব সম্বন্ধে কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। কথায় আছে—'Present is the key to the past'. অনাদি অতীতের বন্ধ দরজা খুললে পৃথিবীর প্রাচীন জনসংখ্যা-বিষয়ক বহু তথ্য জানতে পারবো, যা অনেক সময় আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণেও সাহায্য করবে।

বর্তমান পরিচ্ছেদে মানুষের বাড়-বৃদ্ধি কিভাবে ঘটল, কী কী ধাপের মধ্যে দিয়ে মানুষ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছল তা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

### অতীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন

#### প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ (Pre-historic Age)

**খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার পর্যায় (Food Gathering and Hunting Stage)**

খুব কম হলেও প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে প্রস্তরযুগে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের (যাদের বৈজ্ঞানিক নাম— *হোমো-স্যাপিয়েন্স বা ক্রো-ম্যাগনন*) আবির্ভাব ঘটেছিল। শুধুমাত্র সময়ই নয়, পৃথিবীতে কোথায় তার আবির্ভাব ঘটেছিল, তাও নিশ্চিন্ত করে বলা যায় না। আদিম মানুষের অস্থি বা তার যন্ত্রপাতির খোঁজ মিলেছে ইউরোপে, এশিয়ায় ও আফ্রিকায়। বেশির ভাগ নৃতাত্ত্বিকের ধারণা আদিম মানুষের প্রথম আর্বিভাব ঘটেছিল, তাও নিশ্চিন্ত করে বলা যায় না। আদিম মানুষের অস্থি বা তার যন্ত্রপাতির খোঁজ মিলেছে ইউরোপে, এশিয়ায় ও আফ্রিকায়, বেশির ভাগ নৃতাত্ত্বিকের ধারণা আদিম মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল পূর্ব গোলার্ধের বিভিন্ন জায়গায়। আফ্রিকা এই বিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, এশিয়া ছিল গৌণ বিন্দুতে। ইউরোপে ক্রো-ম্যাগনন বা হোমো স্যাপিয়েন্সদের অস্তিত্বের খোঁজ মিলেছে 35, 000 বছর আগে ; আর আমেরিকাতে আরও পরে, প্রায় 25,000 বছর আগে।

অনুমান করা হয় যে প্রাচীন পৃথিবীর (Old World) কেন্দ্রবিন্দু থেকে সামান্য সংখ্যায় হলেও প্রস্তরযুগের মানুষ শিকার ও খাদ্যসংগ্রহ পেশাকে ভিত্তি করে পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষিবিপ্লবের আগে— অর্থাৎ প্রায় 10,000 বছর আগে— যখন উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশে বরফ গলতে শুরু করেছিলো, তখন মানুষ

ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার নানা স্থানে, দুই আমেরিকার অনেকখানি, ইউরোপের $50^0$ উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত বহু স্থান জুড়ে বাস করতো।

প্রায় 25,000 বছর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় 3.3 মিলিয়ন। 15,000 বছর পরে (অর্থাৎ প্রায় 10,000 বছর আগে) এটা বেড়ে সম্ভবত 5.3 মিলিয়নে পৌঁছেছিল। অনুমান করা হয় যে এই সময়ে পৃথিবীতে গড় জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে 0.44 জন। খাদ্যসংগ্রহ পর্যায়ে যদিও পৃথিবীতে গড় জনঘনত্ব কম ছিল, তবুও সবসময় ও সব জায়গায় একই রকম জনঘনত্ব ছিল না। Dewey-র মতে বরফযুগের (lee Age) সূচনায় যখন মানুষ খাদ্যের জন্য ছিল প্রকৃতিনির্ভর, তখন প্রতি 100 বর্গকিমিতে জনঘনত্ব ছিল 3 জন। অনুমান করা হয় খাদ্য সংগ্রহের আর একটু উন্নত পর্যায়— অর্থাৎ কিনা বরফযুগের শেষে ও বরফোত্তর (post-glacial) যুগের শুরুতে— এই গড় জনঘনত্ব গিয়ে দাঁড়াল 12.5 জন। যেমন ক্যারিবো (বল্গা হরিণ) শিকারী এস্কিমোদের দেশে জনঘনত্ব প্রতি 100 বর্গকিমিতে ছিল 1.07 জন, বুনো ধান সংগ্রাহক ওজিবাদের (Ogibwa) 13 জন, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের 8 জন।

যতদূর জানা গেছে প্রস্তরযুগে (Stone age) মানুষদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা ছিল কম, সম্ভবত 6 থেকে 12 জন সদস্য নিয়ে এক একটি পরিবার। অবশ্য যেখানে বেশি রকম খাদ্য পাওয়া যেত সেই সব জায়গায় কিছু ব্যতিক্রম ছিল। খাবার সংগ্রহে ভাটা পড়লে তবেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার প্রশ্ন উঠত। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর কোথায় কতজন লোক বাস করতেন, জনঘনত্ব বা কত ছিল, তা Deevey-র '**Scientific American'** পত্রিকায় (Vol. 203, 1960) প্রকাশিত **''Human Population''** নামক প্রবন্ধটি থেকে তুলে দেওয়া হল (সারণি)।

**সারণি 2.1 : বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব**

| বছর আগে (আনুমানিক) | সাংস্কৃতিক অবস্থান | বাসস্থান | মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসেবে) | অনুমিত জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | নিম্ন প্রস্তর যুগ (শিকার ও সংগ্রহ) | আফ্রিকা | 0.12 | 0.004 |
| 300,000 | আদি প্রস্তর যুগ (শিকার ও সংগ্রহ) | আফ্রিকা ইউরেশিয়া | 1 | 0.012 |
| 25,000 | মধ্য প্রস্তর যুগ (শিকার ও সংগ্রহ) | , , মহাদেশ | 3.34 | 0.04 |
| 6,000 | গ্রামীণ কৃষিও নতুন নগরায়ণ | পুরোনো পৃথিবী নতুন পৃথিবী | 86.5 | 1.0<br>0.04 |
| 2,000 | গ্রামীণ কৃষিও নগরায়ণ | সমস্ত মহাদেশ | 133 | 1.0 |

| বছর আগে (আনুমানিক) | সাংস্কৃতিক অবস্থান | বাসস্থান | মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসেবে) | অনুমিত জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে) |
|---|---|---|---|---|
| 310 (1650) | কৃষি ও শিল্প | ঐ | 545 | 3.7 |
| 210 (1750) | ঐ | ঐ | 728 | 4.9 |
| 160 (1800) | ঐ | ঐ | 906 | 6.2 |
| 60 (1900) | ঐ | ঐ | 1,610 | 11.0 |
| 10 (1950) | ঐ | ঐ | 2,500 | 16.4 |
| 2000 (খ্রীঃ অঃ) | ঐ | ঐ | 6,270 | 46.0 |

কৃষি বিপ্লবের পর থেকেই পৃথিবীর জনসংখ্যার বড় রকমের বাড়-বৃদ্ধি ঘটেছিল (চিত্র 2.1)। তবে এটা ঠিক যে খাদ্যসংগ্রহ থেকে কৃষিকাজে অংশ নিতে কয়েক হাজার বছর কেটে যায়। চাষবাসের শুরুর সময় থেকে কিছু কিছু এলাকায় ও পরবর্তীকালে বিস্তীর্ণ এলাকায় শস্যচাষ ও পশুপালন শুরু হয়েছিল, এর ফল ছিল ব্যাপক। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, তা আস্তে আস্তে সরে গেল। বিনিময়ের জন্য উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রীর যোগান পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। ব্যবধান স্থান করে দিল সম্পর্কের। ফলে পরিবর্তন ঘটল তাড়াতাড়ি।

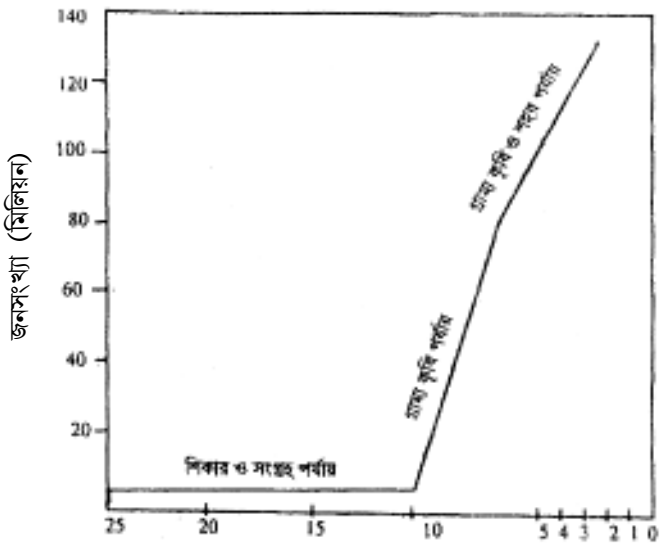

বছর পূর্বে ('000-র হিসেবে)

প্রাচুর্য আর খাদ্য যোগানের নিরাপত্তা প্রতি বর্গ পরিমাপ জায়গায় আরো-বেশি সংখ্যক লোকের বসবাসের সুযোগ করে দিল। আর খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করতে কিছু সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হল, ফলত কিছু লোক নতুন নতুন কাজের জন্য পাওয়া গেল। তাই কৃষি আবিষ্কারের পর তাঁত, লাঙল, চাকা, ধাতব জিনিষের প্রয়োজন ঘটল। Zelinsky-র ভাষায় ''This was the first decisive step toward control of the environment (P-84).''

Zelinsky—আরো লিখেছেন যে, ''Socio-economic development was hardly more advanced than it had been in the favoured localities among specialised collectors, hunters and fishermen.''

কৃষিভিত্তিক জীবন স্থায়ী গ্রামীণ বসতির জন্ম দিয়েছিল। প্রায় 8000–9000 বছর আগে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জেরিকোতে (Jericho) যে কৃষিবিপ্লব দেখা দেয়, (চিত্র 2.2), তার ফল ছিল ব্যাপক। প্রথমতঃ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে আয়ত্তে এনে খাদ্যে স্বয়ংভর হতে পেরেছিল, ফলে মানুষ যাযাবর জীবন থেকে মুক্তি পাবার স্বাদ পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, খাদ্য-সংগ্রহের অহেতুক ঝুঁকি নেবার প্রয়োজনীয়তা কমে গেল। ফলে অপঘাতজনিত মৃত্যু কমে গিয়ে জনসংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তৃতীয়ত, যাযাবর জীবনে প্রতিটি মানুষকেই খাদ্য-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হত, কিন্তু কৃষিকাজে প্রতিটি মানুষের শ্রমের প্রয়োজন ছিল না। ফলে উদ্বৃত্ত খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল কিছু লোক নতুন নতুন সৃষ্টির কাজে হাত দিল। চতুর্থত, স্থায়ী বসতিতে সমাজ জীবনের বিকাশ ঘটল। কারণ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা, বৃত্তি (occupation) বন্টন ও সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে একটা সমাজ জীবনের রূপ দিল। Zelinsky-র ভাষায় ''Assured of relative abundance, these hunters, fishermen and collectors were able to build larger, more complex societies.'' (P.83)

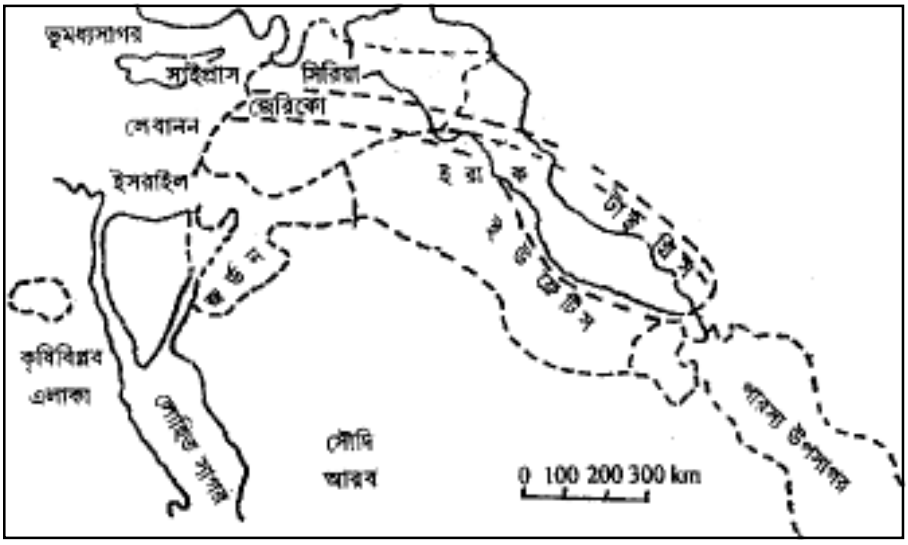


চিত্র **2.2 :** পৃথিবীতে কৃষিবিপ্লবের প্রথম এলাকা (Trewartha-র অনুকরণে)

পঞ্চমত, এই সময় থেকে মানুষ পাথরের বদলে ধাতুর ব্যবহার শিখল। এর ফল ছিল ব্যাপক। বর্তমানে প্র-তাত্ত্বিক আবিস্কারের ফলে জানা গেছে যে এই সময়ে আমেরিকায় বিক্ষিপ্তভাবে বিশেষত মেক্সিকোর তেহুকান (Tehukan) উপত্যকায় কিছু কিছু চাষবাস শুরু হয়েছিল। Braidwood, Krozman ও Tax সেই সময়কার পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন :

(1) ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ উত্তর অঞ্চল, ক্রান্তীয় দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশ ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শুষ্ক অঞ্চল যা এর আগে ছিল জনবসতিহীন।

(2) সিন্ধু উপত্যকা, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া— এখানে চাষবাসের পাশাপাশি খাদ্যসংগ্রহ চালু ছিল। স্বভাবই এই সব এলাকা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ।

(3) দু'য়ের মাঝামাঝি বিস্তীর্ণ অঞ্চল— এখানে মানুষ পুরনো খাদ্যসংগ্রহ প্রথার ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করত, আর জনঘনত্ব ছিল মাঝারি রকমের।

এবার নগরায়ণের কথায় ফিরে আসা যাক। জেরিকোতে প্রথম নগরায়ণ থেকে শুরু করে পরবর্তী 3000–4000 বছরের মধ্যে নগরায়ণ আরও প্রসার লাভ করে। আনুমানিক 4,000 বছরের আগে ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস নদী উপত্যকায় ইরেখ, এরিডু, ঊর, লাগাস, লারমা প্রভৃতি শহর গড়ে উঠেছিল (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)। আরও উত্তরে ছিল কিশ ও জেমদেত নামে দুটো শহর। ঐ একই সময়ে মিশরের নীল নদের নিম্ন উপত্যকায় থিস, মেমফিস, হেলিও, পলিস, এরিডস, নেখের ইত্যাদি শহরগুলো গড়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে নগরায়ণ নীল নদের উচ্চ উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। এরও কিছু পরে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব 2,500 – 1,500 অব্দের মধ্যে সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জদারো ও ইরাবতী উপত্যকায় হরপ্পাকে কেন্দ্র করে এক উন্নত নগর-সভ্যতা জন্মলাভ করে। আরও কিছু পরে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব 1500-র কাছাকাছি সময়ে চীনের হোয়াংহো অববাহিকায় নগরায়ণ ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীষ্টজন্মের কয়েকশ শতাব্দী আগে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে ইউকাটান গুয়াতেমালা ও মেক্সিকোয় নগরসভ্যতা বিকাশলাভ করে। এদের মধ্যে মেক্সিকোয় মায়া সভ্যতাই বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

### 2.2.1 প্রাচীন-মধ্য যুগ (খ্রীষ্টাব্দের শুরু থেকে 1650 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) [The Ancient-Medieval Period (A.D. 0 to 1650)]

অনুমান করা যায় যে খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে পৃথিবীতে 133 থেকে 300 মিলিয়ান লোক বাস করতেন। বিভিন্ন সূত্র ও পরোক্ষ প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এইরকম একটা অনুমান করা হয়েছে। সেই যাই হোক, এবার সেই সময়কার—অর্থাৎ প্রায় 2,000 বছর আগেকার— জনবসতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সময়টা ছিল গ্রীক-রোমীয় যুগ (Greek-Roman Age)। এটা আবার ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারেরও যুগ। এই সময় নগর ও সংস্কৃতি তিনটি প্রধান রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। চীন ও হান্ বংশের নেতৃত্বে বিবদমান সমস্ত রাষ্ট্রগুলো চীনে একীকরণ হয়েছিল। ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের নেতৃত্বে মৌর্য সাম্রাজ্য সমস্ত উত্তর ভারত ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য থেকে 10 উঃ অঃ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের অংশ ও ইউরোপের অনেকাংশ রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।

প্রতিটি সাম্রাজ্যেই বিরাট সংখ্যক জনতা বাস করতেন, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে। এখানে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে জনসংখ্যা 100 থেকে 140 মিলিয়ন (Trewartha, 1969) ছিল। দ্বিতীয় ও অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মূল চীনা ভূখণ্ড। মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান ও ভিয়েতনামকে নিয়ে গঠিত এই চীন সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা খ্রীষ্টীয় 2 সালে (A. D. 2) 57.7 মিলিয়নে পৌঁছেছিল। চীন সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থিত ফুকিনকে বাদ দিয়ে চীনের বর্তমান সীমানায় অবস্থিত। 18টি প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল 55 মিলিয়ন। "হান্ চীনের" সম্ভবত তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা অব-আর্দ্র ও প্রায় শুষ্ক উত্তর অঞ্চলে, বিশেষত হোয়াংহো বদ্বীপ অঞ্চলে বাস করতেন। জনবসতির তৃতীয় কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সম্রাট অগাস্টাসের রোম সাম্রাজ্য। এখানকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় 54 মিলিয়ন। এটা ঠিক যে এই বিরাট সংখ্যক জনতাকে নিয়ে রোম প্রশাসনের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না, কারণ এই প্রশাসন ব্যক্তিসাম্যে বিশ্বাস করত না।

ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে রোমান সাম্রাজ্যকে বাদ দিয়ে মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার শুষ্কাঞ্চলের বাসিন্দারা প্রধানত এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে বাস করতেন। সমগ্র মধ্য এশিয়ার 48,00,000 বর্গকিমি এলাকায় খুব সম্ভবত 5 মিলিয়নের কম লোক বাসত করতেন। খ্রীষ্টীয় যুগের শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যা ও জনবন্টন সম্পর্কে খুব কম তথ্য রয়েছে। তবে 600 খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যা 18-19 মিলিয়নের মত ছিল, এর মধ্যে আরবে বাস করতেন 1 মিলিয়ন, সিরিয়ার 4 মিলিয়ন, মেসোপটেমিয়ায় 9.1 মিলিয়ন ও উচ্চভূমিতে 4.6 মিলিয়ন জনতা।

উপরের তিনটি অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য স্থানের জনবন্টন সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। খাদ্য সংগ্রাহকরা এ্যাংলো-আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর ইউরেশিয়ার সরলবর্গীয় বনাঞ্চলের কিছু জায়গা জুড়ে বাস করতেন। বেশির ভাগ কৃষি-জনতা বাস করতেন ক্রান্তীয় ল্যাতিন আমেরিকা, দক্ষিণাংশ বাদে সম্পূর্ণ আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ার উত্তরাংশ ছাড়া সর্বত্র। রোমান সাম্রাজ্যে জনঘনত্ব খুব বেশি ছিল, কারণ সেখানে নগরায়ণ ব্যাপকভাবে ঘটেছিল। এছাড়া বহুদূরব্যাপী বাণিজ্য এখানকার অর্থনীতির একটা অঙ্গ ছিল।

### 2.2.2 মধ্য যুগ (The Medieval Period)

মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক (1650 খ্রীঃ) শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা থেকে মিলিয়নের মধ্যে ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই বৃদ্ধির হার খুব ধীরে ধীরে ঘটেছে। এক অঞ্চলের বৃদ্ধির হার অন্য অঞ্চলের বৃদ্ধির হারের সমান ছিল না, বা বৃদ্ধির হার সব সময়েই একরকম ছিল না। আবার কিছু কিছু দুর্যোগপূর্ণ বছরে মৃত্যুহার জন্মহারকে ছাড়িয়ে যেত। বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা ও জনবৃদ্ধির হার একইরকম ছিল—1600 খ্রীঃ চীনে 150 মিলিয়ন লোক বাস করতেন। খ্রীস্টাব্দের শুরু থেকে এই সময় (1600 খ্রীঃ) পর্যন্ত জনসংখ্যা 2 থেকে 3 গুণ বেড়েছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে হিন্দুস্থানে লোকসংখ্যা খুব ধীরগতিতে বেড়েছিল। সাধারণ বছরগুলোতে এই বৃদ্ধির হার ছিল ধীরগতিতে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধের বছরগুলোতে বেশি মৃত্যুহার এই বৃদ্ধির হারকে ম্লান করে দিত।

মধ্যযুগে ইউরোপীয় অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মহামারীর দরুন তা কমে যায়। উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরে চতুর্দশ শতাব্দীতে উপরোক্ত কারণে জনসংখ্যা খুব কমে যায়। সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগে আল্পস্ কার্পেথিয়ান পর্বতের উত্তর জনসংখ্যা বেড়েছিল, কারণ বন পরিস্কার করে কৃষকেরা বসবাস শুরু করেছিলেন। তাই দেখা যায় জুলিয়াস সীজারের সময় যে জার্মানীর জনসংখ্যা ছিল 2 থেকে 3 মিলিয়ন, ষোড়শ শতাব্দীর শেষে তা বেড়ে দাঁড়াল 17 মিলিয়ন। অনুরূপভাবে স্লাভজাতি-অধ্যুষিত পূর্ব-মধ্য ইউরোপে 1000 খ্রীঃ 8.5 মিলিয়ন লোক বাস করতেন, 1700 খ্রীঃ তা বেড়ে দাঁড়াল 18 মিলিয়ন। দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপ (গ্রীক, স্পেন ও ইতালি বাদে যেখানে জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল) ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে জনসংখ্যা কম হারে বেড়েছিল, যদিও বৃদ্ধির হারে আঞ্চলিক বৈষম্য ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব চীন, দক্ষিণ জাপানের পলিগঠিত নিম্ন সমভূমি, মেসোপটেমিয়া, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী আফ্রিকা বিশেষত নীল উপত্যকা, মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ, ল্যাতিন আমেরিকার কিছু স্থানে বিশেষত মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও পেরু-বলিভিয়া আন্দিজ অঞ্চলে জনঘনত্ব বেশি ছিল।

### 2.2.3 বর্তমান যুগ (1650 খ্রীঃ-র পর) (The Modern Period after 1650)

আমরা আগেই দেখেছি যে একসময় কৃষিবিপ্লব জনবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে শিল্প-বিজ্ঞান বিপ্লব এই ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। তবে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কার একদিকে যেমন চাষবাস বা বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় জোয়ার এনেছিল, তেমনি মৃত্যুহার রোধ করে জনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনেছিল। 1650 থেকে 1950 অর্থাৎ তিনশ বছরে— লোকসংখ্যা বেড়েছিল 5 গুণ। তবে 1850 থেকে 1950 এই এক শতাব্দীর মধ্যে বৃদ্ধির হার ছিল একটু বেশি [ চিত্র 2.3(b)], শতকরা 100 ভাগ। Dudley Stamp-এর Our Developing World থেকে পৃথিবীর (1650-1950 খ্রীঃ-র মধ্যে) জনবৃদ্ধির শতকরা হারটি তুলে দেওয়া হল ঃ

| বছর | % বৃদ্ধির হার | বছর | % বৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|
| 1650-1750 | | 1800-1850 | 29.2 |
| 1700-1750 | 16.8 | 1850-1900 | 37.3 |
| 1750-1800 | 24.4 | 1900-1950 | 53.9 |
| | | 1950-2001 | 143.4 |

1900-1950 এই পঞ্চাশ বছরে যদিও বৃদ্ধির হার 53.9 শতাংশ হয়েছে, তবুও বৃদ্ধির হার সব দশকে সমান ছিল না [ চিত্র 2.3(a)]। কারণ, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 1914-1918 ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 1939-1945 ঘটেছে। তাতে বহু প্রাণহানি ঘটেছে, বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের মৃত্যু। এছাড়া 1930-এর দশকে অর্থনৈতিক মন্দা জনবৃদ্ধিকে প্রতিহত করেছিল। 1950-এর পর থেকে পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে গেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও আধুনিক চিকিৎসার প্রসার এর জন্য দায়ী [ চিত্র 2.3(b)]। 1820 সালের মধ্যে পৃথিবীর 1000 জনসংখ্যা, মিলিয়নে পৌঁছেছিল। 1930 সাল নাগাদ তা হল 2,000 মিলিয়ন, 1960 সালে 3,000 মিলিয়ন, 1975 সালে 4,000 মিলিয়ন ও 1996 সালে 5,804 মিলিয়ন। বলা যায় যে পৃথিবীর জনসংখ্যা 1,000 মিলিয়নে পৌঁছাতে কয়েক হাজার বছর লেগেছিল, 2,000 মিলিয়নে পৌঁছাতে

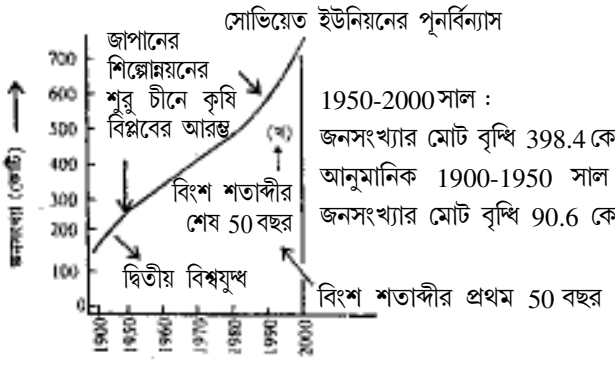


চিত্র **2.3(a) :** পৃথিবীর জনসংখ্যা (1900-2000)

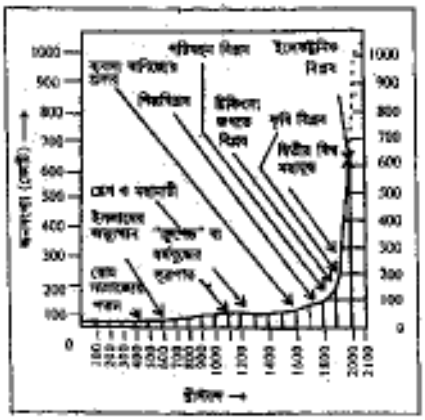

চিত্র **2.3(b) :** পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ; খৃস্টাব্দের শুরু থেকে 2100 পর্যন্ত

(উৎস ঃ Lamn, R. D., Hard Choices, 1985 ও Corson, W. H., (Ed.), The Global Ecology Handbook, 1990)

মাত্র 100 বছর, 3,000 মিলিয়ন হতে প্রায় 30 বছর, আর 4,000 মিলিয়ন হতে মাত্র 15 বছর লেগেছে। 2001 সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা 613,7 মিলিয়ন হয়েছে (চিত্র 2.4)। সারণি 2.2 তে প্রায় 350 বছরের জনসংখ্যার চিত্রটি তুলে ধরা হল।

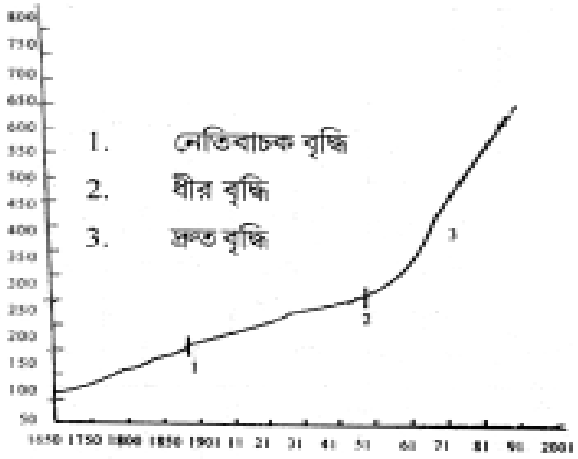


চিত্র **2.4 :** পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি (1650-2001)

**সারণি 2.2 ঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা (1650 খ্রীঃ থেকে 2001 খ্রীঃ)**

| খ্রীঃ | জনসংখ্যা (কোটি) | খ্রীঃ | জনসংখ্যা (কোটি) |
|---|---|---|---|
| 1650 | 54.5 | 1950 | 240.0 |
| 1750 | 72.8 | 1960 | 298.6 |
| 1800 | 90.6 | 1970 | 361.2 |
| 1850 | 100.0 | 1980 | 442.7 |
| 1900 | 161.0 | 1984 | 476.3 |
| | | 1996 | 580.4 |
| | | 2001 | 613.7 |

1951 সালে U.N.O. থেকে প্রকাশিত ''The Future Growth of World Population'' পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে পৃথিবীর 2,500 মিলিয়ন জনসংখ্যা পূরণ হতে 2,00,000 বছর লেগেছিল। কিন্তু আর 2000 মিলিয়ন লোকসংখ্যা পূরণ হতে মাত্র 30 বছর লাগবে। Trewartha যথার্থই বলেছেন যে পৃথিবীর জনবসতি ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বড় রকমের জনবসতি ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বড় রকমের পরিবর্তন ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার বহুদিন ধরে চলতে পারে না। গণতত্ত্ববিদরা (Demographers) সকলে একমত যে এই অনিয়ন্ত্রিত জনবৃদ্ধি এক বিলাসিতা এবং ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের (Population Explosion) অবস্থা সৃষ্টি করবে।

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হার নিয়ে আলোচনা করলাম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত দু'দশকে এই বৃদ্ধির হার পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হারকে বেশি নাড়া দিয়েছে। সারণি 2.3 থেকে তা সহজেই পরিস্কার হবে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপিয়রাও যথেষ্ট সংখ্যায় বেড়েছেন। শুধুমাত্র নিজেদের মহাদেশেই নয়, মহাদেশের বাইরে যেখানে তারা উপনিবেশ গড়ছেন, সেখানেই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে।

**সারণি 2.3 ঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি ঃ 1650-2001 (কোটিতে)**

| মহাদেশ | 1650 | 1750 | 1900 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আফ্রিকা | 10.0 | 9.5 | 12.4 | 22.4 | 28.2 | 36.4 | 47.6 | 63.3 | 81.8 |
| উঃ আমেরিকা | 0.1 | 0.1 | 8.1 | 16.6 | 19.9 | 22.6 | 25.2 | 27.8 | 31.6 |
| ল্যাতিন আমেরিকা | 1.2 | 1.1 | 6.3 | 16.6 | 21.7 | 28.3 | 35.8 | 44.0 | 52.5 |
| এশিয়া | 30.0 | 48.0 | 94.0 | 140.3 | 170.3 | 214.7 | 264.2 | 318.6 | 372 |
| ইউরোপ | 10.0 | 14.0 | 40.0 | 54.9 | 60.5 | 65.6 | 69.3 | 72.2 | 72.7 |
| ওশেনিয়া | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
| পৃথিবী | 55.0 | 72.9 | 161.4 | 252.1 | 302.2 | 369.5 | 444.4 | 528.5 | 613.7 |

অবশ্য বর্তমান শতাব্দীতে এই বৃদ্ধির হার বেশ কিছুটা কমে গেছে (সারণি 2.3)। বর্তমানে রাশিয়ার এই (C.I.S.) অংশ বাদে ইউরোপের জনসমষ্টি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র 12 শতাংশ। কিন্তু 1920 সালে এই ভাগ ছিল 18 শতাংশ। সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি দুই আমেরিকার (উত্তর ও দক্ষিণ) জনসংখ্যার 10 শতাংশের বেশি বেড়েছে। নিচের সারণিতে (সারণি) মহাদেশগুলোর অন্তর্বর্তী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলে ধরা হল।

**সারণি 2.4 : মহাদেশসমূহের অন্তর্বর্তী জনসংখ্যা বৃদ্ধির % হার**

| মহাদেশ | 1750-1800 | 1800-1850 | 1850-1900 | 1900-1950 | 1950-1980 | 1980-2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এশিয়া | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
| আফ্রিকা | 0.01 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
| উত্তর আমেরিকা | – | 2.7 | 2.3 | 4.1 | 0.6 | 1.3 |
| ল্যাতিন আমেরিকা | 0.08 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 2.7 | 2.3 |
| ইউরোপ | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
| ওশেনিয়া | – | – | – | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
| পৃথিবী | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.9 |

সারণি 2.4 যা আমাদের চোখে পড়ে, তা হল পৃথিবীর অনুন্নত (আফ্রিকা) ও উন্নয়নশীল (দঃ আমেরিকা ও এশিয়া) মহাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুল হার। এই সব ক'টি মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া। এর ফলে মৃত্যুহার কমে গেল, কিন্তু সেই তুলনায় জন্মহার বেশি থেকে গেল। বিগত দু'শো বছরে এই সব মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ঔপনিবেশিকদের দৌলতে বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। ফলে এখানে মৃত্যুহার কমে যায়। কিন্তু

জন্মহার বেশি থেকে যায়। যেমন বলা চলে ভারত গড়ে একজন নারী 3 জন সন্তানের জন্ম দেন। অবশ্য এর মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য আছে। শহরাঞ্চলে এই হার কিছুটা কম, আবার উত্তর ভারতের চারটে রাজ্যে এই হার 5 জন। আফ্রিকায় গড়ে একজন নারী 6 জন সন্তানের জন্ম দেন। অবশ্য এদের মধ্যে 2/3 জন শিশু-সন্তান মারা যায়। পৃথিবীতে মৃত্যুহার কমার একটি বড় কারণ হল শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমে যাওয়া। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই কঠোরভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে তুলনীয়। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মহাদেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল হল চরম দারিদ্র্য, বেকারী, অনাহার ও অপুষ্টি।

ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষি ও শিল্প-উৎপাদনের গতির মধ্যে সংগতি রয়েছে। ইউরোপে কিছু দেশ আছে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কাছাকাছি। কানাডা ও ওশেনিয়ায় এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। স্বভাবতই সেখানে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে, দক্ষিণ আমেরিকায় জনবৃদ্ধির একটি কারণ হল সেখানকার অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে মানুষের মনে অতিরিক্ত উচ্চাশা পোষণ, অর্থাৎ আগামী দিনের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম রয়েছে বলে সেখানকার বাসিন্দারা মনে করেন। আশার কথা হল, এশিয়া, দঃ আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র দেরীতে হলেও জনাধিক্যের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হয়েছেন এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে য-বান হয়েছেন। এর বিপরীত মেরুতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের কিছু দেশ যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার জন্য বেশ কিছু সরকারী প্রকল্প চালু রয়েছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস আলোচনা করলে কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনবার হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে—(i) 8000 খ্রীঃ পূঃ, (ii) 1750 খ্রীঃ এবং (iii) 1950 খ্রীঃ (Rubenstein, 1990)। প্রতিবারই নতুন নতুন কৌশলের উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। কলা-কৌশলের অগ্রগতি মানুষকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখিয়েছে। শুধু তাই নয়, কলাকৌশলের এই অগ্রগতি পৃথিবীকে আরোও বেশি জনসংখ্যা ধারণ করার ক্ষমতা জোগালো। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি (i) প্রথমবার কৃষিবিপ্লব, (ii) দ্বিতীয়বার শিল্পবিপ্লব এবং (iii) তৃতীয়বার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিপ্লবের ফলে সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যতদিন গেছে, ততই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে। মানুষের ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বছরে মাত্র 0.0015 শতাংশ। আর বর্তমান তা দাঁড়িয়েছে 1.7 শতাংশ। অবশ্য এই বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান হয়নি। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বৃদ্ধির হার যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হল।

## 2.3 ভারতের জনসংখ্যা ঃ গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Population of India : Trends and Characteristics)

### ভূমিকা (Introduction)

পৃথিবীর 3 শতাংশের কম স্থান জুড়ে থাকা ভারতবর্ষে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 16 শতাংশ লোক বাস করেন। বিশ্বে জনসংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় এই দেশ আগামী দিনে প্রথম স্থানাধিকারী হবে।

### ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Growth of India's Population)

বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। চলতি শতাব্দীর ভারতের জনমিতি-ইতিহাসকে তিনটি সুনির্দিষ্ট সময়ে ভাগ করা যায়—(1) নিশ্চল (stagnant), (2) ধীর বৃদ্ধি ও (3) দ্রুত বৃদ্ধির যুগ (চিত্র 3.1)। 1901 থেকে 1921 সাল পর্যন্ত সময়কে **নিশ্চল যুগ** বলা চলে। এই সময় জনসংখ্যা মাত্র 12 মিলিয়ন বেড়েছে (236 থেকে 248 মিলিয়ন)। এই সময় মৃত্যুহার জন্মহারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যসংকট বেশি মৃত্যুহারের জন্য দায়ী ছিল। এই সময় জন্ম ও মৃত্যু উভয় হারই ছিল প্রতি হাজারে 40-র বেশি। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ ছিল কম।

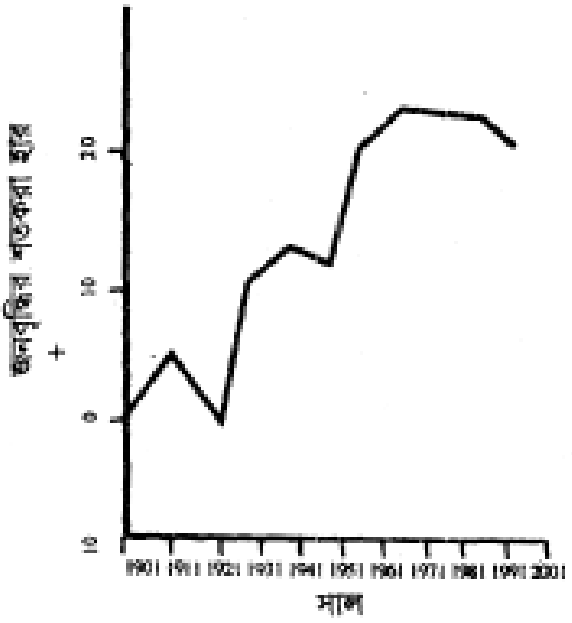

চিত্র **3.1 :** ভারতের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (1901-2001)

1921 -র জনগণনাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সূচনা বলা যেতে পারে। কারণ এর পর থেকে জনসংখ্যা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1921 থেকে 1951 সালের মধ্যে জনসংখ্যা 112 মিলিয়ন বেড়েছিল (248 থেকে 360 মিলিয়ন, সারণি 3.1)। ভারতের জনমিতি চিত্রে এই সময় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল, কারণ এই সময় মহামারী, দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর ওপর সরকারের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে বন্টন ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতিকে খাদ্য উৎপাদনের উন্নতির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুহার কমিয়ে আনার জন্য পয়ঃপ্রণালী ও চিকিৎসা পরিষেবার প্রচুর উন্নতি ঘটানো হয়েছিল। সারণি 3.2 থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে 1921 সালে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল 47 আর 1951 সালে তা কমে হল 27। দ্রুত মৃত্যুহার কমার দরুন 1921 থেকে 1951 সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার ধীর বৃদ্ধি ঘটেছিল, কিন্তু জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে (1951) 40 জন।

**সারণি 3.1 ঃ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (1905-2001)**

| বছর | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) | পূর্ববর্তী দশকে % বৃদ্ধি | বছর | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) | পূর্ববর্তী দশকে % বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 236 | – | 1951 | 360 | +13.3 |
| 1911 | 249 | +5.7 | 1961 | 439 | +21.5 |
| 1921 | 248 | –0.3 | 1971 | 548 | +24.8 |
| 1931 | 276 | +11.0 | 1981 | 685 | +24.7 |
| 1941 | 315 | +14.2 | 1991 | 844 | +23.5 |
| | | | 2001 | 1.027 | +21.3 |

**সারণি 3.2 ভারতের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (1901 – 2001)**

| বছর | প্রতি হাজারে জন্মহার | প্রতি হাজারে মৃত্যুহার | স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার | বছর | প্রতি হাজারে জন্মহার | প্রতি হাজারে মৃত্যুহার | স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 49 | 43 | 6 | 1961 | 42 | 23 | 19 |
| 1921 | 48 | 47 | 1 | 1971 | 37 | 15 | 22 |
| 1931 | 46 | 36 | 10 | 1981 | 4 | 12 | 22 |
| 1941 | 45 | 31 | 14 | 1991 | 31 | 11 | 20 |
| 1951 | 40 | 27 | 12 | 2001 | 26 | 8 | 18 |

1951 সালকে ভারতের জনমিতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যেতে পারে। কারণ 1951-র পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা অভাবিত হারে বেড়েছে। 1951 থেকে 2001 সালের মধ্যে জনসংখ্যা তিন গুণের বেশি বেড়েছে। (360 থেকে 1027 মিলিয়ন)। গড়ে প্রতি বছর বৃদ্ধির হার হল শতকরা দুভাগ। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু উন্নয়নমূলক কার্যসূচি, পর্যাপ্ত খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার দরুন মৃত্যুহার কমে গিয়ে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে 27 থেকে কমে 11 হল। এই সময়কার জনমিতি ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল জন্মহার ধীরে ধীরে কমে ছিল,কিন্তু মৃত্যুহার দ্রুততালে কমে গিয়েছিল, ফলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারও বেশি ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার কমে যাওয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধির কিছু ফল লক্ষ্য করা যায়। ভারতের জনসংখ্যায় তরুণ জনতার হার বাড়ছে। এ দেশের 36.5 শতকরা ভাগ জনসংখ্যার বয়স 15 বছরের কম। জন্মহার বেশি ও আয়ুষ্কাল বাড়ায় পুনরুৎপাদন বয়সপুঞ্জে জনসংখ্যার শতকরা হার বাড়ছে, যার পরোক্ষ ফল হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সর্বোপরি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

এ দেশের গ্রাম ও শহর এলাকায় জনবৃদ্ধি হারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যদিও সাধারণভাবে এ দেশে জনবৃদ্ধির হার বেশি, তবুও শহরাঞ্চল অথবা গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধির হার কম। 1971-81-র দশকে গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে 19 ও 46 শতাংশ। যেহেতু ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হলেন গ্রামবাসী, তাই জনসংখ্যার নিরিখে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি গ্রামাঞ্চলেই ঘটেছে। গ্রাম্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের ভূমি সম্পদের ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। গ্রামে বেকারত্ব ও অর্থ-বেকারত্ব ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। যদি গ্রামে শিল্পায়নের দ্বারা অর্থনীতির উন্নতি ঘটানো না যায়, তবে সেখানকার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

পক্ষান্তরে, শহর এলাকা, বিশেষ করে বড় শিল্পকেন্দ্র ও জেলা-সদর শহরে, বাইরে থেকে প্রচুর লোকজন এসে বসবাস করছেন। ফলে ঐ সব স্থানের জনবৃদ্ধি দ্রুততালে ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে দেশের উর্বর কৃষিজমির ওপর লাগাম-ছাড়া নগরায়ণ ঘটে চলেছে। শহরে বস্তির সৃষ্টি হচ্ছে, সামাজিক সুযোগ-সুবিধের ঘাটতি ঘটেছে, দুষণের জন্য পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

**একনজরে ভারতের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা**

(India's Population, Health and Education at a glance)

| | | |
|---|---|---|
| 2025 সালের সম্ভাব্য জনসংখ্যা | ঃ | 133.02 কোটি |
| জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার তারিখ | ঃ | 2031 সাল |
| জনসংখ্যা (2001) | ঃ | 102.70 কোটি |
| পুরুষ | ঃ | 53.13 কোটি |
| মহিলা | ঃ | 49.57 কোটি |
| এক দশকে বৃদ্ধি (91-01) | ঃ | 22.34% |
| মোট বৃদ্ধি (1991-01) | ঃ | 183 কোটি |
| শহুরে জনসংখ্যা (2001) | ঃ | 27.78% |
| গ্রামীণ জনসংখ্যা ( „ ) | ঃ | 72.22% |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে) | ঃ | 324 জন |
| সাক্ষরতা (2001) | ঃ | 65.38% |
| পুরুষ | ঃ | 75.85% |
| মহিলা (1997) | ঃ | 54.16% |
| গড় আয়ু | ঃ | 62.6 বছর |
| হাজার পুরুষে মহিলার সংখ্যা | ঃ | 933 জন |
| প্রজনন হার (1997) | ঃ | 3.3% |
| জন্মহার (প্রতি হাজারে) | ঃ | 9.0 (1998) |
| মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) | ঃ | 70 (1999) |
| শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে পাঁচ বছরের কম বয়সী | ঃ | 70 (1999) |
| শিশুর মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) | ঃ | 98 (1999) |
| মাতৃত্বকালীন মৃত্যু (এক লক্ষ শিশুপিছু) | ঃ | 410 (1980-99) |
| চিকিৎসাগত কারণে ভ্রূণ হত্যা | ঃ | 6.15 লক্ষ (1999) |
| 60 বছরের বেশি বয়সী (জনসংখ্যার অংশ) | ঃ | 6.1% |
| 60 বছর বয়সের আগেই মৃত্যু (জনসংখ্যার অংশ) | ঃ | 30% |
| প্রতিবন্ধী (জনসংখ্যার অংশ) | ঃ | 0.2 (1995-96) |
| এইড্‌স রোগী (2000) | ঃ | 37 লক্ষ |

**শ্রমিক বিভাগ**

কৃষি ঃ 64

শিল্প ঃ 16

ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ঃ প্রাথমিক স্কুল 46.1

মধ্যস্তরের স্কুল 38 : 1 মাধ্যমিক স্কুল 32 : 1 উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল 35 : 11 কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয় 21 : 11

টেলিফোন - 27 (প্রতি হাজার), ফ্যাক্স 0.1 (প্রতি হাজারে)। রেডিও 80 (প্রতি হাজারে)।

প্রকাশিত বই—1 (প্রতি লক্ষে)।

ডাক্তারপিছু মানুষ 2.437। নার্স পিছু মানুষ 3.333। গবেষক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ 0.3 (প্রতি হাজারে)।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তারতম্য রয়েছে। যদিও সাধারণভাবে ভারতবর্ষ জনমিতি পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে, তবুও দেশের বিভিন্ন অংশ দ্বিতীয় পর্যায়ের একই ধাপে নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে কেরালার মৃত্যুহার হল প্রতি হাজারে 5.9, কিন্তু জন্মহার 19.8। এই রাজ্যটি জনমিতি পরিবৃত্তকালের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তু বিহার, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশ (পূর্ব) দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথমদিকে রয়েছে।

সারণি 3.3 থেকে আমরা গত দু'দশকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি চিত্র পাচ্ছি ঃ (i) স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার (1981-91) জনবৃদ্ধির হার কম ঘটল। 1971-81-র দশকে দেশের জনবৃদ্ধি ছিল 24.66 শতাংশ, 1981-91-র দশকে তা গিয়ে দাঁড়াল 23.5; (ii) দেশের বিভিন্ন অংশে জনবৃদ্ধির হার সমান নয়। নাগাল্যান্ডে গত দু'দশকে যেখানে জনবৃদ্ধি ঘটেছে +6.0 শতাংশ, সেখানে সিকিমে –22.3 শতাংশ, আর কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড়ে বৃদ্ধির হার হল –33.4 শতাংশ, (iii) ভারতবর্ষের 28টি রাজ্যের মধ্যে 16 টি রাজ্যের বৃদ্ধির হার নেতিবাচক (negative)। অন্যান্য রাজ্যে বৃদ্ধির হার খুব একটা বেশি নয়। চারটি রাজ্যের (বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ) জনবৃদ্ধির হার সমান নয়। রাজস্থানের বৃদ্ধির হার (–4.9%) জাতীয় গড়ের (–1.2%) চেয়ে অনেক কম। পক্ষান্তরে বিহার (–0.15%) ও উত্তরপ্রদেশের (0.01%) বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে কিছু কম, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বৃদ্ধির হার +1.5।

সাধারণত কেন্দ্রশাসিত এলাকাসমূহ হল শহরাঞ্চল। স্বভাবতই গ্রাম থেকে লোকজন এখানে এসে বসবাস করেন। ফলে এখানে জনবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু 1981-91-র দশকে সাতটির মধ্যে চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (শহর) মধ্যে চণ্ডীগড় সব থেকে শিক্ষিত শহর। চণ্ডীগড়ের জনসাধারণ ক্ষমতা তার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। এর পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে পাঁচকুলা ও মেহেলী নামে উপনগরী সৃষ্টি হয়েছে। এইসব কারণের জন্য চণ্ডীগড়ের জনধারণ ক্ষমতা তার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। এর পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে পাঁচকুলা ও মেহেলী নামে উপনগরী সৃষ্টি হয়েছে। এইসব কারণের জন্য চণ্ডীগড়ের জনবৃদ্ধি কমেছে।

জেলাস্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশের মোট জেলার 10 শতাংশের (45টি জেলা) বৃদ্ধির হার (1981-91) 15 শতাংশের কম। এক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর 14টি জেলা দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এগিয়ে আছে। এর পরের স্থান হল কেরালা (7), কর্ণাটক (6), মহারাষ্ট্র (4), গুজরাট (4), উত্তরপ্রদেশ (3), পাঞ্জাব (2), হিমাচলপ্রদেশ (2), বিহার, গোয়া ও পশ্চিমবঙ্গের (প্রতিটির 1টি করে জেলা)।

### 2.3.1 1991-2001 সাল পর্যন্ত জনবৃদ্ধি (Growth of Population from 1991 to 2001)

এই দশকে জনবৃদ্ধি আরও হ্রাস পেয়েছে। এই দশকে জনবৃদ্ধি ছিল 21.34 শতাংশ যা পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় 2.52 শতাংশ (23.86 – 21.34) কম (সারণি 3.1)। 1981-91 দশক থেকে যে জনবৃদ্ধির হার কমেছিল, তা বর্তমান দশকে আরও কমে গেল।

রাজ্যগুলোর মধ্যে পূর্বের ন্যায় এবারও কেরলে সবচেয়ে কম জনবৃদ্ধি ঘটেছে, মাত্র 9.42 শতাংশ, যা পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় 4.88 শতাংশ কম। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে এই দশকে 15 শতাংশের কম বৃদ্ধি ঘটেছে তারা হল তামিলনাড়ু (11.19%), অন্ধ্রপ্রদেশ (13.86%), ও গোয়া (14.89%)। গোটা দেশের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের সবচেয়ে কম জনবৃদ্ধি ঘটেছে, তা হল পূর্ববর্তী দশকের (24.20%), তুলনায় 10.84 শতাংশ কম (বর্তমান দশকে 13.86 শতাংশ)।

জাতীয় গড়ের (21.34 শতাংশ) তুলনায় কম ও জনবৃদ্ধির রাজ্যগুলো হল ত্রিপুরা (15.74 শতাংশ), ওড়িশা (15.94), কর্ণাটক (17.25), হিমাচলপ্রদেশ (17.53), পশ্চিমবঙ্গ (17.84), ছত্তিশগড় (18.06), অসম (18.85), উত্তরাঞ্চল (19.2) এবং পাঞ্জাব (19.76)। এভাবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে ভারতের 28টি রাজ্যের মধ্যে 13টির জনবৃদ্ধির হার 20 শতাংশের কম। এইসব রাজ্যগুলোর মধ্যে আছে সমস্ত দক্ষিণের রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরার মতো পূর্বের রাজ্যগুলো, উত্তরাঞ্চল, নতুন সৃষ্ট উপজাতি রাজ্য ছত্তিশগড় এবং কৃষিসমৃদ্ধ পাঞ্জাব।

এর বিপরীতে রয়েছে নাগাল্যান্ড যেখানে জনবৃদ্ধির হার ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, 64.6 শতাংশ। (1991-2001) পূর্বের দশকের (56.8 শতাংশ) তুলনায় এই বৃদ্ধির হার 8.33 শতাংশের বেশি। এই ধরনের বৃদ্ধির পেছনে কারণ হল এখানে সবসময় দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে এবং দেশের বাইরে থেকে অভিবাসন (immigration) ঘটে চলেছে। অন্যান্য যে সব রাজ্যে যেখানে জলবৃদ্ধির হার বেশি, সেগুলো হল সিকিম (32.98 শতাংশ), মণিপুর (30.08), মেঘালয় (29.94), মিজোরাম (29.18), জম্মু ও কাশ্মীর (29.04), বিহার (28.43), রাজস্থান (28.33), হরিয়ানা (28.06), অরুণাচলপ্রদেশ (26.15), উত্তরপ্রদেশ (25.8), মধ্যপ্রদেশ (24.34), ঝাড়খণ্ড (23.18), মহারাষ্ট্র (22.57) ও গুজরাত (22.48)। উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকাংশ ছোট রাজ্যই জনবৃদ্ধি বেশি। এ থেকে বোঝা যায় যে এই অঞ্চলে সীমান্তের ওপার থেকে ওই সব রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। এটি খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার এবং এটি শাসকদলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।

কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র পণ্ডিচেরী (20.56) ও লাক্ষাদ্বীপে (17.19) ঐ জাতীয় গড়ের (21.34) চেয়ে কম জনবৃদ্ধি ঘটেছে। দাদরা ও নগর হাভেলী-তে জনবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে (59.2)। এর পরের স্থান হল (55.59), দিল্লী (46.31), চণ্ডীগড় (40.33), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (26.94)। যেহেতু অধিকাংশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো হল শহরাঞ্চল, তাই সেখানে কাজের সন্ধানে গ্রামীণ জনতার অভিবাসন ঘটেছে।

সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাতটির মধ্যে পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জনবৃদ্ধির হার কমেছে। কেবলমাত্র দাদরা ও নগর হাভেলী এবং দমন ও দিউ-তে জনসংখ্যা বেড়েছে।

দেশের পক্ষে এটাই বড় সন্তোষের কথা যে 24 টির মধ্যে 21টিতে জনবৃদ্ধির হার কমেছে (সারণি 3.3)। এ থেকে মনে হয় যে জনসংখ্যা হ্রাস একটি বড় অঞ্চল জুড়েই ঘটেছে। যে সমস্ত রাজ্যে খুব বেশি জনহ্রাস ঘটেছে, সেগুলো হল উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা (–18.56 শতাংশ), অরুণাচল প্রদেশ (–10.68), মিজোরাম (–10.52) এবং দক্ষিণের অন্ধ্রপ্রদেশ। সে তুলনায় যেসব রাজ্যে বর্তমান দশকে জনবৃদ্ধি বেশি ঘটেছে সেগুলো হল উত্তরপ্রদেশ

(0.25 শতাংশ), হরিয়ানা (0.65), মেঘালয় (0.7), গুজরাত (1.29), সিকিম (4.5), বিহার (5.0), এবং নাগাল্যান্ড (8.3)। উপরের তথ্য থেকে বলা যায় যে নাগাল্যান্ড ও বিহার ছাড়া প্রায় সর্বত্রই জনবৃদ্ধির হার খুব সামান্য এবং মনে হয় যে আগামী দিনেও ভারতে জনবৃদ্ধির হার কম ঘটবে। আরও বলা যেতে পারে ভারতে জনমিতি বিবর্তনের এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক, এই দশকের (1991-2001) একটি দুশ্চিন্তার কারণ হল গর্ভপাত, বিশেষ করে অবাঞ্ছিত কন্যা-শিশু হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এতে করে হয়তো পরিবারের আয়তন সীমিত রাখা যাচ্ছে। কিন্তু বয়ঃপুঞ্জের কন্যা-শিশুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে। কন্যা ভ্রূণহত্যা আগামী দিনে আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ অনুপাতের ভারসাম্য নষ্ট করবে এবং সমাজে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় বন্ধ করে দিয়েছে, তবুও এই ঘটনা আজও ঘটেই চলেছে।

**সারণি 3.3 ঃ ভারত—জনবৃদ্ধির হারের পরিবর্তন ঃ 1981-2001 ( % হারে)**

| রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল | 1981-91 | পরিবর্তন 1971-81 এবং 1981-91 | 1991-2001 | পরিবর্তন 1981-1991 এবং 1991-2001 |
|---|---|---|---|---|
| **ভারত** | 23.86 | –8.8 | 21.34 | –2.51 |
| **রাষ্ট্র** | | | | |
| নাগাল্যান্ড | 56.08 | +6.03 | 64.41 | +8.31 |
| সিকিম | 28.47 | -22.30 | 32.98 | +4.51 |
| মণিপুর | 29.29 | -3.17 | 30.02 | +0.73 |
| মেঘালয় | 32.86 | +0.82 | 29.94 | -2.92 |
| মিজোরাম | 39.70 | -8.85 | 29.18 | -10.52 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 30.34 | -0.77 | 29.04 | -1.30 |
| বিহার | 23.38 | 0.52 | 28.43 | +5.05 |
| রাজস্থান | 28.44 | -4.53 | 28.33 | -0.11 |
| হরিয়ানা | 27.41 | -1.35 | 28.06 | +0.65 |
| অরুণাচল প্রদেশ | 36.83 | +1.68 | 26.15 | -10.68 |
| উত্তর প্রদেশ | 25.55 | -0.01 | 25.80 | -0.25 |
| মধ্যপ্রদেশ | 27.24 | +1.57 | 24.36 | -2.90 |
| ঝাড়খণ্ড | 24.03 | N.A. | 23.18 | -0.85 |
| মহারাষ্ট্র | 25.73 | +1.21 | 22.57 | -3.16 |
| গুজরাত | 21.19 | -6.48 | 22.48 | +1.29 |

| রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল | 1981-91 | পরিবর্তন 1971-81 এবং 1981-91 | 1991-2001 | পরিবর্তন 1981-1991 এবং 1991-2001 |
|---|---|---|---|---|
| পাঞ্জাব | 20.81 | -2.92 | 29.76 | -1.05 |
| উত্তরাঞ্চল | 24.23 | N.A. | 19.20 | -5.03 |
| আসাম | 24.24 | +0.22 | 18.85 | -5.39 |
| ছত্তিশগড় | 25.73 | N.A. | 18.06 | -7.67 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 24.73 | +1.56 | 17.84 | -6.89 |
| হিমাচল প্রদেশ | 20.79 | -2.92 | 17.53 | -3.26 |
| কর্ণাটক | 21.12 | -5.63 | 17.25 | -3.87 |
| ওড়িশা | 20.06 | -0.11 | 15.94 | -4.12 |
| ত্রিপুরা | 34.30 | +2.38 | 15.74 | -18.56 |
| গোয়া | 16.08 | -10.66 | 14.89 | -1.19 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | 24.20 | +1.10 | 13.86 | -10.34 |
| তামিলনড়ু | 15.39 | -2.11 | 11.19 | -4.20 |
| কেরালা | 14.32 | -4.92 | 9.42 | -4.90 |
| **কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল** | | | | |
| দাদরা ও নগর হাভেলী | 33.57 | -6.21 | 59.20 | +25.63 |
| দমন ও দিউ | 28.62 | +2.55 | 55.59 | +26.97 |
| দিল্লী | 51.45 | -1.95 | 46.31 | -5.41 |
| চণ্ডীগড় | 42.16 | -33.39 | 40.33 | -1.83 |
| আন্দামান ও নিকোবর | 48.70 | -15.23 | 26.94 | -21.76 |
| পণ্ডিচেরী | 33.64 | +5.49 | 20.56 | -13.08 |
| লাক্ষাদ্বীপ | **28.47** | **+1.94** | **17.19** | **-11.28** |

*Source : Census of India 2001, Provisional Populations Totals, 2001 Table G-1 and Census of India, 1991 : Final Population Totals, India, Paper 11 of 1992, p. 44*

যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারত-ই প্রথম 1951-52 সালে জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছে তবুও পৃথিবীর মধ্যে জনবৃদ্ধি ঘটাতে এই দেশের অবদান সবচেয়ে বেশি। এর কারণ হল আমাদের জনসংখ্যা নীতি দেশের জনগণের মানসিকতার ওপর গভীর ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও নীতি নির্ধারকদের (Policy-marker) যুক্তির মধ্যে বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। তাই যাদের জন্য পরিকল্পনা, তাদের

এ ব্যাপারে জড়াতে না পারলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, জনগণের জন্য তৃণমূল স্তর থেকে পরিকল্পনা হাতে নিলে তা সফল হবে। তাই দেখা যায় পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, ক্রমশ তা বেড়েই চলেছে। বস্তুত, গত 40 বছরের (1951-91) মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা দুগুণেরও বেশি বেড়েছে। ম্যালথাসের মতে প্রতিটি দেশের জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে 30-35 বছরের মধ্যে দু'গুণ হওয়ার প্রবণতা থাকে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকেই সমর্থন করে।

## এক নজরে আমাদের খাদ্য

## (Our Food at a glance)

| | | |
|---|---|---|
| ক্যালোরি গ্রহণ (গড়ে প্রতিদিন মাথা-পিছু) | 2.415 | |
| দুধ (প্রতিদিন) | 203 | গ্রাম |
| মাংস (বাৎসরিক) | 2 | কেজি |
| মাথা-পিছু খাদ্য প্রাপ্তি (প্রতিদিন) | 467 | গ্রাম |
| ডাল | 11.5 | কেজি (প্রতি বছর) |
| ভোজ্য তেল | 1 | কেজি (প্রতি বছর) |
| বনস্পতি | 1 | কেজি (প্রতি বছর) |
| শাকসবজি | 150 | গ্রাম (প্রতিদিন) |
| ফল | 80 | গ্রাম (প্রতি বছর) |
| চিনি | 14 | কেজি (প্রতি বছর) |
| প্রোটিন | 59 | গ্রাম |
| স্নেহ পদার্থ | 44 | গ্রাম |

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

সূত্র ঃ মনোরমা ইয়ারবুক, 2002

## সুষম খাদ্যের গঠন

| খাদ্যদ্রব্য | নিরামিষভোজী | গ্রাম ক্যালরি | আমিষভোজী | গ্রাম ক্যালোরি |
|---|---|---|---|---|
| খাদ্যশস্য | 325 | 1150 | 325 | 1150 |
| ডাল ও বাদাম | 100 | 320 | 50 | 160 |
| দুধ (মিলি) | 200 | 235 | 100 | 117 |
| মূলজাতীয় সবজি | 150 | 145 | 150 | 117 |
| অন্যান্য সবজি | 100 | 50 | 100 | 50 |
| শাকপাতাযুক্ত সবজি | 100 | 50 | 100 | 50 |

| খাদ্যদ্রব্য | নিরামিষভোজী | গ্রাম ক্যালরি | আমিষভোজী | গ্রাম ক্যালোরি |
|---|---|---|---|---|
| ফল | 100 | 100 | 80 | 80 |
| ডিম (1টি) | — | — | 50 | 85 |
| মাংস | — | — | 100 | 195 |
| চর্বি | 50 | 450 | 50 | 450 |
| চিনি/গুড় | 30 | 120 | 30 | 120 |
| **মোট** | | **2620** | | **2574** |

## 2.4 জনসংখ্যার পরিবর্তন (Demographic Transition)

**ভূমিকা (Introduction)**

''Dictionary of Human Geography'' থেকে জনসংখ্যা বিবর্তন সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হল—''A general model describing the evolution of levels of fertility and mortality over time. It has been devised with particular reference to the experience of developed countries.''

মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেশ ও সময়ের সাথে সাথে বদলে যায়। ফলে মানব উন্নয়নের সূচকের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যের প্রকৃতিও বদলে যায়। সময় ও দেশের প্রভাব মানুষের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করে সে বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানীরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 1929 সালে Warren Thompson সর্বপ্রথম, জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থনীতির প্রভাবের কথা বলেছেন। তাঁর মতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রত্যেকটির নিজস্ব ধরন ও চাহিদা আছে। সুতরাং কৃষিভিত্তিক সমাজের যা চাহিদা, তা কখনই শিল্পভিত্তিক সমাজে থাকতে পারে না। ফলে কৃষি যত উন্নত হয়, সমাজ ও অর্থনীতি ততই মজবুত হতে থাকে। এইভাবে যখন শিল্প ও বাণিজ্যের চূড়ান্ত অগ্রগতি হয়, তখন সমাজের অর্থনীতি আরও মজবুতভাবে গড়ে ওঠে। আসলে Thompson (1929), Notestein (1945), Blacker (1947) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে জন্মহার ও মৃত্যুহারের সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং এই ধারণার ভিত্তিতেই জনসমষ্টির বিবর্তন তত্ত্ব (Demographic Transition Theory) গড়ে উঠেছে।

### 2.4.1 জনসংখ্যার বিবর্তন তত্ত্ব (Demographic Transition Theory)

আলোচ্য তত্ত্বটির মূল কথা হল, কোন দেশের সমাজ ও অর্থনীতি অর্থাৎ মানব উন্নয়নের অবস্থার সাথে ঐ দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে (চিত্র 4.1)। যেমন—

(i) উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার = কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি = সমাজ ও অর্থনীতির দুর্বল অবস্থা।

(ii) উচ্চ জন্মহার ও নিম্নমুখী মৃত্যুহার = শিল্পোন্নয়ন = উন্নয়নের শুরু

(iii) নিম্নমুখী জন্মহার ও নিম্নমুখী মৃত্যুহার = শিল্প ও বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি এবং আধুনিক কৃষি = সমাজ ও অর্থনীতির সবল অবস্থা।

(iv) নিম্ন জন্মহার ও অতি নিম্নমুখী মৃত্যুহার প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা হ্রাস সবল অর্থনীতি দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা (চিত্র 4.1) (এটি সাধারণত একটি সাময়িক অবস্থা)।

Beaujeu-Garnier (1966)-এর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মূলতঃ তিন ধরনের—

(1) ক্রমবর্ধমান প্রাচীন প্রকৃতির হার।

(2) ক্রমবিবর্তিত হার বা নবীন পাশ্চাত্য পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির হার।

(3) পরিণত হার বা আধুনিক পাশ্চাত্য পর্যায়।

**জনবৃদ্ধির হার অনুযায়ী তিন ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্য**

| পর্যায়/হার | জন্ম | মৃত্যু | জনবৃদ্ধি | অর্থনীতি |
|---|---|---|---|---|
| 1. প্রাক-শিল্পীয় (Pre-Industrial) | বেশি (High) | বেশি পরিবর্তনশীল | স্থানু থেকে কম (Static to low) | আদিম বা কৃষিভিত্তিক |
| 2. নবীন-পাশ্চাত্য (Early-Western) | বেশি (High) | কমের দিকে | বেশি | মিশ্র |
| 3. আধুনিক-পাশ্চাত্য (Modern-Western) | নিয়ন্ত্রিত, সাধারণভাবে কম থেকে মাঝারি | কম | কম থেকে মাঝারি | শহর শিল্পাশ্রিত ও মিশ্র |

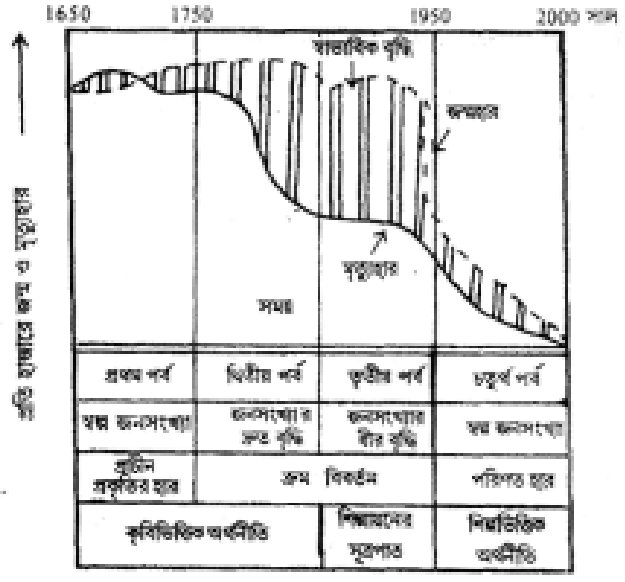


চিত্র **4.1 :** জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃতি ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্ক

অনেক সমাজবিজ্ঞানী অবশ্য 3-টির বদলে 4-টি স্তরের (Stage বা Phase) কথা বলেছেন (চিত্র 4.2)। এঁদের মতে **প্রথম স্তরে** জন্মহার ও মৃত্যুহারে দুই-ই বেশি থাকায় জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে। **দ্বিতীয় স্তরের** বৃদ্ধি আরও বেশি রকমের। কারণ এই স্তরে জন্মহার বেশি, কিন্তু মৃত্যুহার কম (চিত্র 4.3)। অনুন্নত দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রথম স্তরে এবং ভারত দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে। **তৃতীয় স্তরে** জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুব একটা ঘটে না। একে বলে **Plateau Phase** বা **মালভূমি স্তর** বলে। মালভূমির পৃষ্ঠদেশের উচ্চতা যেমন মোটামুটি একই থাকে, তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির রেখাচিত্র (Graph) একই থাকে। স্পেন, ইতালি প্রভৃতি দেশ এই স্তরে রয়েছে। এখানে জন্ম ও মৃত্যুর হার দুই-ই কম, তাই বৃদ্ধির হারও বেশ কম। **চতুর্থ স্তরে** জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায়। জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক [ চিত্র 4.4 (ক)], সুইডেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ এই স্তরে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই দেশগুলোতে জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা কমই বলা চলে। অতি উন্নতমানের জীবনযাত্রা ও সামাজিক অবস্থা এর জন্য দায়ী। বয়স্ক পুরুষ অপেক্ষা বয়স্ক নারী সংখ্যা এ দেশগুলোতে বেশি।

### 2.4.2 জনমিতি বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় এবং পর্যায় গঠনের কারণ

বিভিন্ন ধরনের জনমিতি বিবর্তনের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জনসংখ্যা বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এই জনমিতি বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ এবং তাদের সম্ভাব্য কারণগুলো নিচে আলোচিত হল ঃ

#### 2.4.2.1 প্রথম পর্ব ঃ ক্রমবর্ধমান প্রাচীন প্রকৃতির হার (First Stage : Increasing Primitive Types)

এটি জনসমষ্টির বিবর্তন বা-এর প্রথম পর্ব। এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল ঃ

(i) জন্মহার ও মৃত্যুহার অত্যধিক (প্রতি হাজারে 30-এর বেশি)

(ii) জন্মহার ও মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হওয়ার জন্য দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

(iii) দেশীয় বা আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। অর্থনৈতিক প্রগতি ও মানব উন্নয়নের হার মন্থর।

(iv) অর্থনীতি কৃষিনির্ভর ও সমাজ কৃষিভিত্তিক। এটি নিম্নবিত্ত-উন্নয়নশীল দেশের প্রচলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

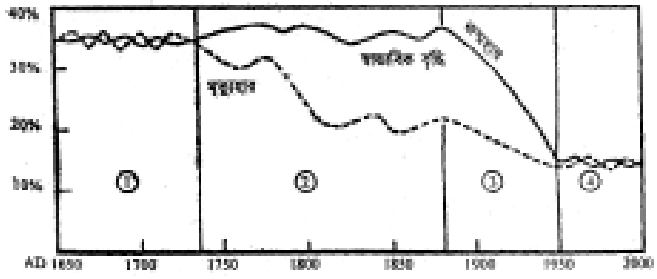


চিত্র **4.2 :** 1650 সাল থেকে পৃথিবীর জনমিতি পরিবৃত্তকালের একটি মডেল। চারটি পর্যায় এখানে দেখান হয়েছে। (1) জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, (2) প্রথমদিকে জনবৃদ্ধি: (3) শেষদিকের জনবৃদ্ধি, (4) জন্ম-মৃত্যু হ্রাস-বৃদ্ধি।

আফ্রিকা মহাদেশের গ্যাবন, জাম্বিয়া, সোয়াজিল্যাণ্ড ইত্যাদি প্রাচীন প্রকৃতির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দেশ। প্রাক-অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেট বৃটেনে এই ধরনের অবস্থা ছিল (চট্টোপাধ্যায় 2001)।

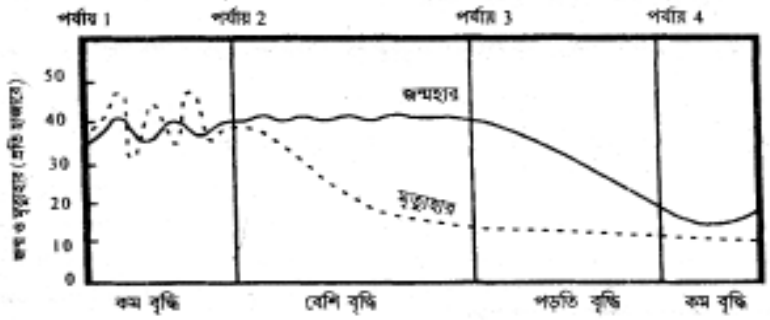


চিত্র **4.3 :** পৃথিবীর জনমিতি পরিবৃত্তকালের একটি মডেল (সাধারণ)

**2.4.2.2 দ্বিতীয় পর্ব ঃ ক্রমবিবর্তিত হার বা নবীন পাশ্চাত্য পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির হার (Second Stage : Transitional Type)**

আলোচ্য পর্যায়টি জনসমষ্টির বিবর্তন বা Demographic Transition-এর দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(i) ক্রমবর্ধমান বিবর্তিত হার (Increasing Transitional Type) ও (ii) আয়ত্তাধীন বিবর্তিত হার (Controlled Transitional Type)।

ক্রমবর্ধমান বিবর্তিত হার (Transitional Type) পৃথিবীর সেই সমস্ত দেশে দেখা যায় যেখানে অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হলেও শিল্প ও পরিষেবামূলক সুযোগ-সুবিধে ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হল ঃ

(i) জন্মহার বেশি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত।

(ii) চিকিৎসার সুযোগ বাড়ার জন্য মৃত্যুহার আস্তে আস্তে কমে যায়।

(iii) জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হওয়ার জন্য জনসংখ্যা এই পর্যায়েও বাড়তে থাকে।

(iv) দেশীয় বা আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো ধীরে ধীরে মজবুত হয়।

(v) অর্থনীতি প্রধানত মিশ্র প্রকৃতির। যা উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য।

এশিয়া মহাদেশের চীন, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি রাষ্ট্র **ক্রমবর্ধমান বিবর্তিত** (Incresing Transitional) জনসংখ্যার দেশ।

বিপরীতভাবে, **আয়ত্তাধীন বিবর্তিত** হারের দেশগুলোতে (Controlled Transitional Type) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম অর্থাৎ এখানে।

(i) জন্মহার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত।

(ii) সম্প্রসারিত চিকিৎসার সুযোগ মৃত্যুহার আরও কমে।

(iii) উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার আয়তন ক্রমহ্রাসমান।

(iv) মজবুত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো প্রবর্তন।

(v) আলোকপ্রাপ্ত জনসমাজ (চট্টোপাধ্যায়, 2000)

স্পেন, গ্রীস, ইতালি, রুমানিয়া অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলো হল **আয়ত্তাধীন বিবর্তিত হারের দেশ।**

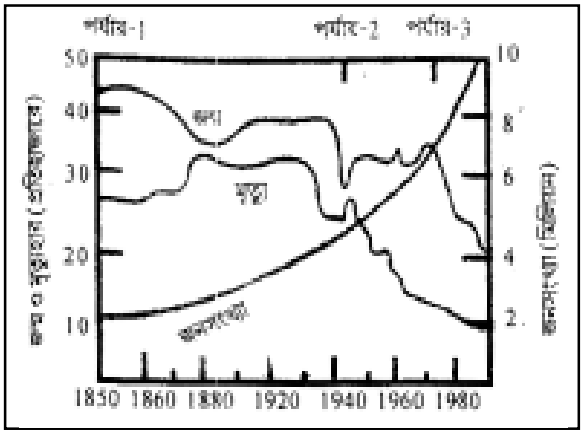


জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনুসারে দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ নবীর পাশ্চাত্য পর্যায়ের দেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(i) **গুয়াতেমালা হার,** (ii) **থাইল্যান্ড হার ও** (iii) **চিলি হার।**

(i) **গুয়াতেমালা হার** (Guatemala Type) ঃ কোন দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 20-30 এর মধ্যে থাকলে, তাকে গুয়াতেমালা হার বলে। এই হারের দেশগুলোতে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, কারণ এখানে জন্মহার (গড় প্রতি হাজারে 43 জন) মৃত্যুহারের চেয়ে (গড়ে 15 জন) স্বাভাবিকভাবেই বেশি। সুতরাং জন্মহার অনিয়ন্ত্রিত। জন্মনিয়ন্ত্রণ করার জন্য এসব দেশে কোন সরকারি ব্যবস্থা নেই। এখানে মৃত্যুহার কমানোর জন্য চিকিৎসার সুযোগ কম। যেমন— পূর্ব এশিয়া (বাংলাদেশ, পাকিস্তান), মধ্য প্রাচ্য ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ।

(ii) **থাইল্যান্ড হার** (Thailand Type) ঃ কোন দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 25-35 এর মধ্যে থাকলে তাকে থাইল্যাণ্ড হার বলে। এই হারের দেশগুলোতে জন্মহার বেশি ও চিকিৎসা সুযোগ বেশি থাকার জন্য মৃত্যুহার কম। মানব উন্নয়নের প্রকৃতি অনুসারে এই হার গুয়াতেমালা হারের চেয়ে অনেকটাই বিপরীত। যেমন শ্রীলঙ্কা, পুয়োর্তোরিকো।

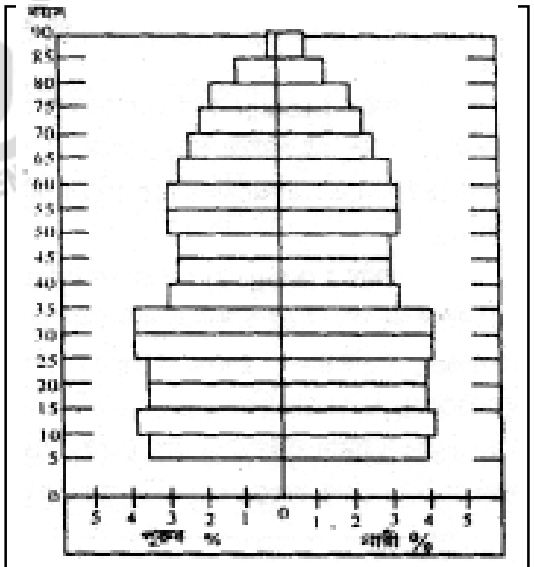

চিত্র **4.4**(খ) **:** ডেনমার্কের জনসংখ্যা পিরামিড

(iii) **চিলি হার** (Chile Type) ঃ কোন দেশের জনসংখ্যার হাজারে 27, মৃত্যুহার 8.4 এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 19 জন হলে তাকে **চিলি হার** বলে। যেমন—চিলি। এখানে জন্মহার ক্রম-হ্রাসমান এবং মৃত্যুহার কম [ চিত্র 4.4 (ক) ও (খ)]। তবে জন্মহার এখনও মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি। গুয়াতেমালা হারের দেশগুলোতে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল নিয়ে লোকজনের বিশেষ উদ্বেগ নেই, চিলি হারের দেশগুলো কিন্তু তার চেয়ে অনেক উন্নত। এখানে জনগণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপার সামাজিকভাবে সচেতন।

### 2.4.2.3 তৃতীয় পর্ব ঃ পরিণত হার (Third Stage : Mature Type)

এটি জনসংখ্যা বিবর্তনের তৃতীয় পর্ব। এই পর্যায়ে জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। এটি উন্নত অর্থনীতি ও সচেতন সমাজব্যবস্থায় পরিচয় বহন করে। এই জাতীয় সমৃদ্ধ অর্থব্যবস্থায় জনসাধারণ ধনী, শিক্ষিত ও সচেতন হয়। ফলে—

(i) জন্মহার সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

(ii) জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান ও সমপ্রায় অবস্থায় পৌঁছোয় অর্থাৎ জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়।

ডেনমার্ক, জাপান, নরওয়ে, জার্মানি ইত্যাদি ক্রমহ্রাস জন্মহারের দেশ।

উল্লেখ্য যে, ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা বা স্থিতিশীল জনসংখ্যার দেশগুলোতে যৌথ পরিবার দেখা যায় না এবং নারী ও পুরুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা সমান হয়।

**নবীন পাশ্চাত্ত্য পর্যায় বা প্রাথমিক প্রকৃতির হারের মত** এক্ষেত্রেও কয়েকটি উপরিভাগ লক্ষ্য করা যায়।

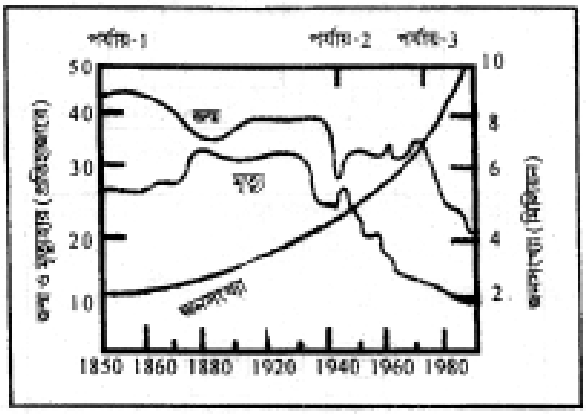


চিত্র **4.5** (ক), (খ) : চিলির জনমিতি পরিবৃত্তকালের মডেল ও জনসংখ্যা পিরামিড। 1930-র দশকে চিলি জনমিতি পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। মৃত্যুহার হঠাৎ করে কমে গিয়েছিল। কিন্তু জন্মহার প্রতি হাজারে 30 শতাংশ ছিল। 1960-র দশকে সরকারি জন্ম নিয়ন্ত্রণ নীতির দরুন জন্মহার হঠাৎ করে কমে যায়। অবশ্য 1979 সালে ঐ নীতি বদলের ফলে 1980 দশক থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

**পর্যায় 1 (Stage 1)** ঃ যেখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে বা তার কম। দক্ষিণ ইউরোপের অনেকগুলো দেশ এই পর্যায়ে পড়ে। যেমন— পর্তুগাল (9‰), রাশিয়া (9.‰), যুগোশ্লোভিয়া (9.3‰), স্পেন (107‰), এছাড়া অস্ট্রেলিয়া (10.4‰), নিউজিল্যাণ্ড (12‰), কানাডা (8.1‰) প্রভৃতি দেশও এই পর্যায়ে পড়ে।

**পর্যায় 2 (Stage 2)** ঃ এরপরও রয়েছে কিছু দেশ যেখানে জন্ম (প্রতি হাজারে প্রায় 12) ও মৃত্যু (প্রায় 10) দুই-ই খুব কম। ফলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হাজারে দুই জন 2। উত্তর ইউরোপের দেশসমূহ, যেখানে অস্ট্রিয়া (0.6‰), বেলজিয়াম (1.2‰), যুক্তরাজ্য (1.9‰) (চিত্র 4.6) ও সুইডেন (3‰)-এর মধ্যে পড়ে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে (U.S.A) স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 5.6। সাম্প্রতিককালে (1987) যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার বিগত বছরগুলোর তুলনায় দারুণভাবে কমে গেছে। উচ্চশিক্ষা ও জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার বাসনার দরুন এদেশের যুবক-যুবতীরা বিয়ে স্থগিত রাখছে এবং এটিই জন্মহার হ্রাসের কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে।

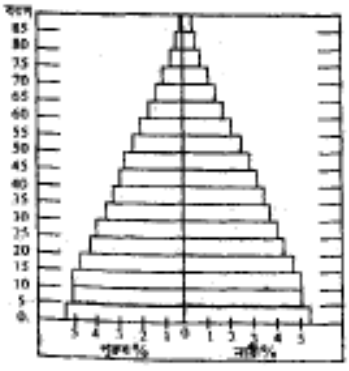

চিত্র **4.5**(খ) **:** চিলির জনসংখ্যা পিরামিড

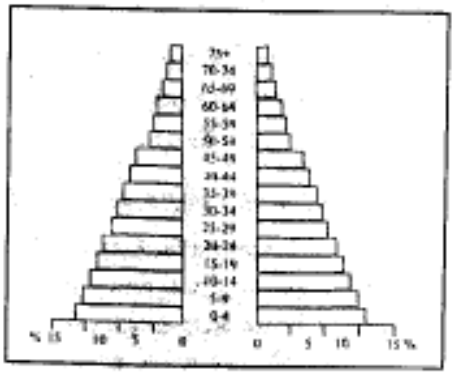

চিত্র **4.6**(ক) **:** যুক্তরাজ্যের (U.K.) জনসংখ্যা পিরামিড, 1891

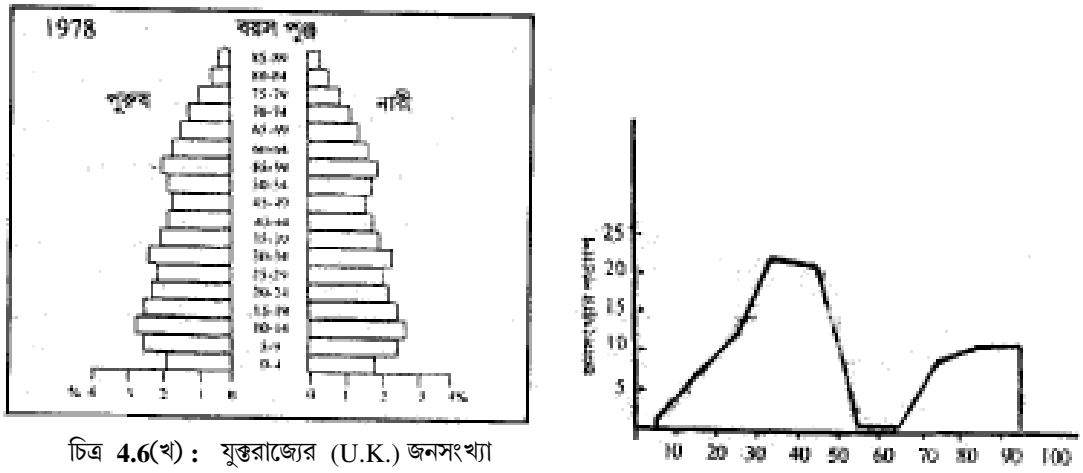


চিত্র **4.6(খ) :** যুক্তরাজ্যের (U.K.) জনসংখ্যা পিরামিড, 1978

### 2.4.2.4 চতুর্থ পর্ব ঃ নেতিবাচক বৃদ্ধিহার (Fourth Stage : Negative Growth Rate)

পরিণত হার-এর পাশাপাশি কতগুলো দেশ রয়েছে যেখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নেতিবাচক অর্থাৎ জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহার বেশি। যেমন জার্মানি (2.3%), লাক্সেমবার্গ (2.1%), অস্ট্রিয়া এবং বেলজিয়ামও এই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি। জনসংখ্যা বিবর্তনের চতুর্থ পর্যায়ে উপনীত দেশসমূহে সাধারণত জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রায় একই থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য। এই অবস্থাকে বলা হয় **শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি** (Zero Population Growth)

এভাবে জনসংখ্যা বিবর্তন একটি দেশকে বিবর্তন চক্রের প্রথম অবস্থায় নিয়ে আসে (অতি সামান্য বা কোন বৃদ্ধি না হওয়া)। এই পর্যায়ে জনবৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে 15 জন। ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড এই চতুর্থ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বগ (Bogue) অবশ্য এই জনসংখ্যা পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের অন্য নাম দিয়েছেন। সেগুলো হল ঃ

(1) **প্রাক্-পরিবর্তন অবস্থা** (Pre-transitional i.e., Stage A – High Potential Growth),

(2) **পরিবর্তন অবস্থা** (Transitional i.e., Stage B – Transitional Growth),

(3) **পরিবর্তন-উত্তর অবস্থা** (Post-transitional i.e., Stage C – Incipient Decline)।

Bogue অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়কে আরও তিনভাগে ভাগ করেছেন, যথা—,

2(a) **পরিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থা (Early-transitional)** ঃ এই অবস্থার দেশগুলোতে সাধারণভাবে মৃত্যুহার কমার দিকে, জন্মহার বৃদ্ধির দিকে। মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জন্মহার সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। জনসংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে।

2(b) **পরিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থা (Mid-transitional)** ঃ এই ধরনের দেশগুলোতে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়েই হ্রাস পাচ্ছে যদিও জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় খুব বেশি।

2(c) **পরিবর্তনের শেষ অবস্থা (Late-transitional)** ঃ এই ধরনের দেশগুলোতে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়েই হ্রাস পাচ্ছে যদিও জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় খুব বেশি। মৃত্যুহার কমার গতি মন্থর। জন্মনিরোধক বড়ি ও প্রযুক্তি

সমাজের সর্বস্তর গ্রহণ করেছে। জন্ম ও মৃত্যুহারের তফাৎ যথেষ্ট কমার জন্য জনসংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে। শীঘ্রই এই বৃদ্ধি শূন্যে পৌঁছবে (চিত্র 4.7)।

**জনসংখ্যা পরিবর্তনের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক**

Thompson এবং Notestein-এর মত আরো অনেকে জনসংখ্যার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন C. P. Blacker, Karl Sax ও Adoph Landry.

**C. P. Blacker-এর 'পঞ্চ পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি' (Five Stages of Population Growth)**

Blacker মনে করেন জনসংখ্যা পাঁচটি পর্যায়ে বাড়ে (চিত্র 4.8)। এই পর্যায়গুলো হলো নিম্নরূপ ঃ

A. **উচ্চ স্থানু জনসংখ্যা ঃ** এই পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই খুব বেশি। অতি অনুন্নত অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থায় উচ্চ জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য থাকে। ফলে জনসংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ে। অনেক সময় মৃত্যুহার বাড়ার ফলে জনসংখ্যাও কমে যায়। দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর ফলে বহু লোকের মৃত্যু হয়। Blacker-এর মতে 1900 সাল নাগাদ চীন ও ভারতবর্ষ উভয়েই এই পর্যায়ে ছিল। Blacker আরো দেখিয়েছেন যে 1930 সাল পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় 22 শতাংশ জনতা এই পর্যায়ে ছিলেন।

B. **প্রাক্-বিস্তার পর্যায় ঃ** যখন (ক) দুর্ভিক্ষ-মহামারীর প্রকোপকে কিছুটা বাগে আনা সম্ভবপর হলো, (খ) চিকিৎসা-ব্যবস্থা জনগণের মধ্যে কিছুটা সম্প্রসারিত হলো এবং (গ) প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ কমে আসল, তখন জনতার মৃত্যুহার নিশ্চিতভাবে কমতে শুরু করলো। মৃত্যুহারের পরিবর্তন হলো ঠিকই, কিন্তু জন্মহার প্রায় একই রকম থেকে গেল। ফলে জনসংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলো। Blacker-এর মতে 1930 সাল নাগাদ পৃথিবীর প্রায় 40% জনসংখ্যা এই পর্যায়ে ছিল। ঐ সময়ে আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশই এই পর্যায়ে ছিল। এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলো এই সময় তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

C. **শেষ বিস্তার পর্যায় ঃ** মৃত্যুহার কমে যাবার বেশ কিছুকাল পর জন্মহারও কমতে শুরু করে। লক্ষ্যণীয় যে এই সময় মৃত্যুহার দারুণভাবে কমে গেছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিও খুব বেশি। এই পর্যায়ে সাধারণ মানুষ বেশি সংখ্যক সন্তানের অসুবিধের কথা বুঝতে শেখেন। সরকারি প্রচার সীমিত সংখ্যক সন্তানের পক্ষে শুরু হয়। Blacker-এর মতে 1930 সাল নাগাদ 22% মানুষই এই পর্যায়ে ছিলেন। উন্নতিশীল দেশগুলো এই পর্যায়ে প্রবেশ করার মুখে।

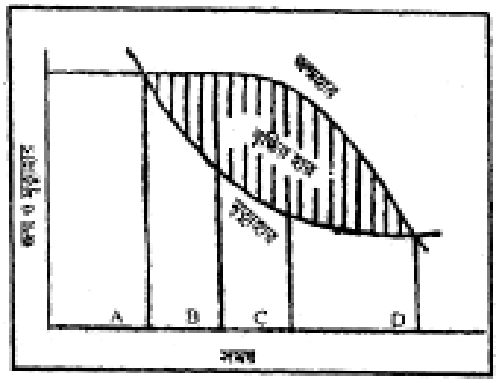

চিত্র **4.8 :** জনসংখ্যাবৃদ্ধির ক্রান্তি পর্যায়ে বিভিন্ন স্তর

D. **নিম্ন স্থানু জনসংখ্যা ঃ** জন্মহার ও মৃত্যুহার খুব কাছাকাছি এবং উভয়ই খুব কম। প্রথম পর্যায়ের মত এখানে জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল। তবে প্রথম পর্যায়ে খুব বেশি মৃতুহারের জন্য যে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হতো তা এই পর্যায়ে ঘটে না। প্রায় প্রতিটি মানুষই জন্ম নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী। জীবনযাত্রার মানও খুব উচ্চ। Blacker-এর মতে 1930 সাল নাগাদ পৃথিবীর প্রায় 14% জনতা এই পর্যায়ে ছিলেন। যেমন পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের

উন্নত দেশগুলো, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও তাসমানিয়া। এই পর্যায় Notestein-এর তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ Incipient Decline স্তরের সঙ্গে তুলনীয়।

E. **হ্রাসমান জনসংখ্যা ঃ** এই পর্যায়টি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির দিক থেকে অতি উন্নত বা অতি অনুন্নত উভয় প্রকার দেশেই দেখা যেতে পারে। জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহার বেশি হলে জনসংখ্যা কমে যায়। অতি উচ্চ জন্ম এবং মৃত্যুহারেও এ ধরনের ঘটনা ঘটবার যেমন সম্ভাবনা, তেমনি অতি নিম্ন জন্ম এবং মৃত্যুহারেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যে সব দেশ 'একটিমাত্র সন্তান' আদর্শ (one-child-norm) গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝেই ঋণাত্মক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা ঘটতে পারে। 1930-এর আগে বিশ্বের জনসংখ্যার এই পর্যায়ে ছিলেন (মজুমদার, 1991)।

Karl-Sax-এর মতে জনসংখ্যা ক্রমবিবর্তনের চারটি পর্যায় (চিত্র 4.9) আছে। এগুলো হল ঃ

**I. উঁচু স্থানু পর্যায় ঃ (High Stationary Stage)** ঃ এই পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার অতি উচ্চ এবং তা ঘন ঘন ওঠানামা করে। তার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় না।

**II. প্রাক্-বিস্ফোরক বৃদ্ধি ঃ (Early Explosive Increase)** মৃত্যুহার কমতে আরম্ভ করলেও জন্মহার প্রথম পর্যায়ের মত উঁচুস্তরেই রয়ে গেছে। জনসংখ্যা-তাড়াতাড়ি বাড়ছে।

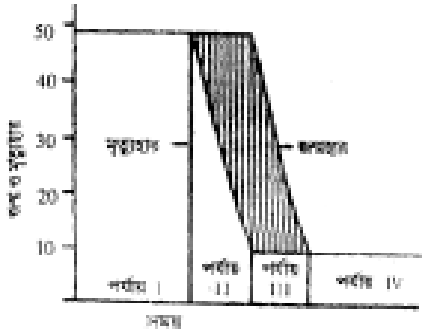


চিত্র **4.9 :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রান্তি পর্যায় -(Karl Sax-এর মতে)

**III. পরবর্তী বিস্ফোরক বৃদ্ধি (Late Explosive Increase)** ঃ জন্মহার কমতে আরম্ভ করেছে, মৃত্যুহার খুবই কম, প্রায় স্থিতিশীল অথবা খুব আস্তে আস্তে কমছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমলেও অবস্থা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবার কারণ জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে ব্যবধান।

**IV. নিম্ন স্থানু পর্যায় (Low Stationary Stage)** ঃ এই পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার প্রায় নিম্ন সীমায় পৌঁছেছে। ফলে জন্ম ও মৃত্যুহারে আবার সমতা ফিরে এসেছে।

**Adoph Landry-র 'তিন পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি' (Three stages of demographic regime) :** Landry জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি বিকল্প শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এতে তিনি সবচেয়ে জোর দিয়েছেন জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক প্রভাবের ওপর Landry-র পর্যায়গুলো হল নিম্নরূপ ঃ

**I. আদিম জনমিতিক অবস্থা (Primitive Demographic Regime)** ঃ নিছক অস্তিত্ব বজায়ের সংগ্রামে যখন মানুষ লিপ্ত ছিল সেই সময়ে কোনো দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি যে অবস্থায় ছিল তাকেই Landry জনসংখ্যার আদিম অবস্থা (Primitive Population Regime) বলেছেন। খাদ্যের যোগান বাড়লে জনসংখ্যা বাড়ে। এই বর্ধিত জনসংখ্যার দরুন জীবনযাত্রার মান নেমে যায়, মৃত্যুহার বাড়ে। জনসংখ্যার এই আদিম অবস্থায় মৃত্যুহার উচ্চ জন্মহারের কাছাকাছি দ্রুত ওঠা-নামা করে। জনসংখ্যার আয়তন নির্ভর করে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের ওপর।

**II. আদিম জনমিতিক অবস্থা (Intermediate Demographic Regime)** ঃ জনসংখ্যার এই মধ্যবর্তী অবস্থা তখনই আসে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর খাদ্য সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ ও গোটা সমাজ একটা নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মান সরবরাহের বদলে বিবাহের হার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। উচ্চতর জীবনযাত্রার

মান সম্বন্ধে আগ্রহী সাধারণ মানুষ মনে করে বেশি সংখ্যক মানুষ সর্বপ্রকার উন্নয়নের বাধাস্বরূপ। আর্থিক উৎপাদন জনসংখ্যার আয়তনের উপর নিশ্চিতভাবে প্রভাব ফেলে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি জীবনযাত্রার মানকে উন্নয়ন করে। আর এই অর্জিত মান ধরে রাখবার জন্য সাধারণ মানুষ বেশি সন্তানের জন্ম দিতে নিরুৎসাহিত হয়।

**III. আধুনিক জনমিতিক অবস্থা (Modern Population Regime)** ঃ জনমিতিক বিপ্লবের ফলে জনসংখ্যা তার বিবর্তনের এই পরম স্তরে পৌঁছোয়। এই সময় জন্মহার দ্রুত হ্রাস পায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করলেও তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয় না। এই স্তরেও জনসংখ্যা কিছু বাড়তে পারে, কিন্তু এই বৃদ্ধি কোনো জনসংখ্যা তত্ত্বকেই অনুসরণ করে না। এই পরম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যই হলো 'কম সন্তান উৎপাদন' (মজুমদার 1991)।

**সমালোচনা (Criticism)**

পরিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। বিশেষ করে সেই সব দেশে যেখানে অতি সম্প্রতি উন্নয়নের ঢেউ লেগেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে মৃত্যুহার হ্রাস, শিল্প প্রসার, নগরায়ন ও শিক্ষার বিস্তার প্রায় একই সাথে ধীরে ধীরে ঘটেছে। জনসংখ্যা হ্রাস কিছু পরে হয়েছে। মৃত্যুহারের নিম্নগতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শিক্ষার বিস্তার জন্মহার নিয়ন্ত্রণে শুরু থেকেই বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোও যদি জন্মহার নিয়ন্ত্রণে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর উদাহরণ অনুসরণ করে তাহলে জন্ম ও মৃত্যুহারের সমতা যতদিনে আসবে ততদিনে এই সব দেশের জনসংখ্যা এমন এক বিপুল আয়তন ধারণ করবে যে সবরকম অগ্রগতির পথই এই সব দেশে রুদ্ধ হয়ে যাবে। বস্তুতপক্ষে, এটা উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের পক্ষে একটা বিরাট সমস্যা (চিত্র 4.10)। পরে আমরা জনবৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।

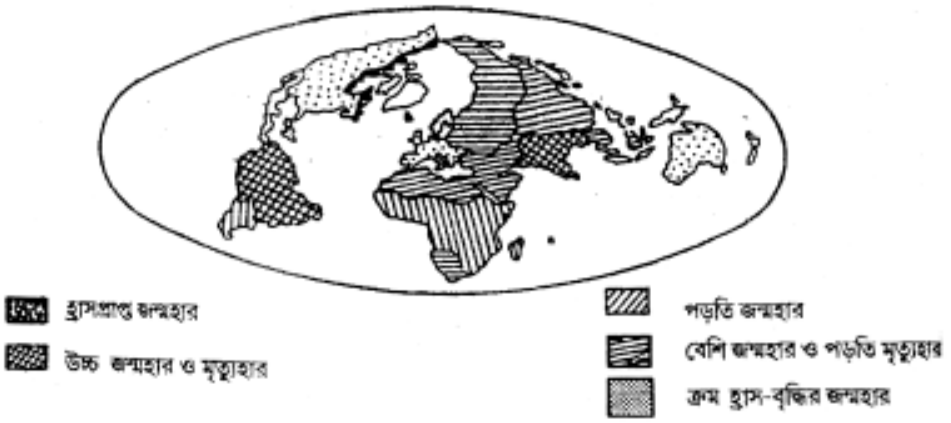


চিত্র **4.10 :** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনমিতিক অবস্থা

## 2.5 জীবনগত পরিসংখ্যান ও পরিমাপ (Vital statistics and its Measurement)

### 2.5.0 ভূমিকা (Introduction)

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'— এ শুধু কবির কথা নয়, প্রকৃতিরও অমোঘ নিয়ম। জনসংখ্যা

ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত থাকা মানুষের জন্ম-মৃত্যু এই ভূগোলে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যে কোন দেশের জনতার জন্ম-মৃত্যু থেকে সেই দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ণয় করা যায়। জন্ম-মৃত্যু পরিমাপের কয়েকটি পদ্ধতি আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা জন্ম-মৃত্যুর কয়েকটি পরিমাপ নিয়ে আলোচনা করব।

### 2.5.1 প্রজনন পরিসংখ্যান (Fertility Data)

জন্ম সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার তিনটি উৎস আছে—

(1) **সরকারি জীবনগত পরিসংখ্যান নথি (Official Vital Statistics Registration)** ঃ এ থেকে প্রতি বছর নথিভুক্ত জন্মের (registered births) সংখ্যা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে শিশুর জন্ম-তারিখ ; শিশুর মাতা-পিতার ধর্ম, তাদের বৃত্তি ও নিবাস, শিশুটি ছেলে না মেয়ে ইত্যাদি তথ্যও আমরা জানতে পারি। U.N.O. থেকে প্রতি বছর প্রকাশিত ''Demographic Year Book''-এ বিভিন্ন দেশের জীবন্ত শিশুর (live births) সংখ্যা, তার মায়ের বয়স, শিশুটি ছেলে না মেয়ে, গ্রাম ও শহরের স্থূল জন্মহার (crude bithrate) সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া থাকে। 1945-50, 1959, 1969, 1975 ও 1984 সালে ''Year Book'-এ জন্ম ছিল আলোচনার একটি প্রধান বিষয়।

(2) **জনগণনা দপ্তরের নমুনাভিত্তিক সমীক্ষা (Sample Survey of Census Office)** ঃ লোকগণনার সময় বিবাহিত মহিলাদের সরাসরি প্রশ্ন করা হয় "তাঁর ক'টি বাচ্চা জন্মেছে" (The number of Children ever born)? এই উত্তরের ভিত্তিতে আমরা প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য পাই। যে সব দেশের জন্ম নথিভুক্ত করার পদ্ধতি খুব উন্নতমানের নয়, সেখানে লোকগণনার পূর্ববর্তী বছরগুলোতে যত শিশু জন্মেছে তা ঐ সময় (জনগণনা) জিজ্ঞাসা করা হয়।

(3) **ব্যক্তিগত জনগণনা দপ্তরের নমুনাভিত্তিক সমীক্ষা (Personal Sample Survey)** ঃ এই ক্ষেত্রে গবেষককে ক্ষেত্র-সমীক্ষার সাহায্য নিতে হয়। স্বভাবতই এই ধরনের পরিসংখ্যান খুব নির্ভরযোগ্য। এছাড়া বিয়ের সময় দম্পতির বয়েস, পরিবারের বংশধারার ইতিহাস, পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে সচেতনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। এই কারণে অনেক উন্নত দেশে পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য জন্ম-নথিভুক্তকরণ পদ্ধতি চালু থাকলেও সেই সব দেশে বিশেষ নমুনা সমীক্ষা করা হয়।

### 2.5.2 প্রজননের সংজ্ঞা (Definition of Fertility)

''The Dictionary of Human Geography''র-j (ed, by Johnston) মতে, প্রজনন হল—The number of live births produced by a woman প্রজনন শব্দটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যায় জীবিত নবজাতকের সংখ্যা সূচিত করে। ''Asha A. Bhende ও Tara Kanitkar-এর মতে, প্রজনন হল—''actual reproductive performance - whether applied to an individual or a group''. প্রজনন 'জনসংখ্যা ভূগোলে'-র একটি প্রধান বিষয়। জীবগত পরিবর্তনের জন্য প্রজনন বিশেষভাবে দায়ী এবং মানবসমাজ রক্ষার ক্ষেত্রেও এটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রজনন বা fertility এবং fecundity (অর্থাৎ একজন মহিলার 15-45 বছর বয়সের মধ্যে সন্তান ধারণের ক্ষমতা) শব্দ দু'টির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটির অর্থাৎ প্রজননের প্রকৃত মানে জন্মদান এবং এটি বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আর দ্বিতীয়টি হল উর্বরতা বা নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা, কিন্তু এ দিয়ে বোঝায়না যে ঐ নারী সন্তানের জন্ম দিয়েছেন কিনা ?

### 2.5.3 প্রজননের বিভিন্নতার কারণ

জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে প্রজননের বিভিন্নতার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। জে. বনগার্ট প্রজনন হারের

বিভিন্নতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক জন্মদান ক্ষমতার ওপর কতগুলো বাধা সৃষ্টি হয়ে প্রজননের তারতম্য ঘটে। তাঁর মতে, (i) স্ত্রীলোকেরা জন্মদান ক্ষমতা ধারণের পুরো সময়টি বিবাহিত থাকতেন, (ii) কোনরকম জন্ম শাসন পদ্ধতির সাহায্য না নিতেন, (iii) গর্ভপাত না ঘটাতেন এবং (iv) শিশুদের বুকের দুধ না খাওয়াতেন তাহলে তাঁরা যে পরিমাণ সন্তানের জন্ম দিতে পারতেন সেটাই তাঁদের প্রজনন ক্ষমতার সঠিক ধারণা। এরকম অবস্থায় কোন স্ত্রীলোক সাধারণত 13 থেকে 17টি সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। এই সাধারণ ক্ষমতা (i) বিয়ের বয়স, (ii) জন্মশাসন পদ্ধতি গ্রহণের প্রবণতা, (iii) স্বেচ্ছায় গর্ভপাত ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রভাতরঞ্জন মজুমদার (1991) প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কতকগুলো প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। যেমন—

(1) অনেক দেশেই বিয়ের আগে শিশুর জন্মদান নিছকই একটি গৌণ ঘটনা। সন্তান ধারণক্ষম বয়ঃসীমার মধ্যে (15-49 বছর) থেকেও ভারতবর্ষের মত রক্ষণশীল দেশে এই বয়সের দুই মহিলার সন্তান জন্ম দেবার সম্ভাবনা কখনই ভাবা যায় না। তবুও একই বয়সে সবার বিয়ে হলে এই সম্ভাবনার কথা ভাবা যেতো।

(2) প্রথম সন্তানের আগমনের সময়টা যত নিশ্চিতভাবে বলা যায়, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা তার পরবর্তী সন্তানের আগমনের সম্ভাব্য সময় সম্পর্কে ততটা জোর দিয়ে বলা সম্ভব না। মায়ের স্বাস্থ্য, বাচ্চার (মায়ের) দুধ খাওয়া, প্রথম সন্তানটি পুত্র না কন্যা প্রভৃতি বিষয়গুলো অনেক সময়ই পরবর্তী সন্তানের আগমনকালকে প্রভাবিত করে।

(3) একটি নির্দিষ্ট বয়সের মহিলাদের মধ্যে (সবাই বিবাহিত হলেও) গর্ভধারণ সম্ভাবনা অন্যান্য অসুবিধের জন্য সমান নাও হতে পারে। একজন সুস্থ মহিলা এবং একজন অসুস্থ মহিলার সন্তান সম্ভাবনা কখনই এক নয়। আগের সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের স্বাস্থ্যে নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে যা পরবর্তী সন্তানের আগমনকে বিলম্বিত করতে পারে। এখানে শুধু সন্তান জন্ম দেবার সম্ভাবনার (risk of exposure) কথা বলা হয়েছে। মহিলার জীবনের অন্যান্য সম্ভাবনার কথা অর্থাৎ মৃত্যু, বিবাহ-বিচ্ছেদ, স্বামীর মৃত্যু, জীবিকা গ্রহণ বা পরিবর্তন, প্রব্রজন ইত্যাদি এখানে আসছে না। এরাও কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্তান আগমনের সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(4) গ্রামে অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের মধ্যে বিয়ের বয়স সাধারণত কম। 24-25 বছরের মধ্যেই তারা অনেকেই তিন-চার সন্তানের মা হয়ে যান। শহরে অনেক মহিলা ঐ সময় বিয়ে করেন। তাই একই বয়সে শহর ও গ্রামের অগ্রসর ও অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে সন্তান সম্ভাবনার যথেষ্ট ব্যবধান থাকে।

(5) বিবাহ-বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যু মহিলাদের গর্ভধারণ বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মহিলাদের বর্তমান বয়স কত তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁরা কতদিন বিবাহিত জীবন যাপন করছেন (মজুমদার, 19991)।

(6) স্বামী-স্ত্রীর বয়সের তফাৎ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের যৌন সম্পর্ক ও তার সম্ভাব্য পরিণতিতে প্রভাব ফেলে। জন্মহার নির্ধারণে স্বামীর নয়, স্ত্রীর বয়সকেই বিবেচনা করা হয়।

(7) সব মহিলাই সন্তান ধারণক্ষম নন। বয়ঃসন্ধির আগেও মাসিক বন্ধ হয়ে (যা সবার ক্ষেত্রে এক সময় হয় না) যাবার পর তাঁরা সন্তান ধারণক্ষম থাকেন না।

(8) বিজ্ঞানীরা এখনও এমন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেননি যাতে করে বলা যায় মহিলাদের মধ্যে কত শতাংশ গর্ভধারণক্ষম। শারীরবৃত্তীয় এই ঘটনাটি তাই জন্মহার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(9) মৃত্যু বিষয়টি ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু জন্ম? দম্পতির সন্তানে আগ্রহ বা অনাগ্রহ বংশবৃদ্ধিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। মৃত্যু অবধারিত, জন্ম নয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে জন্মহার নির্ধারণ করা খুব সোজা নয়। বিভিন্ন সম্ভাবনা ও

নানান রকম চাপ বিষয়টিকে জটিলতর করে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে জন্ম-সংক্রান্ত তথ্য নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ না হওয়া। জন্মহার নির্ণয়ের এই সব সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই আমরা এবার জন্মহার পরিমাপ পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

### 2.5.4 জন্মহার পরিমাপ (Measurement of Fertility)

সাধারণত মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার পরিমাপ বেশি অসুবিধাজনক। তবে জন্মহার ও মৃত্যুহার পরিমাপের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে নবজাতকের (জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ) মোট সংখ্যা ও ঐ সময়কালে গড় লোকসংখ্যার (ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ বয়সের মহিলাদের) অনুপাত। জন্মহার পরিমাপের নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো হল ঃ

**স্থূল জন্মহার** (Crude birth rate), **সাধারণ প্রজনন ক্ষমতার হার** (General fertility rate), **প্রজনন ক্ষমতার অনুপাত** (Fertility ratio), **শিশু-নারী অনুপাত** (Child-woman ratio), **বয়ঃক্রমিক জন্মহার** (Age specific birth rate), **প্রামাণ্য জন্মহার** (Standaridized birth rate), **সার্বিক প্রজনন ক্ষমতার হার** (Total fertility rate), **নীট পুনরুৎপাদন বা সংজনন হার** (Net reproduction rate) ইত্যাদি, এইসব পদ্ধতিগুলো নিয়ে এবার বিস্তৃত আলোচনায় আসা যাক।

**এক নজরে ভারতবাসীদের জীবনগত পরিসংখ্যান**
**(Vital Statistics of the Indians at a glance)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| গড় আয়ু (1997) | : | 62.6 | বছর |
| হাজার পুরুষে মহিলার সংখ্যা (2001) | : | 933 | জন |
| প্রজনন হার (1997) | : | 3.3% | |
| জন্মহার (প্রতি হাজারে) (1998) | : | 26.4 | |
| মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) (1998) | : | 9.0 | |
| শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) (1999) | : | 70 | জন |
| **পাঁচ বছরের কম বয়সী** | | | |
| শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) (1991) | : | 98 | জন |
| মাতৃত্বকালীন মৃত্যু (এক লক্ষ শিশু পিছু) (1980-99) | : | 410 | |
| চিকিৎসাগত কারণে ভ্রূণহত্যা (1999) | : | 6.14 | লক্ষ |
| 60 বছর বেশি বয়সী (জনসংখ্যার অংশ) | : | 6.1% | |
| 60 বছর বয়সের আগেই মৃত্যু (জনসংখ্যার অংশ) | : | 30% | |

(i) **স্থূল জন্মহার (Crude birth rate)** ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয়ে এটি সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত পন্থা। প্রতি বছর কোন দেশ বা অঞ্চলে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় যত সংখ্যক জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাকে স্থূল

জন্মহার বলে। এক বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যাকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ঐ ভাগফলকে দিয়ে 1,000 দিয়ে গুণ করলে স্থূল জন্মহার পাওয়া যায়।

1986 সালে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে স্থূল জন্মহার ছিল—

$$= \frac{\text{7,55,000 (এক বছরে নবজাতকের মোট সংখ্যা)}}{\text{5,67,63,000 (1986 সালের মধ্যবর্তী সময়ের দেশের মোট জনসংখ্যা)}} \times 1{,}000 = 13.3\%$$

**সুবিধে ঃ** (i) স্থূল জন্মহার পরিমাপের পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ।

(ii) এই পদ্ধতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সরাসরি পাওয়া যায়।

(iii) এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অতি সহজেই পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সঠিক হয়।

**অসুবিধে ঃ** (i) এই পদ্ধতির গুরুত্ব জনসংখ্যার গঠন, বিবাহ, বয়স এবং লিঙ্গ নির্ধারণে সক্ষম নয়। ফলে তুলনামূলক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির গুরুত্ব কমে যায় **(Clarke, Population Geography)**

(ii) এই সূত্রে দেশের মোট জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে নাবালিকা নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদেরও গণনা করা হয়। এ কারণে একে প্রজনন ক্ষমতার সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যায় না।

(iii) **সাধারণ প্রজনন ক্ষমতার হার (Generaly birth rate)** ঃ স্থূল জন্মহার থেকে সাধারণ প্রজনন ক্ষমতার হার আরেকটু বিশেষ ধরনের পরিমাপ বলা যেতে পারে যে জন্মহার পরিমাপের অপর একটি ব্যবহারিক সূচক হল "সাধারণ প্রজনন ক্ষমতার হার" এটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গণনা করা হয় ঃ

$$GFR = \frac{BL}{Pf_{15-44}} \times 1{,}000$$

[ BL = নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে জীবিত নবজাতকের মোট সংখ্যা।

$Pf_{15-44}$ = নারীর প্রজননক্ষম বয়স অর্থাৎ 15 – 44 বছর বয়সী নারীর সংখ্যা।

এই পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রথমেই মোট নারীসংখ্যায় মহিলাদের বয়স অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করতে হবে। সাধারণত 5 বছর ব্যাপী বয়সসীমার এক একটি শ্রেণি গঠন করা হয়। যেমন—15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 40-44, 35-39 ইত্যাদি এবং প্রতিটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নারীর নির্দিষ্ট সময়ে জাত মোট জীবিত শিশুর সংখ্যা হিসাব করতে হবে। এই দুটি সংখ্যার অনুপাত গ্রহণ করতে হবে।

**সুবিধে ঃ** (i) এই পদ্ধতিতে স্থূল জন্মহারের মত মোট জনসংখ্যা না ধরে গড় হিসেবে প্রজননক্ষম নারীর মোট সংখ্যাকে গণনা করা হয় (15-45 বা 15-49 বছর)। ফলে স্থূল জন্মহারের অনেক ত্রুটি এড়ানো যায়।

(ii) অনুন্নত সমাজে যেখানে জন্ম নথিভুক্তকরণের সুব্যবস্থা নেই, সেখানে এই পদ্ধতি সুবিধেজনক।

(iii) এই হার নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রজনন অবস্থা সূচিত করে।

**অসুবিধে ঃ** (i) আদমসুমারীর বছর ছাড়া অন্য বছরে এই হার গণনা করা যায় না। কারণ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য কেবলমাত্র আদমসুমারী বয়স-তালিকা থেকে পাওয়া যায়।

(ii) 5 বছরের কম বয়সী জীবিত শিশুদের সংখ্যাই শুধুমাত্র এক্ষেত্রে পরিমাপ করা হয়।

(iii) সমস্ত মহিলাদেরই গণনার ক্ষেত্রে ধরা হয়। অথচ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে 15 থেকে 19 বছর এবং 30 থেকে 44 বছরের নারী অপেক্ষা 20 থেকে 29 বয়সপুঞ্জের মহিলারা বেশি সন্তানের জন্ম দেন।

(iv) যে সব দেশে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বেশি সেখানে এই পরিমাপ প্রযোজ্য হয় না। এক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধ প্রজনন ক্ষমতার হারকে আলাদা করিতে হয়। বৈধ/অবৈধ সন্তান সংখ্যা এবং প্রতি হাজার প্রজননক্ষম বিবাহিত / অবিবাহিত নারীর সংখ্যার অনুপাত দিয়ে এটি পরিমাপ করতে হয়।

**(iii) প্রজনন ক্ষমতার অনুপাত (Fertility Ratio) ঃ** কোন দেশ বা রাজ্যের জনগণনায়, বছরে প্রতি হাজার জন প্রজননক্ষম (15-49 বছর) মহিলা-পিছু বছরের কম বয়সী জীবিত শিশুর অনুপাতকে (চিত্র 5.1) প্রজননের অনুপাত বলে। একে নারী-শিশু অনুপাতও বলে।

$$FR = \frac{P_o - 4}{Pf_{15-49}} \times 1{,}000$$

FR = প্রজনন

$P_o$-4 = 5 বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা

$Pf_{15-49}$ = মহিলার প্রজননক্ষম বয়স

এই পরিমাপের কয়েকটি ত্রুটি আছে। যেমন—

(1) আদমসুমারীর বছরেই এই পরিমাপ করা সম্ভব হয়। কারণ কেবলমাত্র জনগণনাতেই (census) বছরের কম বয়সী শিশু বা প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা পাওয়া যায়।

(2) এই পরিমাপে মোট কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করলে তা ধরা যায় না।

(3) এতে বিবাহিত বা অবিবাহিত সব মহিলাদের গণ্য করা হয় যা বাস্তবসম্মত নয়।

(4) অনেক যৌথ পরিবারে প্রজননক্ষম মায়েরা তাদের শিশু সন্তানদের অভিভাবকদের কাছে রেখে কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যান। ফলে ঐ সব নারী গণনার সময় বাদ পড়ে যান (Chandna, 2002)

(iv) **বয়স বিশেষিত প্রজনন হার (Age Specific Birth Rate) ঃ** বয়সপুঞ্জের নিয়মানুসারে এখানেও প্রজননক্ষম নারীকে (15 থেকে 49 বছর পর্যন্ত) 5 বছরের ব্যাপ্তিতে (interval) যেমন—15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 ইত্যাদি 7টি বয়ঃক্রম বা বয়ঃপুঞ্জ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। উপরোক্ত 7টি শ্রেণির যে কোন একটি শ্রেণির বয়সের মহিলাদের জীবন্ত শিশু।

এই গণনার পদ্ধতি হল— $\frac{bi}{pi} \times k$

bi = বছরে বিশেষ বয়ঃক্রমের অন্তর্ভুক্ত মায়েদের জীবিত শিশুর সংখ্যা

pi = বছরের মধ্যবর্তী সময়ে ঐ বয়ঃক্রমের মহিলা জনসংখ্যা

k = 1,000

জন্মদানের সংখ্যাকে উক্ত শ্রেণির মোট প্রজননক্ষম মহিলার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে এবং ভাগফলকে 1,000 দিয়ে গুণ করে বয়ঃক্রমিক জন্মহার পাওয়া যায়। ধরা যাক, 1967-68 সালে কোলকাতা নগরীর কোন এক অঞ্চলে 20-24 বয়ঃপুঞ্জের নারীর সংখ্যা ছিল 387 এবং ঐ বয়ঃপুঞ্জের মহিলাদের জীবন্ত শিশুর জন্মদানের সংখ্যা ছিল 57। এক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট বয়ঃপুঞ্জের জন্মহার হল ঃ

$$\frac{57 \times 100}{387} = 149.29$$ জন।

এই পরিমাপ থেকে বিভিন্ন বয়ঃপুঞ্জের মহিলাদের প্রজনন হারের তুলনা করার সুবিধে আছে। তবে প্রত্যেক বয়ঃপুঞ্জের মহিলাদের আলাদা আলাদাভাবে হিসেব করতে হয় বলে এই পদ্ধতিতে বেশি সময় লাগে। আবার অনেক সময় প্রতিটি বয়ঃপুঞ্জের নারী ও শিশুর সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়াও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

(v) **প্রামাণ্য জন্মহার (Standardized Birth Rate)** ঃ প্রজনন হার প্রামাণ্য জন্মহারের সাহায্যেও বের করা যায়। এটি বয়ঃক্রমিক জন্মহারের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। পদ্ধতিটি হল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমে প্রত্যেক নির্দিষ্ট (মহিলাদের) বয়ঃপুঞ্জের সম্ভাব্য শিশু জন্মের সংখ্যা বের করতে হবে। এরপর সম্ভাব্য সমস্ত বয়ঃপুঞ্জের আগন্তুক শিশুদের সমষ্টিকে সমগ্র জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। ঐ ভাগফলকে 1,000 দিয়ে গুণ করলে প্রামাণ্য জন্মহার নির্ণয় করা যাবে। তবে এটি একটি জটিল পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিকে প্রামাণ্য জন্মহার নির্ণয় করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

**বিশেষ আলোচনা**

**বিভিন্ন প্রকার প্রজনন পরিমাপের একটি তুলনামূলক আলোচনা**

| বয়স গোষ্ঠী | মোট স্ত্রীলোক | মোট জন্মসংখ্যা | বয়স বিশেষিত প্রজনন হার (প্রতি হাজার স্ত্রীলোকে) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 15-19 | 3,94,119 | 18,670 | 47.37 |
| 20-24 | 3,35,924 | 75,651 | 225.20 |
| 25-29 | 3,13,611 | 69.048 | 220.17 |
| 30-34 | 3,51,825 | 46. 193 | 131.30 |
| 35-39 | 3,72,637 | 23,559 | 63.22 |
| 40-44 | 3,34,594 | 6,409 | 19.15 |
| 45-49 | 3,21,900 | 456 | 1.42 |
| | 24,24,610 | 2,39,986 | 707.83 |

সাধারণ প্রজনন হার = $\frac{2,39,986}{24,24,610} \times 1000 = 99$

**বয়স বিশেষিত প্রজনন হার** (15-19) বৎসর $\frac{18,670}{3,94,119} \times 1000 = 47.37$

**সামগ্রিক প্রজনন হার** = বয়স বিশেষিত প্রজনন হারের সমষ্টি $\times 5$

প্রতি হাজার নারীতে – $707.83 \times 5 = 3,439$ জন অথবা নারী প্রতি 3.5 জন।

**(vi) সার্বিক প্রজনন ক্ষমতার হার (Total Fertility Rate)** ঃ প্রজনন পরিমাপের ক্ষেত্রে সার্বিক প্রজনন ক্ষমতার হার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সারা জীবন (কাল) ব্যাপী (Whoel life span) বয়ঃক্রমিক প্রজনন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। মহিলারা মাথাপিছু গড়ে যে সংখ্যক শিশুর জন্মদান করে থাকেন, তাকে সার্বিক প্রজনন ক্ষমতার হার বলে। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি বয়ঃক্রমিক শ্রেণির প্রজনন ক্ষমতার হারকে যোগ করে প্রাপ্ত যোগফলকে দিয়ে গুণ করতে হয় (যেহেতু প্রতিটি বয়ঃপুঞ্জ 5 বৎসর ব্যাপ্তিতে গঠিত)। আবার, প্রতিটি মহিলার গড় সন্তান-সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য এই গুণফলকে 1,000 দিয়ে ভাগ করতে হয়। ধরা যাক, 1967-68 সালে কোনো স্থানে জন্মদানের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| **বয়ঃপুঞ্জ গোষ্ঠী** | **জন্মের সংখ্যা স্ত্রীলোক** | **মহিলাদের সংখ্যা জন্মসংখ্যা** | **নির্দিষ্ট বয়ঃপুঞ্জের জন্মহার [{(2)+(3)}×1,000]** |
| 15-19 | 10 | 360 | 27.78 |
| 20-24 | 57 | 387 | 147.29 |
| 25-29 | 49 | 366 | 145.83 |
| 30-34 | 4 | 351 | 96.87 |
| 35-39 | 10 | 191 | 38.91 |
| 40-44 | 2 | | 10.47 |
| | | | 467.15 |

**এক্ষেত্রে মোট প্রজনন হার হল** = $\frac{467.15 \times 5}{1,000} = 2.34$ জন

আমরা জানি যে পৃথিবীর উন্নত, মধ্যম উন্নত ও বিকাশশীল দেশগুলোতে সার্বিক প্রজনন ক্ষমতার হারের বেশ পার্থক্য রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে এই হার কম, কিন্তু বিকাশশীল দেশগুলোতে এই হার দু'গুণ, ক্ষেত্রবিশেষে তিনগুণও। এ থেকে বোঝা যায় কেন বিকাশশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে।

**(vii) নীট পুনরুৎপাদন বা সংজনন হার (Net Reproduction Rate)** ঃ কোন দেশে 1,000 জন স্ত্রীলোক যদি তাদের মৃত্যুর সময় সমসংখ্যক অর্থাৎ 1,000 জন কন্যাসন্তান রেখে মারা যান, আর তারা যদি প্রত্যেকেই

সন্তান ধারণের সক্ষম বয়স (15-49) পর্যন্ত জীবিত থাকেন তাহলে নীট সংজনন হার হবে এক। এক্ষেত্রে দেশের জনসংখ্যা ভবিষ্যতে না বেড়ে তা নিশ্চল (Static) থাকবে।

$$\text{নীট সংযোজন হার} = \frac{\text{15-49 বয়ঃপুঞ্জের মায়েদের প্রসবিত জীবিত প্রজননক্ষম কন্যাসন্তানের সংখ্যা} \times 1{,}000}{\text{15-49 বয়সশ্রেণির মায়েদের সংখ্যা}}$$

কোন দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি এই পদ্ধতির মাধ্যমেই যথার্থভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

**(viii) বিবাহিতদের মধ্যে সামগ্রিক জন্মহার (Marital Fertility Rate)** ঃ এই হার প্রতি 1,000 বিবাহিত মহিলার মধ্যে বৈধ সন্তান জন্মের সংখ্যা নির্দেশ করে।

(ix) **লিঙ্গ-বয়স আনুপাতিক জন্মহার (Sex-Age Adjusted Birth Rate)** ঃ জন্মহার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্থূল জন্মহার প্রযোজ্য নয়। ফলে দুই জনগোষ্ঠীর জন্মহার তুলনা করার ক্ষেত্রে এই পরিমাপ ব্যবহৃত হয়।

### 2.5.5 জন্মহারের পার্থক্যের কারণসমূহ (Causes for Variation of Birth Rate)

জন্মহার রাজনৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে জন্মহার সর্বদা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তা সে স্বাভাবিক জন্মহার বা নিয়ন্ত্রিত জন্মহার যাই হোক না কেন।

(i) **ধর্ম (Religion)** ঃ বিশ্বের প্রধান চারটি ধর্মের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধধর্মই উচ্চ জন্মহারকে সমর্থন করে না।

হিন্দুধর্মে এত ভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও লোকগাথার সমাবেশ হয়েছে যে বৃহত্তর জনস্বার্থে জন্মনিয়ন্ত্রণ এই ধর্মে স্বীকৃত কি না তার কোন সহজ উত্তর পাওয়া যায় না। তবে সাধারণত হিন্দুধর্ম বংশবৃদ্ধিকে উৎসাহ দেয়। পুনর্জন্মে বিশ্বাসী পুরুষকেন্দ্রিক হিন্দুসমাজে পুত্রসন্তানের গুরুত্ব অপরিসীম। অহিংসায় বিশ্বাসী হিন্দুরা তাই জন্মশাসনের বিরোধী। হিন্দুদের মধ্যে যৌন সম্পর্কে অত্যন্ত বেশি বাধা নিষেধ দেখা যায়।

ইসলাম ধর্ম প্রধানত সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফসল। ধর্ম অনুযায়ী মুসলিমরা চারটি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। তাই এঁরা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত ও প্রথাগত মুসলিম দেশগুলোতে জন্মহার অত্যন্ত বেশি। 1985 সালে মুসলিম দেশ লিবিয়া ও সৌদি আরবের জন্মহার 46% ও 43%।

খ্রীষ্টধর্মে সন্তান উৎপাদনই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ গর্ভনিরোধের ভীষণ বিরোধী ছিল। ক্যাথলিক নীতিতে বলা হয়েছে যখন খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় হ্রাস পায় তখন দ্রুত বংশবৃদ্ধি করা উচিত। জন্মশাসনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টধর্মীয় অনুশাসনের অনুকূল এমন যে কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

**(ii) অর্থকরী বৃত্তি (Occupation)** ঃ প্রথাগত বৃত্তি ও আধুনিক বৃত্তির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে তার বিশেষ প্রভাব জন্মহারের ওপর দেখা যায়। আধুনিক শিল্পনির্ভর বৃত্তিতে উচ্চমানের শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

কৃষিনির্ভর সমাজে সন্তানকে আয়ের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়। এই সমাজে শিক্ষা এখনও প্রসার লাভ করেনি বলে বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই রোজগার করতে শেখে ও সংসারের আর্থিক দিক দিয়ে সহায়তা করে। প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থার মানসিকতা ছোট পরিবারের আদর্শ গহণের পক্ষে অনুকূল নয়। তবে বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণমাধ্যমের প্রচারের দ্বারা গ্রামকে আধুনিকীকরণ করা হলেও গ্রামের মানুষ এখনও জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক চিন্তাভাবনার পুরোপুরি শরিক হতে পারে নি। শ্রমজীবি মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের কর্মজীবনের প্রভাব জন্মহারের

ওপর দেখা যায়। বেশি সন্তান সাধারণত তাদের স্বাধীন জীবিকার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সন্তান পালনে বেশি সময় ব্যয় হলে তা তাদের বৃত্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জনসংখ্যাতত্ত্ববিদরা একেই বলেছেন—''Opportunity cost of child bearing.''

(iii) **রাজনৈতিক প্রভাব (Political Influence)** ঃ বর্তমান শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের সরকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করছেন। 1930 সালের শেষদিকে জার্মান, ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধে দিয়ে পরিবার বড় করার চেষ্টা করেছিল। অস্ট্রেলিয়া পরিযানের ফলে আগন্তুকদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে দেশের জনসংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। অপরদিকে, ভারত ও পাকিস্তান জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। চীনে **এক শিশু নীতি (One Child Policy)** দেশের জন্মহার হ্রাসে সাহায্য করেছে (চিত্র **5.2**) । চীনে প্রথম সন্তান জন্মালে দম্পতিকে পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান জন্মালে তাকে দূরের স্কুলে পড়তে পাঠানো হয়। তৃতীয় সন্তান জন্মালে তাকে আরো দূরের স্কুলে পড়তে পাঠানো হয়।

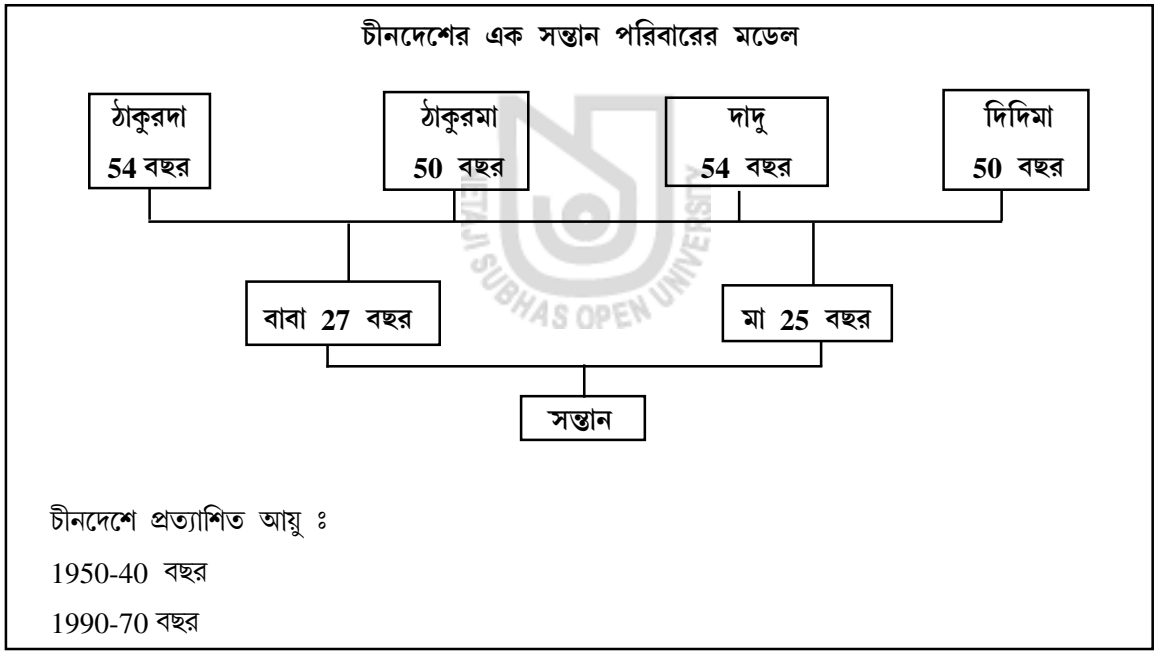


চিত্র 5.2 : চীনদেশের এক সন্তান পরিবারের মডেল

(iv) **সামাজিক রীতি (Social Customs)** ঃ পৃথিবীর যে সব দেশে জন্মহার অত্যধিক, যে সব দেশে জন্মহার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। দেখা গেছে যে শারীরবৃত্তীয় বা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রক অপেক্ষা সামাজিক রীতিনীতি জন্মহারের প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। বিবাহের ধারণা, একগামীতা বা বহুগামীতা, বিবাহের গড় বয়সে পার্থক্য প্রভৃতি জন্মহারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যেমন—ভারতীয় হিন্দুসমাজে মেয়েদের বিবাহের গড় বয়স 16 (সরকারি আইন মোতাবেক 18 বছর) এবং প্রথম সন্তান জন্ম নেয় বছর বয়সে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে গড়ে প্রতি পরিবারে 4টি সন্তান জন্মায়। সন্তানের জন্মদান সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে জনসংখ্যা বাড়ে।

জন্মহারের ক্ষেত্রে জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়— যেমন ব্রাজিলে নিগ্রো জাতির মানুষদের তুলনায় শ্বেতকায় মানুষদের মধ্যে জন্মহার বেশি। আবার যুক্তরাষ্ট্রে এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। সামাজিক শ্রেণি ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য যে সব সমাজব্যবস্থায় প্রকট সেখানেই জন্মহারের পার্থক্য বেশি চোখে পড়ে।

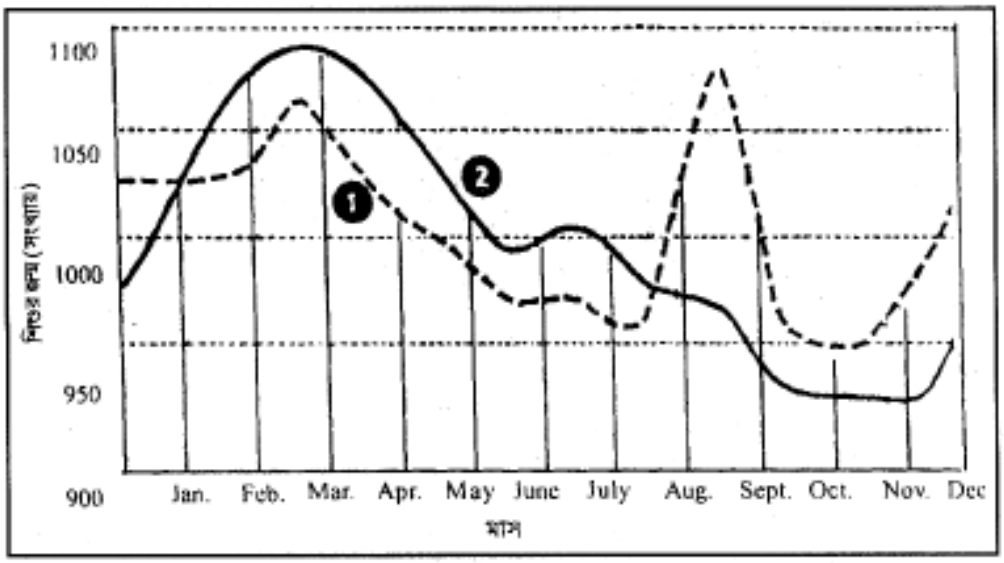


চিত্র 5.3 : মাসিক জন্ম ছন্দ চিত্র

(v) **জলবায়ু (Climate)** ঃ মানুষের যৌন-জীবন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত (চিত্র 5.3)। যেসব দেশে ঋতুগত বৈপরীত্য খুব সুস্পষ্ট,, সেখানে বসন্তের সমাগম মানুষের যৌন-আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তোলে। এস্কিমোদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গরমকাল আসলে তাদের মধ্যে যৌন-আকাঙ্খা বাড়ে। পশ্চিম ইউরোপের গ্রামাঞ্চলে একসময় দেখা যেত বছরের শুরুতে নারীরা সন্তান প্রস্রব করেন, কারণ তারা গত বসন্তে গর্ভবর্তী হয়েছিলেন। বিপরীতভাবে, শীতল শীতকাল ''Show up even now as dips in the curve, nine months later'' (Beaujeu-Garnier, 1978).

(vi) **খাদ্য (Diet)** ঃ খাদ্য সরবরাহ শুধুমাত্র-প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে না। এটি জীবনযাত্রার মানের ওপরও নির্ভর করে (চিত্র 5.4)। জন্মহারের ওপর এর প্রভাব বিতর্কিত বিষয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে বেশি প্রোটিনযুক্ত খাদ্য (যেমন—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি) খেলে নারীদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব বাড়ে। Josue de Castro তাঁর ''The Geography of Hunger'' বইতে লিখেছেন দরিদ্রতম দেশে জন্মহার খুব বেশি। আবার কম খাদ্য যোগানের কিছু কুফল আছে, যেমন— এর ফলে নারীরা দুর্বলতায় ভোগেন ও গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায়।

(vii) **স্বাস্থ্য (Health)** ঃ ব্যক্তিগত সাধারণ স্বাস্থ্য ও সন্তান উৎপাদনের মধ্যে সমতা নেই, তবে কিছু সম্পর্ক আছে। কারণ খুব রুগ্ন ও অপুষ্ট মহিলারা সুস্বাস্থ্য ও সুষম খাদ্যাভোগী মহিলাদের চেয়ে বেশি সন্তান উৎপাদনক্ষম। মহামারীর প্রাদুর্ভাব সাময়িকভাবে বন্ধ্যাত্ব ঘটায়। আফ্রিকায় যৌন রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক বন্ধ্যাত্ব ঘটিয়েছে।

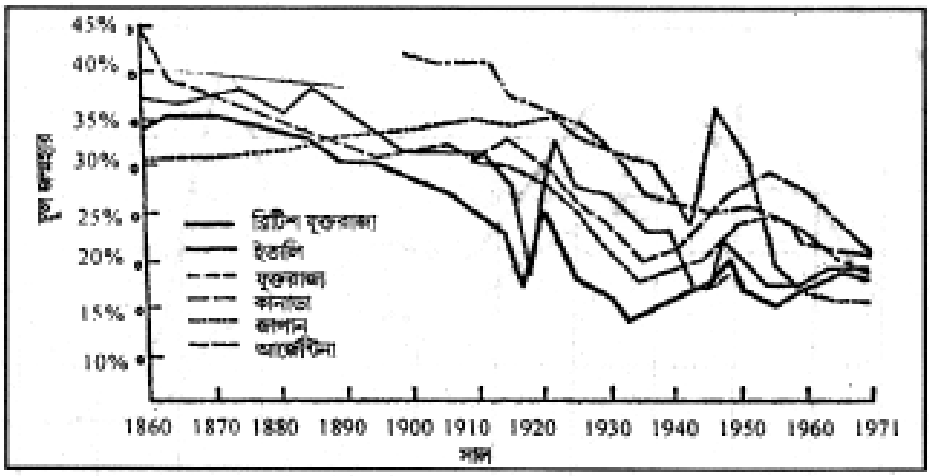


চিত্র 5.4 : কয়েকটি নির্বাচিত দেশের জন্মহারের ঘটতি (1860-1970)।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জন্মহারের ঘটতি লক্ষ্যণীয়।

(vii) **অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition)** ঃ জাতীয় স্তরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মন্দা বিবাহ ও জন্মহারের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। দেখা গেছে হঠাৎ সমৃদ্ধির সূচনা পরিবারের আয়তন বাড়ায় এবং অর্থনৈতিক মন্দার ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। কারণ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে ও সন্তান পালনের ব্যয় কমাতে মানুষ সন্তান উৎপাদনে আগ্রহী হয় না।

আবার বেকারত্বও জন্মহার বিশেষভাবে কমাতে সাহায্য করে। 1920-1970 সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে এই অবস্থা দেখা গিয়েছিল (চিত্র 5.5)

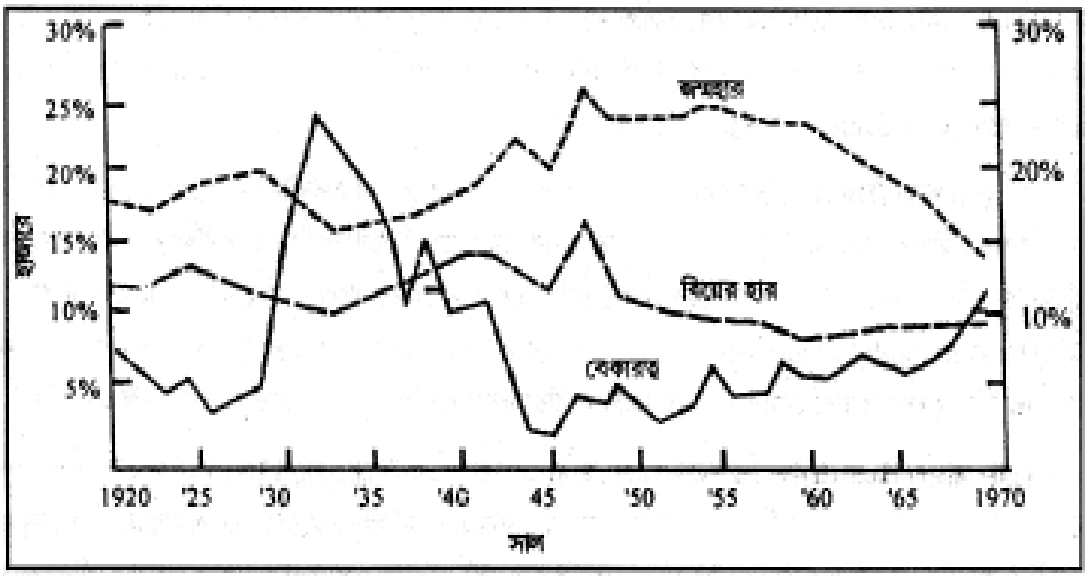


চিত্র 5.5 : যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার, বিয়ের হার এবং বেকারত্বেরস্তার (1920-70) (Beauieu-Garnier অবলম্বনে)

(ix) **জনসংখ্যা গঠন (Population Structure)** ঃ জনসংখ্যা গঠন জন্মহারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে জনসংখ্যার বয়স গঠন। জন্মহার ও প্রজনন হারের তুলনা এর গুরুত্বকে প্রকাশ করে। যেমন 1982 সালে সিঙ্গাপুর ও স্পেনের স্থূল জন্মহার এক হলেও সিঙ্গাপুরের প্রজনন হার অনেক কম ছিল। এর কারণ হল ঐ দেশের জনসংখ্যায় যুবা বয়সের আধিক্য ছিল। নতুন গঠিত শহর, গুরুত্বপূর্ণ বসতি এবং যে সব অঞ্চলে অভিবাসনের হার অধিক সে সব এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে সাধারণত গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলে জন্মহার বেশি।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, প্রজনন ক্ষমতার হার সাধারণত নারীর শারীরবৃত্তীয় উপাদানের উপর নির্ভরশীল। তবে আর্থিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো একেবারেই উপেক্ষিত নয়।

### 2.5.6 মৃত্যু প্রণবতা ও ঐ সংক্রান্ত তথ্য (Mortality and its Related Data)

United Nations-এর মতে মৃত্যুর সংজ্ঞা হল—''Death is permanent disappearance of all evidence of life at any time after birth has taken place'' অর্থাৎ জন্মাবার পর যখন কোন মানুষের মধ্যে জীবনের কোন স্পন্দন লক্ষ্য করা যায় না, তখন তাকে আমরা মৃত বলে থাকি। U.N.O.-র এই সংজ্ঞা সব দেশ মানে না। যেমন ইকয়োঃ গিনি, মরক্কো প্রভৃতি দেশে যে সব শিশু জন্মাবার 24 ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়, তাদেরকে জীবন্ত শিশু (Still births) হিসেবে গণ্য করা হয়। আলজিরিয়া, ফরাসী গিনি ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে যেসব শিশু জন্মাবার পর নথিভুক্ত হবার আগেই মারা যায়, তাদেরকেও জীবন্ত শিশু হিসেবে ধরা হয়।

মৃত্যু সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সরকারি নথিদপ্তর (registration office) থেকে সংগ্রহ করা হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে জন্ম-মৃত্যুর মত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান রক্ষা করা বাধ্যতামূলক নয়। স্বভাবতই সেই সব দেশের অনিয়মিত (irregular) পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্য নয়। অনেক অনুন্নত দেশে মৃত্যু সংক্রান্ত পরিসংখ্যান খুব কম করে দেখানো হয়ে থাকে। এমন কি, কিছু কিছু উন্নত দেশে মৃত্যু সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যাপারটা সাম্প্রতিককালে হাতে নেওয়া হয়েছে।

পরিসংখ্যানের এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা চিন্তা করে জনসংখ্যাবিদরা (Demographers) অনেক সময় (i) পরপর দুটি জনগণনা (census) থেকে এবং (ii) নমুনা সমীক্ষা (Sample survey) থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে নিজেদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করেন। (i) জনগণনা থেকে আমরা পরোক্ষভাবে মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য পাই। এক্ষেত্রে দুটি জনগণনা (যার সময়ের ব্যবধান 10 বৎসরের) থেকে জনসংখ্যার বয়স (age) ও লিঙ্গ ভিত্তিক (Sex-Wise) মৃত্যুহার সম্পর্কে অনুমান করা হয়। (ii) নমুনা সমীক্ষায় জনসংখ্যাবিদরা কোন নির্দিষ্ট বছরে কোন পরিবারে কোন বয়সের কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তা সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন।

U.N.O.-র ''Demographic Year Book''-এ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মৃত্যুর সংখ্যা, মৃতের বয়স ও লিঙ্গ, শিশুমৃত্যুর হার, মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি তথ্য থাকে। এই বইয়ের বিশেষ সংখ্যাগুলোতে (Special issue) মৃত্যু সম্বন্ধে বিশদ তথ্য দেওয়া থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা World Health Organisation-র Statistical Report-এ মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য থাকে।

### 2.5.7 মৃত্যু প্রবণতার কয়েকটি পরিমাপ (Some Measures of Mortality)

কোন দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নিরূপণ করতে জন্মহারের ন্যায় মৃত্যু প্রবণতার হার নির্ণয় করা খুব জরুরী। মৃত্যু প্রবণতার হার বিশ্লেষণ করতে সাধারণত কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। **স্থূল-মৃত্যুহার** (death rate), **বয়ঃক্রমিক মৃত্যু হার** (Age-Specific death rate), **শিশুমৃত্যু প্রবণতার হার** (Trend of infant mortality rate) ও **প্রসূতি মৃত্যু-প্রবণতার হার** (maternal death rate) ও প্রত্যাশিত **আয়ুষ্কাল** (life expectancy) ইত্যাদি।

**স্থূল-মৃত্যুহার ঃ** সামগ্রিকভাবে একটি জনসমাজের মৃত্যুপ্রবণতার পরিমাপ করতে গেলে যে বহুল প্রচলিত অনুপাত গ্রহণ করা হয় সেটিকে **স্থূল মৃত্যুহার** (**Crude Death Rate**) বলে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পরিমাপ।

প্রতি বছর কোন স্থানে প্রতি হাজারে যে সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করেন, তাকেই স্থূল মৃত্যুহার বলে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিস্কার হবে। ধরা যাক, 1993 সালের বৃহত্তর বোম্বাইয়ে (মুম্বাই) স্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল, 61,931 আর ঐ বছরের মধ্যবর্তী সময়ে (1\7\1993) মোট জনসংখ্যা ছিল 6,551,000। অতএব 1993 সালে বৃহত্তর বোম্বাইয়ে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় স্বাভাবিক মৃত্যুহার ছিল ঃ

$$\frac{61,931}{6,551,000} \times 1,000 = 9.45 \text{ জন}$$

মৃত্যু-প্রবণতা হার পরিমাপের এটি হল (i) সচরাচর ব্যবহৃত পদ্ধতি, (ii) এটি সহজেই নির্ণয় করা যায় ও (iii) সেই সঙ্গে সহজেই বোঝা যায়। এই পরিমাপ থেকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা যায়। (বাসার, 1985)।

তবুও এই পদ্ধতির কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, এই পরিমাপ একটি গড় হিসেব দেয়। কোন স্থানে মৃত্যু কম-বেশি হতে পারে। যেহেতু এই পরিমাপ গড় মৃত্যুহারকে নির্দেশ করে, তাই এ থেকে আমরা মৃত্যুহারের স্বাভাবিক চিত্রটি পাই না। দ্বিতীয়ত, এই পরিমাপে সমগ্র জনতার সমস্ত বয়স শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের মৃত্যুকে নির্দেশ করা হয়। আলাদা আলাদাভাবে কোন বয়সশ্রেণিতে কতজন কি কি রোগে মারা গেছেন তা নিরূপণ করা যায় না।

তবে (i) পারস্পরিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই হার বিশেষ কার্যকরি হয়। (ii) দুটি জনসংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধির হার এবং বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ বিশেষিত গঠন যদি মোটামুটি একই রকম হয় তবে এই দুই জনসংখ্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার মরণশীলতার সূচক হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। মৃত্যুর প্রবণতা নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন সাধারণ শারীরিক অবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি পালন, চিকিৎসা ব্যবস্থা, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, বয়স ভেদ ইত্যাদি। এর মধ্যে শেষের দুটি বিষয়কে পৃথক করে নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথকভাবে মৃত্যুহার নির্ধারণ করা যায়। এই ধরনের পরিমাপকে আমরা বয়স বিশেষিত বা বয়স-লিঙ্গ বিশেষিত মৃত্যুহার বলি।

**বয়ঃক্রমিক মৃত্যুহার ঃ** বিভিন্ন বয়ঃক্রমে বা বয়সশ্রেণিতে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় যে সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করেন, তাকে বয়ঃক্রমিক মৃত্যু বলে। এটি পরিমাপের সূচক হল ঃ

$$\text{বয়ঃক্রমিক মৃত্যুহার} = \frac{\text{এক বছরে নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমে লোকের জনসংখ্যা}}{\text{এক বছরে নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমে মোট লোকসংখ্যা}} \times 1000$$

বয়স লিঙ্গ বিশেষিত অনুপাত জানতে গেলে জনসংখ্যা ও মৃতের সংখ্যাকে বয়সের মতন স্ত্রী-পুরুষ ভেদেও ভাগ করে দেখাতে হবে। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে কি ধরনের বিশেষিত মৃত্যুহার গঠন করা হবে তা নির্ধারিত হয়। বিশেষিত মৃত্যুহারের সাহায্যে জনসংখ্যার এক একটি অংশের একটি সময়-সীমার মধ্যে মরণশীলতা পরিমাপ করা হয়। ধরা যাক, 1980 সালের মধ্যভাগে পশ্চিমবাংলার 40-49 বৎসরের স্ত্রীলোকের সংখ্যা 3,89,286। ওই বৎসর ওই বয়সের 4,322 জন স্ত্রীলোক মারা গেল। বয়স-লিঙ্গ বিশেষিত মৃত্যুহার হাজারে 11 জন।

এই পদ্ধতিতে সুবিধে হল এতে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক মৃত্যুহার নির্ণয় করা যায়। তবে বিভিন্ন বয়সশ্রেণিতে কতজন পুরুষ ও স্ত্রী আছেন এবং তাদের মধ্যে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তা আলাদাভাবে (উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে) নির্ণয় করা পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার।

**প্রসূতি মৃত্যু-প্রবণতার হার ঃ** সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত দেশে যেখানে বলতে গেলে প্রতি-বছরই মহিলারা সন্তানের জন্ম দেন, সেই সব দেশে এই ধরনের মৃত্যুর গুরুত্ব আছে। কোন দেশে কোন বছরে প্রতি এক লাখের মধ্যে শিশু প্রসবকালীন জটিলতার ফলে যতসংখ্যক মা মৃত্যুবরণ করেন, তাকে প্রসূতি মৃত্যু প্রবণতার হার বলে। এই পরিমাপ থেকে সেই দেশে চিকিৎসার সুযোগ কি রকম আছে তা বোঝা যায়।

**শিশু মৃত্যু-প্রবণতার হার ঃ** কোনো বছরে প্রতি হাজারে এক বছরের কম যতসংখ্যক শিশু মৃত্যুবরণ করে, তাকে শিশুমৃত্যু প্রবণতার হার বলে। এই পরিমাপের সূচক হল ঃ

$$\text{শিশুমৃত্যু প্রবণতার হার} = \frac{\text{অনূর্ধ্ব এক বছর বয়সে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{অনূর্ধ্ব এক বছর বয়সে জীবন্ত মোট সংখ্যা}} \times 1,000$$

শিশুমৃত্যুর হার নির্ধারণ করতে গেলে দুটি তথ্য জানা আবশ্যক। নির্দিষ্ট সময়ে জীবিতাবস্থায় কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করল এবং তাদের ভিতর কতজন ওই সময়ের মধ্যে মারা গেল। এই পরিমাপ ভবিষ্যৎ শিশুমৃত্যুর সম্ভাবনাকে সূচিত করছে।

শিশুমৃত্যুর হারকে দুইভাবে দেখা যায়—(1) জন্মের একমাসের মধ্যেই কতজন মারা গেল এবং (2) একমাস থেকে এক বছরের মধ্যে কতজন মারা গেল। প্রথম ক্ষেত্রে জন্মকালীন পারিপার্শ্বিকের গুরুত্ব বেশি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জন্মের পর শিশুকে কেমনভাবে রাখা হয়েছে, চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে কিনা এইসব বিষয় জানতে হয়। এইভাবে বিশেষিত মৃত্যুহার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ বা কোনও নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী গ্রহণের সহায়তা করে।

শিশুমৃত্যুর হার থেকে কোন জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়। শিশুমৃত্যু প্রবণতা হার উভয় লিঙ্গের শিশুদের মৃত্যুর হারকে আলাদা আলাদা করে নির্ণয় করা যেতে পারে। কোন বছরে প্রতি হাজার জীবন্ত (live) শিশুপুত্রের (male child) মধ্যে কত সংখ্যক শিশুপুত্র মারা গেছে তা দিয়ে শিশুপুত্রের মৃত্যু প্রবণতার হার নির্ণয় হতে পারে। শিশুপুত্র ও শিশুকন্যার মৃত্যুহারের তুলনা থেকে আমরা সেই দেশের সামাজিক অবস্থার কথা জানতে পারি। ভারতবর্ষের মত দেশে কন্যা সন্তানের বেশি মৃত্যুহার এ দেশের কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্যের কথাই তুলে ধরে।

**কারণ বিশেষিত মৃত্যুহার ঃ** আবার নানা কারণে মৃত্যু ঘটে। রোগ, বার্ধক্য, আকস্মিক দুর্ঘটনা এ সব কিছুই মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কারণ অনুসারে মৃত্যুর শ্রেণিবিভাগ করে কারণ বিশেষিত মৃত্যুহার পরিমাপ করাও সম্ভব। বিশেষ করে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ নির্ধারণে এই পরমিাপ যথেষ্ট সহায়তা করে। এইভাবে রোগের প্রকোপ

নির্ধারিত হলে রোগ প্রতিষেধক ও চিকিৎসার দিকে নজর দিতে সুবিধে হয়। সমাজে মৃত্যুহার হ্রাস করার এটি অন্যতম পন্থা।

**প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ঃ (Life Expectancy) :** The Dictionary of Human Geography (johnston)তে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল—''The average number of births to be lived''. Majid Hussain (**Human Geography**) আরও সহজ করে বলেছেন যে—''The number of years a new born infant is expected to live.'' সোজা কথায় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বলতে বেঁচে থাকার বয়স-সীমা বোঝায়। Johnston আরও লিখেছেন—''*Life expectancy at birth,* eo, is frequently used as a summary measure of Mortality for the whole population'' অর্থাৎ জনসমগ্রকের মোট মরণশীলতার পরিমাণ দিয়ে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালকে (eo) সচরাচর প্রকাশ করা হয়। শিশুমৃত্যুর কারণে প্রথম বছরের পর সচরাচর প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কম হয়, কিন্তু তারপর থেকে এটা কমে আসতে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদেও আয়ুষ্কাল বিভিন্ন হয়। এজন্য স্ত্রী-পুরুষের আলাদা আলাদা জীবন সারণি তৈরি করা হয়।

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের দুটো দিক আছে—(i) জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের সাহায্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভেতর মরণশীলতা প্রকোপের তুলনা করা যায়। (ii) আবার, একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বয়সে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের তালিকা প্রত্যেক বয়সের অন্তর্ভুক্ত মানুষের কাছে ভবিষ্যতে সে আর কতবছর বাঁচার আশা করতে পারে তার একটি ধারণা দেয় (গুহ, 1987)

প্রত্যাশিত জীবনসীমা দীর্ঘ হলে, দেশে বয়স্ক জনসংখ্যা বাড়ে। আবার বয়স্ক জনসংখ্যা বাড়লে কর্মক্ষম জনসংখ্যা কমে। কর্মক্ষম জনসংখ্যা কমলে সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়।

### 2.5.8 মৃত্যুহারে আঞ্চলিক ও জাতিগত পার্থক্য (Mortality Differentials)

**বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে মৃত্যুহারের পার্থক্য ঃ** বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে মৃত্যুহারের পার্থক্য জনসংখ্যা তত্ত্বের গবেষণা ও আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাকৃতিক নিয়মেই দেখা যায় গর্ভাবস্থা থেকে জন্মমুহূর্ত পর্যন্ত কন্যাসন্তানের তুলনায় পুরুষ সন্তানের সংখ্যাধিক্য, গর্ভপাত ও মৃত সন্তান প্রসবের বাৎসরিক পরিসংখ্যান কোন দেশেই খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। পরিসংখ্যানের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে একমত যে ভ্রূণাবস্থাতেও পুরুষদের সংখ্যাধিক্য, ভ্রূণহত্যা বা স্বাভাবিক গর্ভপাতের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে গর্ভাবস্থায় যে সব ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায় তাদের মধ্যেও পুরুষ সন্তানের সংখ্যাধিক্য আছে। মৃতাবস্থায় যে সব শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাদের মধ্যেও পুরুষের সংখ্যা বেশি।

দেশকাল-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে জন্মমুহূর্তে যে কোন দেশে পুত্র সন্তানের সংখ্যা বেশি। জন্মাবার পর থেকে কন্যাদের তুলনায় এদের মধ্যে মৃত্যুর হারও কিছু বেশি, মহিলাদের মধ্যে প্রায় প্রতিটি বয়সেই পুরুষদের তুলনায় মৃত্যুহার কিছু কম। শৈশব অবস্থা থেকেই পুরুষসন্তানেরা প্রায় তিনটি সমাজে কন্যাসন্তানদের তুলনায় সব রকম সুযোগ-সুবিধের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পেলেও যেহেতু সংসারের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব প্রধানত তাদেরই বহন করতে হয়, তাই তাদের জীবনে দুর্বিপাকের সম্ভাবনাও বেশি। অর্থকরী উপার্জনের সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্ক কয়েক দশক আগেও খুব একটা ঘনিষ্ঠ ছিল না। সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর মহিলাদের বৃদ্ধি পেলেও প্রায় প্রতিটি বয়সে মহিলাদের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা পুরুষদের তুলনায় কম। সন্তান ধারণক্ষমতার বয়সসীমা (15-49 বছর) অতিক্রম করার পর তারাই ক্রমশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকদেশেই সমগ্র জনসমগ্রকে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বেশি। পঞ্চাশোর্ধ বয়সের গড় আয়ু বেশি। ভারতীয় সমাজে 34 বছর বয়স অর্থাৎ

মহিলাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনার প্রায় প্রান্তসীমা পর্যন্ত মহিলাদের মধ্যে মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে বেশি (মজুমদার, 1991)।

**যুদ্ধ ও শান্তিকালীন অবস্থায় মৃত্যুহারের পার্থক্য (Mortality Difference in Peace and War Condition) :** Malthus যুদ্ধকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধনাত্মক রোধ (Positive Check) বলেছেন। অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে জীবন ধারণের মান দ্রুত হ্রাস পায়। ভোগ্যপণ্যের অভাব সূচিত হয়। দ্রব্যমূল্য চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই আকাঙ্খিত জীবনযাত্রা মানুষকে পশুশক্তির ব্যবহারের দিকে ঠেলে দেয়। অতীতে খাদ্য, ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহের আগ্রহে দেশে দেশে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত। প্রবলের পরাক্রমে দুর্বল হতো শোষিত। সাময়িকভাবে মৃত্যুহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যাকে একটি সহনীয় স্তরে নিয়ে আসত। এ মধ্যযুগে রাজায় রাজায়, দেশে দেশে, যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। ওই সময়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির রেখচিত্র পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই ওই রেখচিত্র কখনই মসৃণ নয়। জনসংখ্যার বৃদ্ধির গতি কখনও দ্রুত, কখনও মন্দ, কখন কখন জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অপেক্ষাকৃত শান্ত সময়ে সহায়ক পরিবেশে, জীবনযাত্রার মান যখন স্থিতিশীল বা ঊর্ধ্বগামী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তখন দ্রুত হয়েছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং যুদ্ধবিগ্রহ অচিরেই ফিরে এসেছে। ঋতুচক্রের মতো মৃত্যুহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

**সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদে মৃত্যুহারের পার্থক্য (Mortality Differential by Social and Economic Class) :** সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদে একই দেশের মধ্যে মৃত্যুহারের পার্থক্য অনেক সময়েই প্রকট তবে সামাজিক শ্রেণিভেদে মৃত্যুহারের পার্থক্য নির্ধারণের জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন তার নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভাব প্রায় প্রতিটি দেশেই। পুর প্রতিষ্ঠানসমূহের মৃত্যু সংক্রান্ত পুঁথিতে ব্যক্তি বা তার পরিবারের সামাজিক শ্রেণি নির্ণয়ের লক্ষণগুলির তথ্য থাকে না। তবে অনেক দেশেই বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের বয়সভিত্তিক মৃত্যুহার পাওয়া যায়। এইসব তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে উচ্চতর পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে যেমন খনি, সিমেন্ট ধাতু শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মৃত্যুহার সাধারণভাবে বেশি। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের মধ্যে মৃত্যুহারের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে রাজ্যে রাজ্যে মৃত্যুহারের পার্থক্য যথেষ্ট। তথাকথিত অগ্রসর শ্রেণির মধ্যে সাধারণ মৃত্যুহারের পার্থক্য দেখা যায়। ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে মৃত্যুহার ও মৃত্যুর কারণে পার্থক্য দেখা যায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক শ্রেণিভেদে মৃত্যুহারে যে পার্থক্য নজরে আসে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদে তার জন্য প্রধানত দায়ী কিন্তু চিকিৎসার অসম সুযোগ-সুবিধে, উপযুক্ত পরিমাণে সুষম-খাদ্যের অভাব, নিচু মানের বাস-ব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি।

আমেরিকার মতো উন্নত দেশে শ্বেত ও অশ্বেতকায়দের মধ্যে মৃত্যুহারের পার্থক্য লক্ষণীয়। এই যে পার্থক্য তার অন্যতম প্রধান কারণ কিন্তু সামাজিক শ্রেণিভেদ। শেতাঙ্গদের তুলনায় নিগ্রো বংশোদ্ভূতরা নিম্ন সামাজিক মর্যাদাপ্রাপ্ত। শ্বেতাঙ্গদের গড় আয়ু যেখানে 76-77 বৎসর, অশ্বেতাঙ্গদের গড় আয়ু সেখানে 67 বছরের কম। অবশ্য, একথা সত্য যে পূর্বের তুলনায় শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের বিভিন্ন বয়সের মৃত্যুহারের, ব্যবধান হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের দেশেও অগ্রসর, অনগ্রসর, শ্রেণির মধ্যে এই ব্যবধান ক্রমশই কমছে। সকল মানুষের মধ্যেই পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ ও প্রচার মাধ্যমগুলির নিরলস প্রয়াসের ফলে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে (মজুমদার, 1991)।

**2.5.9 উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে মৃত্যুহারের পার্থক্য (Mortality Differential between**

**Developed and Developing Countries)**

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার সময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৃত্যুহারের পার্থক্য খুব চোখে পড়ার মতো ছিল। যুদ্ধ পরবর্তীকালে এই ব্যবধানের মাত্রা কমেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও যে ব্যবধান দেশে দেশে বা অঞ্চলে অঞ্চলে রয়েছে তা নগণ্য নয়। বর্তমান বা অতীতে দেশে দেশে বা অঞ্চলে অঞ্চলে মৃত্যুহারের এই যে ব্যবধান এর পিছনে যে প্রধান কারণ তা হল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান, আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে ওইসব দেশে বা অঞ্চলে প্রযুক্তি বা অর্থনৈতিক প্রগতি কোন স্তরে রয়েছে। 50 এর দশকের গোড়ার দিকেও আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাতিন আমেরিকার বহু অনুন্নত দেশেই অশোধিত মৃত্যুহার প্রতি হাজারে 50 বা তার কাছাকাছি ছিল। ওই একই সময়ে উন্নত দেশগুলোতে (ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা) মৃত্যুহার 14 বা তার কম ছিল। সত্তরের দশকে প্রথমোক্ত দেশগুলোতে মৃত্যুহার খুবই দ্রুত কমেছে। তুলনামূলকভাবে উন্নত দেশগুলোতে মৃত্যুহার যথেষ্ট ধীরে হ্রাস পেয়েছে।

### 2.5.9A দেশের বর্তমান মৃত্যুহারের সঙ্গে অতীতের মৃত্যুহারের পার্থক্য (Difference Between Current Death Rate and Past Death Rate)

বেশির ভাগ উন্নত দেশেই মৃত্যুহার বেশ কমে গিয়ে এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেছে যা থেকে আর খুব বেশি কমানোর সম্ভাবনা নেই। এইসব দেশে শিশুমৃত্যুর হার যথেষ্ট কমেছে এবং এখনও কিছু কমবার সম্ভাবনা রয়েছে। 40 বছরের নিচে যাদের বয়স তাদেরও মৃত্যুহার যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে এবং এখনও পাচ্ছে। কিন্তু যাদের বয়স 75-80 বৎসর তাদের মধ্যে পরিবর্তনের ছাপটা খুব একটা পরিস্কার নয়।

এছাড়া মৃত্যুহারের পার্থক্যের জন্য আরও অনেক কারণের প্রতি জনসংখ্যাতত্ত্ববিদরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিতদের মৃত্যুহার কিছু বেশি, যারা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ তারাই বিবাহিত জীবনযাপন করে। বিবাহিত জীবনে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে, যে দায়িত্ববোধ আসে তা মানুষকে সংযমী করে, নিজের ও পরিবারের অন্য সকলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে।

### 2.5.10 মৃত্যু কারণের ভৌগোলিক বিশ্লেষণ (Geographical Analysis of the Causes of Death)

মৃত্যু-প্রবণতা হারের হ্রাসের হ্রাস-বৃদ্ধি জনমিতি পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থান-কাল ভেদে মৃত্যু কারণের পার্থক্য হয়। বিভিন্ন দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কারিগরি বিকাশের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু মৃত্যুর কারণ ও উন্নয়নের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তাই দেশে দেশে মৃত্যুহারেও পার্থক্য হয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকে দেশেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, শিক্ষার অগ্রগতি, ক্যালোরি (calorie) গ্রহণের পরিমাণ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটেছে। ফলে সেই সব দেশে মৃত্যুহার কমে এসেছে।

পৃথিবীতে মৃত্যুর কারণগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(i) **জৈবিক (Biological)** ও (ii) **পরিবেশগত (Environmental)**। জৈবিক কারণগুলো মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশের গোলমাল (disorder) থেকে শুরু হয়। হার্টের অসুখ, ক্যানসার ইত্যাদি অসুখগুলো এই জৈবিক কারণের এবং হজমের গণ্ডগোল, ছোঁয়াচে রোগ ইত্যাদি অসুখ পরিবেশগত কারণের মধ্যে পড়ে। আকস্মিক ঋতু পরিবর্তনের (change of season), অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা থেকে পরিবেশগত রোগের সৃষ্টি হয়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলো এই রোগের প্রকোপে পড়ে। আরো ব্যাখ্যা করে বলতে হয় যে কোন দেশের মৃত্যুহার জনমিতি গঠন (demographic

structure), সামাজিক অগ্রগতি ও আর্থিক উন্নতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জনমিতি কারণের মধ্যে (i) বয়স গঠন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর পরের স্থান হল — (ii) লিঙ্গ গঠনের (sec composition) ও নগরায়ণের মাত্রার (degree of urbanisation) ওপর। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ছোঁয়াচে, হাপানী জাতীয় রোগ বেশি দেখা যায়। United Nations Development Programme-র ''Human Development Report'' (1999) থেকে দেখা যাচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানুষদের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কম (সারণি 5.1)।

**সারণি 5.1 : পৃথিবী ঃ প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছরে) একনজরে, 1997**

| এলাকা | গড় আয়ুষ্কাল | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|---|
| পৃথিবী | 66.7 | 68.9 | 64.7 |
| কম উন্নত দেশসমূহ | 64.4 | 66.1 | 63.0 |
| শিল্পোন্নত দেশসমূহ | 77.7 | 80.9 | 74.5 |

*Source : UNDP (1999), Human Development Report, 1999*

এক্ষেত্রে আফ্রিকার দেশগুলোর কথা উল্লেখ করতে হয়। ঐ মহাদেশের লেসোথো ছাড়া অন্যত্র নারী ও পুরুষদের আয়ুষ্কাল সাধারণভাবে 50-এর কম। ব্যতিক্রম অবশ্য কিছু আছে, যেমন নাইজেরিয়া, জাইর, সুদান ইত্যাদি দেশগুলো। এর বিপরীতে (চিত্র 5.6) রয়েছে উন্নত দেশগুলো যেখানে মহিলাদের গড় আয়ুষ্কাল 75 বছর (ব্যতিক্রম ত্রিনিদাদ)। মধ্যম উন্নত দেশগুলোর গড় আয়ুষ্কাল উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলোর মাঝামাঝি। পরিশিষ্ট 4.2 তে আরও দেখা যাচ্ছে যে মালদ্বীপ ও নেপাল ছাড়া সব দেশেই পুরুষদের আয়ুষ্কাল মহিলাদের চেয়ে কম, কোন কোন ক্ষেত্রে 1 বছর, আবার কোন ক্ষেত্রে 11 বছর।

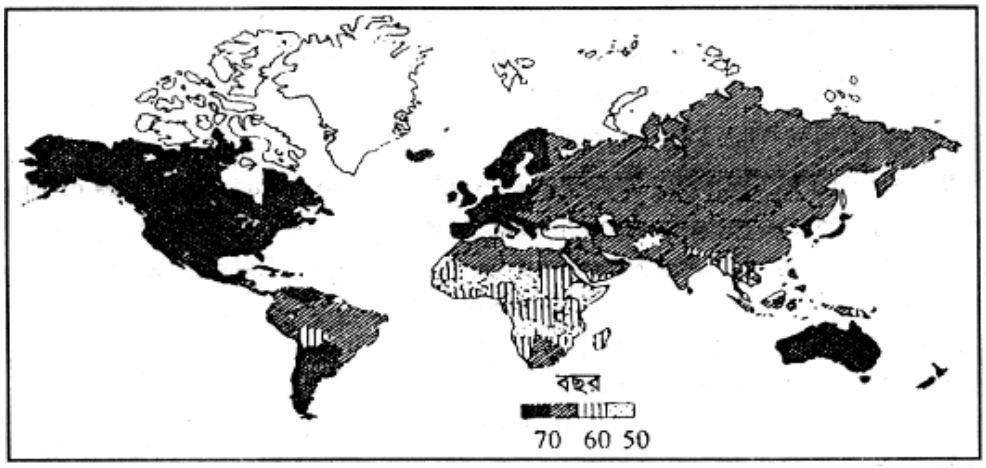


চিত্র 5.6 : পৃথিবী ঃ প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (1990-95)

উন্নত দেশগুলোর বেশির ভাগ পুরুষ হার্ট অ্যাটাক ও দুর্ঘটনায় মারা যান। সব দেশেই মহিলারা বেশি দিন বাঁচেন। এর সম্ভাব্য কারণ হল এঁদের মানসিক দৃঢ়তা ও শারীরিক ক্ষমতা, যদিও এটা ঠিক যে উন্নয়নশীল দেশের

মহিলারা অপুষ্টি, প্রসবের ধকল, চিকিৎসার প্রতি তাঁদের অনীহা ও স্বামী-পুত্রের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন পূজো, উপোস ইত্যাদির দরুন প্রসবকালীন বেশি সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হন (সারণি 5.2)। উন্নত দেশগুলোতে যেখানে প্রসূতি মৃত্যু-প্রবণতার হার (প্রতি একলক্ষ জীবন্ত শিশুতে) সাধারণভাবে 10-কম, উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোন কোনটিতে তা 2,000 (মালি) পর্যন্ত। এই সব দেশগুলোতে এই ধরনের মৃত্যুর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা হল যথাক্রমে 2,000 ও 160 জন। তৃতীয়ত নগরোন্নয়নের মাত্রা মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে। অতীতে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে মৃত্যুহার অনেক কম ছিল। বর্তমানে অবশ্য এই হার অনেক কমে গেছে। তবে এই ক্ষেত্রেও উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত দেশগুলোর তুলনায় শেষোক্ত দেশগুলোতে গ্রামাঞ্চলের মৃত্যুহার শহরাঞ্চলের চেয়ে বেশি। এর কারণ হল বিকাশশীল দেশগুলোতে (i) চিকিৎসার সুযোগ শহরেই সীমাবদ্ধ। (ii) গ্রামবাসীদের তুলনায় শহরবাসীদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি। (iii) শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার কারণেও শহরাঞ্চলে মৃত্যুর হার কিছুটা কম।

**নগরায়ণ ও মৃত্যুহারের** মধ্যে কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। অত্যাধিক জনসংখ্যার দরুন শহরাঞ্চল ছোঁয়াচে রোগের কবলে পড়ে। গ্রামের আবহাওয়া কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। তাই গ্রামবাসীরা ব্যাধির কবলে পড়েন কম। কায়িক পরিশ্রম করতে হয় বলে এঁদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এছাড়া উদ্বেগহীন জীবন যাপন করেন বলে হৃদরোগজনিত অসুখে এঁরা কম ভোগেন।

**সামাজিক দিক** দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় কোন কোন সমাজে শিশুহত্যা প্রথম মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে। অতীতে অনেক সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে শিশুহত্যার চল ছিল। জাপানের সাবেকী সমাজে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে শিশুহত্যা প্রথার একটা বড় ভূমিকা ছিল। আমাদের দেশেও অতীতে শিশুকন্যা হত্যা প্রথা চালু ছিল। (এখনও বিশেষ করে বিহারের পূর্বদিকের জেলাগুলোতে এই প্রথা চালু আছে) তখন এদেশে কন্যা সন্তানের জন্মকে বোঝা হিসেবে দেখা হতো, কিন্তু পুত্র সন্তানের জন্মকে পরিবারে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হতো। এখনও অনেক পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মালে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এছাড়া, ভারতীয় সমাজে বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিয়ে বিরূপ মনোভাব ও সংস্কার এবং অতীতের সতীদাহ প্রথা মৃত্যুহার বেশি হওয়ার জন্য দায়ী ছিল।

চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধের ওপরও মৃত্যুহার নির্ভর করে। একথা খুব স্বীকৃত যে জনতা-পিছু চিকিৎসকের সংখ্যা ও মৃত্যুহারের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের জনতা-পিছু চিকিৎসকের সংখ্যা তুলনা করলে এই সত্য ধরা পড়ে। এর সঙ্গে আমরা পানীয় জল, পুষ্টি, আবাসস্থল ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে যুক্ত করতে পারি। কারণ পুষ্টির অভাব, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার অপ্রতুলতা নানাবিধ অসুখ-বিসুখের সৃষ্টি করে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অনেক অনুন্নত দেশের বাসিন্দারা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন নন। সবশেষে বলা চলে অনেক সনাতনী সমাজে আজও ধর্মীয় কারণে লোকে আধুনিক ওষুধ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুযোগ নিতে চান না। ফলে সেসব দেশে মৃত্যুহারও বেশি।

**অর্থনৈতিক কারণের** মধ্যে প্রথমেই পরিবারের আয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা ভালো খাদ্য ও চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। দরিদ্ররা অপুষ্টি ও অনেক সময় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। এছাড়া, কোন দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও মৃত্যুহারের ওপর প্রভাব ফেলে। কৃষিভিত্তিক সমাজের তুলনায় শিল্পাশ্রয়ী দেশগুলোতে অত্যধিক জনসমাগম, পরিবেশ দূষণ, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বেশি। কারণ প্রথমোক্ত সমাজের বাসিন্দারা উন্মুক্ত বাতাস প্রাণভরে নিতে পারেন। আর এই সব কারণে সেখানে রোগের প্রকোপ অনেক কম। উপরের যে সব কারণ নিয়ে আলোচনা করা হল, তাছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ, মহামারী, খাদ্যাভাবের কারণে মৃত্যুহার দারুণভাবে বেড়ে যায়। অতীতে এই সব কারণে মৃত্যুহার বেশি ঘটলেও বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে বহুলাংশে নিজের আয়ত্তে এনেছে। ফলে মানুষের আয়ুষ্কাল বেড়েছে। সেই সঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। ''Life expectancy is now 17 years longer than it was in 1960. Infant mortiality has been nore than haved''. (Human Development Report, P.15)

### 2.5.11 মৃত্যুহারের বন্টন (Distribution of Death Rate)

1962 সালে UNO আশা করেছিলো যে এক বা দু'দশকের মধ্যে পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যক জনতার আয়ুষ্কাল (life span), 65 বছর বা তার বেশি হবে। 1974 সালে World Population Conference আশা পোষণ করেছিল যে পৃথিবীতে মানুষের আয়ুষ্কাল 1985 এবং 2000 সালের মধ্যে যথাক্রমে 62 ও 74 বৎসর হবে। ওই সম্মেলন আরও আশা পোষণ করেছিল যে স্বল্পোন্নত দেশগুলো আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৌলতে তাদের দেশে মৃত্যুহার কমিয়ে ফেলে উন্নত দেশগুলোর সমকক্ষ হবে। 1997 সালের Human Development Report থেকে দেখা যাচ্ছে (চিত্র 5.8) যে, গোটা পৃথিবীতে স্থূল মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 9.2 জন (1990-95 সালের গড়)। উন্নত ও বিকাশশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে ঐ সময় মৃত্যুহারের পার্থক্য ছিল কম— প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রতি ক্ষেত্রে 9 জন ও দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে 10 জন। বিভিন্ন মহাদেশগুলোর মধ্যে আফ্রিকায় মৃত্যুহার ছিল সবচেয়ে বেশি—16 জন। এর পরের স্থান হল ইউরোপের, 11 জন। পরবর্তী স্থানগুলোতে ছিল যথাক্রমে এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, ল্যাতিন আমেরিকা ও ওশিয়ানিয়া। যেহেতু অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জন্ম/মৃত্যু সংক্রান্ত নথিপত্র (register) সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয়, তাই তাদের প্রতিবেদন (Report)-এর অনুমিত (estimated) জন্ম/মৃত্যুহার ঐ দেশগুলোর প্রকৃত অবস্থাকে বোঝায় না। গোটা পৃথিবীতে 1997 সালে নারী ও পুরুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ছিল (Life Expectancy at birth) 66.7।

**সারণি 5.2 ঃ পৃথিবী ঃ প্রসূতি মৃত্যু-প্রবণতার হার, 1980-92 (প্রতি 1,00,000-এ জীবন্ত শিশু)**

| উন্নত দেশসমূহ | | মধ্যম উন্নত দেশসমূহ | | বিকাশশীল উন্নত দেশসমূহ | |
|---|---|---|---|---|---|
| দেশ | প্রসূতি মৃত্যুর হার | দেশ | প্রসূতি মৃত্যুর হার | দেশ | প্রসূতি মৃত্যুর হার |
| কানাডা | 5 | বুলগেরিয়া | 9 | পাকিস্তান | 500 |
| যুক্তরাষ্ট্র | 8 | তুরস্ক | 150 | ঘানা | 1,000 |
| জাপান | 11 | ইকোয়েডর | 170 | কেনিয়া | 170 |
| নেদারল্যান্ডস | 10 | ইরান | 120 | মায়ানমার | 460 |
| ফিনল্যান্ড | 11 | কিউবা | 39 | ভারত | 460 |
| নরওয়ে | 3 | লিবিয়া | 70 | মাদাগাস্কার | 570 |
| ফ্রান্স | 9 | বটসওয়ানা | 250 | জাম্বিয়া | 150 |
| স্পেন | 5 | টিউনিসিয়া | 70 | ল্যাও | 300 |
| সুইডেন | 5 | সৌদি আরব | 41 | বাংলাদেশ | 600 |
| অস্ট্রেলিয়া | 3 | সিরিয়া | 140 | তানজানিয়া | 340 |
| বেলজিয়াম | 3 | জর্ডন | 48 | হাইতি | 600 |
| | | কোরিয়া | 41 | মধ্য আফ্রিকা গণতন্ত্র | 600 |

| উন্নত দেশসমূহ | | মধ্যম উন্নত দেশসমূহ | | বিকাশশীল উন্নত দেশসমূহ | |
|---|---|---|---|---|---|
| দেশ | প্রসূতি মৃত্যুর হার | দেশ | প্রসূতি মৃত্যুর হার | দেশ | প্রসূতি মৃত্যুর হার |
| সুইজারল্যান্ড | 5 | আলজেরিয়া | 140 | নেপাল | 830 |
| অস্ট্রিয়া | 8 | প্যারাগুয়ে | 300 | সেনেগাল | 600 |
| জার্মানি | 5 | জামাইকা | 120 | কাম্বোডিয়া | 500 |
| ডেনমার্ক | 3 | পেরু | 300 | বেনিন | 160 |
| নিউজিল্যান্ড | 13 | দক্ষিণ আফ্রিকা | 84 | রাওয়ান্ডা | 210 |
| যুক্তরাষ্ট্র | 8 | শ্রীলঙ্কা | 80 | মালাবী | 400 |
| আয়ারল্যান্ড | 2 | রোমানিয়া | 72 | উগান্ডা | 550 |
| ইতালি | 4 | ফিলিপাইনস | 100 | ভুটান | 1,310 |
| ইস্রায়েল | 3 | ইন্দোনেশিয়া | 450 | চাদ | 960 |
| গ্রীস | 5 | ইরাক | 120 | গিনি বিসাউ | 700 |
| হংকং | 6 | মিশর | 270 | সোমালিয়া | 1,100 |
| কোস্টারিকা | 36 | নামিবিয়া | 370 | মোজাম্বিক | 300 |
| আর্জেন্টিনা | 140 | মঙ্গোলিয়া | 200 | গিনি | 800 |
| কোরিয়া প্রজাতন্ত্র | 26 | চীন | 95 | আফগানিস্তান | 640 |
| উরুগুয়ে | 36 | গুয়াতেমালা | 200 | ইথিওপিয়া | 560 |
| চিলি | 35 | বলিভিয়া | 600 | মালি | 2,000 |
| সিঙ্গাপুর | 10 | গাবোন | 190 | সিয়েরা লিওন | 450 |
| পর্তুগাল | 10 | হন্ডুরাস | 220 | নাইজার | 700 |
| মালয়েশিয়া | 59 | মরক্কো | 330 | বুরকিনা ফাসো | 810 |
| মরিশাস | 99 | ভিয়েতনাম | 120 | জাইর | 800 |
| কুয়েত | 6 | কঙ্গো | 900 | সুদান | 550 |
| ত্রিনিদাদ | 110 | পাপুয়া নিউগিনি | 900 | টোগো | 420 |
| পানামা | 60 | ক্যামেরুণ | 430 | নাইজিরিয়া | 800 |
| হাঙ্গেরী | 15 | | | | |
| পোল্যান্ড | 11 | | | | |
| মেক্সিকো | 110 | | | | |
| কলম্বিয়া | 200 | | | | |
| থাইল্যান্ড | 50 | | | | |
| ব্রাজিল | 200 | | | | |

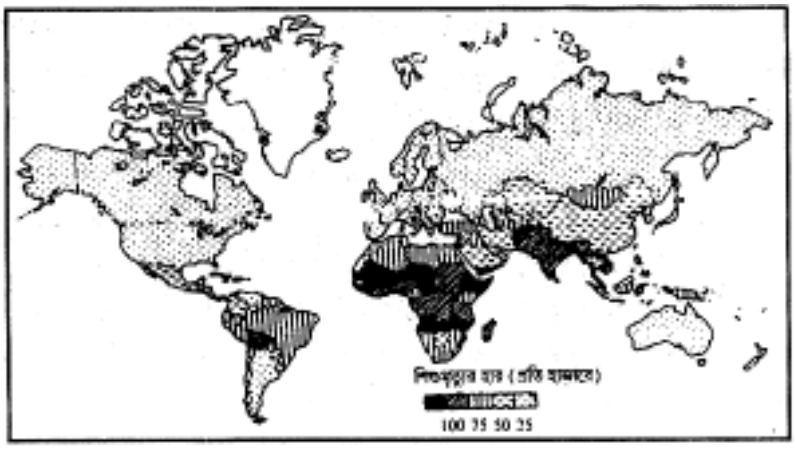


চিত্র 5.7 : পৃথিবী ঃ শিশুমৃত্যু হার (1990-95)

উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে এটা ধরা হয় 78 বছর এবং বিকাশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে 64 বছর। উত্তর আমেরিকাবাসীদের জীবনদীপ সবচেয়ে বেশি, 77 বছর। এর পরের স্থান যথাক্রমে অস্ট্রেলীয়দের, ইউরোপীয়দের, ল্যাতিন আমেরিকাবাসীদের, এশিয়াবাসীদের এবং আফ্রিকাবাসীদের (যথাক্রমে 74, 73, 69, 66) এবং 54 বছর)। রুশ এবং ভারতীয়দের আয়ুষ্কাল ছিল যথাক্রমে 67 এবং 63 বছর।

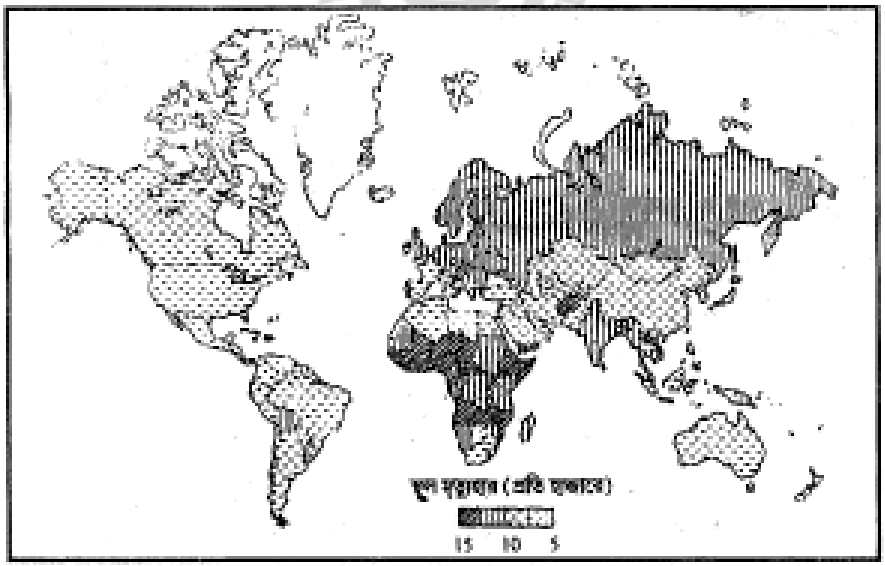


চিত্র 5.8 : পৃথিবী ঃ স্থূল মৃত্যুহার (1990-95)

শিশুমৃত্যুর হার হল কোন দেশের উন্নয়নের সূচক। এক্ষেত্রেও অঞ্চলগত বৈষম্য চোখে পড়ার মতন (চিত্র 5.7)। যদিও সারা বিশ্বে শিশুমৃত্যুর গড় হার প্রতি হাজারে 64 জন, ইউরোপের ক্ষেত্রে এই হার হল 12 জন, আর এশিয়ার ক্ষেত্রে 98 জন। সাধারণভাবে ধরা হয় উন্নত দেশগুলোতে শিশুমৃত্যু হার হল 14 জন এবং কম উন্নত দেশগুলোতে 64 জন। এশিয়ার পরেই আফ্রিকার স্থান (93 জন)। এর পরের স্থান হল যথাক্রমে ল্যাতিন

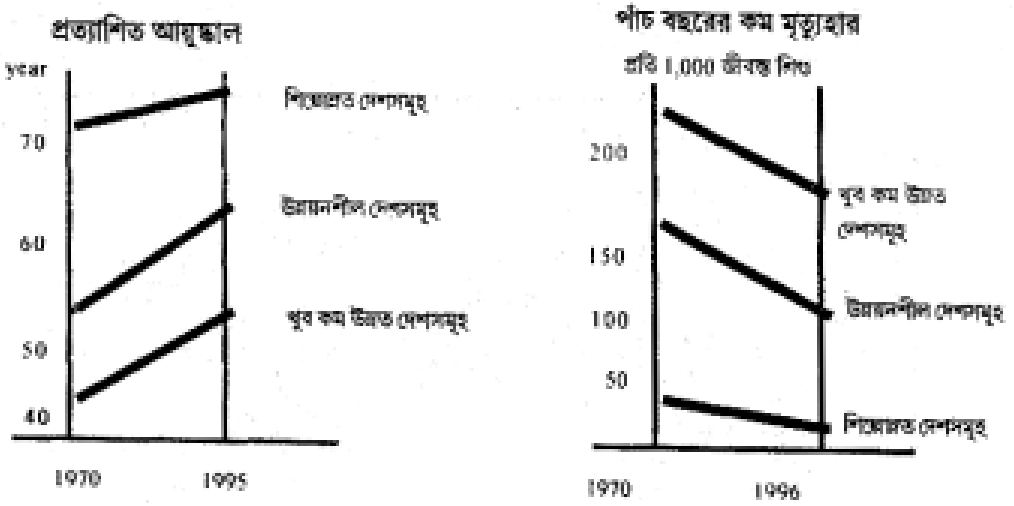


চিত্র 5.9 : মানব উন্নয়ন ঃ উন্নয়নশীল ও শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ও মৃত্যুহার (লক্ষ্য করার মত যে গত 25 বছরের উন্নয়নশীল ও খুব কম উন্নত দেশসমূহে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ও সাক্ষরতা বেড়েছে। পক্ষান্তরে, ঐ সব দেশে পাঁচ বছরের কম শিশুমৃত্যু হার কমেছে।)

আমেরিকা (84 জন), ওশিয়ানিয়া (41 জন)। রুশদের শিশুমৃত্যু হার 25 জন। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, কোন দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচক শিশুমৃত্যুর হার উন্নত ও বিকাশশীল দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে। **শিশুমৃত্যুহারের চিত্র** থেকে (চিত্র 5.9) আমরা **পৃথিবীর দেশগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ** করতে পারি— **উন্নত, মধ্যম উন্নত ও স্বল্পোন্নত**। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, চীন, জাপান, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা, গিয়ানা, সুরিনাম ইত্যাদি দেশগুলোতে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে 25 থেকে 50 জনের মধ্যে। আফ্রিকা মহাদেশ শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি, ৭৫-র বেশি এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা 100 ছাড়িয়ে যায়। ল্যাতিন আমেরিকার অবশিষ্ট দেশগুলো এবং গোটা এশিয়ায় (চীন বাদে) শিশুমৃত্যুর হার মাঝারি ধরনের 50 থেকে 100-র মধ্যে। তবে একথাও ঠিক যে গত কুড়ি বছরে (1970-75 থেকে 1990-95) এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে শিশু মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য কমে গেছে। এশিয়ার বাংলাদেশ, ইয়েমেন, আফগানিস্তান এ ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। আফ্রিকার ইথিওপিয়া, এ্যাঙ্গোলা ইত্যাদি দেশগুলোতে মৃত্যুহার বেশ বেশি (সারণি 5.3)।

যদিও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে মৃত্যুর হারে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবুও তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে উভয় গোষ্ঠীর দেশগুলোতে মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়ছে। গত 30 বছরে উন্নত ও বিকাশশীল দেশগুলোর মধ্যে মৃত্যুহারের ব্যবধান আট বছর কমে গেছে (চিত্র 5.9)। অনুন্নত ও বিকাশশীল দেশগুলোতে চিকিৎসার অভাব, পুষ্টির অভাব, মায়েদের শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীনতা ও পরিবার পরিকল্পনার যথার্থ রূপায়নের অভাব বেশি মৃত্যুহারের কারণ। পক্ষান্তরে, উন্নত দেশগুলোতে ছোঁয়াচে রোগের সমূল উৎপাটন মৃত্যুহার কমার কারণ। এসব দেশগুলোতে মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়ছে (সারণি 5.1 দ্রষ্টব্য)। শিশুমৃত্যুর হারও কমতির দিকে। তবে এই সব উন্নত দেশে দুর্ঘটনা, হার্টের অসুখ ও ক্যান্সারে বেশি লোক মারা যাচ্ছেন। উন্নত দেশগুলোতে হার্টের অসুখ ও ক্যান্সারে যথাক্রমে মোট মৃত্যুর 50 ভাগ ও 20 ভাগ ঘটে থাকে। এইসব দেশগুলোতে শিল্পদূষণ ও বিভিন্ন প্রকার মাদকাশক্তির দরুন মৃত্যু আগামী দিনে বেড়েই চলবে।

### 2.5.12 ভারতে মৃত্যুহার (Death Rate in India)

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভারতে মৃত্যুহার ছিল বেশি। তাই জন্মহার বেশি থাকলেও জনসংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। 1921 সালের পর থেকে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে। ভট্টাচার্য ও শাস্ত্রীর হিসেব অনুসারে 1911-20-র দশক থেকে 1969-70-এর মধ্যে মৃত্যুহার শতকরা 65.9 হ্রাস পেয়েছে। তবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মৃত্যুহারের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 1911-20 সাল এই পার্থক্যের ব্যাপ্তি ছিল শতকরা 25.4 ভাগ, 1961-70-এর দশকে তা 10.8 এসে নামে। 1920-70-এর অবস্থা পর্যালোচনা করে বিভিন্ন রাজ্যের মৃত্যুহার বিশ্লেষণ করে এঁরা দেখিয়েছেন যে রাজস্থান, কেরালা, মহীশূরে মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। আবার তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে এই হ্রাসের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, যেহেতু বোধ হয় তুলনামূলকভাবে এ রাজ্যের মৃত্যুর হার আগে থেকেই কম ছিল (গুহ, 1987)।

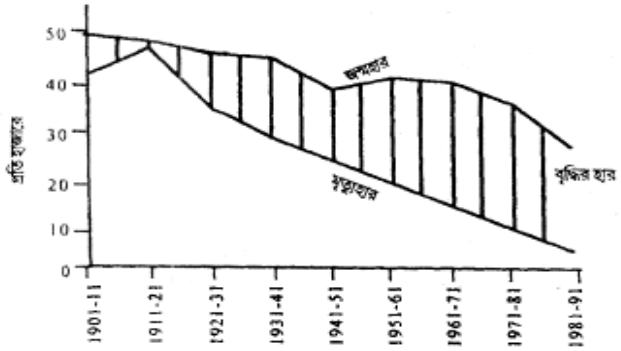


চিত্র 5.10 : ভারত ঃ স্থূল জন্ম ও মৃত্যুহার : 1901-11 থেকে 1981-91 (প্রতি হাজারে)

ভারতবর্ষের মৃত্যুহার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই শতাব্দীর শুরু থেকে বর্তমান সময় অর্থাৎ 1901 থেকে 1991 সাল পর্যন্ত মৃত্যুহারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস [ প্রতি হাজারে 42 থেকে 11-তে কমে আসা মৃত্যুহার (চিত্র 5.10)]। সারণি 5.3 থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 1921-31-র দশক থেকেই মৃত্যুহার বেশ কমেছে এবং তার পরে প্রতি দশকেই মৃত্যুহার 3 থেকে 5 জন করে কমছে। সারণি 5.3 থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি

**সারণি 5.3 ভারতে প্রতি হাজারে স্থূল জন্ম ও মৃত্যুহার (1901-11 থেকে 1981-91)**

| বৎসর | জন্মহার | মৃত্যুহার |
|---|---|---|
| 1901-11 | 49.2 | 42.6 |
| 1911-21 | 48.1 | 47.2 |
| 1921-31 | 46.4 | 36.3 |
| 1931-41 | 45.2 | 31.2 |
| 1941-51 | 39.9 | 27.4 |
| 1951-61 | 41.7 | 22.8 |
| 1961-71 | 41.2 | 19.0 |
| 1971-81 | 37.2 | 15.0 |
| 1981-91 | 30.9 | 10.8 |

**সূত্র ঃ** *(i) Census of India, A Handbook of Pupulation Statistics (1988), Table 35, p.99*
*(ii) Registrat General, Sample Registration Bulletin, June 1986, Vol. XX. No. 1, p.3*

যে বর্তমানে ভারতে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার 10 জন। গ্রামাঞ্চলে (প্রতি হাজারে 11.1) ও শহরাঞ্চলের মধ্যে (7.1) মৃত্যুহারের পার্থক্যের মূলে রয়েছে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধের অভাব। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মতন রাজ্যস্তরেও মৃত্যুহারের হেরফের রয়েছে। সারণি 5.4 থেকে আমরা দেখতে পাই যে ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে নাগাল্যাণ্ডে মৃত্যুহার সবচেয়ে কম (4.1)। এর পরের স্থান হল যথাক্রমে কেরালা (5.9), মণিপুর (6.7) ও ত্রিপুরা (7.7)। অন্যান্য যে সব রাজ্যে মৃত্যুহার জাতীয় মৃত্যুহারের (10.2) চেয়ে কম, সেগুলো হল জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, হিমাচলপ্রদেশ, সিকিম, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত।

**সারণি 5.4 ঃ ভারতের স্থূল মৃত্যুহার 1989**

| রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | মোট মৃত্যু | গ্রাম | শহর |
|---|---|---|---|
| ভারত | 10.2 | 11.1 | 7.1 |
| নাগাল্যান্ড | 4.1 | 4.7 | 1.3 |
| কেরালা | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| মণিপুর | 6.7 | 7.0 | 6.0 |
| গোয়া | 7.7 | 7.9 | 5.7 |
| ত্রিপুরা | 7.8 | 8.2 | 7.2 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 7.9 | 8.3 | 6.4 |
| মহারাষ্ট্র | 7.9 | 8.9 | 6.1 |
| পাঞ্জাব | 8.3 | 8.8 | 6.8 |
| হরিয়ানা | 8.4 | 9.0 | 6.5 |
| তামিলনাড়ু | 8.6 | 9.7 | 6.6 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 8.6 | 9.3 | 6.8 |
| কর্ণাটক | 8.7 | 9.5 | 6.5 |
| হিমাচলপ্রদেশ | 8.7 | 8.9 | 6.1 |
| সিকিম | 9.1 | 10.1 | 4.3 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | 9.3 | 10.0 | 6.5 |
| গুজরাত | 9.6 | 9.9 | 8.8 |
| অসম | 10.3 | 10.5 | 7.5 |
| রাজস্থান | 10.6 | 11.3 | 7.7 |
| মেঘালয় | 11.3 | 12.6 | 4.8 |
| বিহার | 12.1 | 12.5 | 7.9 |
| ওড়িশা | 12.6 | 13.1 | 8.0 |
| উত্তরপ্রদেশ | 12.6 | 13.7 | 8.2 |
| মধ্যপ্রদেশ | 12.8 | 13.8 | 8.3 |
| অরুণাচল | 14.1 | 15.0 | 4.7 |

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

| রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | মোট মৃত্যু | গ্রাম | শহর |
|---|---|---|---|
| দিল্লী | 6.7 | 7.7 | 6.6 |
| চণ্ডীগড় | 3.8 | 6.6 | 3.6 |
| আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 5.9 | 6.6 | 3.4 |
| লাক্ষাদ্বীপ | 6.0 | 8.5 | 3.1 |
| পণ্ডিচেরী | 7.8 | 8.2 | 7.5 |
| দমন ও দিউ | 8.2 | 7.7 | 6.6 |
| দাদরা ও নগর হাভেলী | 8.2 | 8.5 | – |

**সূত্র** : *Sample Registration System Data, Office of the Registrar General, Vital Statistics Division.*

সারণি 5.4 থেকে আরো দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত রাজ্যেই প্রতি হাজারে মৃত্যুহার বেশ কিছুটা কম। এ থেকে বলতে পারি যে ভারতবর্ষে (15 জনের কম মৃত্যুহারের নিরিখে) জনমিতি পরিবৃত্তকালের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। পণ্ডিচেরী ও দমন, দিউ ছাড়া বাকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মৃত্যুহার শহরাঞ্চলের জাতীয় গড়ের (7.1) চেয়ে কম রয়েছে। কারণ অধিকাংশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলই হল শহরাঞ্চল, যেখানে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলোর মধ্যে চণ্ডীগড়ে মৃত্যুহার সবচেয়ে কম। এখানে শিক্ষার হার বেশি। এছাড়া গোটা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মধ্যে এখানে চিকিৎসার সুযোগ বেশি। পক্ষান্তরে, সম্পূর্ণভাবে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার দরুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে দাদরা ও নগর হাভেলীতে মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি।

শিশুমৃত্যু হারের দিক দিয়ে গ্রাম (98) ও শহরের (58) মধ্যে পার্থক্য হল 40 জন (সারণি 5.5)। শিশুর বিকাশ ঘটে থাকে তার মায়ের পুষ্টির মানের ওপর যা প্রকারান্তরে ভারতের জনতার আর্থিক মানের ওপর নির্ভরশীল। দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী শিশুদের বেঁচে ধাকার সম্ভাবনা অনেক কম,। ফলে এদেশে শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশি। এছাড়া, উত্তর ভারতের অনেক রাজ্যে এখনও 75 শতাংশ প্রসব বাড়িতে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অল্পশিক্ষিত দাইদের উপস্থিতিতে হচ্ছে, যা নবজাত শিশুমৃত্যুর হারকে বাড়িয়ে দেয়। সারণি 5.5 থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওড়িশায় শিশুমৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। এর পরের স্থান হল যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার ও অসমের।

**সারণি 5.5 ঃ কয়েকটি রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার, 1989 (প্রতি হাজার জীবন্ত শিশুতে)**

| রাজ্য | মোট | গ্রাম | শহর |
|---|---|---|---|
| ওড়িশা | 112 | 126 | 76 |
| উত্তরপ্রদেশ | 118 | 126 | 75 |
| মধ্যপ্রদেশ | 117 | 124 | 78 |
| রাজস্থান | 96 | 103 | 59 |
| বিহার | 91 | 93 | 63 |
| অসম | 91 | 93 | 63 |
| গুজরাত | 86 | 92 | 70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| হরিয়ানা | 82 | 88 | 58 |
| **রাজ্য** | **মোট** | **গ্রাম** | **শহর** |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | 81 | 87 | 53 |
| কর্ণাটক | 80 | 89 | 53 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 77 | 82 | 53 |
| হিমাচলপ্রদেশ | 74 | 77 | 33 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 69 | 72 | 55 |
| তামিলনাড়ু | 68 | 80 | 43 |
| পাঞ্জাব | 67 | 72 | 53 |
| মহারাষ্ট্র | 59 | 66 | 44 |
| কেরালা | 22 | 23 | 15 |
| ভারত | **91** | **98** | **58** |

**সূত্র** : *Office of the Registrate General, Vital Statistics Division.*

, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লাইনগুলো তুলনীয়

বিকৃত ক্ষুধার মাঝে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে।
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর।

ভারতবর্ষের মৃত্যুহার সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখিলাম—(1) বিংশ শতাব্দীতে শুরুতে আমাদের দেশে মৃত্যুহার খুব বেশি ছিল, বর্তমানে তা কমে অনেক উন্নত দেশের সমগোত্রীয় হয়েছে। (2) রাজ্যস্তরে জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহারের পার্থক্য অনেক কম। (3) উন্নত দেশের তুলনায় ভারতের গ্রামাঞ্চলে মৃত্যুহার শহরাঞ্চলের চেয়ে বেশি। (4) আমরা জন্মহার রোধের চেয়ে মৃত্যুহার রোধ করতে বেশি সফল হয়েছি। (5) বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মৃত্যুহার কমেছে, কিন্তু জন্মহার কমেছে 1971 সালের পরে। (6) পশ্চিমী দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার চারগুণ বেশি। কেরালা-ই একমাত্র রাজ্য যেখানকার শিশুমৃত্যুর হার পশ্চিমী দেশগুলোর সাথে তুলনীয়।

**2.5.13 জন্মহার হ্রাস পাওয়ার কারণ ঃ** গোটা বিশ্বে জন্মহার কমছে এবং আগামীদিনে আরো কমবে। জন্মহার কমার পেছনে কতকগুলি কারণ কাজ করছে। অবশ্য উন্নত ও অনুন্নত দেশে জন্মহার কমার পেছনে কারণগুলি সামান্য ভিন্ন। যেমন "লিভ-টুগেদার" উন্নত দেশে বিবাহ না করেও একজন পুরুষ ও মহিলা একসঙ্গে থাকতে পারেন কিন্তু আমাদের সমাজে এখনও এই বিষয়টিকে ভালোভাবে নেওয়া হয় না। লিভ-টুগেদারের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা একসাথে থাকেন কিন্তু উভয়েই সন্তান চান না। লিভ-টুগেদারের ক্ষেত্রে একজন পার্টনার অপরজনকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

**মহিলাদের বেশী বয়সে বিয়ে করা ঃ** পাশ্চাত্য দেশের মহিলারা উচ্চ শিক্ষা ও কেরিয়ারের পেছনে ছুটছেন। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ এঁদের উদ্দেশ্য। ফলে এরা বিয়ে করার ফুসরৎ পান না। তারপর যখন বিয়ে করেন, তখন আর সন্তানধারনের বয়স থাকে না।

**সন্তান ধারণের ঝুঁকি ও সন্তান লালন-পালনে অনীহা ঃ** বিদেশে অনেক মহিলাই গর্ভ ধারণের ঝুঁকি নিতে

চান না। আবার সন্তান প্রতিপালন করার মত সময়ই তাদের নেই। এই উভয়বিধ কারণই হ্রাস পাবার কারণ। ইউরোপের কয়েকটি দেশে ও এই কারণে জনবৃদ্ধি সুস্থিত (Stable) অবস্থায় রয়ে গেছে।

**ছোট পরিবারের প্রতি আকাঙ্খাও** জন্মহার হ্রাস পাওয়ার কারণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশগুলিতেই ছোট পরিবারের প্রতি আকাঙ্খা জন্মহার হ্রাসের কারণ। তবে প্রাচ্যে গ্রামীণ এলাকার চেয়ে শহর এলাকায় এই প্রবণতা বেশী দেখা যায়।

**বন্ধ্যাত্ম ঃ** বন্ধ্যাত্ম একটি অভিশাপ। নারী, পুরুষ বা উভয়েই বন্ধ্যাত্বের শিকার হতে পারেন। দৈহিক রোগব্যাধি বা স্থূলত্ব এটির অন্যতম কারণ বলা হয়। তবে আজকের শহরের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও এর কারণ বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে বিশেষ করে শহরে, অনেক মেয়েরাই বেশী বয়সে বিয়ে হচ্ছে। এর দরুণ নানা জটিলতার সৃষ্টি হয় যা গর্ভধারণের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে।

| | **বিশ্বের জনসংখ্যার অশোধিত জন্মহার** | |
|---|---|---|
| অঞ্চল | 1950-55 | 1995-2000 |
| সমগ্র বিশ্ব | 37.4 | 24.9 |
| উন্নত দেশসমূহ | 22.6 | 13.4 |
| অনুন্নত দেশসমূহ | 44.6 | 27.9 |
| আফ্রিকা | 49.2 | 41.6 |
| ল্যাটিন আমেরিকা | 42.5 | 24.8 |
| উত্তর আমেরিকা | 24.6 | 13.1 |
| এশিয়া | 42.9 | 24.7 |
| ইউরোপ | 19.8 | 12 |

**জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণের সহজলভ্যতা ঃ** জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণ কম দামে ও সহজে পাওয়া যায়। সেগুলো ব্যবহারের সামাজিক পরিবেশ এবং ধর্মীয় অনুমোদন থাকলে জন্মহার কোন সমাজে দ্রুত হ্রাস পেতে পারে। মনে রাখতে হবে এগুলির সহজলভ্যতা জন্মহার কমিয়েছে, বিশেষ করে প্রাচ্যের দেশগুলিতে।

**একক বিবাহ প্রথা ঃ** যে সমাজে জনগোষ্ঠীর মধ্যে একক বিবাহ প্রথা বিরাজমান এবং তা ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা সমর্থিত সেখানে জন্মহার দ্রুত হ্রাস পেতে পারে। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে একক বিবাহ সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত। এজন্য এই দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহার কম।

**গর্ভপাত ঃ** গর্ভপাতের সুযোগ থাকলে তা জন্মহার হ্রাসে সাহায্য করে। ফলে বৈধ ও অবৈধ সন্তানের জন্ম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশে গর্ভপাত আইনতঃ বৈধ। ফলে এসব দেশে জন্মহার যথেষ্ট কমে গেছে বলা যায়। আবার কিছু কিছু দেশে গর্ভপাত আইনতঃ বৈধ না হলেও গোপনে গর্ভপাতের ব্যবস্থা রয়েছে। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে বৈধ-অবৈধ গর্ভপাত করা হয়। এছাড়া ভ্রূণ হত্যা ও জন্মহার হ্রাসের অন্যতম কারণ।

**বিবাহ বিচ্ছেদ ও বৈধব্য অবস্থা ঃ** স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর তাদের পুনঃবিবাহ না করা এবং মহিলাদের বৈধব্য অবস্থায় জীবন কাটানো জন্মহার হ্রাসে সাহায্য করে। অনেক সময় যে বয়সে বিবাহ বিচ্ছেদ বা

বৈধব্য অবস্থা ঘটে তারপর থেকে সন্তান জন্মের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য অনেক সময় অল্প বয়সে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে পুনরায় বিয়ের সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে সন্তান লাভের সম্ভাবনা থাকে।

**স্থায়ী কুমারীত্ব ঃ** কিছু কিছু সমাজে ধর্মীয় কারণে মহিলাদের একাংশ চিরকুমারী থাকে। যেমন খৃষ্ট সমাজে এক শ্রেণী মহিলা আছে যারা ধর্মীয় এবং মানব সেবার জন্য চিরকুমারীত্ব বরণ করে নেয়। তবে প্রতিটি সমাজেই কিছু নারী পাওয়া যায় যারা দৈহিক, মানসিক বা অপরাপর কারণে অবিবাহিত থেকে যায়। এরূপ স্থায়ী কুমারীত্ব জন্মহার হ্রাসে সহায়ক বলা যায়। আবার যে দেশে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী সেখানে অনেক নারীই অবিবাহিত থেকে যান। যেমন, কেরালা। স্বভাবতই এইসব সমাজে জন্মহার কম থাকে।

**চিরকুমার ঃ** কোন কোন সমাজে পুরুষের একাংশ ধর্মীয় এবং অপরাপর সমাজে সেবামুলক কাজে আত্মনিয়োগের লক্ষ্যে চিরদিন অবিবাহিত থাকে। হিন্দু এবং খৃষ্টান সমাজে এটা বেশি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও, দৈহিক, মানসিক এবং অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ চিরকুমার থেকে যান। এরূপ অবস্থা জন্মহার প্রতিরোধ করে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কারণে অনেকেই সন্ন্যাসীর (লামা) জীবনযাপন করেন।

**শিক্ষার বিস্তার (Spread of Education) ঃ** জনগণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারিত হলে তারা পরিকল্পিত পরিবার গঠনে উদ্যোগী এবং উৎসাহিত হয়। এছাড়া তারা সচেতন হয় বলে আয় অনুযায়ী সন্তান জন্মদানে অগ্রাহী হয়। বর্তমান সময়ে এটি জন্মহার হ্রাসে সাহায্য করেছে।

**মহিলাদের ঋতুকালীন চক্র ঃ** অনেক মহিলা আছে যাদের ঋতুকাল (menstruation period) অনিয়মিত (irregular)। এছাড়া সন্তান জন্মদানের পর অনেক মহিলার পরবর্তী ঋতুস্রাব অনেক দেরীতে হয়। সাধারণত যে সব মহিলারা স্বাস্থ্যবতী নয় অথবা অপুষ্টিতে ভোগে তাদের বেলায় এরূপ ঘটে। এসব অবস্থা জন্মহারকে বিলম্বিত করে।

**নারী জাগরণ ঃ** জন্মদানের সাথে নারীর সম্পর্ক পুরুষের চেয়েও বেশী। তাই নারীর আর্থ-সামাজিক সচেতনতা ঘটলে জন্মহার কমবে এমন আশা করা যায়। সুখের বিষয়, দেরীতে হলেও আমাদের দেশের মহিলারা এ বিষয়ে সতর্ক হয়েছেন। আশা করা যায় আগামী দিনে এই বিষয়টি জন্মহার কমাতে সাহায্য কমবে। এর জন্য অনেক মহিলা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিতে যাচ্ছেন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

**2.5.14 মৃত্যুহার হ্রাসের কারণ ঃ** উন্নত দেশগুলিতে বিংশ শতকের শুরু থেকেই মৃত্যুহার কমতে আরম্ভ করেছে, আর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। সন্দেহ নেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি শেষোক্ত দেশগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাসে সাহায্য করেছে। তবে আরো কতকগুলি কারণও মৃত্যুহার হ্রাসের জন্য দায়ী। যেমন, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, মহামারী প্রতিরোধ, শিক্ষার বিস্তার, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি।

**চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ঃ** চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বাড়লে জনগোষ্ঠীর রোগব্যাধি এবং অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা পায়। আমাদের দেশে 1960-র দশক থেকে চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাবার ফলে মৃত্যুহার বহুলাংশে ঠেকানো সম্ভব হয়েছে।

**জন্ম নিয়ন্ত্রণ ঃ** অধিক জন্মহার অধিক মৃত্যুহারের কারণ। এটি অনুন্নত দেশে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বেলায় বেশি ঘটে। এজন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় ও কার্যক্রমের সম্প্রসারণ (extension) মৃত্যু, বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু বহুলাংশে রোধ করতে সাহায্য করে। আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনার রূপায়ন মৃত্যুহারকে আংশিকভাবে কমিয়েছে।

**মহামারী প্রতিরোধ ঃ** অনেক সময় মহামারীজনিত কারণে কোন সমাজে একসাথে বহু লোক মারা যায়। ম্যালেরিয়া, আমাশয়, কলেরা, গুটি বসন্ত ইত্যাদি রোগ আমাদের দেশে এক সময় প্রচুর প্রাণহানি ঘটাত। ডি.ডি.টি. ছড়ানো, মশা মারার তেল স্প্রে করা, টীকার ব্যাপক কর্মসূচীর ফলে ১৯৬০-র দশক থেকে ঐ রোগগুলি নির্মূল হয়েছে এবং তজ্জনিত মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে।

**বিভিন্ন অঞ্চলের অশোধিত মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে জনসংখ্যার)**

| অঞ্চলসমূহ | 1950-55 | 1960-65 | 1970-75 |
|---|---|---|---|
| সমগ্র বিশ্ব | 18.3 | 14.4 | 12.0 |
| উন্নত দেশ | 10.1 | 9.0 | 9.2 |
| অনুন্নত দেশ | 22.2 | 16.8 | 13.2 |
| আফ্রিকা | 26.9 | 22.4 | 18.8 |
| মধ্য প্রাচ্য | 25.3 | 20.9 | 16.6 |
| ল্যাটিন আমেরিকা | 14.5 | 11.5 | 9.3 |
| চীন | 20.1 | 13.6 | 9.4 |
| পূর্ব-এশিয়া | 30.0 | 11.8 | 8.7 |
| দক্ষিণ-এশিয়া | 24.6 | 19.8 | 15.8 |

**শিক্ষার বিস্তার ঃ** জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সার্বিক মৃত্যুহার হ্রাসে সাহায্য করে। শিক্ষিত মানুষ জীবনের নিরাপত্তা, রোগব্যাধি এবং অপরাপর প্রতিকূল অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকে ও যথা সময়ে উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। শিক্ষার ক্রমবিস্তার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মৃত্যুহার কমিয়ে আনছে।

**বাল্য বিবাহ প্রথা ঃ** বাল্য বিবাহ জন্ম সময়ে শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। সুতরাং এ ধরনের মৃত্যু কমাতে হলে বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন (অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১) বছর এ দেশের জনসাধারণকে কিছুটা সাবধানী করেছে যা মৃত্যুহার কমার জন্য দায়ী।

**জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঃ** জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কারণ পরিবারের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেলে শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্যসহ তার পরিচর্যার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকল্প (বার্ধক্য, ভাতা, ইন্দিরা আবাস যোজনা ইত্যাদি) রয়েছে। তবুও দেশের দরিদ্র জনসংখ্যার তুলনায় তা অতি সামান্য।

**সুলভ মূল্যে খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ ঃ** দুর্ভিক্ষ এবং অপুষ্টিজনিত কারণে যেসব মৃত্যু হয় তার মূল কারণ হচ্ছে সুলভে খাদ্যসামগ্রীর প্রাপ্তির অভাব। তাই সুলভ মূল্যে খাদ্য শস্যের নিয়মিত সরবরাহকে মৃত্যুহার হ্রাসের অন্যতম কারণ বলা হয়। বি.পি.এল. কার্ড প্রদান, অন্তোদয় অন্ন প্রকল্প ইত্যাদি দরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্প মূল্যে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ-এ প্রসঙ্গো উল্লেখের দাবী রাখে।

**পরিবেশের উন্নয়ন ঃ** বাসস্থানের পরিবেশের উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুলভতা জনগণের সার্বিক মৃত্যু

হ্রাসের কারণ বলা হয়। ইদানিং সরকার কর্তৃক বস্তি উন্নয়ন, আর্সেনিক মুক্ত জল তথা বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা দেশের মৃত্যুহারের সম্ভাবনাকে অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে।

**সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ঃ** বহুলাংশে না হলেও অনেক দেশেই নানা ধরনের সামাজিক বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার কারণে কলহ, শত্রুতা, অবাঞ্ছিত যৌন সংসর্গ ইত্যাদি কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে। তাই সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা যে সমাজে বেশি সেখানে স্বভাবতঃই মৃত্যুহার কম।

## 2.6 জনঘনত্ব ও জনবণ্টন (Density and Distribution of Population)

### ভূমিকা (Introduction)

জনসংখ্যার ঘনত্ব হল পরিসংখ্যানগত ধারণা। এটি হল মোট জমির আয়তন ও জনসংখ্যার পরিমাণের অনুপাত। 1996 সালে ইউরোপের জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিমিতে 103 জন, এশিয়ায় 115 জন এবং আফ্রিকায় মাত্র 21 জন। এটি একটি পরিসংখ্যানগত হিসেব যার জন্য সমীক্ষা শেষে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান আদমসুমারী বা Census Report প্রস্তুত করার দরকার হয়।

### 2.6.1 সংজ্ঞা (Definition)

**জনবসতির ঘনত্ব বলতে কোন অঞ্চলের বা কোন দেশের প্রতি বর্গকিমিতে কতজন লোক বাস করেন তাকে বোঝায়।** অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যাকে মোট জমির পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা হল জনবসতির ঘনত্ব। এই সূত্রটি সাজালে যা দাঁড়ায় তা হল ঃ

$$\frac{102,70,15,247}{32,87,263} = 312 \cdot 42 \quad \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট জমির পরিমাণ}} = \text{জনবসতির ঘনত্ব}$$

**উদাহরণ ঃ** যেমন ধরা যায় 2001 সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ছিল 102, 70, 15, 247 জন। ভারতের মোট জমির পরিমাণ 32, 87, 263 বর্গকিমি হলে পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব হল ঃ

$$\frac{102,70,15,247}{32,87,263} = 312 \cdot 42 \text{ জন প্রতি বর্গকিমিতে।}$$

**সঠিক অবস্থা নিরূপণে সীমাবদ্ধতা ঃ** জনবসতির ঘনত্ব দেশের জনবসতি ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক পরিচয় দেয় না। কারণ

(ক) জনবসতির ঘনত্ব থেকে **কোন দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা পরিমাণ কত তা জানা যায় না।** জনসংখ্যার ঘনত্ব কম হলেও জনসংখ্যা বেশি হতে পারে। যেমন—চীন দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে মাত্র 77 জন। অথচ চীন বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ।

(খ) জনবসতির ঘনত্ব থেকে কোন **দেশের অর্থনৈতিক সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না**। সাধারণভাবে বলা হয়, জনবসতি বৃদ্ধি পেলে সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়। কিন্তু জনবসতির ঘনত্ব থেকে তা বোঝা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ, কোরিয়া বা ভিয়েতনামে জনবসতির ঘনত্ব খুব বেশি, কিন্তু ঐসব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত নয়। আবার অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার জনবসতির ঘনত্ব কম হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে সে দেশগুলো উন্নত।

সুতরাং জনবসতির ঘনত্ব দেশের জনসংখ্যা অথবা অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিচয় দেয় না। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

তাই জনসংখ্যা সম্পদের সম্পর্ক বুঝতে সমাজবিজ্ঞানীরা আরো কয়েক প্রকার ঘনত্বের পরিমাণের সাহায্য নেন। Trewartha তিন প্রকার ঘনত্বের কথা বলেছে।

(1) **গাণিতিক (Arithmetic), (2) পুষ্টি (Nutrition) ও (3) কৃষি (Agriculture) ঘনত্ব।**

**(1) গাণিতিক ঘনত্ব ঃ** প্রতি বর্গ পরিমাপ স্থানে ছোট জনসংখ্যা ও মোট জমির আয়তনের অনুপাত হল **গাণিতিক বা সাধারণ ঘনত্ব।** ভৌগোলিক ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা সচরাচর এই পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। কারণ হল পরিসংখ্যান পাওয়ার সুবিধে। জনসংখ্যা-সম্পদ সম্পর্কে এই সহজ অথচ খুব ব্যবহারযোগ্য পরিমাপকে জমির ওপর জনসংখ্যা চাপের পরিমাপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। কারণ এটি শুধুমাত্র মানুষ ও জমির সহজ পরিমাত্রিক সম্পর্ককে বোঝায়।

**গাণিতিক বা সাধারণ ঘনত্বের সীমাবদ্ধতা ঃ** এই ধরনের গড় জনঘনত্বের বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে গড় জনঘনত্ব চরম মান (absolute value) সম্বন্ধে কোন ধারণা দেয় না। এই ঘনত্বের পরিমাপের তুলনাগুলো কেবলমাত্র ক্ষুদ্র এককের অঞ্চলের ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে, যেমন—শহরাঞ্চলের ক্ষুদ্র অংশসমূহ কিন্তু বৃহৎ অঞ্চল যেমন— দেশ বা মহাদেশের ক্ষেত্রে এটি কার্যকরী নয়। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে এই স্থূল জনঘনত্ব সূচক হিসেবে কখনও এককভাবে ব্যবহৃত হয় না।

**(2) পুষ্টি ঘনত্ব ঃ** Demko-র মতে গাণিতিক জনঘনত্বের তুলনায় **পুষ্টি বা শারীরবৃত্তীয় ঘনত্ব** (Physiological) একটু উন্নততর পরিমাপ (''A somewhat refined concept of density, since it eliminates from the denominator barren areas and others not suitable for agricultural production''—Demko)। কারণ এতে মোট জনসংখ্যা ও মোট কৃষিজমির আয়তনকে গণ্য করা হয়। প্রতি বর্গ পরিমাপ কৃষিজমিতে কত সংখ্যক লোক বাস করেন তা দিয়ে এই ঘনত্ব প্রকাশ করা হয়। মানুষ-জমি অনুপাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটি গাণিতিক ঘনত্বের তুলনায় উন্নততর (Refined) পরিমাপ। কৃষিপ্রধান দেশগুলির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব আছে। তবুও এই পরিমাপ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়।

(a) এতে সমস্ত অকৃষি জমিকে উৎপাদনহীন ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আমরা জানি যে মাঝে মাঝে অকৃষি জমিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে তা থেকে প্রচুর সুবিধে পাওয়া যায়।

(b) এই পদ্ধতিতে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, সমস্ত কৃষিজমির উৎপাদিকা শক্তি একই প্রকার।

**(3) কৃষি ঘনত্ব ঃ কৃষি ঘনত্ব** হল কৃষিজমিতে নিয়োজিত জনতা ও জমির অনুপাত।

কৃষিপ্রধান দেশে এই পরিমাণ খুব সন্তোষজনক ফল দেয়। তবে সব দেশে কৃষির বাইরেও অন্য পেশায় নিযুক্ত

ব্যক্তি থাকেন। সারণি 7.1 থেকে উপরিউক্ত তিন প্রকার জনঘনত্ব সম্পর্কে আমাদের মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হতে পারে।

**সারণি 7.1 ঃ কয়েকটি দেশের বিভিন্ন প্রকার জনঘনত্বের মধ্যে তুলনা 1979-80**

| দেশ | গাণিতিক ঘনত্ব a | পুষ্টি বা শারীরবৃত্তীয় ঘনত্ব b | কৃষিঘনত্ব |
|---|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | 2 | 33 | 1 |
| আর্জেন্টিনা | 10 | 77 | 4 |
| রাশিয়া | 12 | 115 | 9 |
| যুক্তরাষ্ট্র | 24 | 118 | 1 |
| মেক্সিকো | 36 | 301 | 31 |
| মিশর | 42 | 1.475 | 209 |
| নাইজিরিয়া | 84 | 254 | 51 |
| পোল্যান্ড | 117 | 238 | 40 |
| ফিলিপাইনস্ | 171 | 515 | 82 |
| ইতালি | 194 | 458 | 19 |
| ভারত | 208 | 409 | 99 |
| যুক্তরাজ্য | 232 | 813 | 8 |
| জাপান | 315 | 2.380 | 135 |
| নেদারল্যাণ্ডস্ | 417 | 1.642 | 34 |

বিঃ দ্রঃ — a. 1980 সালের মোট জনসংখ্যাকে মোট দেশের আয়তন (বর্গকিমি) দিয়ে ভাগ (দেশের অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ যথা—প্রধান নদী ও হ্রদ বাদে)।

b. 1980 সালের মোট জনসংখ্যাকে 1979 সালের কৃষিজমি দিয়ে ভাগ (স্থায়ী ফসল, পশুচারণ, ক্ষেত্রসমূহ)।

c. 1980 সালের কৃষিজীবী জনতাকে 1979 সালের কৃষিজমি দিয়ে ভাগ।

(সূত্র : *The Cultural Lanscape by Rubesnstein et. al.)*

(4) **অর্থনৈতিক ঘনত্ব ঃ** উপরোক্ত পরিমাপসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করে Geogre অর্থনৈতিক ঘনত্ব (Economic Density) নামে একটি নতুন পদ্ধতির কথা বলেছেন। সূত্রটি হল নিম্নরূপ ঃ

$$ED = \frac{NK}{SK^1}$$

ED = অর্থনৈতিক ঘনত্ব, N = অধিবাসীর সংখ্যা, S = বর্গকিমি আয়তন, K = মাথাপিছু প্রয়োজনীয় পরিমাণ,

$K^1$ প্রতি বর্গকিমিতে উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ।

এই পদ্ধতি নির্ণয়ের জটিলতার কথা মনে রেখে নিজেই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শিল্পাশ্রয়ী অর্থনীতিতে এই প্রকার ঘনত্বের পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়।

(5) **গৃহ ঘনত্ব (Room Density)** ঃ উপরোক্ত চার প্রকার পরিমাপ ছাড়া আরও একপ্রকার জনঘনত্বের পরিমাপ দেখা যায়। শহরাঞ্চলে বহুতলবিশিষ্ট বাড়িগুলো জনঘনত্ব এবং অঞ্চলের মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একে **গৃহ ঘনত্ব** (Room Density) বা প্রতি গৃহে গড় ব্যক্তির সংখ্যা বলা হয়। পরিকল্পনাবিদ ও সমাজবিদ্‌রা একে বিশদভাবে একটি সূচক হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। সবশেষে এটুকুই বলা যায় যে ভৌগোলিকেরা গাণিতিক ঘনত্বের পরিমাপ বেশি ব্যবহার করে থাকেন। কারণ কৃষিজমির পরিমাণ বা কত লোক কৃষিতে নিয়োজিত আছেন, এ সম্বন্ধে পরিসংখ্যান পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

### 2.6.2 জনবন্টনের তারতম্যের কারণ (Causes for Varying Distribution of Population)

পৃথিবীর সর্বত্র জনবসতি দেখা যায় না। তাই অঞ্চল ভেদে জনঘনত্বের বিরাট হেরফের রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে কোটিরও বেশি লোক বসবাস করেন। এই বিপুল জনসংখ্যা কিন্তু পৃথিবীর সবখানে সমানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই। কারণ হল প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

এ জন্য বলেছেন যে কোন স্থানের বর্তমান জনসংখ্যার প্রকৃতিতে বুঝতে হলে ঐ স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি, তার সংস্কৃতি, সামাজিক বিন্যাস এবং সর্বোপরি, মানবীয় ভূগোলের সব কয়টি দিকই খতিয়ে দেখতে হবে।

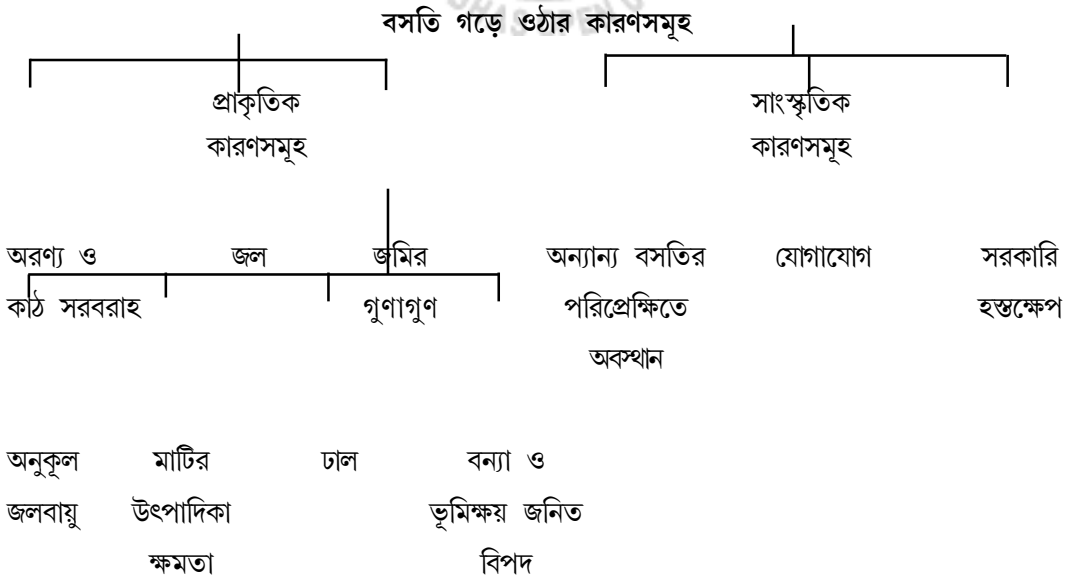


#### 2.6.2.1 প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Physical Factors)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি সত্ত্বেও আজও নানারকম প্রাকৃতিক বাধা বসতি বিস্তারে বাধা দান করে। এই

কারণে শীতল তুন্দ্রা অঞ্চল, মরুভূমি, বন্ধুর পার্বত্যভূমি, জলাভূমি এবং আর্দ্র-ক্রান্তীয় অঞ্চল আজও বলতে গেলে জনশূন্য রয়ে গেছে।

জনসংখ্যার বন্টন ও জনঘনত্বের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—**ভূমিরূপ, জলবায়ু, মরুভূমি, মাটি, শক্তিসম্পদ এবং খনিজ কাঁচামাল ও গম্যতা।**

**(1) ভূমিরূপ ঃ ভূ-প্রকৃতি** — ভূ-প্রকৃতি জনবন্টনের অন্যতম নিয়ামক। পার্বত্য বন্ধুর ভূমি, ধ্বসপ্রবণ ঢালুভূমি, জলমগ্ন প্রভৃতি "নেতিবাচক অঞ্চল" মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত। কিন্তু নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা, নদীমঞ্চ, উপকূলবর্তী সমভূমি প্রভৃতি জনপদ গড়ে তোলার আদর্শ স্থান।

পৃথিবীর আদি সভ্যতার অঞ্চলগুলো—টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র সমভূমিতে গড়ে উঠেছিল, তাই তারা অতি স্বাভাবিক কারণেই জনাকীর্ণ।

আমরা জানি, অনুকূল ভূ-প্রাকৃতিক স্থানে মানুষ বসবাস করে। তুলনামূলকভাবে প্রতিকূল বন্ধুর ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে সীমিত কৃষিজমি ও চাষের কাজে খুব বেশি ব্যয়ের জন্য বেশি বসতি গড়ে ওঠে না।

(i) **জনবসতির ক্ষেত্রে জমির উচ্চতা ও ঢালের প্রভাব ঃ** পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র লোক মিটারের বেশি উচ্চতায় বসবাস করেন। Semple-এর ভাষায়—''Mountain regions are as a rule more sparsely settled than plains'', **(Influence of Geographic Environment)**। আবার Clarke বলেছেন যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 56% লোক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মিটারেরও কম উচ্চতায় বাস করেন।

আমরা দেখতে পাই যে, উচ্চতা ও বসতি গভীর সম্পর্কযুক্ত। যথা—

(i) অধিকাংশ বসতি সমতল এলাকায় গড়ে উঠেছে।

(ii) কারণ সমতলে চাষবাসের জন্য প্রচুর উর্বর জমি পাওয়া যায়।

(iii) এ অঞ্চলে শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত।

(iv) খাড়া ঢালযুক্ত এলাকায় চাষ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল, ফলে জনঘনত্ব কম।

**(ii) সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে বসতির অবস্থান ঃ** সূর্যের অবস্থান, সূর্যরশ্মির পতনকোণ ও সূর্যালোকের সময়ের (duration of souchine) ওপর নির্ভরশীল হয়ে বসতি গড়ে ওঠে। পার্বত্য অঞ্চলে উপরোক্ত প্রভাবসমূহ বেশি হলেও সমভূমি অঞ্চলেও বাড়ি তৈরিতে সূর্যালোকের প্রভাব দেখা যায় (চিত্র 7.1)। দক্ষিণ বাংলায় নিম্নোক্ত বহুল প্রচলিত শ্লোকটি থেকে এ কথাটির সত্যতা বোঝা যাবে।

"দক্ষিণ দুয়ারি ঘরের রাজা,

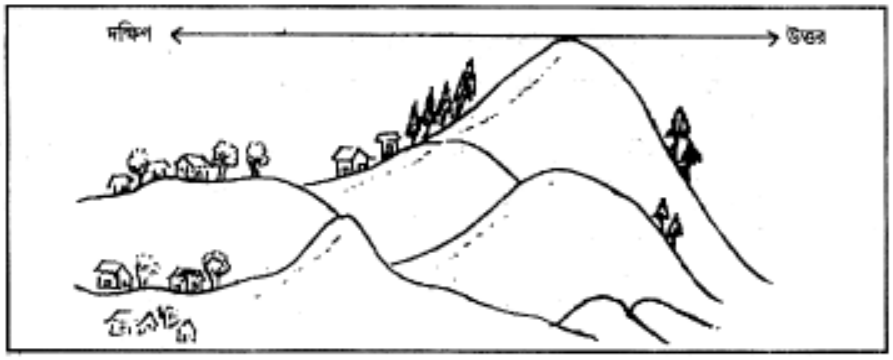


চিত্র 7.1 : হিমালয়ের দক্ষিণঢালে বসতি



ও প্রবচন ]

দক্ষিণবঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে গরমকালে বিকেলের দিকে মনোরম বাতাস বয়। তাই বেশির ভাগ লোক এই দিকে মুখ করে বাড়ি করতে চেষ্টা করেন। আর উত্তর দিক থেকে শীতে ঠাণ্ডা বাতাস বয় বলে সেই দিকের মুখ করে বাড়ি করলে ঠাণ্ডা ভোগ করতে হয়। পূর্বদিকে উদীয়মান সূর্যের (rising sun) তাপ গৃহস্থেরা ভালোভাবে উপভোগ করেন। কিন্তু পশ্চিমদিকে মুখ করে বাড়ি করলে দুপুরের পর থেকে বাড়ি সূর্যের তাপে তেতে ওঠে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইউরোপের অধিকাংশ বাড়ি উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়, যাতে বাড়িগুলো বেশি সূর্যালোক পেতে পারে। অনুরূপভাবে, হিমালয় অঞ্চলের অনেক জায়গায় বাড়িগুলো উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়। যেমন—নৈতিতাল, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল হিমালয়।

**(2) জলাশয়ের ভিত্তিতে বসতির অবস্থান—** জলনিকাশী ব্যবস্থা, ভৌম জলস্তরের গভীরতা ইত্যাদি বসতি স্থাপনে প্রভাব ফেলে। শুধু পানীয় হিসেবেই নয়, ফসল উৎপাদন ও পশুপালনের জন্যও জল খুব দরকার। আমাদের বাংলাতে একসময় জলপথই ছিল পরিবহনের প্রধান উপায়। এছাড়া, জলাশয়ে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য মাছ মেলে। Brunhes লিখেছেন—''The rivers are both roads and fisheries.''

জলের অভাবের দরুন পৃথিবীর অনেকাংশে বসতির বিস্তার ঘটেনি। তাই একদিকে যেমন সাহারা ও আরবের ধূ ধূ মরু প্রান্তরে মরূদ্যানগুলোকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন বসতি গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে জার্মানীর রাইন নদী, উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স, চীনের হোয়াংহো ও ভারতের গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে খুব ঘনবসতি গড়ে উঠেছে।

বসতি স্থাপনে **জলনিকাশী ব্যবস্থার** একটা ভূমিকা আছে। ত্রুটিপূর্ণ জলনিকাশের ফলে সৃষ্ট জলাভূমি ও ঝোপঝাড় ঐ স্থনে জনবসতি গড়ে ওঠার পক্ষে এক বাধাস্বরূপ। Zelinsky (1966) বলেছেন বসতির দিক দিয়ে ভারত ও চীনের বদ্বীপ সমভূমির কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বদ্বীপগুলো [ টোংকিন (Tongkin) অঞ্চল বাদে ] এক বৈসাদৃশ্য মনে হয়। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি জলাভূমি ছিল অনুরূপভাবে, অনুন্নত জলনিকাশী ব্যবস্থার দরুন গুজরাট সমভূমির তুলনায় কচ্ছের রণ এলাকায় বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে উঠেছে।

ভৌম জলস্তরের গভীরতা গ্রাম্য জনবসতির আকৃতি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এটা দেখা গেছে যে যেখানে ভৌম জলস্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি রয়েছে, সেখানকার জনবসতির আকৃতি ছোট ও সংঘবদ্ধ হয়ে বিপরীতভাবে, ভৌম জলস্তর মাটির অনেক গভীরে থাকলে জনবসতি বড় ও বিক্ষিপ্ত হয়। ইরানের উত্তর উপকূলীয় সমভূমিতে ভৌম জলস্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকাতে জনসংখ্যার বিস্তার খুব ছোট হলেও তা ঘনসন্নিবিষ্ট। অন্যদিকে, ইরানের মধ্যভাগে ভৌম জলস্তর খুব গভীর হওয়াতে জলের উৎসের কাছাকাছি বিক্ষিপ্তভাবে জনবসতি গড়ে উঠেছে, ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতে দেখা গেছে যে উচ্চ অংশের সমভূমির তুলনায় নিম্ন প্লাবনভূমিতে জনবসতির আকৃতি খুব ছোট।

**(3) জলবায়ু (Climate) :** জনসংখ্যার স্থানীয় বন্টন, উন্নতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, দীর্ঘকালীন শীত ইত্যাদি

কারণগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের ওপর জলবায়ুর প্রভাব অপরিসীম। Finch এবং Trewatha তাঁদের **Elements of Geograph-Physical and Cultural** গ্রন্থে শীতল মরুভূমি, উষ্ণ মরুভূমি ও আদ্রক্রান্তীয় অঞ্চলকে বসতিহীন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। Lowry-এর মতে দীর্ঘস্থায়ী শীত ও স্বল্পকালীন গ্রীষ্মের দরুন তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ু, স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মে জলনিকাশের অভাবের দরুন **উষ্ণ মরু অঞ্চল,** প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত, জঙ্গাল ভূমিকায়, ধৌতমৃত্তিকা প্রভৃতি কারণে **আদ্র-ক্রান্তীয় অঞ্চল** বসতি গড়ে ওঠার পক্ষে প্রতিকূল। উপরোক্ত সব প্রকার, জলবায়ু মানুষ ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ।

**নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু** মানুষের বসবাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। Hungtington-এর মতে এ ধরনের জলবায়ু মানুষের স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। ''Temperate marine climate with their stimulating and invigorating effects on the physiological and mental framework of men are among the climates par excellance the best area for maximum concentration of human settlement.''

**মনুষ্যবসতির উপর জলবায়ুর প্রভাব তিন রকম** (i) **শৈত্য ঃ** মেরু অঞ্চল ও পার্বত্য উচ্চভূমিতে সারাবছরই শীত থাকে ও শীতকালে শৈত্যের তীব্রতা বাড়ে ও তুষারবৃত থাকে। তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রান্তভাগে অভ্যন্তরীণ মৃত্তিকা স্থায়ীভাবে হিমায়িত থাকে। গ্রীষ্মে খুব সামান্য সময়ের জন্য ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকা স্তরে বরফে গলে যায়। ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল প্লাবিত হয়ে কৃষিকাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। পশুশিকার ও মৎস্যশিকার এ অঞ্চলের উপজীবিকা হলেও বরফ ঢাকা জল থেকে মাছ ধরা কষ্টকর। আবার তীব্র শীতে বেঁচে থাকা পশু কম বলে পশুশিকার সীমাবদ্ধ।

তুন্দ্রার দক্ষিণভাগে বৃহৎ পত্রযুক্ত সরলবর্গীয় গাছের অরণ্য 'তৈগা' নামে পরিচিত। অত্যাধিক তুষারপাতের জন্য এ অঞ্চলের কৃষিকাজ কষ্টসাধ্য। এখানে কাঠ চেরাই শিল্প ও খনি শিল্প বিকাশলাভ করেছে। উচ্চতা শৈত্যকে প্রভাবিত করে। যত উপরে উঠা যায় তত বেশি শীতলতা অনুভূত হয়। তাই উচ্চস্থান বসবাসের অনুপযুক্ত হয়। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 3,000 মিটার অধিক উচ্চতায় জনবসতি প্রায় নেই বললেই চলে।

(ii) **উষ্ণতা ঃ** নিরক্ষীয় অঞ্চল যথা— আমাজন, জাইরে অববাহিকা ও দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার অংশবিশেষে সারাবছর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা (বৃষ্টিপাত) বেশি। এরূপ জলবায়ুতে গভীর অরণ্য ছাড়াও বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর প্রাদুর্ভাব ও হিংস্র জীবজন্তু দেখা যায়। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নতও এই জলবায়ুতে কর্মক্ষমতা সাধারণত কমে যায়। ফলে উষ্ণ অঞ্চলে ঘন জনবসতি গড়ে ওঠেনি।

(iii) **খরা ঃ** জলবায়ুর মধ্যে উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত জনবসতির বন্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এই দু'য়ের মধ্যে বৃষ্টিপাত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে যে, ''The population map of India follows the rainfall map.'' কারণ বৃষ্টি হলে কৃষির জন্য পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায়। আর কৃষি হল ভারতীয় জনতার আর্থিক ভিত্তি। তাই যত পশ্চিমে যাওয়া যায় বৃষ্টিপাত তত কমতে থাকে। সেইসঙ্গে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমতে থাকে। এইজন্য থর মরুভূমিতে জনসংখ্যা বিরল।

একই কথা খাটে ক্রান্তীয় মরুভূমির ক্ষেত্রে। এইসব স্থানে উষ্ণতা অত্যন্ত বেশি। অত্যধিক উষ্ণতা, রুক্ষতা, দীর্ঘকালীন বৃষ্টিহীনতা এখানে বসতির প্রধান অন্তরায়। উদ্ভিদের অভাব হেতু পশুপালন মরুঅঞ্চলের প্রধান জীবিকা এবং অধিবাসীরা মূলত যাযাবর জীবন যাপন করেন। মরুভূমির জনবসতি বিরল ও অস্থায়ী। খনি অঞ্চলেও মরুদ্যানে মূলত জনবসতি চোখে পড়ে।

(4) **মৃত্তিকা ঃ** মাটির গুণাগুণ আংশিকভাবে জনবসতির ঘনত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাটির গঠন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জনঘনত্বের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটায়। পৃথিবীর হিমবাহ ও বরফঢাকা অঞ্চলগুলোতে মাটি না থাকায় সেগুলো জনশূন্য বললেই চলে। এই কারণে, কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটানের অনেক অঞ্চলে বাসযোগ্য নয়। Wolfanger তাঁর **World Population Centres in Relation to Soils-**এ দেখিয়েছেন যে, উচ্চ মধ্য অক্ষাংশের পড্‌লস মাটি ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে ল্যাটেরাইট মাটি নিবিড় কৃষিকার্যের পক্ষে বাধাস্বরূপ বলে এ সমস্ত অঞ্চল বিরল জনবসতিযুক্ত।

অন্যদিকে জাপান, ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের কৃষ্ণমৃত্তিকা, সিন্ধু ও হোয়াংহো নদীর অববাহিকার পলিমাটি, মধ্য ও উপক্রান্তীয় অক্ষাংশের তৃণভূমির মাটি উর্বর বলে জনঘনত্ব বেশি দেখা যায়।

মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের মটিতে এত বেশি পরিমাণ গন্ধক থাকে যে সেই সব অঞ্চলে চাষবাস করা সম্ভব নয়। ফলে জনবসতিও তেমন গড়ে ওঠেনি।

ভারতের বন্ধ্যা ল্যাটেরাইট মাটি বা কিছু আর্কিয়ান যুগের নাইস শিলা দ্বারা গঠিত বন্ধ্যা ভূমিভাগেও জনবসতি গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল নয়।

(5) **শক্তিসম্পদ ঃ** জনসংখ্যা বন্টনের ক্ষেত্রে শক্তিসম্পদ ও খনিজ কাঁচামালের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শীতল সাইবেরিয়া বা উষ্ণ সাহারা মরুভূমির মত প্রতিকূল পরিবেশে খনিজ তেলকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এছাড়া, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি, আলাস্কা, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমিতে প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও শক্তিসম্পদ ও বাণিজ্যের অবস্থান প্রচুর জনসমাবেশ ঘটিয়েছে।

### 2.6.2.2 আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ

**(ক) জীবিকার সুযোগ ঃ** খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান মানুষের মৌলিক চাহিদা। এই সর্বজনীন চাহিদা পূরণ করার প্রাথমিক উপায় হল উপযুক্ত জীবিকার সন্ধান। তাই উপার্জনের সুযোগ যেখানে যত বেশি ও জীবনধারণ করা যেখানে যত সহজ, বাসভূমি হিসেবে সেই স্থান তত আকাঙ্ক্ষিত। সেই কারণে রুক্ষভূমি থেকে শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের দিকে, গ্রাম থেকে শহরের দিকে, শহর থেকে আরও সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ নগরের দিকে মানুষের ঢল নামে, যাকে ভৌগোলিক পরিভাষায় **'পরিব্রাজন'** বলে।

**(খ) প্রশাসনিক শহর ঃ** দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কেন্দ্র থাকে, যেখানে থেকে দেশের বিভিন্ন কাজকর্ম ও শাসন পরিচালনা করা হয়। যেমন— ভারতের রাজধানী দিল্লী। এই শহরটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, আর এখানে নতুন নতুন জনবসতি স্থাপিত হয়েছে। কারণ প্রশাসন কেন্দ্র থাকায় রাস্তাঘাট ও যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা থাকে। বিভিন্ন সংস্থার অফিস, আদালত থাকায় মানুষের বিশেষ সুবিধে হয়। তাই প্রশাসনিক কেন্দ্রে জনবসতির ঘনত্ব বেশি হয়।

**(গ) ধর্মীয় স্থান ঃ** বিভিন্ন দেশের মানুষ নানা ধর্মের সাথে জড়িত থাকে। প্রতিটি ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ঐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে স্থাপিত হয় সেখানে জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করে। কেননা ঐ স্থানে বহুলোক আসে। তাদের নানা দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। তখন দোকান, বাজার ইত্যাদি গড়ে উঠে। এভাবে বসতি বাড়তে থাকে। যেমন— ভারতের বারাণসী ও কাশী শহর। ঐ দুই স্থানে বহু মানুষ বসবাস করেন। এ ছাড়াও আরো অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ঐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠেছে, যেমন মক্কা,

জেরুজালেম। কোন শহর গড়ে উঠলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে জনবসতি বাড়তে শুরু করে। তখন ঐ অঞ্চলটি একটি বড় জনবসতিতে পরিণত হয়।

**(ঘ) শিক্ষাকেন্দ্র ঃ** কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। সেখানে নানা দেশ ও বিদেশ থেকে শিক্ষালাভের আশায় বহু শিক্ষার্থী আসেন তারা ঐ স্থানে বসবাস করেন। তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য বাজার ও দোকানপাট গড়ে ওঠে। এইভাবে একে একে জনবসতি স্থাপন হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রাচীনকালের নালন্দার কথা বলতে পারি। আমাদের দেশে শান্তিনিকেতন একটি অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ও শহর। এর প্রধান কারণ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থাকায় এইখানে বহু দেশ ও বিদেশের শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য আসেন। আর ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানা বসতি ও বাজার শান্তিনিকেতনকে একটি ছোট শহরে পরিণত করে।

**(ঙ) শিল্পকেন্দ্র ঃ** অনেক স্থানে কোন শিল্পকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে ওঠে। শিল্প স্থাপনের সাথে সাথে ঐ এলাকায় শিল্পকর্মীরা বসবাস করেন। তাদের সুবিধার্থে ঐ স্থানে বাজার গড়ে ওঠে। তখন ধীরে ধীরে জনবসতির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এভাবে একটি শহরের জন্ম হয়। যেমন— দূর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গের একটি শিল্পনগরী। এছাড়া হলদিয়াকেও একটি শিল্পনগরী বলা যেতে পারে। শিল্পকেন্দ্রের জন্য বসতির ঘনত্ব বেশি হয়।

**(চ) সরকারি ও বেসরকারি নীতি ঃ** কোনও দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ, সরকারি ও বেসরকারি নীতির সাফল্য ইত্যাদি কারণগুলোও জনসংখ্যার বিন্যাসে সাহায্য করে। যেমন 1947-এ ভারত ভাগ ও পাকিস্তান নামে নতুন একটি দেশ তৈরি হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে যান। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে জনবণ্টনের সামগ্রিক চিত্রটি দ্রুত বদলে যায়। একইভাবে 1948 সালে ইজরায়েল সৃষ্টি হওয়ার পরে পশ্চিম এশিয়ার জনবণ্টনে তারতম্য ঘটে। আবার সাম্প্রতিককালে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ, আলজেরিয়া এবং বসনিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতা, কিংবা ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধ (2003) ইত্যাদির প্রভাবেও আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন ঘটেছে। ফলে জনসংখ্যার বণ্টন ব্যবস্থা বদলে গেছে।

**(ছ) যোগাযোগ ঃ** কোন জায়গার জনবসতির ঘনত্ব, বাসস্থান ও তার প্রধান যোগাযোগের মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হলে অতি উর্বর মৃত্তিকাতেও তেমন একটা জনবসতি গড়ে ওঠে না। সাধারণত দেখা গেছে যে, বিভিন্ন মহাদেশগুলোর মধ্যভাগ অপেক্ষা প্রান্তভাগে জনবসতি ঘন। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর এলাকায় জনবসতি বিকাশের সুযোগ কম থাকে। বিপরীতভাবে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ এলাকায় বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিব্রাজন ঘটে।

**(জ) প্রযুক্তিবিদ্যা ঃ** বর্তমান দিনে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের উন্নতি, জনসংখ্যা বণ্টনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। Clarke বলেছেন যে দ্রুত নগরায়নের ফলে জনসংখ্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব কমছে। বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রশক্তি, আধুনিক কৃষি, শিল্পায়ন প্রভৃতির ফলে ইউরোপে জনবসতির ঘনত্ব বাড়ে।

**(ঝ) সভ্যতার ধারা ঃ** Majid Hussain (**Human Geography) -** র মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনঘনত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সভ্যতার প্রাচীনত্ব। সাধারণভাবে, যে স্থান যত পুরানো, সেখানে ততদিন ধরে কৃষকরা চাষবাস করে আসছেন। ফলে সেখানে আরও মানুষের সমাগম ঘটে ও জনঘনত্ব বাড়তে থাকে। সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি কিংবা পূর্ব চীন সমভূমির তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি সমভূমি, কিংবা আর্জেন্টিনার পাম্পাস নিতান্তই হাল আমলের বসতি। তাই সেখানে তুলনামূলকভাবে জনঘনত্ব কম।

**(ঞ) জনমিতি উপাদান ঃ (Demographic Elements)** প্রজনন হার, মৃত্যুহার ও পরিযানের কারণে জনসংখ্যা ও জনঘনত্বের বণ্টনে অঞ্চলগত হেরফের দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যখন স্থায়ী রাজনৈতিক সীমারেখা দিয়ে ভাগ হলো, তখন অধিকাংশ দেশই পরিযান নিয়ন্ত্রণে নিজেরাই আইন প্রণয়ন করল। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক প্রজনন-হারকে নিয়ন্ত্রণে রাখল। কিন্তু এর বিপরীতে জনবহুল পুরোনো পৃথিবী আরও জনাকীর্ণ হয়ে পড়ল।

**(ট) জাতীয় সীমানার বিধিনিষেধ ঃ** প্রতিটি দেশের নিজস্ব আন্তর্জাতিক সীমানা থাকে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ঐ সীমানা লঙ্ঘন করা যায় না। এই বিধিনিষেধের দরুন, অত্যধিক জনসংখ্যার দেশ থেকে মানুষ অল্প সংখ্যক জনতার দেশে গিয়ে বসবাস করতে পারেন না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশের জনঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে বেশি, অথচ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের জনঘনত্ব খুব কম। আন্তর্জাতিক আইন যদি না থাকত, তবে বাংলাদেশীরা ঐ সব দেশে গিয়ে বাস করতেন। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিধিনিষেধ ''helps to explain the existing distributional pattern of world population'' (Majid Hussian, Human Geography).

এইসব কারণগুলো ছাড়াও কতগুলো প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় অস্থায়ীভাবে জনসংখ্যার মানচিত্রকে পরিবর্তিত করে। Zelirsky-র মতে ভূমিক্ষয়, ধ্বস, অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, হিমবাহের প্রসারণ, ঝড়, মহামারী, আগুন, খরা ইত্যাদি হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কোনো জাতিকে নির্মূলকরণ (হিটলার কর্তৃক ইহুদীদের) বা বিরাট সংখ্যক জনতার জন্মভূমিতে ফিরে আসা— এসব হলো সামাজিক বিপর্যয়।

সবশেষে বলতে পারি যে এই সব উপাদানের মিলিত প্রভাবে জনবসতির বণ্টনে তারতম্য ঘটে থাকে। তবে অনেক সময় একটি বিশেষ উপাদানকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যে খনিজ তেলের কিংবা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে শুধুমাত্র সোনাকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে উঠেছে।

### 2.6.3 পৃথিবীর জনসংখ্যার বণ্টন (World Population Distribution)

2001 সালের মাঝামাঝি পৃথিবীতে জনসংখ্যা ছিল 6,173 মিলিয়ন। এর মাত্র শতাংশ উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান C.I.S. অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মত উন্নত দেশগুলোতে বাস করেন। বাকি 79 শতাংশ আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা, এশিয়ার মত অনুন্নত দেশগুলোতে বাস করেন (চিত্র 7.2)। মহাদেশগুলোর মধ্যে এশিয়া-ই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ (চিত্র 7.3)। এখানে পৃথিবীর 60 ভাগের বেশি (মোট জনসংখ্যা 3,720 মিলিয়ন) লোক বাস করেন। এর পরের স্থান হলো যথাক্রমে আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া। মজার ব্যাপার হলো এই যে অনুন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এইসব দেশগুলো জনমিতিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপে থাকায় এখানে জনবিস্ফোরণ লক্ষ্য করা যায়। 1950 সালে পৃথিবীর 70 শতাংশ জনতা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাস করতেন। কিন্তু, 1996 সালে তা বেড়ে 80 শতাংশে দাঁড়াল। পক্ষান্তরে উন্নত দেশগুলো জনমিতি পরিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছনোর ধরুন সেখানে জনবৃদ্ধি খুব কম হচ্ছে। তাই, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই সব দেশগুলোর অবদান কমে যাচ্ছে। 1950 সালে পৃথিবীর জনসংখ্যার 30 শতাংশ লোক এসব দেশে বাস করতেন। কিন্তু 1996 সালে তা কমে 20 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

2001 সালে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশে অর্থাৎ চীনে লোকসংখ্যা ছিল 1,273 মিলিয়ন, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার তুলনায় সামান্য কিছু কম ছিল। এর পরের স্থান হল ভারতের (1,033 মিলিয়ন)।

তারপর রয়েছে (2001 সাল) যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র (285), ইন্দোনেশিয়া (206), ব্রাজিল (172), পাকিস্তান (145), রাশিয়া (144) ও জাপান (119)। বলা যেতে পারে এই সাতটি পৃথিবীর প্রধান জনবহুল দেশ। পৃথিবীর বেশির ভাগ জনবহুল দেশগুলো এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। এমনকি, জনঘনত্বের দিক দিয়ে এশিয়া ইউরোপকে ছাড়িয়ে গেছে। 1970-71 সালে ইউরোপের জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিমিতে 94 জন। আর 1984 সালে তা হল 99। ঐ সময়ের মধ্যে এশিয়ার জনঘনত্ব 75 থেকে 101-এ পৌঁছেছে। প্রতি বর্গকিমিতে এই অতিরিক্ত জনঘনত্ব এশিয়া মহাদেশের পক্ষে সত্যি এক বোঝা, বিশেষ করে যখন এখানের সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি খুবই মন্থর। সারণি 7.1 থেকে দেখা যাচ্ছে যে অনুন্নত দেশগুলোতে 1970 থেকে 1984 সালের মধ্যে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 34 থেকে 48-এ পৌঁছেছে। কিন্তু একই সময়ে উন্নত দেশগুলোতে এই ঘনত্ব বেড়েছে মাত্র 1 জন, 18 থেকে 19। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিয়া এই ঘনত্ব লাফিয়ে বাড়ছে।

স্থানিক বণ্টনের অসমতা পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টনের আর একটি বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর জনসংখ্যার 90 শতাংশের বেশি লোক উত্তর গোলার্ধে বাস করেন। উত্তর গোলার্ধে আবার অক্ষাংশ ভেদে জনঘনত্বের হেরফের লক্ষ্য করা যায়। যেমন বলা চলে $0^0$ থেকে $20^0$ উত্তর অক্ষাংশে 10% লোক বাস করেন। Trewartha (1969) অনুমান করেছেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক তার মোট আয়তনের 5 শতাংশের কম স্থানে, আর বাকি অর্ধেক 50 থেকে 60 শতাংশ স্থানে বাস করেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে প্রতিটি মহাদেশের

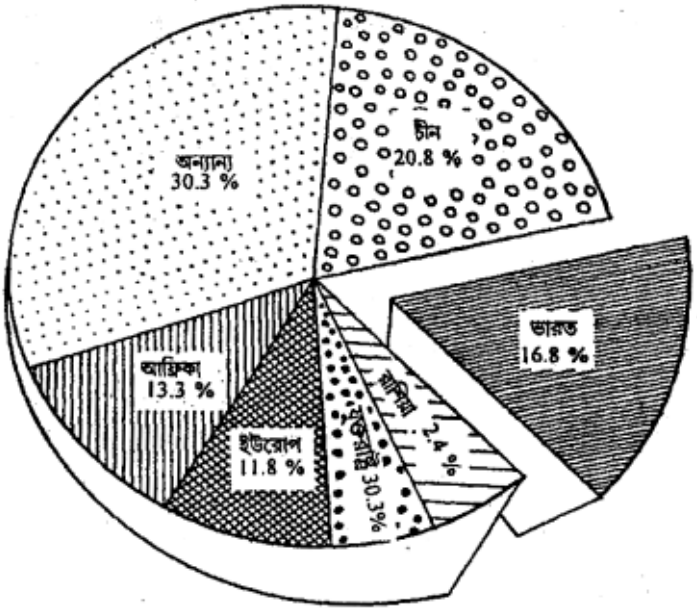


চিত্র 7.2 : পৃথিবীর জনসংখ্যার বণ্টন (%) 2001 সাল

প্রান্তভাগে জনঘনত্ব বেশি। সেই তুলনায় মহাদেশগুলোর মধ্যভাগ বলতে গেলে জনবিরল। Clarke (1965) বলেছেন যে বিশ্বের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ লোক সমুদ্র থেকে 2,000 কিমির মধ্যে বাস করেন, আর দুই-তৃতীয়াংশ 500 কিমির মধ্যে বাস করেন। জনবসতি ঘনত্বের এই তারতম্য জলবায়ু ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দরুন ঘটে থাকে। Trewartha-র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে স্থানিক উচ্চতাভিত্তির (spatial height) জনসংখ্যার গড় বণ্টনে দক্ষিণ আমেরিকার (644 মিটার) স্থান সবার আগে, আর অস্ট্রেলিয়ার স্থান সবার শেষে (95 মিটার)।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে পৃথিবীর জনসংখ্যার 80 শতাংশ লোক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 500 মিটার উচ্চতার মধ্যে বাস করেন।

লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হলো এই যে বেশি ও কম বসতি উভয়ই সনাতন ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রণী সমাজ, নতুন ও পুরানো পৃথিবীতে, ক্রান্তীয় ও মধ্য অক্ষাংশের অঞ্চলসমূহে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের জাভা সনাতন সমাজের, মধ্য অক্ষাংশের বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড পশ্চিমী সংস্কৃতির ও নদীকেন্দ্রিক শুষ্ক পরিবেশ গড়ে ওঠা মিশর দেশ। মোটামুটিভাবে বলা হয় ঘনবসতি মূলত পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব সীমিত। এইসব অঞ্চলের কোন কোন স্থানে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 1,000 থেকে 2,500 জন পর্যন্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে, ইউরোপ ও অ্যাংলো-আমেরিকায় জনঘনত্ব, নগর ও শিল্পোন্নয়নের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। এশিয়ার জনবসতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। তাই এখানে পৌর জনঘনত্ব খুব কমই দেখা যায়।

সাধারণভাবে, পৃথিবীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ **স্থায়ী বসতি অঞ্চল (Ecumene)** এবং **জনহীন অঞ্চল (Non-ecumene)**। যা হোক, এই দুই ধরনের জনবসতির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। এটা অনুমান করা হয় যে পৃথিবীর মোট ভূ-ভাগের এক তৃতীয়াংশ শীতলতা বা শুষ্কতার দরুন অনুর্বর। তাই সে সব অঞ্চল জনবিরল। মহাদেশগুলোর প্রায় 60 শতাংশ ভূমিভাগকে স্থায়ী বসতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সব স্থায়ী বসতিগুলোর জনঘনত্ব সমান নয়। এর মূলে রয়েছে সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণসমূহ। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ চারটি প্রধান বলয়ে সীমাবদ্ধ, যার মধ্যে দু'টি রয়েছে এশিয়ায়, একটি ইউরোপ ও অপরটি উত্তর আমেরিকায়। প্রধান বলয়টিতে (মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ) রয়েছে চীন ও জাপান। দ্বিতীয় বলয়টি দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়ে গঠিত। এখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের বাস। ইউরোপীয় বলয়টির মধ্যে রাশিয়ার জনসংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার বলয়ের মতই। এখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ বাস করেন। উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশের জনসংখ্যা বলয়টি সবচেয়ে ছোট। এখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় 5 শতাংশ লোক বাস করেন (চিত্র 7.2)।

**এই চারটি প্রধান বলয়কে আবার জনসংখ্যার ঘনত্বের দিকে দুটি শ্রেণির ভাগ করা যায়।** এশিয়ার দুটি বলয়কে একটি শ্রেণিতে এবং ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার বলয়টিকে অপর শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এশিয়ার বলয়গুলির বৈশিষ্ট্য হলো যে এগুলো প্রাক্-আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান। এখানকার গরীব চাষী নিবিড় পদ্ধতিতে চাষবাস করেন। এখানে জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ রয়েছে। সবশেষে বলা যায় যে কৃষিযোগ্য জমি জনসংখ্যা ঘনত্বের প্রধান নিয়ন্ত্রক।

পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা এই দুই বলয়ে বাস করেন। এই বলয় দু'টো ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে এরা খুবই উন্নত।

শীতল, শুষ্ক ও আর্দ্র উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল মানুষের বসবাসের অযোগ্য স্থান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। উচ্চ অক্ষাংশের শীতল স্থানগুলো বসবাসের অযোগ্য। কুমেরু ও গ্রীনল্যান্ড, উত্তর আমেরিকা, ও ইউরেশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে জলবায়ুর প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। জলবায়ুর জন্য স্বল্পসংখ্যক লোকবসতি দেখা গেলেও অদূর ভবিষ্যতে এখানে জনসংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

শুষ্ক অঞ্চলের প্রধান সমস্যা হল জল। সেজন্য এই সব অঞ্চলে মুষ্টিমেয় কিছু পশুপালক যাযাবর অস্থায়ীভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করেন। মরু অঞ্চলের মধ্যে মরূদ্যানে ঘনবসতি লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করা গেছে যে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মরুভূমিতে জনবসতির বিস্তার ঘটেছে এবং এই ব্যবস্থার দ্বারাই অদূর ভবিষ্যতে কার্যকরী জনবসতি গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে রাশিয়ায়।

Pokshishevski-র মতে মানুষ তার কারিগরী বিদ্যার উন্নতি ঘটিয়ে জলের পুনর্বণ্টন ও জলধারণ নিয়ন্ত্রণ করে

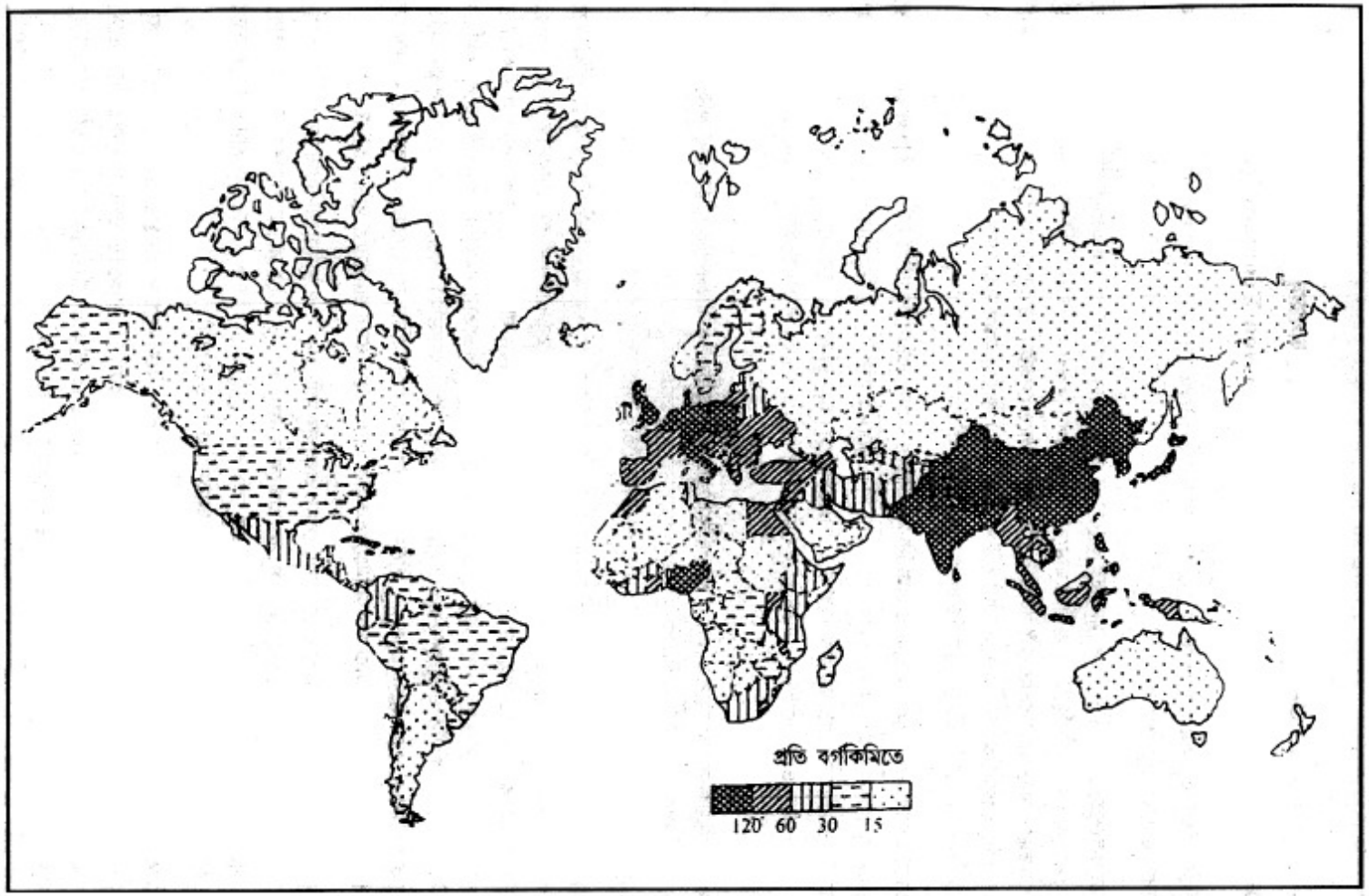


চিত্র 7.3 : পৃথিবীর জনসংখ্যার বণ্টন

চলেছে। একটা সময় হয়তো আসবে যখন আমরা বর্তমান দিনের মরুভূমি ও ক্রান্তীয় বনভূমি অঞ্চলগুলোকে আগামী দিনের পৃথিবীর প্রধান শস্যভাণ্ডার হিসেবে দেখতে পাব (Quoted from Chandna, 1972)।

আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চল পূর্বোক্ত জনবিরল অঞ্চলগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পরিবেশের হেরফেরের দরুন ক্রান্তীয় অঞ্চলের কোন কোন স্থান জনহীন, আবার কোন স্থান ঘনবসতিপূর্ণ। ভবিষ্যতে এই আর্দ্র ক্রান্তীয় ভূমি ব্যবহারের দ্বারা আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের 20 শতাংশ জমি চাষযোগ্য করা যাবে ও ভবিষ্যতে তা জনবসতি বিস্তারে সাহায্য করবে।

## বিশেষ আলোচনা

### জনহীন অঞ্চলে বসতি বিস্তারের পথে বাধাসমূহ

### (Hindrances for Expansion of Settlement in Non-Ecumene Regions)

পৃথিবীর কিছু কিছু স্থান রয়ে গেছে যেখানে জনবসতি নেই বললেই হয়। এখন দেখা যাক কি কি কারণে পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চল জনহীন রয়ে গেছে।

**অত্যধিক শৈত্য ঃ** অত্যধিক শৈত্য মানুষের বসবাসের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। মেরু অঞ্চলে শীত এত তীব্র হয় যে মানুষের চেতনা লোপ পায়। দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড শীত মানুষের স্নায়ুর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দক্ষিণ মেরুতে কিছু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কেন্দ্র ছাড়া বসতি নেই বললেই চলে। প্রাণী বলতে পেঙ্গুইন। উত্তর মেরু তুন্দ্রাতে এস্কিমোদের দেখা মেলে। তৈগা (সরলবর্গীয় অরণ্য) অঞ্চলে 'লগ হাউস' দেখা যায়। শীতের সময় কাঠ বরফ চাপা পড়ে যায়। এখানে ফসল ফলানো কষ্টকর। স্বভাবতই লোকবসতি এখানে খুব অল্প।

**উচ্চতা ঃ** পার্বত্য অঞ্চলে সমভূমি ও এমনকি মৃদু ঢালেও জমির অভাব, অগভীর মাটি ও শীতল আবহাওয়ার জন্য চাষবাস বাধা পায়। এজন্য এখানে বসতি গড়ে ওঠে না। 4000 মিটারের বেশি উচ্চতায় হালকা বায়ুমণ্ডলের জন্য মানুষের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় আর কাজকর্ম করতে অবসন্নতা আসে। মালভূমির যে সব জায়গায় চাষবাস সম্ভব হয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সেখানেই জনবসতি দেখা যায়। পার্বত্য এলাকার নদী উপত্যকাতে সামান্য জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়।

**উষ্ণতা ঃ** নিরক্ষীয় জলবায়ু আমাজন, অববাহিকা, জাইর অববাহিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশবিশেষে সারা বছর উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বেশি থাকে। এই ধরনের জলবায়ু অধিবাসীদের দুর্বল করে দেয়। এরূপ জলবায়ুতে নানা রকম রোগ হয়। এখানকার নদী উপত্যকা ও ইদানীংকালে তৈরি করা পথের ধারে কিছু কিছু জনবসতি দেখা যায়।

**খরা ঃ** ক্রান্তীয় মরুভূমিগুলোতে উষ্ণতা খুব বেশি। অত্যধিক উষ্ণতা বিশেষ করে দীর্ঘকালীন রুক্ষতা, বৃষ্টিহীনতা ও বছরের পর বছর খরা মরুভূমিতে জনবসতির প্রধান অন্তরায়। এখানকার মরূদ্যানগুলোতে জনবসতি গড়ে উঠেছে। অন্যত্র যাযাবররা বাস করেন। পশুপালন তাদের উপজীবিকা। যেখানে যেখানে ঘাস জন্মায়, সে সব অঞ্চলে ঐ যাযাবর গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের পশুর দল নিয়ে ঘুরে বেড়ান। ঘাস ও গুল্মাদির লভ্যতার সময়সীমা অনুযায়ী এদের বসতির সময়সীমা নির্ধারিত হয়। মাঝারি অক্ষাংশের মরুভূমিগুলোতে (যথা— গোবি মরুভূমি) শৈত্য ও জলের অভাব জনবসতি বিস্তারের পক্ষে বাধাস্বরূপ। কোন কোন মরুভূমির খনিজ সম্পদের আকর্ষণে ও খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের ব্যাপারে মরুভূমিতে জনবসতি গড়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু খনিজ সম্পদ নিঃশেষ হবার সাথে সাথে ঐসব জনবসতি স্থায়িত্ব হারায়।

**অনুর্বর মাটি ঃ** অনুকূল জলবায়ু থাকা সত্ত্বেও যেসব অঞ্চলের মাটি অনুর্বর ও স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় না সে সব অঞ্চলের জনবসতি গড়ে ওঠে না। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের কোন কোন স্থানের মাটিতে এত বেশি গন্ধক

(Sulphur) থাকে যে সব এলাকায় চাষ করা সম্ভব নয়। এইসব অঞ্চলে কৃষিকাজ যেমন সম্ভব নয় তেমনি জনবসতিও গড়ে ওঠেনি।

**দুর্গমতা** (Inaccessibility) ঃ জনবসতির ঘনত্ব পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা ও আধুনিক যোগাযোগ সমৃদ্ধ কোন অঞ্চলে অন্যান্য অসুবিধে থাকলেও ভাল জনবসতি গড়ে ওঠে। বাজারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে হেতু যেমন কোন অতি উর্বর জমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করা হয় না, তেমনি অনুরূপ অবস্থানের ওপর উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলে তেমন জনবসতি গড়ে ওঠে না।

পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে এবার আমরা মহাদেশভিত্তিক জনঘনত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

## 2.7 মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যা ও ঘনত্ব (Distribution and Density of Population : Continentwise)

### 2.7.1 এশিয়া (Asia)

এশিয়ার জনঘনত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 60 শতাংশের বেশি লোক এখানে বাস করেন। পৃথিবীর জনঘনত্ব যেখানে প্রতি বর্গমাইল 102 জন, এশিয়ায় সেখানে 2,495 জন। তবে এখানকার জনব
17,3
(চিত্র
বসতি
নিয়ে

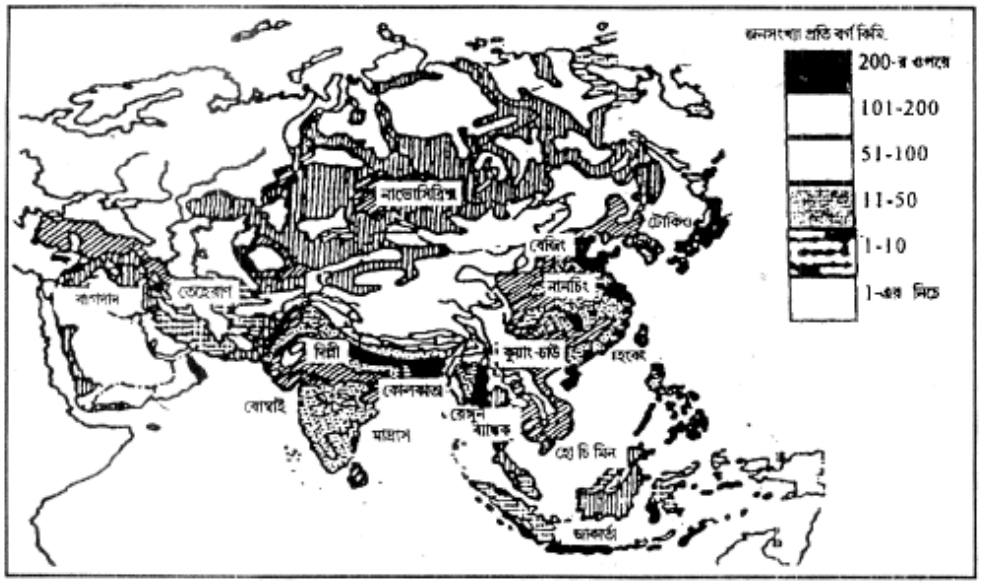


চিত্র 7.4 : এশিয়ার জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

## দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া (South-West Asia)

এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে ইরান, ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া, ইয়েমেনে, সৌদি আরব, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ইত্যাদি দেশ। এখানকার জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 106 জন। প্রধানত বালিয়াড়ি, লবণাক্ত হ্রদ, লাভা গঠিত অঞ্চল, ক্ষয়জাত পর্বত ও উদ্ভিদের অভাব এখানকার বিরাট এলাকাকে জনহীন করে রেখেছে।

অন্যদিকে, তুরস্ক উপকূলের সেচপ্রধান বদ্বীপ বা পার্বত্য নদীর জলে পুষ্ট মরূদ্যানে প্রতি বর্গমাইলে কয়েকশ লোক বাস করেন। কিছু কিছু কৃষি এলাকায় প্রতি বর্গমাইলে প্রায় 221 জন লোক বাস করেন (Cressey, 1963)।

**দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল)**

| দেশ | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) | জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) |
|---|---|---|
| বাহরিন | 0.7 | 2.688 |
| সাইপ্রাস | 0.9 | 247 |
| জর্জিয়া | 5.5 | 203 |
| ইরাক | 23.6 | 139 |
| ইস্রায়েল | 6.4 | 791 |
| জর্ডন | 5.2 | 150 |
| কুয়েত | 2.3 | 297 |
| লেবানন | 4.3 | 1,061 |
| ওমান | 3.4 | 29 |
| প্যালেস্টাইন | 3.3 | 1,365 |
| কোয়াতার | 0.6 | 139 |
| সৌদি আরব | 21.1 | 25 |
| সিরিয়া | 17.1 | 231 |
| ইউ.এ.ই. | 3.3 | 103 |
| ইয়েমেন | 18.0 | 88 |
| তুরস্ক | 66.3 | 221 |

দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার তিনটি উপকূল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ঃ (i) পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চল, (ii) কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল (iii) কাস্পিয়ান সাগরের লাগোয়া এলবুর্জ (Elburz) পর্বতের পাদদেশ অঞ্চল। এখানকার গ্রামীণ জনঘনত্ব মোটামুটিভাবে ভাল। আবার বর্ষার জলে পুষ্ট উর্বর কৃষি এলাকাগুলোর

মধ্যে রয়েছে ইয়েমেনের উচ্চাঞ্চল বা তুরস্কের আর্দ্র ভূ-ভাগ।

দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় জলসেচের সুবিধের ওপর নির্ভর করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি প্রধান নদীর নিম্ন গতিপথে আর পর্বতের পাদদেশে পলিসঞ্চিত ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডে লাইনবন্দী বসতির দেখা মেলে। আরবে যেখানে ঝর্ণা বা অন্য কোন জলের উৎসের দেখা পাওয়া যায়, সেখানেই বসতির দেখা মেলে। ইরান বা আফগানিস্তানের অধিকাংশ গ্রাম-ই বরফে ঢাকা পর্বতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এখানে বসতি গড়ে ওঠার পেছনে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া পর্বতের ঢালু অংশ জনহীন।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় খনিজ তেল বা খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে বসতি স্থায়ী রূপ পেয়েছে। মহাদেশের অন্যান্য শহরের মতো এখানকার শহরগুলোতেও দারুণভাবে জনসংখ্যা গেড়েছে, বিশেষ করে খনিজ তেলকে কেন্দ্র করে। পাঁচ লাখ লোকসংখ্যার বেশি শহরগুলো হলো কনস্টান্টিনোপল (ইস্তানবুল), আঙ্কারা, বেইরুট, দামাস্কাস, বাগদাদ ও তেহরান। 1 লাখ থেকে 5 লাখের মধ্যে কুড়িটির বেশি শহর। লেবানন-ই একমাত্র সমুদ্রের ধারে গড়ে ওঠা রাজধানী শহর। জেরুজালেম ও মক্কা ধর্মীয় শহর। ইরান ও তুরস্কে 50,000-র বেশি লোকসংখ্যার বেশ কয়েকটি বড় শহর রয়েছে।

দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার মোট জনসংখ্যার 65 ভাগ লোক চাষবাস করেন, 8 ভাগ যাযাবর, 12 ভাগ শহরবাসী, 1 ভাগ আশ্রয়হীন প্যালেস্টাইনীয়, বাকি 14 ভাগ গ্রামবাসী।

## দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া (South-East Asia)

থাইল্যান্ড, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, ফিলিপাইনস, কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশ নিয়ে হল এই অঞ্চল। এখানেও জনসংখ্যা অসমানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কয়েকটি পলিগঠিত সমভূমিতে বেশ ঘনবসতি রয়েছে। এর বিপরীতে উঁচু পার্বত্য এলাকায় লোকবসতি নেই বললেই চলে। এখানকার গড় জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 299। উত্তর ভিয়েতনামের হং (লাল) নদীর (Red River) বদ্বীপ, দক্ষিণ ভিয়েতনামের মেকং নিম্নভূমি, থাইল্যান্ডের মেনাম ও মায়ানমারের (ব্রহ্মদেশের) ইরাবতী বদ্বীপ ঘনবসতি এলাকা। দক্ষিণ সেলেবিস, সুমাত্রা উপকূলের কিছু অংশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কিছু কিছু স্থানেও ঘন বসতি চোখে পড়ে, যেমন জাভা ও বালি। এখানকার গড় ঘনত্ব হল প্রতি বর্গমাইলে 200 জন, কোথাও আবার 2,800 জন। কৃষিজমির উর্বরতার হেরফের জন বণ্টনে পার্থক্য ঘটিয়েছে। এখানকার 88 শতাংশ লোক হলেন কৃষিজীবী ও 12 শতাংশ শহরবাসী (Cressey, 1963)।

**জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব, 2001 সাল ঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া**

| দেশ | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) | জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) |
|---|---|---|
| ব্রুণী | 0.3 | 156 |
| কাম্বোডিয়া | 13.1 | 187 |
| ইস্ট তাইমোর | 0.8 | 134 |
| ইন্দোনেশিয়া | 206.1 | 280 |
| ল্যাওস | 5.4 | 59 |
| মালয়েশিয়া | 22.7 | 178 |
| মায়ানমার | 47.8 | 183 |

| | | |
|---|---|---|
| ফিলিপাইনস্ | 77.2 | 666 |
| সিঙ্গাপুর | 4.1 | 17,320 |
| থাইল্যান্ড | 62.4 | 315 |
| ভিয়েতনাম | 78.7 | 623 |

অঞ্চলটির সবকটি মহানগরই বলতে গেলে সমুদ্রবন্দর। ব্যাংকক ছাড়া সব মহানগরগুলোতে বিদেশী ছাপ দেখা যায়। এই সমস্ত নগরগুলোর জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হলেন চীনাভাষী।

## দক্ষিণ এশিয়া (South Asia)

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিয়ে হল এই অংশ। এখানে 1,313 মিলিয়নেরও বেশি লোক বাস করেন। মোট জমির আয়তন ধরলে গড় জনঘনত্ব দাঁড়ায় প্রতি বর্গমাইলে 362 জন। আর কৃষিজমির হিসেবে ধরলে এই ঘনত্ব (গ্রাম) কোথাও 330, আবার কোথাও 4,000। এখানকার অর্ধেক লোক উত্তরের সমভূমিতে বাস করেন, যা আয়তনে দক্ষিণ এশিয়ার 20 শতাংশ স্থান জুড়ে আছে। Clark (1971) *Population Geography and the Developing Countries*-এ লিখেছেন, ''Overall population distributions in South Asia are High.''.... তিনি আরও লিখেছেন যে, ''In South Asia Population distribution is nearly as irregular as in South-West Asia or South-East Asia or East Asia.''.... কারণ অঞ্চলটি কৃষিপ্রধান। তাছাড়া বহুকাল ধরে খালের সাহায্যে জলসেচের ফলে প্রচুর ফসল ফলে। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির প্রধান ফসল হল ধান। এছাড়া উপকূলে প্রচুর ধান জন্মায়। সিন্ধু অববাহিকায় অবস্থিত মরুভূমি ও নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিতে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলে লোকসংখ্যা খুব কম। সিন্ধুর নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলের মাটি উৎকৃষ্ট হলেও এখানকার জলবায়ু খুব শুকনো। অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় জলসেচ করা হয়। যেমন রাজস্থানের মরুভূমিতে জলসেচ করে তা চাষযোগ্য করে তোলা হয়েছে। মরুভূমির অন্যান্য স্থানে খনিজ পদার্থ বা জলের উৎসকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে।

**জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) ঃ দক্ষিণ এশিয়া (2001 সাল)**

| দেশ | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) | জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) |
|---|---|---|
| আফগানিস্তান | 26.8 | 106 |
| বাংলাদেশ | 133.5 | 2.401 |
| ভূটান | 0.9 | 50 |
| ভারত | 1,033.0 | 814 |
| ইরান | 66.1 | 108 |
| মালদ্বীপ | 0.3 | 2,495 |
| নেপাল | 23.5 | 413 |

| | | |
|---|---|---|
| পাকিস্তান | 145.0 | 472 |
| শ্রীলঙ্কা | 19.5 | 771 |

এখানকার হিমালয় পর্বতমালার অনেক স্থানই বসতি বিস্তারের পক্ষে প্রতিকূল। খনিজ সম্পদ বা বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে কয়েকটি ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে। তবে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে অনেক শৈলবাস গড়ে উঠেছে, যেমন দার্জিলিং, কালিম্পং, উটি, নৈনিতাল ইত্যাদি।

## পূর্ব এশিয়া (East Asia)

এর মধ্যে আছে জাপান, চীন ও অন্যান্য দেশ। পূর্ব এশিয়ার গড় ঘনত্ব হল প্রতি বর্গমাইলে 331 জন। জাপানের জনবণ্টন ভূ-প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। যেখানেই সমতল জায়গা ও উর্বর মাটি পাওয়া যায়, সেখানেই জনবসতি গড়ে উঠেছে, তা সে পর্বতময় হোক বা সমতলভূমি হোক। পর্বত সবখানেই বসতি বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এক গ্রাম থেকে অপর গ্রাম বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। সেজন্য অধিকাংশ জাপানীরাই সমুদ্রো-পকূলে বসবাস করতে চান। জাপানে 400-রও বেশি স্থান আছে, যা জাপানের মোট আয়তনের এক শতাংশ জায়গা জুড়ে থাকলেও সেখানে প্রতি বর্গমাইলে 10,000-এর বেশি লোক বাস করেন। এর বিপরীতে (শহরাঞ্চল বাদে) রয়েছে এখানকার এক-চতুর্থাংশ এলাকা, যার জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 4 জন। এর কারণ হল এখানকার খাড়া ঢালু ভূমিভাগ। জাপানে 4টি মহানগর (Metropolis) রয়েছে ঃ টোকিও, ইয়াকোহামা, ওসাকা-কোবে ও কিয়েটো।

**জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ঃ পূর্ব এশিয়া (2001 সাল)**

| দেশ | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) | জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) |
|---|---|---|
| চীন | 1273.3 | 344 |
| হংকং | 6.9 | 16.743 |
| ম্যাকাও | 0.4 | 56,721 |
| জাপান | 127.1 | 872 |
| উত্তর কোরিয়া | 22.0 | 472 |
| দক্ষিণ কোরিয়া | 48.8 | 1,274 |
| মঙ্গোলিয়া | 2.4 | 4 |
| তাইওয়ান | 22.5 | 1,608 |

এবার চীনের কথায় আসা যাক। এখানকার অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করেন, কারণ চাষবাসই এখানকার প্রধান জীবিকা। দেশটি আয়তনে বড় 3,696,100 বর্গমাইল, আবার এখানকার জনসংখ্যাও প্রচুর (1,273.3 মিলিয়ন) জনসংখ্যার দিক দিয়ে চীন পৃথিবীতে প্রথম স্থানাধিকারী হলেও দেশের কম অংশই বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত। চীনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে পর্বত। ক্ষয়ের দরুন এই পার্বত্য এলাকার বহু স্থান চাষবাসের অনুপযুক্ত। চীনের কিছু অংশ আবার সমভূমি।

উত্তর চীন সমভূমি ও বদ্বীপ, দক্ষিণের সোয়েল সমভূমি ও সিকিয়াং অববাহিকার সমভূমি চাষের পক্ষে খুবই

অনুকূল বলে চীনের প্রায় 85 শতাংশ লোক এখানে বাস করেন। ফলে এইসব স্থানে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। উত্তরের সমভূমির ইয়াংসি অববাহিকা, বদ্বীপ এবং আরও কয়েকটি অনুকূল স্থানে জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 800 থেকে 1000 জন। এর ঠিক বিপরীত চিত্রে রয়েছে মঙ্গোলিয়া (জনঘনত্ব 4 জন)। তিব্বত পর্বতঘেরা মালভূমি। সেখানকার ভূপ্রকৃতি বন্ধুর ও জলবায়ু শুষ্ক। তিব্বতে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ কম। জনবলহীন ও সামরিক শক্তিহীন দেশটিকে চীন তার নিজের অধিকারে রেখেছে। কম লোকসংখ্যার দরুন মঙ্গোলিয়াকে চীন আর্থিক দিক থেকে শোষণ করে।

কোরিয়া হল ভৌগোলিক বৈপরীত্যের দেশ। উত্তর কোরিয়ার এলাকা বেশি, লোকসংখ্যা কম। এটি আবার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার এলাকা কম, কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি। দেশটি কৃষিসমৃদ্ধ। এখানকার বেশিরভাগ লোক নদী উপত্যকা ও উপকূলের সমভূমিতে বাস করেন। যদিও চাষযোগ্য নিচু জমি খুব কম (মোট এলাকার মাত্র 10 ভাগ) তবুও নদী অববাহিকা—বিশেষ করে টেডঙ (Teadong) ও ছোট ছোট উপত্যকা— থেকে প্রচুর ফসল পাওয়া যায়। এখানকার প্রায় 75 শতাংশ লোক কৃষিজীবি। কিন্তু যোগাযোগের দিক দিয়ে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে লোকজন বেশি বাস করেন। এশিয়ার সবচেয়ে উত্তরের দেশটি হল রাশিয়া (C.I.S.)। এখানকার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 22 জন। কিন্তু এই ঘনত্বেরও হেরফের আছে। কারণ দেশটি আয়তনে বড় বলে এখানে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু বিরাজ করে। সবচেয়ে উত্তরে রয়েছে তুন্দ্রা অঞ্চল। আমরা আগেই জেনেছি যে এখানকার বেশির ভাগ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও বছরের বেশিরভাগ সময় ভূমিভাগ বরফে ঢাকা থাকায় এখানে লোকজন প্রায় থাকেই না।

**রাশিয়ার জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ও জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) (2001 সাল)**

| দেশ | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) 2001 সাল | জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) |
|---|---|---|
| কাজাখস্তান | 14.8 | 14 |
| কিরখিজস্তান | 5.0 | 65 |
| তাজিকিস্তান | 6.2 | 112 |
| তুর্কমেনিস্তান | 5.5 | 29 |
| উজবেকিস্তান | 25.1 | 145 |
| আজারবাইজান | 8.1 | 243 |
| লাটভিয়া | 2.4 | 95 |
| লিথুনিয়া | 3.7 | 147 |
| এস্টোনিয়া | 1.4 | 78 |
| রাশিয়া | 144.5 | 22 |
| মলডোভিয়া | 4.3 | 328 |

| | | |
|---|---|---|
| ইউক্রেন | 49.1 | 211 |
| আর্মেনিয়া | 3.8 | 330 |

বেশির ভাগ বাসিন্দা শিকারের ওপর নির্ভরশীল। বেঁচে থাকার তাগিদে এখানকার বাসিন্দাদের সব সময়ই বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। স্বভাবতই, এই অঞ্চলের গড় জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 1 জনেরও কম। তুন্দ্রার দক্ষিণে রয়েছে অব-সুমেরু অঞ্চল বা সরলবর্গীয় বনভূমি অঞ্চল। প্রতিকূল জলবায়ু ও বড় বড় শহরের সঙ্গে যোগাযোগের অসুবিধের জন্য এই অঞ্চল মানুষের বসবাসের পক্ষে লোভনীয় নয়। এখানকার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 2 জন। এখানে ভারখয়নস্ক (Verkhoynask), ইরকুটস্ক (Irkutsk), নারিলস্ক, উদ ইত্যাদি শহর রয়েছে। বৈকাল হ্রদের পূর্বে ঘনত্ব বেশি থাকলেও কাস্পিয়ান সাগরের কাছে ঘনত্ব মাত্র 4 জন। শুষ্কপ্রধান এই অঞ্চলের মুখ্য উপজীবিকা হল পশুচারণ। এখানে কয়েকটি পুরানো শহর রয়েছে ঃ সমরখন্দ, তাসখন্দ, নেভোসিরিবস্ক, ওমস্ক, টমস্ক (Tomsk)। ব্লাডিভস্টক সামুদ্রিক বন্দর।

### 2.7.2 ইউরোপ (Europe)

জনসংখ্যার দিক থেকে ইউরোপের (727 মিলিয়ন, 2001) স্থান এশিয়া (3,720 মিলিয়ন) ও আফ্রিকার (818 মিলিয়ন) পরেই। ইউরোপের জনবন্টন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে এখানকার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি লোক একটা জায়গায় এসে জড়ো হয়েছেন (চিত্র 7. 5)। স্বভাবতই ঐ অঞ্চলের জনঘনত্ব বেশি। ইউরোপের জনবন্টন প্রধানত পরিবেশ ও ঐ মহাদেশের সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল।

এখানকার পরিবেশগত উপাদান হচ্ছে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মাটির উর্বরতা ও খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে কয়লার বন্টন। অন্যান্য এলাকার মত এখানকার বদ্বীপগুলোতে লোকবসতি ঘন। তবে চীন বা ভারতের মত অত ঘন নয়। বড় রকমের জনসমাবেশ শিল্পাঞ্চলে দেখা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল কয়েকটি শহরের উপকূলীয় অবস্থান চোখে পড়ার মত।

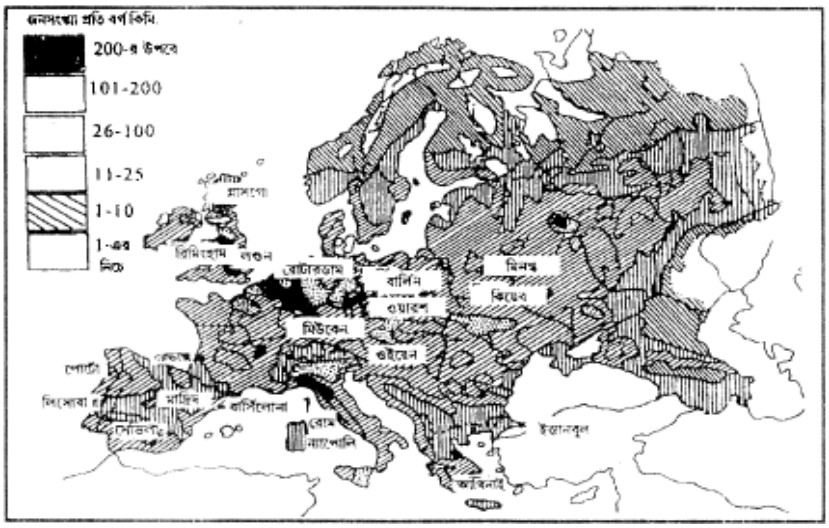


চিত্র 7.5 : ইউরোপের জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

ইউরোপের জনবসতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এখানকার প্রায় 80 শতাংশ অধিবাসী শহরের বাসিন্দা। বাকিরা হলেন কৃষিজীবি। রেলপথ ও সড়কপথ দিয়ে বসতিগুলো একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে।

ইউরোপের **ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগর** উপকূলের দেশগুলোতে জনঘনত্ব বেশি, কারণ এটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানেই ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়ামের মত বড় বড় দেশ রয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানীর কয়লাখনি এলাকায় জনঘনত্ব খুব বেশি। Taylor-এর মতে ইউরোপের জনঘনত্ব সোয়নসিয়া থেকে সাইলেসিয়া পর্যন্ত কয়লাখনি অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। বেলজিয়ামে কয়লাখনিগুলো দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে সরে যাবার ফলে জনবসতিও উত্তরদিকে সরে গিয়েছে। কেমপেনল্যান্ডে নতুন কয়লাখনি আবিষ্কারের ফলে সেখানে লোকসমাগম হয়েছে। এখানকার পতিত জমি পুনরুদ্ধার ও জলসেচের সম্প্রসারণের দরুন কিছু এলাকা বসতিযোগ্য হয়েছে। এইসব অঞ্চলের জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 500 জনের বেশি।

**উত্তর ইউরোপ ঃ জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ও জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)**

| দেশ | জনসংখ্যা | জনঘনত্ব |
|---|---|---|
| ডেনমার্ক | 5.4 | 322 |
| ফিনল্যাণ্ড | 5.2 | 40 |
| আইসল্যাণ্ড | 0.3 | 7 |
| আয়ারল্যাণ্ড | 3.8 | 142 |
| নরওয়ে | 4.5 | 36 |
| সুইডেন | 8.9 | 51 |
| যুক্তরাজ্য | 60.0 | 635 |

অন্য একটি ঘনবসতি অঞ্চল হল জার্মানীর **রাইন উপত্যকা**।Taylor-এর মতে রাইন ও পো (Po) উপত্যকার 180 মিটারের কম উচ্চতায় এবং বোহেমিয়া উচ্চভূমির প্রায় 400 মিটার পর্যন্ত ঢালু অংশে ইউরোপের সবচেয়ে বেশি জনঘনত্ব লক্ষ্য করা যায়। স্পেন ও বুলগেরিয়ায় 900 মিটারের ও বেশি উচ্চতায় অনেক বসতি দেখা যায়। পোল্যাণ্ডের অনেক জলাজমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। পোল্যাণ্ডের অনেক লোক কৃষিজীবি।

**পশ্চিম ইউরোপ ঃ জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল) (প্রতি বর্গমাইলে)**

| দেশ | জনসংখ্যা | জনঘনত্ব |
|---|---|---|
| অস্ট্রিয়া | 8.1 | 251 |
| বেলজিয়াম | 10.3 | 872 |
| ফ্রান্স | 59.2 | 278 |
| জার্মানী | 82.2 | 597 |

| | | |
|---|---|---|
| লিটেনস্টিন | 0.03 | 534 |
| লাক্রামবার্গ | 0.4 | 446 |
| মোনার্কো | 0.03 | 45,333 |
| নেদারল্যাণ্ডস্ | 16.0 | 1,018 |
| সুইজারল্যাণ্ড | 7.2 | 453 |

এই মহাদেশের **ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে** মধ্য ইউরোপের মতো অতো বেশি জনসমাবেশ দেখা যায় না। কারণ এটি প্রধানত পার্বত্য এলাকা। ফ্রান্সের সবচেয়ে জনবিরল এলাকা হল বেস (Basse) আল্পস্ (প্রতি বর্গমাইলে 50 জন), ও হাউটি (Hauti) আল্পস্ (60 জন)।

বলতে গেলে, গোটা **নরওয়েই** পার্বত্য এলাকা। এখানকার জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 36 জন। এই দেশটিতে চাষের জমি প্রায় 400 বর্গমাইলের মত। এগুলো আবার ফিয়র্ডের উৎস অঞ্চলে কিংবা পশ্চিম উপকূলের আশপাশে ছোট ছোট অংশ বা দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য উপত্যকায় দেখা যায়। এই সব অঞ্চলেই নরওয়ের বেশির ভাগ লোক বাস করেন। গ্রানাইট পাথর থেকে সৃষ্ট অনুর্বর মাটি, প্রচুর বৃষ্টিপাত, অসমতল জমি ও বহুলোকের দেশত্যাগের ফলে নরওয়ের জনসংখ্যা কমই রয়ে গেছে।

**ফিনল্যাণ্ডের** বেশিরভাগ জায়গাতেই বসতি খুব কম। দেশটি প্রধানত অরণ্যময় হওয়ায় এখানকার বেশিরভাগ অধিবাসীদের পেশা হলো কাষ্ঠাহরণ।

**গ্রেট ব্রিটেনের** শতকরা 80 ভাগ লোক শহরে বসবাস করেন। এখানকার বেশিরভাগ বসতি কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মধ্য ইংল্যাণ্ডে পেনাইন পর্বতের তিনদিকে কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে তিনটি ঘনবসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। যেমন পেনাইনের পশ্চিমে ল্যাঙ্কাশায়ারকে কেন্দ্র করে ম্যাঞ্চেস্টার ও লিভারপুল শহর, আর পেনাইনের পূর্বে ইয়র্কশায়ারকে কেন্দ্র করে লিডস্, বেডফোর্ড, শেফিল্ড গড়ে উঠেছে। উত্তর-পূর্ব ইংল্যাণ্ডে কয়লা ও লোহা আকরিকের সাহায্যে নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহোমে লোহা-ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠেছে। এইসব শিল্পের সমাবেশ এখানে একটি ঘনবসতি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যাণ্ডে টেমস্ নদীর তীরে ব্রিটেনের রাজধানী লণ্ডনকে কেন্দ্র করে দেশের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা গড়ে উঠেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এই শহরের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়েছে। এছাড়া ইংল্যাণ্ডের মধ্য সমভূমি অঞ্চলে বার্মিহাম, স্টোক ইত্যাদি শিল্প শহর রয়েছে। স্কটল্যাণ্ডের অনুর্বর পাহাড়ি এলাকা বলতে গেলে জনমানবহীন। এখানকার জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 12 জন। স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমদিকের (4 থেকে 40) চেয়ে পূর্বদিকে জনঘনত্ব (75 থেকে 150) অনেক বেশি। স্কটল্যাণ্ডের মধ্য উপত্যকায় গ্লাসগো ও এডিনবরার কয়লা ও লোহা আকরিকে কেন্দ্র করে একটি জনবসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। ওয়েলসের রাডনর (Radnor), মন্টগোমারীতে (Montogomery) জনঘনত্ব 50-এর কম, কারণ এগুলো পাহাড়ি এলাকা। দক্ষিণ ওয়েলসের কয়লাখনিকে আশ্রয় করে সোয়ানসীতে একটি ঘনবসতি এলাকা বিকাশ লাভ করেছে। দেশের মধ্যভাগ ছাড়া আয়ারল্যাণ্ডের ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 100 থেকে

500 জন।

লোকসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে সাবেকী রাশিয়ার স্থান আগে ছিল তৃতীয় (273 মিলিয়ন, 1984)। অবশ্য বিরাট দেশের তুলনায় এখানকার লোকসংখ্যা কমই। এখানকার ইউরোপীয় অংশে সমতল ভূমিভাগ, তুলনামূলকভাবে মৃদু জলবায়ু, প্রচুর খনিজ সম্পদ ও উন্নত যোগাযোগের দরুন বেশি লোক বাস করেন (মোট জনসংখ্যার 60 ভাগেরও বেশি)। যখন সমগ্র রাশিয়ার গড় জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 22 জন, তখন ইউরোপীয় রাশিয়ার ঘনত্ব হল 28 জন। এই দেশের প্রায় 50 শতাংশ লোক শহর বাসিন্দা।

**পূর্ব ইউরোপ ঃ জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল)**

| দেশ | জনসংখ্যা | জনঘনত্ব |
|---|---|---|
| বেলারাস | 10.0 | 125 |
| বুলগেরিয়া | 8.1 | 190 |
| চেক রিপাবলিক | 10.3 | 337 |
| হাঙ্গেরী | 10.0 | 278 |
| পোল্যাণ্ড | 38.6 | 328 |
| রুমানিয়া | 22.4 | 243 |
| স্লোভাকিয়া | 5.4 | 286 |

**দক্ষিণ ইউরোপ ঃ জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল)**

| দেশ | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) | জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) |
|---|---|---|
| আলবানিয়া | 3.4 | 310 |
| আরডোরা | 0.1 | 380 |
| বসনিয়া হারর্জগোভিনা | 3.4 | 173 |
| যুগোশ্লোভিয়া | 10.7 | 270 |
| ক্রোশিয়া | 4.7 | 197 |
| গ্রীস | 10.9 | 214 |
| ইতালি | 57.8 | 497 |
| মাসেডেনিয়া | 2.0 | 205 |
| মাল্টা | 0.4 | 3,157 |
| পর্তুগাল | 10.0 | 282 |

| | | |
|---|---|---|
| সান মেরিনো | 0.03 | 1,166 |
| স্লোভেনিয়া | 2.0 | 256 |
| স্পেন | 39.8 | 204 |

ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ডের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চলগুলো হল ঃ

1. রাইন, সোম (Somme), স্লেড (Scheldt) ও নিম্ন সীনের (Lower Seine) উর্বর অববাহিকা ও কয়েকটি কয়লাখনি অঞ্চল।
2. মধ্য জার্মানীর অধিকাংশ এলাকা যা দক্ষিণ-পূর্ব চেক রিপাবলিক ও পোল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। অঞ্চলটি খনিজ সম্পদে ভরপুর।
3. ইতালির উত্তরাংশ অর্থাৎ উর্বর পো-উপত্যকা।
4. উত্তর পশ্চিম ইউরোপের শিল্পাঞ্চল।

### 2.7.3.2 উত্তর আমেরিকা (North America)

এই মহাদেশের মোট জনসংখ্যা হল 316 মিলিয়ন (2001 সাল)। এখানকার প্রায় 85 শতাংশ লোক 100° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের পূর্বে বসবাস করেন। এর কারণ হলো এখানকার ইউরোপীয় বাসিন্দারা পূর্বদিক থেকে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। পূর্বদিকে জনসমাগম হবার পর পশ্চিম ও উত্তরদিকে জনবসতি শুরু হল। পশ্চিমদিকের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ও জলসেচ সেবিত এলাকায় ঘনবসতি দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার জনবসতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এই মহাদেশের অধিকাংশ লোক যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন। এর পরের স্থান হলো মেক্সিকো ও কানাডার।

কানাডার জনবণ্টন খুব অসম। কানাডা হল পর্বত, অরণ্য, হ্রদ, নদী-নালা, গমবলয়, খনিজসম্পদ, আধুনিক কলকারখানা ও অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভার দেশ। কানাডার উত্তরে লরেন্সীয় শীল্ড অঞ্চলে সোনা, তামা ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম, নিকেল, অ্যাসবেস্টস পাওয়া যায়।

কানাডার জনবসতি খাদ্য উৎপাদক অঞ্চল ও শিল্পকেন্দ্রিক ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দেশের তিনটি প্রধান ঘনবসতি এলাকা হল (চিত্র 7.6) ঃ

1. পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও নদী উপত্যকা। এই দেশের 20 শতাংশ লোক এখানে বাস করেন।
2. পূর্বে অন্টারিও উপদ্বীপ ও সেন্ট লরেন্স উপত্যকা, ম্যারিটাইম প্রদেশের শিল্পপ্রধান অঞ্চল। এখানে কানাডার 60 ভাগ লোক বাস করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যবর্তী এই অঞ্চলটি কৃষি-শিল্প সমৃদ্ধ।
3. কৃষিপ্রধান প্রেইরি অঞ্চল। মোট জনসংখ্যার 16 ভাগ লোক এখানে বাস করেন।

**উত্তর আমেরিকার লোকসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল)**

| দেশ | জনসংখ্যা | জনঘনত্ব |
|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | 284.5 | 77 |
| মেক্সিকো | 99.6 | 132 |
| কানাডা | 31.0 | 8 |
| কিউবা | 11.3 | 264 |
| ডোমিনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ | 8.6 | 456 |

| | | |
|---|---|---|
| হাইতি | 7.0 | 650 |
| হণ্ডুরাস | 6.7 | 155 |
| এল সালভাডোর | 6.4 | 788 |
| নিকারাগুয়া | 5.2 | 104 |

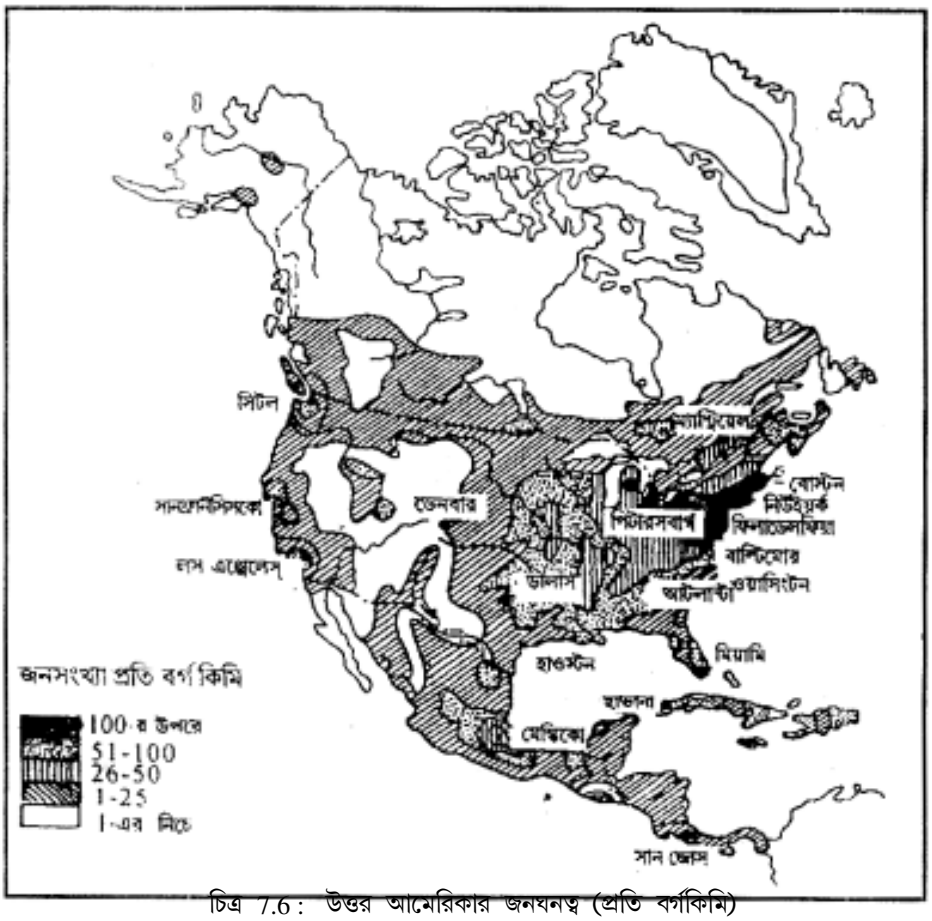


চিত্র 7.6 : উত্তর আমেরিকার জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

নর্দান টেরিটোরি ও ইউক্রেন উপত্যকা কানাডার মোট এলাকার 40 ভাগ জায়গা জুড়ে থাকলেও এখানে দেশের মাত্র 0.3 শতাংশ লোক বাস করেন। অঞ্চলটি আংশিকভাবে তুন্দ্রা অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা হলেন রেড ইন্ডিয়ান ও এস্কিমো।

যুক্তরাষ্ট্রে লোকসংখ্যা হল 284.5 মিলিয়ন (2001)। লোকসংখ্যা অনুসারে এই দেশের স্থান পৃথিবীতে চতুর্থ,

চীন, ভারত ও রাশিয়ার পরই। পৃথিবীর মোট জনবসতির 5 শতাংশের মত লোক এখানে বাস করেন। আয়তনের তুলনায় এদেশের লোকবসতি খুব কম। আবার জনঘনত্ব হল প্রতি বর্গমাইলে 8 জন। এই দেশের বেশির ভাগ লোক $100^0$ পশ্চিম দ্রাঘিমারেখার পূর্বাংশে বাস করেন। এই অংশের গড় ঘনত্ব হল প্রতি বর্গমাইলে 70 জন। আর্দ্র ও সমতল এই অঞ্চলটি চাষবাসের পক্ষে উপযুক্ত। তবে এই এলাকার বেশির ভাগ লোক দক্ষিণের তুলা ও ভুট্টা বলয়ে বাস করেন। তবে পূর্বে আটলান্টিকের উপকূলস্থ মেরীল্যাণ্ড থেকে মেইন পর্যন্ত শিল্পপ্রধান অঞ্চল সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ। এখানকার শিল্পপ্রধান ঘনবসতি এলাকাগুলো হল ঃ

1. ড্রেটয়েট, ক্লীভল্যাণ্ড, বাফেলো ও অ্যাক্রনকে কেন্দ্র করে ইরি হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল।
2. চিকাগো-মিলওয়াকি-কে কেন্দ্র করে মিচিগান হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল।
3. রচেস্টার ও সাইরেকাস্।
4. অন্টারিও এবং মহাওক (Mahawuk) উপত্যকা অঞ্চল।
5. পেনসিলভেনিয়া এবং পূর্বে ওহিও নদীর উপত্যকা অংশে পিটস্বার্গ শিল্পশহর।

$100^o$ পশ্চিম দ্রাঘিমারেখার পশ্চিমাংশ যুক্তরাষ্ট্রের মোট আয়তনের 30 ভাগ জায়গা জুড়ে থাকলেও পর্বত ও মালভূমি প্রধান এই শুষ্ক এলাকার জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) মাত্র 5জন। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ও জলসেচের সুবিধের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকায় ঘনবসতি গড়ে উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের তিনটি ঘনবসতি এলাকা হল ঃ

1. সানফ্রানসিসকো, আয়ারল্যাণ্ডকে ঘিরে ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকা।
2. দক্ষিণে লস্ এঞ্জেলস্-সানডিয়াগো-র সমভূমি অঞ্চল।
3. উত্তরের ওয়াশিংটন এবং ওরিগন রাজ্যের পোর্টল্যাণ্ড, সিয়াটেল প্রভৃতি শহর।

এর বিপরীতে রয়েছে ইসাহো (10), মন্টানা (6), ইউওমিং (5) ও নেভাদা (4) ইত্যাদি জনবিরল এলাকা। এখানকার অনুর্বর মাটি বিরাট সংখ্যক কৃষিজীবী জনতার ভরণপোষণে অক্ষম।

মেক্সিকোর জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 132 জন। কিন্তু দেশের উত্তরাংশ মরুপ্রায় বলে সেখানে খুব কম লোক বাস করেন। অবশ্য এই অঞ্চলে যেখানে খনিজদ্রব্য পাওয়া যায় ও যেখানে পশুচারণের সুবিধে আছে সেখানেই কেবল বিক্ষিপ্তভাবে বসতি গড়ে উঠেছে। ইদানীং জলসেচের সাহায্যে চাষবাস শুরু হওয়ায় এখানে কিছু মানুষ বসবাস করছেন। মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলবর্তী আর্দ্র উষ্ণ এলাকা চাষবাসের পক্ষে উপযুক্ত এছাড়া এই এলাকা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বলে মেক্সিকোর বেশির ভাগ লোক এখানে বসবাস করেন। এর বিপরীতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এলাকা ও ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপ প্রায় শুকনো বলে এইসব এলাকায় লোকবসতি কম। মেক্সিকোর উচ্চ মালভূমি অঞ্চলে উচ্চতার জন্য নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। এটি শ্বেতকায় অধিবাসীদের বাসস্থান বলা চলে।

মধ্য আমেরিকা জনবসতি প্রধানত খনিজ ও কৃষিনির্ভরশীল। এখানকার আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু চাষবাসের পক্ষে খুব উপযুক্ত। মধ্য আমেরিকার সবচেয়ে বেশি ঘনবসতি এলাকা হল প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এল-সালবাডোর (788 জন)।

(সূত্র ঃ *2001 Population Data Sheet of the Population Reference Bureau)*

### 2.7.4 আফ্রিকা (Africa)

আফ্রিকার জনসংখ্যা (818 মিলিয়ন, 2001) নিয়ে আলোচনা করার আগে এই মহাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। যেমন, পৃথিবীর কৃষি উৎপাদনের 3 শতাংশ, খনিজ পদার্থের 5 শতাংশ, বাণিজ্যের 5 শতাংশ এই মহাদেশ থেকে আসে। পৃথিবীর রেলপথের 5 শতাংশ এদেশে বিস্তৃত। আবার এই মহাদেশ গোটা পৃথিবীর 22 শতাংশ স্থান জুড়ে থাকলেও এখানে বিশ্বের মাত্র 13 শতাংশ লোক বাস করেন। একমাত্র অস্ট্রেলিয়া (9 জন) ছাড়া এত কম ঘনত্ব (70 জন) আর কোন মহাদেশে নেই। কিছুটা জলবায়ু, আর কিছুটা ভূপ্রকৃতি এর জন্য দায়ী।

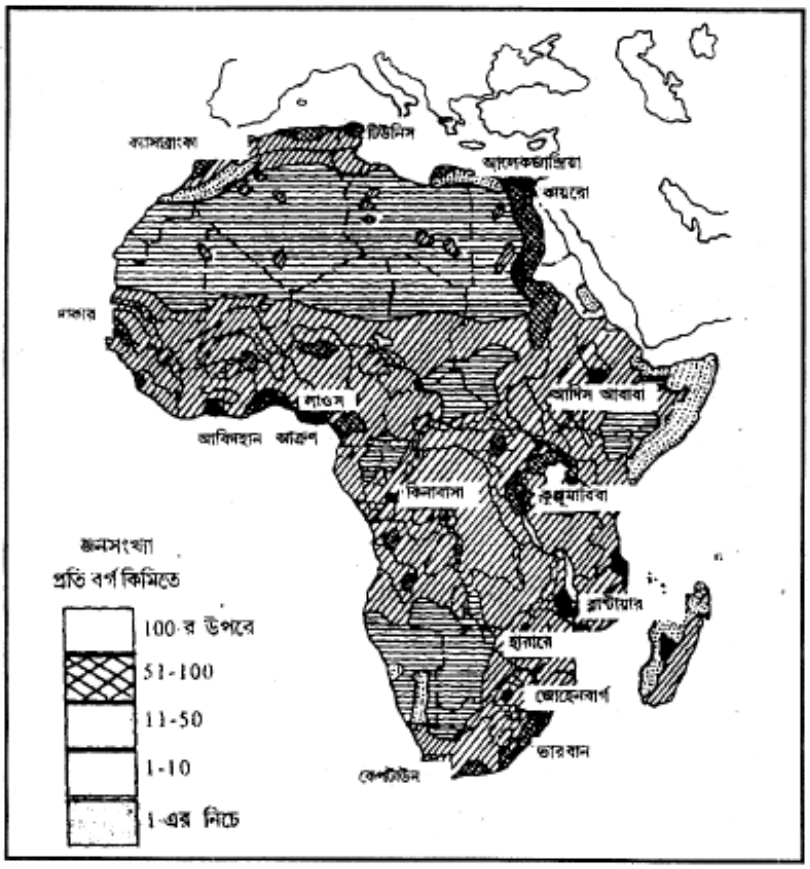


চিত্র 7.7 : আফ্রিকার জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা যথাক্রমে দেশের উত্তর মধ্যাংশ ও দক্ষিণ মধ্যাংশের ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে দু'টো মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষিসংস্থার (FAO) হিসেব অনুযায়ী আফ্রিকার শতকরা

40 ভাগের বেশি এলাকা খরাপ্রবণ। এছাড়া নিরক্ষরেখা দেশের মাঝখান দিয়ে গেছে বলে এই মহাদেশের বিরাট এলাকা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এই নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রচুর বৃক্ষ জন্মালেও তাদের অর্থনৈতিক ব্যবহার খুব সীমিত। মাটির অনুর্বরতা ছাড়াও এখানকার ফসলের বড় শত্রু হল কীটপতঙ্গ। মোটের ওপর, এখানকার প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ বসবাসের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোনটি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর জন্য বসবাসের পক্ষে আরামদায়ক। অনুরূপ একটি এলাকা হল ইথিওপিয়ার মালভূমি। নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হলেও উচ্চতার জন্য এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের জন্য উপকূলের কিছু কিছু এলাকা বসবাসযোগ্য। ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে আফ্রিকার জনঘনত্ব নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক ঃ

মহাদেশটি কৃষিপ্রধান। নীল উপত্যকা ছাড়া এখানে তেমন কোন লোভনীয় চাষের জমি খুব একটা নেই। বহুদিন ধরেই নীলনদ মিশরবাসীদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে আসছে। এইসব কারণেই এখানে জনঘনত্ব বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের মত আয়তনবিশিষ্ট সাহারা মরুভূমি বলতে গেলে জনহীন। মরূদ্যানগুলোকে আশ্রয় করে কিছু কিছু ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারিতে নিকৃষ্ট লতাগুল্ম মহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে আছে। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই হয়তো এখানকার বড় নদী উপত্যকাগুলোতে ঘনবসতি গড়ে ওঠেনি। আবার একটানা লম্বা খরার দরুন নদী থেকে সময়মত সেচের জল পাওয়া যায় না। আবার নদীতে নৌ চলাচলও সম্ভব হয় না। এ কারণে ওরেঞ্জ (Orange) ও উচ্চ (Upper) জাম্বিয়া অববাহিকায় বসতি ঘন নয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-মধ্য আফ্রিকায় খনিজ সম্পদ ও বসতির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। ঐ সব অঞ্চলে (নীলনদ উপত্যকা বাদ দিয়ে) জনঘনত্ব ও গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের মধ্যে একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

আফ্রিকার গড় ঘনত্বের চেয়ে পাঁচটি বেশি জনঘনত্বের অঞ্চল হল (চিত্র 7.7) ঃ

1. আইভরি কোস্টের কিছুটা অংশ বাদে পশ্চিমে গিনি থেকে পূর্বে ইকোয়েটরিয়াল গিনি পর্যন্ত বিরাট এলাকা।

2. পূর্বে আফ্রিকার মালভূমির বৃহৎ হ্রদ অঞ্চল, বিশেষ করে ভিক্টোরিয়া হ্রদের আশেপাশের এলাকা।

3. পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল যা মোসাম্বার কাছ থেকে কেপ টাউন পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য এই গোটা এলাকাটিতে একই রকম জনঘনত্ব দেখা যায় না।

4. ভূমধ্যসাগরের লাগোয়া এলাকা—টিউনেশিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোর উত্তরদিকের কিছু অংশ।

5. পূর্বে ইথিওপিয়ার মালভূমি।

কৃষিপ্রধান এই সব এলাকার জীবনযাত্রা গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের (75 সেমির বেশি) ওপর নির্ভরশীল (Fitzerald, 1967)।

### 2.7.5 দক্ষিণ আমেরিকা (South America)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল ইউরোপীয়দের বহির্বিশ্বে প্রভুত্ব কায়েম করার যুগ। দক্ষিণ আমেরিকাও এর ছোঁয়া পেয়েছিল। এইসব বিদেশী প্রভুরা পূর্ব উপকূলে এসে ডেরা বেঁধেছিলেন তারপর ধীরে ধীরে দেশের ভেতরে সরে গিয়েছিলেন। আফ্রিকার মতন এই মহাদেশে উত্তরাংশের ওপর দিয়ে নিরক্ষরেখা গেছে। ফলে এখানকার

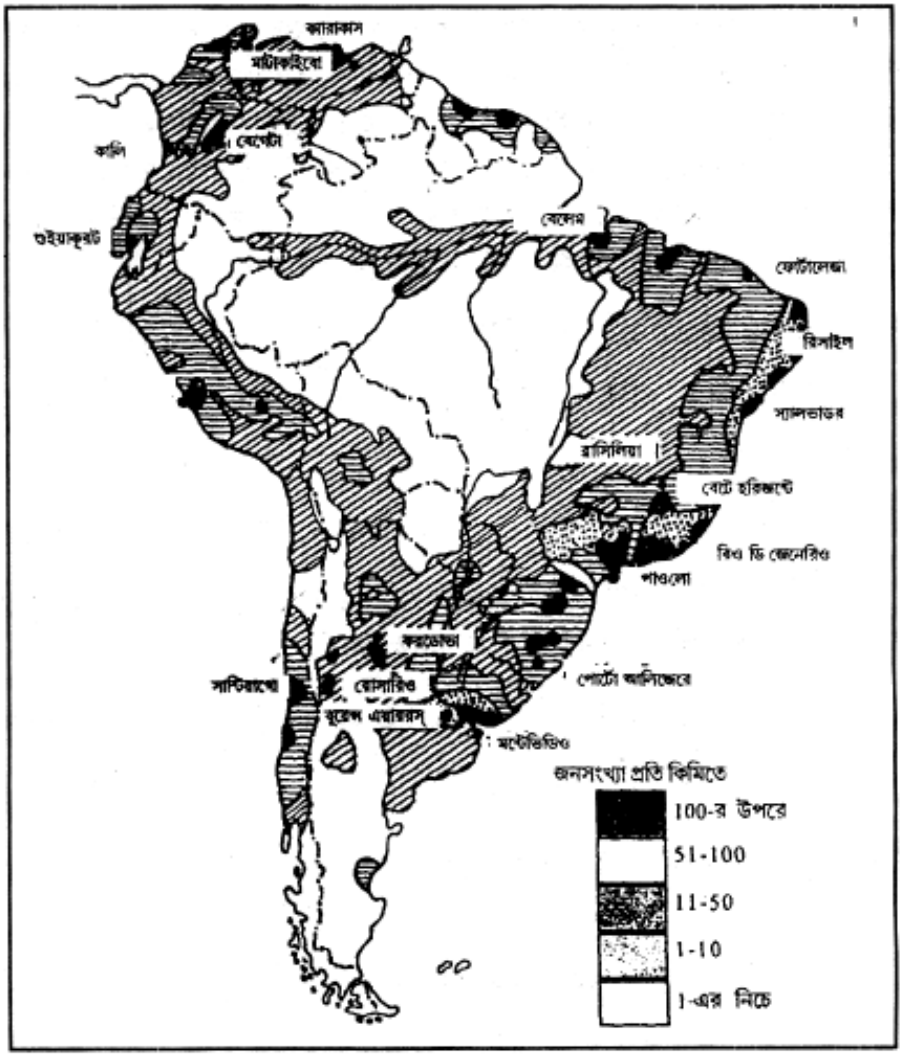


চিত্র 7.8 : দক্ষিণ আমেরিকার জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

বিরাট এলাকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। আবার মহাদেশের দক্ষিণাংশ কুমেরু অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত বলে সেখানে শীতকালে কনকনে মেরু বাতাস বয়। তাই বলা চলে জলবায়ুর জন্যই এই মহাদেশের উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যাংশে বসতি বিকাশ লাভ করেনি। এইজন্য একমাত্র উপকূল ছাড়া মহাদেশের অন্যান্য অংশে জনবসতি খুব একটা গড়ে ওঠেনি। এই কারণেই আয়তনের দিক দিয়ে এই মহাদেশের স্থান পৃথিবীতে পঞ্চম (মাত্র 13 শতাংশ) হলেও বিশ্বের মাত্র 5 শতাংশ লোক এখানে বাস করেন, যদিও মহাদেশটির গড় জনঘনত্ব 51 জন।

পরের পৃষ্ঠার সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রাজিলে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করেন (52.29 শতাংশ, কিন্তু ইকোয়েডরে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি (118)। গায়ানার একটা বড় অংশ বিরল বসতির (চিত্র 7.8)।

এখানকার শতকরা 95 ভাগ লোকই দেশের মাত্র 4 শতাংশ জায়গায় বাস করেন। বাকি লোক পার্বত্য এলাকা, বনাঞ্চল, সাভানা অঞ্চলে বাস করেন। আখ এখানকার প্রধান অর্থকরী ফসল। দেশের একটা বড় অংশে ধান উৎপন্ন হয়। কিন্তু দেশের চাহিদা মিটিয়ে তা বাইরে পাঠানো সম্ভব হয় না। খনিজ পদার্থের মধ্যে বক্সাইড বিদেশে রপ্তানি হয়। অন্যান্য খনিজ পদার্থের মধ্যে আছে সোনা ও হীরে। বন থেকে বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য ও উপকূলীয় এলাকা থেকে নারকেল পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাংশ (মেরু, ইকোয়েডর, কলম্বিয়ার অংশবিশেষ) পার্বত্যময়। নদী উপত্যকাগুলো খুব সরু। ঢালু অঞ্চলে কিছু চাষবাস করা হয়। বলিভিয়ার জনঘনত্ব কম। দেশের আয়তনের (4,24,162 বর্গমাইল) তুলনায় এখানকার জনসংখ্যা খুব কম। ভেনেজুয়েলা (352,143 বর্গমাইল) ও সুরিনামে (63,039 বর্গমাইল)

**দক্ষিণ আমেরিকার লোকসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল)**

| দেশ | জনসংখ্যা | জনঘনত্ব |
|---|---|---|
| ব্রাজিল | 171.8 | 52 |
| আর্জেন্টিনা | 37.5 | 35 |
| কলম্বিয়া | 43.1 | 98 |
| পেরু | 26.1 | 53 |
| ভেনেজুয়েলা | 24.6 | 70 |
| চিলি | 15.4 | 53 |
| ইকোয়েডর | 12.9 | 118 |
| বলিভিয়া | 8.5 | 20 |
| প্যারাগুয়ে | 5.7 | 36 |
| উরুগুয়ে | 3.4 | 49 |
| গায়ানা | 0.7 | 8 |
| সুরিনাম | 0.4 | 7 |
| ফরাসী গায়ানা | 0.2 | 7 |

লোকসংখ্যা খুব কম। ব্রাজিলের এক বড় অংশ বনে ঢাকা পার্বত্য এলাকা। চাষবাসই এখানকার প্রধান পেশা। আয়তনের (3,300,154 বর্গমাইল) তুলনায় এখানকার লোকসংখ্যা খুব কম। আর আমরা আগেই জেনেছি যে এই দেশটির ওপর দিয়ে নিরক্ষরেখা গেছে। এখানকার জলবায়ু ও পরিবেশ বসতি গড়ে ওঠার পক্ষে একটা বিরাট বাধা। আমাজন উপত্যকাতে জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 4 থেকে 12 জন, অন্যত্র 52 জন। ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলে কয়েকটি বড় শহর রয়েছে। সাধারণভাবে, পূর্ব উপকূলের জনঘনত্ব 25 থেকে 40 জন, আর শহর ও তার লাগোয়া অঞ্চলে 45 থেকে 300-র বেশি।

### 2.7.6 অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড (Australla and Newzealand)

অস্ট্রেলিয়া হল উত্তর আমেরিকার মতই এক নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশ। স্বভাবতই, আগন্তুকরা এখানে এসে উপকূলের দিকে অর্থাৎ মহাদেশের পূর্বভাগে বসবাস শুরু করেছিলেন। পূর্বদিকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, আর এর অভাবে পশ্চিমদিকে বিরাট মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবশ্য বৃষ্টিপাত হয়, যদিও তা পশ্চিম উপকূলের মত অত কম নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে পূর্ব উপকূল বরাবর রয়েছে পর্বতশ্রেণি (গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ)। তাছাড়া, উত্তর, দক্ষিণ, মধ্যাংশ এবং পশ্চিমাংশেও পর্বতশ্রেণি রয়েছে। স্বভাবতই, এই মরুভূমি ও পার্বত্য এলাকা বাদ দিলে এই মহাদেশে চাষের জমি কম। দুই উপকূল (পূর্ব ও পশ্চিম) ও মরুভূমির কোন কোন জায়গায় কিছু কিছু খনিজদ্রব্য পাওয়া যায়। মহাদেশের চাষ ও শিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যা পশুপালকদের তুলনায় বেশি।

আগের আলোচনার সূত্র ধরে এবার অস্ট্রেলিয়ার জনঘনত্ব (সারণি 7.6) বিচার করা যাক। আয়তনে সবচেয়ে ছোট এই মহাদেশে (মাত্র 6 অংশ) পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা (6,137 মিলিয়ন) মাত্র 0.5 শতাংশ (31 মিলিয়ন, 2001) বাস করেন। এই মহাদেশে 25 সেমির কম বৃষ্টিপাতের এলাকায় কোন বড় জনবসতি গড়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত বসতি মধ্য কুইন্সল্যান্ড থেকে নর্দান টেরিটোরির পশুচারণ ক্ষেত্রের দিকে বাড়ছে। ক্রান্তীয় আবহাওয়ার দরুন উত্তরে বসতি খুব কম (চিত্র 7.9)। ফ্লাইন্ডার্স পর্বতমালার দক্ষিণে তুলনামূলকভাবে ভাল বৃষ্টিপাতের দরুন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় কিছু ঘনবসতি দেখা যায়। নিউ সাউথ ওয়েলসের দক্ষিণ-পূর্বের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর। তাই প্রচুর জল থাকা সত্ত্বেও এখানকার বেশ কিছু এলাকা প্রায় জনশূন্য। অস্ট্রেলিয়ায় এই রকম আটটি অনুর্বর ও বন্ধুর অঞ্চল আছে, যেখানে জনসংখ্যা খুব কম। তা সত্ত্বেও আর্মিডেল, কাটুম্বা ও কুম্পা-র আশেপাশে মাঝারি মাপের জনবসতি দেখা যায়। এখানে কোথাও কোথাও পশুচারণ, আবার কোথাও কোথাও পর্যটন শিল্প বিকাশ লাভ করেছে। এসব অঞ্চলে 62 সেমির মত বৃষ্টিপাত হয়।

জনঘনত্বের বিচারে অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচটি বড় মাপের ঘনবসতি অঞ্চল রয়েছে (Taylor, 1959)। এগুলো হল— (1) সিডনির পশ্চিমে পর্বতের ঢাল, (2) ভিক্টোরিয়ার একটি বড় অংশ, (3) কুইন্সল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব দিক, (4) দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ফ্লাইন্ডার্স রেঞ্জের দক্ষিণদিক ও (5) সোয়ানল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক। টাসমানিয়া ও নর্দান টেরিটোরিতে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র নেই।

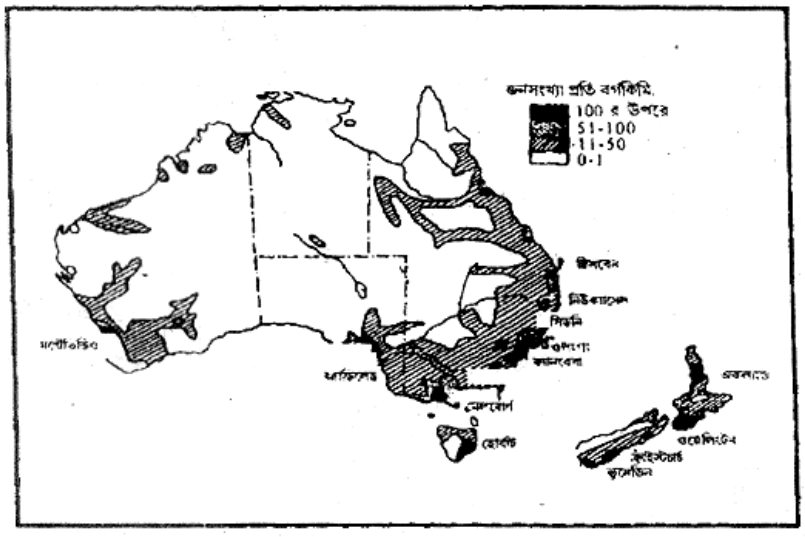


এবার অঞ্চলী



চিত্র 7.9 : অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

কুইন্সল্যান্ডে সুন্দর নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ছাড়াও পূর্ব উপকূলে উর্বর চাষের জমি আছে। এখানকার মূল্যবান খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে কুলি (Coolie)-র কয়লা। জনবসতির দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে ভিক্টোরিয়া ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া। কৃষিসম্পদের দিক দিয়ে উভয় রাজ্যই সমান পর্যায়ের। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর তৃণভূমি আছে। অবশ্য এর বেশির ভাগই নিম্নমানের। উপরন্তু, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা মরুভূমি। তাই অর্থনৈতিক বিচারে এই রাজ্যটি অনেকটা গুরুত্বহীন। ভিক্টোরিয়ার মোরওয়েলে (Morewell) প্রচুর কয়লা আছে। এখানে সারা বছর একই রকম বৃষ্টিপাত হয়। তাসমানিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ কনকনে ঠাণ্ডা বলে এখানে জনবসতি খুব কম। তা সত্ত্বেও এখানকার সীমিত চাষের জমি নর্দান টেরিটোরির বিরাট এলাকার তুলনায় অনেক কাজে লাগে।

**জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব : ওশেনিয়া (2001 সাল)**

| দেশ | জনসংখ্যা (মিলিয়ন) | জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি) | জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি) |
|---|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | 19.4 | 2,988,888 | 6 |
| মাইক্রোনেশিয়া | 0.1 | 270 | 444 |
| ফিজি | 0.8 | 7,054 | 119 |
| ফ্রেঞ্চ পলিনেসিয়া | 0.2 | 1,544 | 153 |
| গুয়াম | 0.2 | 212 | 744 |
| কিরিবাটি | 0.1 | 282 | 337 |
| মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | 0.1 | 69 | 1,007 |
| নাউরু | 0.01 | 9 | 1,412 |
| নিউ ক্যালিডোনিয়া | 0.02 | 7,174 | 30 |
| নিউজিল্যান্ড | 3.9 | 104,452 | 37 |
| পালাউ | 0.02 | 178 | 107 |
| পাপুয়া নিউগিনি | 5.0 | 178,703 | 28 |
| সোলেমন দ্বীপপুঞ্জ | 0.5 | 11,158 | 41 |
| টোঙ্গা | 0.1 | 290 | 349 |
| টুভালু | 0.01 | 10 | 1,100 |
| ভানুআটু | 0.2 | 4,707 | 44 |
| ওয়েস্টার্ন স্যামাও | 0.2 | 1,097 | 155 |
| ওশেনিয়া | 31 | 3,306,741 | 9 |

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও উর্বর মাটি আর খরামুক্ত বলে নিউজিল্যান্ডে দোহশিল্প (Dairy Industry) গড়ে উঠেছে। ফলে এখানে জনঘনত্ব মধ্যম রকমের।

## 2.8 ভারতের জনসংখ্যা বণ্টন ও জনঘনত্ব (Distribution and Density of Population in India)

স্বাধীনতার আগে ভারতের জনসংখ্যা নিয়ে খুব একটা গবেষণা হয়নি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে Ahmed (1941) ও (Geddes (1942)-এর বিশ্লেষণ উল্লেখের দাবি রাখে। স্বাধীনতার পর 1951 সালের লোকগণনাকে ভিত্তি করে অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জী (1962) জাতীয় স্তরে ভারতের জনসংখ্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলেন। আঞ্চলিক স্তরে কুরিয়ান (1938), ভার্মা (1956), সিনহা (1958), চ্যার্টার্জী (1961), কৃষাণ (1968), ঘোষ (1970), প্রকাশ (1970) ও মেহেতার (1970) বিশ্লেষণ ছিল যথাক্রমে কেরালা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান ভিত্তিক। 1969 থেকে 1972 সাল পর্যন্ত গবেষণামূলক তথ্যাদির ভিত্তিতে দেশের জনসংখ্যা বণ্টন ও ঘনত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গোসাল ও চাঁদনা (Gosal & Chandna) জনগণনা প্রতিবেদনের (Census Report) ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

**জনসংখ্যার বণ্টন (Distribution of Population)**

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভারতের জনসংখ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ঃ

(1) বিপুল জনসংখ্যা (2001 সালে, 1,033 মিলিয়ন),

(2) বহুসংখ্যক প্রজাতি (Ethnic Multiplicity),

(3) প্রধানত গ্রামীণ জনসংখ্যা ও তার অসম বণ্টন।

কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis, 1951) তাঁর এক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে দারিদ্র্য ও প্রজাতির বৈচিত্র্যের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র আয়তনের কথা বিবেচনা করলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এই দেশের উন্নতির সম্ভাবনা আছে। বহুবিধ জাতি এদেশের একটি সমস্যা। সাম্প্রতিক কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক সংকীর্ণতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তার ফলে দেশের ঐক্য যেমন একদিকে বিপন্ন হতে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুস্থিরতা নষ্ট হতে চলেছে। ভারতের তিন-চতুর্থাংশের বেশি লোকসংখ্যা (76.6 শতাংশ) গ্রামে বাস করেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহুসংখ্যক গ্রামে (5 লাখের বেশি) এই জনতার বসবাস। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এটি একটি বিরাট বাধা, কারণ প্রতিটি বসতিতে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক উন্নয়ন, সুষম বণ্টনব্যবস্থা, স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিকাঠামো তৈরি করতে প্রচুর ব্যয় হবে।

জনবণ্টনের অসমতা ভারতের জনসংখ্যার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামে বাস করেন, বাকি অর্ধেক সংঘবদ্ধ গ্রামে। বিক্ষিপ্ত জনবসতি দেশের মধ্যভাগ ও হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায়, আর ঘন জনবসতি পলিময় সমভূমি অঞ্চলে। জনসংখ্যার এই অসম বণ্টন আবার ঘন জনবসতি বিরল জনবসতি অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমানায় আরও বেড়েছে।

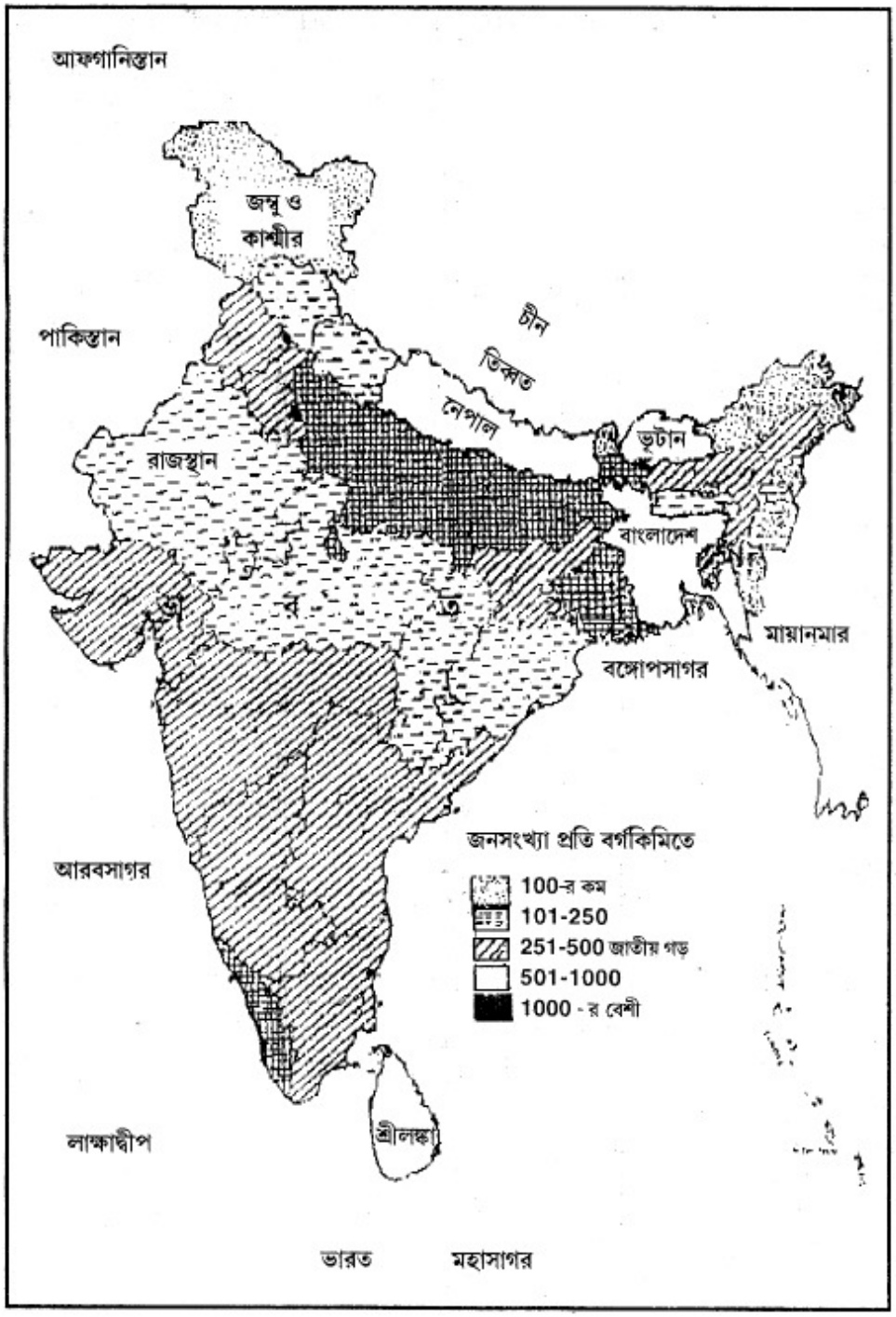


চিত্র 7.10 : ভারতের রাজ্যভিত্তিক জনসংখ্যা (2001) প্রতি বর্গকিমি

**জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)**

প্রতি বর্গকিমিতে 324 (জন) জনঘনত্ব (2001 জনগণনা) হিসেবে ভারত পৃথিবীর ঘনবসতিযুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ (প্রতি বর্গকিমিতে 904 জন) সবচেয়ে ঘনবসতিযুক্ত রাজ্য (সারণি 7.2), আর জাতীয় রাজধানী (National Capital) দিল্লী (9,294) সবচেয়ে ঘন বসতিযুক্ত অঞ্চল (Territory)। পশ্চিমবঙ্গের পরের স্থান হল বিহার (880), কেরালা (819), উত্তরপ্রদেশ (689), পাঞ্জাব (482), তামিলনাড়ু (478), হরিয়ানা (477), গোয়া (363), অসম (340) ও ঝাড়খণ্ড (338)-এর। গড় ঘনত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতকে তিনভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র 7.10)।

A. **বেশি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল** : 350 জনের বেশি লোক।

B. **মাঝারি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল** : 150-350 জন লোক।

C. **কম ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল** : 150-এর কম লোক।

**সারণি 7.2 : ভারত : জনঘনত্ব 1991 ও 2001 (প্রতি বর্গকিমি)**

| দেশ | 2001 | 1991 |
|---|---|---|
| ভারত | 324 | 267 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 904 | 767 |
| বিহার | 880 | 685 |
| কেরালা | 819 | 749 |
| উত্তরপ্রদেশ | 689 | 548 |
| পাঞ্জাব | 482 | 403 |
| তামিলনাড়ু | 478 | 429 |
| হরিয়ানা | 477 | 372 |
| গোয়া | 363 | 316 |
| অসম | 340 | 286 |
| ঝাড়খণ্ড | 338 | 274 |
| মহারাষ্ট্র | 314 | 257 |
| ত্রিপুরা | 304 | 263 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | 275 | 242 |
| কর্ণাটক | 275 | 235 |
| গুজরাত | 258 | 211 |
| ওড়িশা | 236 | 203 |

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

| | | |
|---|---|---|
| মধ্যপ্রদশে | 196 | 158 |
| রাজস্থান | 165 | 129 |
| **দেশ** | **2001** | **1991** |
| উত্তরাঞ্চল | 159 | 133 |
| ছত্তিশগড় | 154 | 130 |
| নাগাল্যান্ড | 120 | 73 |
| হিমাচল প্রদেশ | 109 | 93 |
| মণিপুর | 107 | 82 |
| মেঘালয় | 103 | 79 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 99 | 77 |
| সিকিম | 76 | 57 |
| মিজোরা | 42 | 33 |
| অরুণাচল প্রদেশ | 13 | 10 |
| **কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল** | | |
| দিল্লী | 9294 | 6252 |
| চণ্ডীগড় | 7903 | 5632 |
| পণ্ডিচেরী | 2029 | 1683 |
| লাক্ষাদ্বীপ | 1894 | 1616 |
| দমন ও দিউ | 1411 | 907 |
| দাদরা ও নগর হাভেলী | 499 | 282 |
| আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 43 | 34 |

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

### A. বেশি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ (High Density Regions)

1981 সালের জনগণনানুযায়ী ভারতের 20%-এর বেশি জেলায় প্রতি বর্গকিমিতে 350 জনেরও বেশি লোক বাস করতেন। হিন্দীভাষী অঞ্চলে— বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ, বিহার রাজ্য, পশ্চিমে হরিয়ানা রাজ্য এবং পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গো — জনঘনত্ব বেশি। মোটামুটিভাবে এই বলয়টিতে গড়ে প্রতি বর্গকিমিতে 500 লোক বাস করেন, যদিও এই বলয়ের কোথাও কোথাও এর থেকে বেশি লোক বাস করেন। এই জনবসতি মূলত গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে উঠেছে, যদিও পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে শিল্প বিকাশের ফলে ব্যাপক জনসমাবেশ হয়েছে।

জনবসতির দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায় যে উর্বর পলিমাটিতে গড়ে ওঠা কৃষিকাজই এখানকার অর্থনীতির মূল উৎস। এই বলয়ের অধিকাংশ অঞ্চলেই কৃষিকাজ আবার সেকেলে ধরনের। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এখানে ভাল চাষবাসের

সুযোগ (সমতল জমি, পলিমাটি, সেচের জন্য জল) থাকলেও এখানকার কৃষিব্যবস্থা সেকেলে ধরনের। অনুন্নত জলসংরক্ষণ ব্যবস্থা এই বলয়ের চাষবাস-এ পিছিয়ে থাকার একটা বড় কারণ। সস্তায় প্রচুর শ্রমিক (লোকসংখ্যা বেশি বলে) ও কম পরিমাণ জমি উন্নতমানের চাষবাস চালু করার পথে আর এক বাধা। এর স্বাভাবিক ফল হল— (i) এখানকার বিরাট এলাকা জুড়ে গ্রাম্য জনতার ভীড়। (ii) বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বদিক থেকে ভূমিহীন চাষীদের স্বদেশত্যাগ। এদের গন্তব্যস্থল হল চাষবাসে উন্নত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও অসম রাজ্য। কিন্তু বহিঃপ্রবণতা সত্ত্বেও এখানে ঘনত্ব খুব বেশি। যাহোক, বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে (ইক্ষুশিল্প) ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকায় (পাটশিল্প) গ্রামীণ শিল্পায়ন জনসংখ্যার গ্রহণ ক্ষমতা বাড়িয়েছে। ভারতের এই দুই প্রান্তে অন্যান্য অংশের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ বেশি।

জনঘনত্বের দিক দিয়ে এর পরের স্থান হল মালাবার উপকূল ও তামিলনাড়ু উচ্চভূমি। এই অঞ্চলের মধ্যে মালাবার এলাকা ও পৌর জেলা চেন্নাইয়ের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তামিলনাড়ুর উচ্চভূমিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে প্রায় 350 জন। মালাবার উপকূল অঞ্চলে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 1,000 জন বা তারও বেশি। নিবিড় কৃষিভিত্তিক ধানচাষ এখানকার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। দেশের মধ্যেকার জেলাগুলোতে বাগিচা চাষ (চা, রবার, কফি) এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্প এখানে জনঘনত্ব বেশ বাড়িয়েছে। চাষবাসে উন্নতি ও বেশ কয়েকটি শহরে কুটিরশিল্পের বিকাশ কাবেরী বদ্বীপ ও তার লাগোয়া উত্তর-পূর্ব তামিলনাড়ুর উচ্চভূমিতে বেশি জনঘনত্বের কারণ। যদিও কিছু লোক এখান থেকে বাইরে চলে গেছেন, তবুও ভারতের এ অংশে অধিক নগরায়ণ জনঘনত্বকে কারণ বাড়িয়ে তুলেছে। এখানকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল কেন্দ্র হল চেন্নাই। বাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটোর, মাদুরাই, টুটিকোরিন ও চেন্নাই এই অঞ্চলের পুরানো শহর।

এসব প্রধান ঘনবসতি অঞ্চলগুলো ছাড়াও চাষবাসে উন্নত মহানদী বদ্বীপ, গোদাবরী বদ্বীপ, বারী (Bari) এবং বিতস্তা দোয়াব ও অত্যাধুনিক বৃহত্তর মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, খেদা (Kheda), ইন্দোর, দিল্লী ও চণ্ডীগড়ে ঘন জনবসতি লক্ষ্যণীয়। অ-কৃষি পেশা নির্ভর লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জেও জনবসতি বেশ ঘন।

### B. মাঝারি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ (Medium Density Regions)

1981 সালের লোকগণনাতে ভারতের 130টি জেলায় মাঝারি ধরনের জনবসতি লক্ষ্য করা যায়। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে সবচেয়ে কম জনবসতি ছিল (প্রতি বর্গকিমিতে 151জন)। যা হোক, দক্ষিণ ভারতে মাঝারি ধরনের জনবসতি বেশ লক্ষ্যণীয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গোটা মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় এলাকার একটা বড় অংশে মাঝারি ধরনের জনবসতি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণে তামিলনাড়ুর কিছু অংশ, কর্ণাটকের দক্ষিণভাগ, অন্ধ্রপ্রদেশের রায়লসীমার কিছু অংশে মাঝারি জনবসতি দেখা যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সেখানকার অসমান ভূপ্রকৃতি চাষবাস ও সেচের জল সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নগরায়ণ ও শিল্পোন্নতির জন্য এখানে মাঝারি ধরনের জনঘনত্ব দেখা যায়। ছোটনাগপুরের সম্ভাব্য সম্পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। সেখানে একই মানের জনঘনত্ব রয়েছে। বলা যেতে পারে যে দেশের এই অংশে বর্তমানে খনিজ ও শিল্পের বিকাশ একদিকে যেমন সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি এর পশ্চাদপদ এলাকার উন্নতি ঘটিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে মাঝারি জনঘনত্ব সৃষ্টি করেছে।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সমভূমি ও রাজস্থানের উত্তরাংশ মিলিয়ে আর একটি মাঝারি মাপের জনবসতি বলয় দেখা যায়। স্বাধীনতার পর জাতীয় রাজধানী দিল্লীর সান্নিধ্য, পাঞ্জাবের পুনর্গঠনের ফল (1966) এবং সর্বোপরি সবুজ

বিপ্লবকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে পৌর শিল্পবসতি গড়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে স্বাধীনতার সময় পাঞ্জাব (বর্তমানে পাকিস্তান) থেকে নিরাশ্রয় মানুষদের এদেশে আগমনের ফলে ভারতের এই অংশে শহরায়ন দ্রুততালে ঘটেছে। সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে।

### C. কম ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ (Low Density Regions)

পাকিস্তান, চীন ও ব্রহ্মদেশের (মায়ানমার) সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে প্রতি বর্গকিমিতে 50 জনেরও কম লোক বাস করেন। এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে কিছু প্রাকৃতিক বাধা রয়েছে। যেমন গুজরাতের কচ্ছের রণে জল জমে থাকা, রাজস্থানের মরুভূমি ও অন্যান্য জেলাগুলোর পাবর্ত্য ভূ-প্রকৃতি। যে সব জায়গায় এসব বাধা নেই সেখানে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, যেমন রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলা, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর, অমৃতসর ও ফিরোজপুর জেলা। তাই দেখা যায় যে সীমান্তবর্তী অবস্থান ও তার সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা এই জেলাগুলোর জনঘনত্বকে কমিয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চল বাদে মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে গোন্ড আদিবাসী অধ্যুষিত বস্তার জেলায় জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 50 জনের কম।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও জনঘনত্ব কম (50 থেকে 150 জন)। কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যাংশেও কম জনবসতি দেখা যায়। এর কারণ হল প্রাকৃতিক বাধা ও জলকষ্ট। তার ফলে এই অঞ্চল দুটো চাষবাসের দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে। তাছাড়া, কোথাও কোথাও ব্যাপক ভূমিক্ষয়, আবার কোথাও গভীর বনভূমি চাষবাসের উন্নতির পক্ষে প্রধান বাধা। এর ফলে এখানে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে উঠেছে। বর্তমানে কৃষিসম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় একই শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য অংশের তুলনায় এই অঞ্চলে জনঘনত্ব সামান্য বেড়েছে। কতকগুলো অংশে যেমন দণ্ডকারণ্য, চম্বল উপত্যকায়—(i) আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন, (ii) অবহেলিত অ-খ্রীষ্টীয় আদিবাসী এলাকায় সমাজ জীবনের মান উন্নয়ন, (iii) উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং (iv) প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ইত্যাদি উদ্দেশ্য সামনে রেখে কৃষি উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

### জনঘনত্ব : 1991 ও 2001

পূর্বের (767) মত এবার (904) ও জনঘনত্বের দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সবার শীর্ষে রয়েছে। 1991 সালে জনঘনত্বের দিক দিয়ে বিহারের স্থান ছিল তৃতীয় এবং কেরালার দ্বিতীয়। 2001 সালে এদের উভয়ের স্থানের রদবদল ঘটেছে। অর্থাৎ বর্তমান জনগণনায় বিহারের স্থান রয়েছে দ্বিতীয় এবং কেরালার তৃতীয়।

পূর্বের (1991) ন্যায় এবার (2001)-ও দশটি প্রদেশের জনঘনত্ব জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি রয়েছে। বলা বাহুল্য, ঐ রাজ্যগুলোতে জনঘনত্ব জাতীয় গড়ের চেয়ে দু'বারই বেশি ছিল।

পাহাড়ি এলাকাগুলোতে জনঘনত্ব কমই রয়েছে। 1991 সালে পাহাড়ি রাজ্যগুলোতে জনঘনত্ব 100-র (প্রতি বর্গকিমিতে) কম ছিল। বর্তমান জনগণনায় মেঘালয় (103), মণিপুর (107), হিমাচল প্রদেশ (109) ও নাগাল্যান্ডের (120) জনঘনত্ব (100) ছাড়িয়ে গেছে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া সব কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলোতেই জনঘনত্ব জাতীয় গড়ের অনেক ওপরে। বলা বাহুল্য ঐ সব কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলো শহর এলাকা। আন্দামান ও নিকোবর কতকগুলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নিয়ে গঠিত এবং যোগাযোগের ব্যবস্থাও খুব অনুন্নত। কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলোর মধ্যে দিল্লী ও চণ্ডীগড়ের জনঘনত্ব দারুণভাবে বেড়েছে। বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধে যে এর জন্য দায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

# একক 3 ❑ জনসংখ্যা তত্ত্ব ও জনসংখ্যা নীতি

গঠন


**3.0** প্রস্তাবনা

**3.1** উদ্দেশ্য

**3.2** ম্যালথুসীয় তত্ত্ব

**3.3** অন্যান্য তত্ত্ব

**3.4** কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

**3.5** মানুষ-জমি অনুপাত

**3.6** জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চল

**3.7** মানব সম্পদ ও তার গুণগত আয়তন

**3.8** জনসংখ্যা সমস্যা ঃ উন্নয়নশীল দেশ

**3.9** জনসংখ্যা সমস্যা ঃ উন্নত দেশ

**3.10** জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি

**3.11** উন্নত দেশের জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি

**3.12** চীনের জনসংখ্যা নীতি

**3.13** ভারতের জনসংখ্যা নীতি


## 3.0 প্রস্তাবনা

জনসংখ্যার আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, চৈনিক দার্শনিক কনফিউসিয়াস, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, কৌটিল্য কিংবা রোমক সাহিত্যে জনগঠনের ভূমিকা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন লেখকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সহায়-সম্পদের সম্পর্কের কথাও বলেছেন। কিন্তু কোন দেশের জনসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে ম্যালথাস্ সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন যা ম্যালথুসীয় তত্ত্ব নামে পরিচিত। জনসংখ্যা অনেক সময় সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় তা উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই যে কোন দেশের সুষ্ঠু অর্থ সামাজিক পরিকল্পনা রচনা করতে সেই দেশের সরকার থেকে কিছু কিছু নীতি নেওয়া হয় যা জনসংখ্যা নীতি নামে পরিচিত। অবশ্য এক এক দেশের জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি ভিন্ন ভিন্ন।

## 3.1 উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনারা জানতে পারবেন :

- জনবৃদ্ধির কিছু তত্ত্ব আছে কিনা ?
- কাম্য জনসংখ্যা কি ? মানুষ-জমি অনুপাতই বা কি ?
- জনসংখ্যাকে সম্পদ বলা হয় কেন ?
- জনসংখ্যা নীতি কি ?
- বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা নীতি ইত্যাদি।

## 3.2 জনসংখ্যা তত্ত্ব ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Population Theory and Economic Development)

**ভূমিকা (Introduction)**

জনসংখ্যার আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি। মানবসভ্যতার ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবে অতীতে একটা দেশকে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়েছে জনসংখ্যার কর্মক্ষম অংশের উপর। আধুনিক মারণাস্ত্র তখন ছিল না। তাই দেশের সামরিক শক্তি ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল ছিল দেশের সামরিক বাহিনীর আয়তনের উপর। তাই বলা চলে যে জনসংখ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা মানুষের বহুকালের পুরানো। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরেরও আগে সুমেরীয়দের মধ্যে জনগণনার প্রচলন ছিল। চৈনিক দার্শনিক কনফিউসিয়াসের চিন্তাধারায় জমির উৎপাদন ও রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারটা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি বলেছিলেন, জনসংখ্যা খুব কম থাকলে চাষবাস কম হবে। ফলত রাজস্ব আদায়ও কমবে। তাঁর ভাবনার মূলে আছে সর্বাপেক্ষা কাম্য বা অনুকূল জনসংখ্যা (Optimum Population)। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সার্বভৌম শাসনাধিকার প্রাপ্ত স্বাধীন নারীর (City States) বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে জনসংখ্যার আয়তন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। তাঁর মতে সর্বাপেক্ষা কাম্য জনসংখ্যা হল তাই যা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে প্রয়োজন হয়। কৌটিল্য তাঁর **অর্থশাস্ত্রেও** সর্বাপেক্ষা কাম্য জনসংখ্যা বলতে বুঝিয়েছেন প্রতি এক বা দুই বর্গমাইল এলাকায় 100-150 কৃষিপরিবারের বাসকে। রোমক সাহিত্যেও দেখা যায় যে রোমসম্রাটরা শুধুমাত্র দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থক ছিলেন না। জনসংখ্যা যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ে তার জন্যও তারা উৎসাহ দিতেন। (মজুমদার, 1991)।

পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকার আবিষ্কার, ভারতের সাথে সমুদ্রপথে যোগাযোগ স্থাপন, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের জীবনযাত্রায় একটা বড় পরিবর্তন আনল। মৃত্যুহার কমল, জনসংখ্যা বাড়ল। নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপিত হল। এইসব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন জনসংখ্যা চিন্তাভাবনায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

Malthus-পূর্ব পর্বে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনসংখ্যা বিষয়ক চিন্তাভাবনার রূপটি Mercantilist School of Political Economy-র তাত্ত্বিক আলোচনায় পাওয়া যায়। এই অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার শরিকরা এমন সব প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন যেমন বিবাহে উৎসাহ, বড় পরিবারের বাঞ্ছনীয়তা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, অন্যদেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে যাওয়ার (Emigration) প্রবণতাকে বন্ধ করা যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হবে।

Classical School of Economics-এর প্রাণপুরুষ Adam Smith জনসংখ্যার বর্ধিত আয়তন সমাজে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া আনতে পারে তা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, জনসংখ্যা বাড়লে একদিকে যেমন পণ্যের বাজার বৃদ্ধি পাবে তেমনি বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থার স্বার্থে শ্রম-বিভাজনকে (Division of Labour) আরও প্রসারিত করা সম্ভব হবে।

Machiavelli, Botero এবং Richard Cantillon-এর লেখায় Malthus তত্ত্বের পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। Machiavelli-এবং Botero আরও বলেছেন যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও রোগাক্রমণের কারণে জনসংখ্যার প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ স্বাভাবিকভাবেই লোপ পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সহায়-সম্পদের সম্পর্কের কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। Cantillon জনসংখ্যার আয়তন বৃদ্ধির সাথে জীবনযাত্রার মানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার দু'টি মূল সুর হল—(1) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থতির সাথে তাল রেখে জনসংখ্যা একটি বিশেষ মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, (2) জীবনযাত্রার মানের উন্নতির সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Robert Wallace এবং আরো অনেকে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য রাষ্ট্রীয় বদান্যতার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছেন। Poor Laws-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন যে, দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তা করতে রাষ্ট্র অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এগিয়ে আসলে তা দেশের সার্বিক জীবনযাত্রার মানকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত করতে পারে (মজুমদার, 1991)।

Hung Liang-Chi অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে কথা বলেন তা বহুলাংশে Malthus-এর বক্তব্যেরই অনুরূপ। Malthus-এর মত তিনি জনসংখ্যা ও জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনে অসম বৃদ্ধির হারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনগণনা জনপ্রিয়তা লাভ করায় অনেক দেশের জনসংখ্যা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য বহুল পরিমাণে জনমিতিবিদদের করায়ত্ত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সত্ত্বেও ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের মধ্যে ব্যবধানটি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি বিষয়ে সবাই একমত যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির গতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতির তুলনায় যথেষ্ট কম। সেজন্য জনসংখ্যা দেশের সমৃদ্ধি, প্রগতি ও শক্তির প্রতীক না হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রতিবন্ধক রূপেই ক্রমশ স্বীকৃত হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ে এই যে মনোভাবের পরিবর্তন তা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে Malthus-এর জনসংখ্যা তত্ত্বে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জনমিতিবিদরা জনসংখ্যা বিবর্তনের ইতিহাসে Malthus-কে মধ্যমণি রেখে তিনভাগে ভাগ করেছেন—(1) Malthus পূর্ববর্তীকাল, (2) Malthus-এর সমসাময়িককাল ও (3) Malthus পরবর্তীকাল (Pre-Malthusian, Malthusian and Post-Malthusian Era)। নিচে আমরা কয়েকটি জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

### ম্যালথুসীয় তত্ত্ব

কোন দেশের জনসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে রেভারেন্ড টমাস রবার্ট ম্যালথাস (1766-1834)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, যা 'ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব' নামে পরিচিত। তাঁর মতে কোন দেশের জনসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, কিন্তু কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নিয়ম (Law of Diminishing Returns) অনুসারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সেই হারে বাড়ে না। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা গুণোত্তর প্রগতিতে (Geometrical Progression) অর্থাৎ 1, 2, 4, 8, 16, 32 এইভাবে বাড়ে, অর্থাৎ এই প্রগতির বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি রাশিই তার আগের রাশির দু'গুণ। খাদ্যোৎপাদন সমান্তরাল প্রগতিতে (Arithmetical Progression) যেমন 1,3,5,7,9,11 .... এইভাবে বাড়ে। ম্যালথাস আরও বলেছেন যে এই হারে জনবৃদ্ধি চলতে থাকলে পঁচিশ বছর পর তা দু'গুণ হবে। ম্যালথাসের মতে দেশে খাদ্যশস্যের যোগানের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন দেশের খাদ্যোৎপাদন জনগণের চাহিদা মেটাতে পারে না। ফলে দেশে জনাধিক্য দেখা দেয়। জনাধিক্য মানেই খাদ্যের ঘাটতি, আর খাদ্য ঘাটতি মানেই অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধের হাতছানি। ফলস্বরূপ, দেশে মৃত্যুহার বাড়ে এবং জনসংখ্যাও কিছু কমে। এইভাবে জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যালথাসের মতে এই ভারসাম্য কিন্তু খুবই ক্ষণস্থায়ী, কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জনসংখ্যা গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়তে তাকে, কিন্তু যেহেতু খাদ্যের যোগান সেই হারে বাড়ে না তাই অল্পদিনের মধ্যেই জনাধিক্য দেখা যায়। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে দুটি প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণের (Preventive Checks) কথা বলেছেন। যেমন— বেশি বয়সে বিয়ে করা বা চিরকুমার / চিরকুমারী থাকা।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাবলীর চিন্তাভাবনা ও ব্যাখ্যায় Malthus (1766-1834) কে পথিকৃৎ-এর সম্মান দেওয়া হয়। অবশ্য, তাঁর অনেক আগে থেকেই আমাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে জনসংখ্যার ভূমিকা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। দার্শনিক Plato এবং Aristotle জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ও জনসংখ্যা সমস্যার মোকাবিলায় কিছু কিছু ব্যবস্থারও উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ায় Malthus-এর জন্মের প্রায় ষোলশত বৎসর পূর্বে দার্শনিক Tertullian জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলেছেন। Tertullian-র বক্তব্যের সারমর্ম হল : মানুষের সংখ্যা দিন দিনই পৃথিবীর নিকট বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কেননা জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিন দিন আমাদের চাহিদা বাড়ছে, আর এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে প্রকৃতি তাল রাখতে পারছে না। এই অবস্থা চলতে থাকলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং ভূমিকম্পই আমাদের মাঝে-মধ্যে কিছু পরিমাণ জনসংখ্যা কমিয়ে দিয়ে অশেষ দুর্দৈব থেকে বাঁচাতে পারে।

Malthus-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি জনসংখ্যা পরিবর্তন সম্পর্কে একটি সুসামঞ্জস ও সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম যিনি গণিতের সাহায্যে দেখালেন কি দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির গতি কেমন করে নিয়ন্ত্রণ হতে পারে বা করা যেতে পারে সে সম্বন্ধেও তিনি উপযুক্ত নির্দেশিকা রাখলেন। 1798 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সেই সাড়া জাগানো ছোট্ট বইটিতে : An Essay on the Principles of Population as it affects the Future Improvement of Mankind with remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet and other writers.

**ম্যালথাসের তত্ত্বের মূল সুর**

উপরোক্ত তত্ত্ব দাঁড় করাতে ম্যালথাস কয়েকটি অনুমান করেছেন। তা হল—

(1) মানুষ সামাজিক জীব। তাই তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের চাপ- এই দুই শক্তির মধ্যে যে

টানাপোড়েন তা মনুষ্যেতর প্রাণীর চেয়ে বেশ জটিল। বংশবৃদ্ধির সহজাত সংস্কার খুব প্রবল হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তাকে রাশ টানতে হয়। তার বিচার-বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম ক্ষমতাই তাকে ভাবতে বাধ্য করে যে যাদের সে এই পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসছে তাদের লালন-পালনের জন্য যথেষ্ট রসদ যোগানোর মত ক্ষমতা আছে কিনা?

(2) ম্যালথাসের মতে— মানুষ স্বভাব-অলস। বিয়ে ও সন্তান-সন্ততিই তাকে কাজে উদ্বুদ্ধ করে। "প্রতিটি সবল মানুষের পিছনেই আছে অন্তত একজন মহিলা এবং একদল অমিতাহারী সন্তান-সন্ততি। কাজ যেহেতু ভাল, বিবাহও ভাল কেননা বিবাহের ফলেই মানুষের কর্মে আগ্রহ আসে।" জনবৃদ্ধি কিভাবে রোধ হয়? এ বিষয়ে ম্যালথাস কিছু অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন ও কয়েকটি দেশের উদাহরণ দিয়েছেন। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ বা সভ্যতার কথা শোনা যায়নি যেখানে অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু ব্যবস্থাপত্র নেই। সব দেশেই কুসংস্কার, শহর জীবনের অশুভ পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর বৃত্তি বা কঠিন পরিশ্রমের ফলে কিছু না কিছু লোক অকালেই মারা যায়। তিনি আরও বলেছেন বংশ বিস্তারের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পৃথিবীর কোনো দেশে কখনও ছিল না, কখনও থাকবে না, একটি উদাহরণও তিনি দিয়েছেন—

আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের দেশগুলো খাদ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা যথেষ্ট সহজ-সরল, বিশুদ্ধ ও অনাড়ম্বর। অল্প বয়সে বিবাহের যে সমস্ত বাধা ইউরোপে ছিল তা ওখানে ছিল না বললেই চলে। ম্যালথাসের হিসেবে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত এই দেড়শ বছরে 25 বছর অন্তর ঐ সব দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ঐ সময়ের শহর জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ঐ একই সময়ে কোনো কোনো শহরে মৃত্যুহার জন্মহারের থেকেও বেশি ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ঐ সব শহরে বংশবৃদ্ধির হার স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ছিল, আর সেই কারণেই প্রাকৃতিক নিয়মেই মৃত্যুহারও দ্রুত। ম্যালথাস চীন, জাপান, এশিয়া ও আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে উৎপাদন ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেছেন যে অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে এই সব দেশে খাদ্যোৎপাদন দ্বিগুণ হতে বহু বৎসর সময় লাগবে।

শেষ পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহে বিরাট ঘাটতিই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করবে এ বিষয়ে ম্যালথাস নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু এই চরম প্রতিবন্ধকের প্রয়োগ দুর্ভিক্ষ ছাড়া সাধারণ সময়ে দরকার হয় না।

**সমালোচনা**

ম্যালথাসের এই জনসংখ্যা তত্ত্বটিকে আধুনিক অর্থনীতিবিদরা নানা দিক থেকে সমালোচনা করেছেন। যেমন—(1) পৃথিবীর বহুদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস আলোচনা করে দেখা গেছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে। তাই বলা চলে যে ম্যালথাসের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে সেই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক আছে। আরও দেখা গেছে যে কোন দেশের জীবনযাত্রার মান ও শিক্ষার হার যত বাড়ে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও তত কমে আসে। যে সমস্ত দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে, তাদের কাছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তেমন কোন সমস্যা নয়।

(2) ম্যালথাস বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা চিন্তা করেন নি। ম্যালথাসের তত্ত্ব প্রচারের পর পৃথিবীর অনেক দেশে কৃষি ও শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে খাদ্যের যোগান যে বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব, ম্যালথাস তা বিচার করেন নি।

(3) কোন দেশ খাদ্যোৎপাদনে স্বাবলম্বী না হলেও ঐ দেশ বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে পারে। অনেক দেশ আছে যারা শিল্পে উন্নত, অথচ খাদ্যোৎপাদনের দিক দিয়ে স্বনির্ভর নয়।

পক্ষান্তরে, শিল্পে অনগ্রসর দেশও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যোৎপাদন করে। এ ক্ষেত্রে ওই দু-দেশের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য ও খাদ্যশস্যের বিনিময়ের মাধ্যমে খাদ্যসমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়।

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব কোন উন্নয়ন তত্ত্ব নয়। যে সব দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার দু-ই বেশি, সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য (Zero) হয়। ফলে উন্নয়ন বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উন্নত দেশে জন্ম ও মৃত্যুহার এক নয়। এইসব দেশে কাম্য জনসংখ্যার পরিধি (Size of Optimum Population) সময়ের তালে তাল রেখে পাল্টায়। সুতরাং কাম্য জনসংখ্যার সঠিক পরিধি নির্ণয় করা যায় না। তাই যদি হত, তবে ওই অপরিবর্তনীয় জনসংখ্যার (কাম্য জনসংখ্যা একই থাকলে) জন্য এত অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন হত না। পক্ষান্তরে, উন্নয়নের প্রবাহকে এগিয়ে নিতে গেলে বেশিসংখ্যক লোকের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, কোন দেশের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে বিপুলসংখ্যক জনসংখ্যার প্রয়োজন। তাই অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, কানাডা প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়ে থাকে। তাই বাস্তব পরিস্থিতিতে ম্যালথুসীয় তত্ত্বের অসাড়তা ধরা পড়ে।

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদের আংশিক সত্যতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অনেকে মনে করেন পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে আগামী দিনে সারা পৃথিবীতে খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে কোন উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের প্রথমদিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে মৃত্যুহার দ্রুত কমে যায়, অথচ জন্মহার প্রায় একই থাকে। এর ফলে জনসংখ্যা বেশ তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। এর ফলস্বরূপ দেশের মাথাপিছু আয় কমে যায়, যার দরুন দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাই উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভারতের মত স্বল্পোন্নত অথচ জনবহুল দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

## 3.3 অন্যান্য তত্ত্ব

**3.3.1 Sadler :** ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও সমাজ-সংস্কারক মাইকেল টমাস স্যাডলার (1780-1835) ছিলেন ম্যালথাসের সমসাময়িক। Sadler-এর জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়ম ম্যালথাসের তত্ত্বের ঠিক বিপরীত। Sadler-এর মতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতার মধ্যে এক বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যান্য শর্তাবলী একই প্রকার থাকলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তখনই কমবে, যখন সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের জন্য সবচেয়ে বেশি সুখ অর্জন করা যাবে। বস্তুতপক্ষে, Sadler-এর তত্ত্বের ভিত্তি হল কোনো স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রজনন আকাঙ্ক্ষা কমে, অর্থাৎ Sadler-এর জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বিষয় হল জনকল্যাণের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ।

**সমালোচনা**

এ কথা ঠিক যে, প্রজনন ক্ষমতা বেশি না হলে জন্মহার বেশি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রজনন ক্ষমতা বেশি হলে জন্মহারও বেশি হবেই এ কথা ঠিক নয়, কেননা জন্মহার প্রজনন ক্ষমতা ছাড়াও আরও অনেক কিছুর উপর

নির্ভর করে। Sadler ব্যাখ্যা করেন নি জনঘনত্বের সঙ্গে (যা মূলত পরিবেশ ঘটনা) শারীরবৃত্তীয় ঘটনার সম্পর্কটি কেমনভাবে আসছে।

**3.3.2 Doubleday :** ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও সমাজ দার্শনিক Thomas Doubleday (1790-1870) বলেছিলেন যে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যে একটা পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক আছে। যে সব জায়গায় খাদ্য সরবরাহ পর্যাপ্ত রয়েছে, সেই সব স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হয়। আবার যেখানে খাদ্যের যোগান কম, সেখানে জনবৃদ্ধির হার বেশি। তাঁর মতে শোষাক্ত অবস্থা দরিদ্র দেশে দেখা যায়। এই দুই বিপরীত অবস্থার মধ্যে রয়েছে সেইসব দেশ যেখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব কম। Dobleday-র এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে Castro পরিমার্জিত করেছিলেন। Castro-র মতে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য বেশি খেলে প্রজনন ক্ষমতা কমে যায় (সারণি 1.1)।

**সারণি 1.1 : কয়েকটি দেশের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় জৈব প্রোটিনের গড়মাত্রা এবং ঐ সব দেশের জন্মহার**

| দেশের নাম | জন্মহার | প্রতিদিনের খাদ্যে জৈব প্রোটিনের গড় মাত্রা (গ্রামে) |
|---|---|---|
| ফরমোসা | 45.6 | 4.7 |
| মালয়েশিয়া | 39.7 | 7.5 |
| ভারত | 33.0 | 8.7 |
| জাপান | 27.0 | 9.7 |
| যুগোশ্লাভিয়া | 25.9 | 11.2 |
| গ্রীস | 23.5 | 15.2 |
| ইতালি | 23.4 | 15.2 |
| বুলগেরিয়া | 22.2 | 16.8 |
| জার্মানি | 20.0 | 37.3 |
| আয়ারল্যান্ড | 19.1 | 46.7 |
| ডেনমার্ক | 18.3 | 59.1 |
| অস্ট্রেলিয়া | 18.0 | 59.9 |
| যুক্তরাষ্ট্র | 17.9 | 61.4 |
| সুইডেন | 15.0 | 62.6 |

এটা পরীক্ষিত সত্য সমস্ত দেশে জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের ভাগ্যে যেখানে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে

না, যাও বা জোটে তার খাদ্যগুণ অতি নিম্ন মানের, যেখানে অনাহারে ও অর্ধাহারে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়, সেই সব দেশেই জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ভয়াবহ ( যেমন—এশিয়া, ল্যাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকা)। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলোতে খাদ্যের সরবরাহ শুধু পর্যাপ্তই নয়, খাদ্যের গুণগত মানও উচ্চস্তরের। এই সব দেশ শুধু যে মৃত্যুহার কম তা নয়, জন্মহারও কম, যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড। মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এটা প্রমাণিত হয়েছে। গো-পালকরা লক্ষ্য করেছেন যে কোনো গরু যদি অত্যধিক মোটা হয়ে যায় তবে তার প্রজননক্ষমতা হ্রাস পায়। এই সব গরুকে যদি বেশ কিছুদিন স্বল্পাহারে রাখা যায় তবে তারা আবার তাদের স্বাভাবিক প্রজননক্ষমতা ফিরে পায়।

Decastro-র *(The Geography of Hunger)* মতে ধারাবাহিক অর্ধাহার ব্যক্তি মানসিকজীবনে পরিবর্তন আনে। অর্ধাহারের ফলে শারীরবৃত্তীয় ঘাটতিজনিত অতৃপ্তি যৌবন আবেদন বাড়ায়। সাধারণ অবস্থায় শারীরিক ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধার মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকে। একের ঘাটতি অপরটিকে সক্রিয় করে।

**সমালোচনা**

Decastro-Doubleday তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবেই জৈবতত্ত্ব। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত চিন্তাভাবনা যে জন্মনিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। সুতরাং জৈবিক ঘটনার সঙ্গে এই সামাজিক উপাদানসমূহের কোনো সম্পর্ক আছে কি না এবং কেমন করেই বা সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে তা যতদিন না বোঝা যাচ্ছে ততদিন শুধুমাত্র জৈব কারণেই জন্মহারের পার্থক্য ঘটে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। বরং জন্মহার নিয়ন্ত্রণে একে অপরের পরিপূরক এ ধরনের চিন্তা যুক্তিগ্রাহ্য (মজুমদার, 1991)।

**3.3.3 Spencer :** ব্রিটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (1820-1903) সামাজিক ও জৈবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে Sadler ও Doubleday-র মতবাদের সঙ্গে তাঁর মতবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতিতে একটা নিয়ম আছে যা মানুষকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেবে। স্পেনসার বলেছেন মানুষ নিজেকে যত ব্যক্তিগত, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগাবে ততই প্রজননের প্রতি আগ্রহ কমবে। তাঁর মতে এটাই হল প্রকৃতির নিয়ম। স্পেনসারের মতে ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য আরও সময় ও শক্তির প্রয়োজনে নারীদের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা (reproductive capacity) স্বাভাবিকভাবে কমে যাবে। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে প্রজনন উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে আনবে।

পশ্চিমী দেশগুলোর দিকে তাকালে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় Spencer যা বলেছেন তা হয়তো স্বাভাবিক নিয়মেই মানব সমাজে ঘটে থাকে। এই সব দেশের জনগণ ব্যক্তিগত উৎকর্ষ, শিক্ষা-দীক্ষা, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও অর্থনৈতিক প্রগতির অতি উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে। এই সব দেশে জন্মহারও বিশ্বের নিম্নতমদের অন্যতম। কিন্তু এই সব দেশের মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা কমছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি (মজুমদার 1991)।

**সমালোচনা**

ম্যালথাস দেখিয়েছেন মানুষের দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার চাপ মূলত জৈবিক। তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে সব সময়েই থেকেছে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি সমস্যা। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মূল বিষয় এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকেই

তিনি ইতিহাস, দর্শন ও সামসাময়িক সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে Marx-এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার আলোচনা (সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জনসংখ্যা যে সমস্যা হতে পারে তা তিনি স্বীকার করেন না) বেশ কিছুটা বিক্ষিপ্ত। তার প্রবন্ধের বেশিরভাগটাই Malthus-এর তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করতে ও ধনতন্ত্রবাদের বিরোধিতা করতেই কেটে যায় (মজুমদার, 1991)।

Thompson এবং Lewis বলেছেন যে, Marx 'বিশ্বাস করতেন' জনসংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ম্যালথাসের তত্ত্বের ঠিক বিপরীত। তাঁরা আরো বলেন যে Marx-এর এই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি যথেষ্ট দৃঢ় নয়। Marx-এর জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধ পড়লে একটা কথাই মনে হয় যে ম্যালথাসের তত্ত্ব নিয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা না দিলে হয়তো তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা সম্বন্ধে কলমই ধরতেন না। তাঁর লেখা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে অনেক সময়ই মনে হয় যে ম্যালথাসের বক্তব্য খুব একটা ধৈর্য ও য- সহকারে তিনি পড়েন নি। ম্যালথাস তাঁর নিবন্ধ প্রথম প্রকাশ হবার পর আরো অনেক অভিনিবেশ সহকারে ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা এবং দেশ বিদেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির নানা তথ্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সেই সঙ্গে প্রতিকূল সমালোচনার সারবত্তা অনুধাবনের চেষ্টাও করেছেন। পরবর্তীকালের সংস্করণগুলিতে তিনি তাঁর তত্ত্বের বেশকিছু পরিমার্জিত ও সংযোজন করছেন ( যেমন, প্রথম সংস্করণে প্রতিষেধক প্রতিরোধের কথা বলেন নি) এবং তাঁর মূল বক্তব্যের সমর্থনে নানাবিধ তথ্য সরবরাহ করেছেন। Marx-এর লেখা পড়লে মনে হয় যে তিনি বোধ হয় ম্যালথাস নিবন্ধের সবকটি সংস্করণ পড়েন নি অথবা পড়লেও প্রথম সংস্করণের পাঠটিকেই সমালোচনার লক্ষ্য বস্তু করেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে একটা তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার ভঙ্গি দেখতে পাওয়া যায়। কখনও বা মনে হয় কেবলমাত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমর্থকদের একহাত নেবার জন্যই তিনি জনসংখ্যা সমস্যা সম্বন্ধে কলম ধরেছিলেন (মজুমদার, 1991)।

**3.3.4 Marx :** *Das Kapital*-র লেখক কার্ল মার্কস (Karl Marx, 1818-1883) একজন প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ছিলেন। সাম্যবাদ (Communism) তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থনীতি বিষয়ে মার্কস নিজে যেটুকু লিখেছেন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লেখা হয়েছে তাঁর লেখাকে নিয়ে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে তাঁর লেখায় পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈপ্লবিক আবশ্যকতা ও যৌক্তিকতার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? Marx দাবি করেছেন জীবন ধারণের রসদের উপর জনসংখ্যার চাপের যে প্রবণতা তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ধনতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থব্যবস্থা। কম্যুনিজমের আদর্শ গ্রহণ করলে এই চাপ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হবে। Marx বলছেন, "শ্রমিকশ্রেণি তাদের পরিশ্রম দিয়ে শুধু যে পুঁজিই বৃদ্ধি করে তা নয় ; এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন তারা নিজেরাই হয়ে যায় অপাংক্তেয়, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ; এবং এই ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।" এই অবস্থা (উদ্বৃত্ত শ্রমিক) প্রতিনিয়ত চলার ফলে শ্রমিকশ্রেণির মাথায় সর্বদাই ছাঁটাই-এর খড়্গ উদ্যত থাকে। এই অবস্থাকে কাজে লাগিয়েই মালিকপক্ষ ক্রমাগত শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ করে যান। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করে মার্কস বলেছেন যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় পারস্পরিক উৎপাদন সম্পর্কগুলো সমাজের উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না। ফলে সমাজে বিত্তবান (haves) ও সর্বহারা (have-nots) মধ্যে অবিরাম সংঘাতের সৃষ্টি হয় যা পুঁজিবাদের উন্নতি পর্যায়ে চরম আকার ধারণ করে। এরূপ সংগ্রামে শেষপর্যন্ত পুঁজিবাদ উৎখাতিত হয়ে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the proletariat) প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কস ঐতিহাসিক যে কোন ঘটনাকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক কারণেই পৃথিবীর সমস্ত

সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্কিত বিবর্তন ঘটে থাকে। ঐতিহাসিক মতবাদকে উপেক্ষা করে তিনি বলেছেন যে অর্থনৈতিক শক্তিই সমস্ত রকম বিবর্তনের জন্য দায়ী। উপরন্তু সামাজিক কাঠামোর সবপ্রকার পরিবর্তন শ্রেণিসংগ্রামের (Class Struggle) মধ্যে দিয়ে ঘটে থাকে। মার্কসের মতে সামাজিক বিবর্তনের পাঁচটি স্তর আছে—(1) আদিম সাম্যবাদ (Primitive Communism), (2) দাস সমাজ (Slavery), (3) সামন্ততন্ত্র (Feudalism), (4) ধনতন্ত্র (Capitalism) ও (5) সমাজতন্ত্র (Socialism)। এই পাঁচটি স্তরের মধ্যে একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে উত্তরণ ঘটে থাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী। অন্যভাবে বলতে হয় উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ একস্তর থেকে অপর স্তরে গিয়ে পৌঁছোয়। এই 5টি স্তরের মধ্যে প্রথম ও শেষ স্তর যথাক্রমে শ্রেণিহীন এবং শোষণহীন সমাজ। অন্য 3টির বৈশিষ্ট্য হল এই যে ওই তিনটি স্তরে কোন একটি শ্রেণি অপর শ্রেণিকে শোষণ করে, আর তার ফলে ওই তিনটি স্তরে শ্রেণিসংগ্রাম দেখা যায়। এই শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমেই অর্থনীতি অগ্রসর লাভ করে।

মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী সবক্ষেত্রে সফল হয়নি। আবার যেভাবে সফল হবে মনে করা হয়েছিল, অনেক দেশে সেভাবে সফল হয়নি, অর্থাৎ সাম্যবাদ হলেও মার্কস-নির্দেশিত উপায়ে তা কার্যকরি হয়নি। তবে মার্কসীয় মতবাদের যতই সমালোচনা করা হোক না কেন, এটা ঠিক যে তিনি সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর কিছু কিছু ধারণা বর্তমান দিনে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও অনেকগুলো মৌলিক মতবাদ আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁর কারিগরি উন্নতি, মুনাফা, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ইত্যাদি ধারণাগুলো উন্নয়ন অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। শোষিত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাকেই বড় করে দেখেছিলেন বলে মার্কসের মতবাদ এত ঝড় তুলেছিল।

**3.3.5 Ricardo :** ডেভিড রিকার্ডো (1772-1823) ম্যালথুসীয় তত্ত্বকে গ্রহণ করলেও তাকে কিছুটা পরিমার্জিত করে নিজস্ব বিশ্লেষণে একটি তত্ত্ব খাড়া করেন। 'The Principle of Political Economy' বইতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে David Ricardo যে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন তা পরবর্তীকালে "বাজার তত্ত্ব" (Marketing Principle) নামে খ্যাত হয়। রিকার্ডোর মতে ভূস্বামী, পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণির যৌথ অংশগ্রহণে দ্রব্য তথা শস্য উৎপাদিত হয়। সে কারণে উৎপাদিত সামগ্রী এই তিন শ্রেণির মধ্যে বন্টিত হওয়া উচিত, তবে বাজার তত্ত্বে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রমকে। শ্রমিকের চাহিদা মজুরীর ঊর্ধ্বমুখী গতি সৃষ্টি করে। রিকার্ডোর মতে মুনাফা ও মজুরীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক আছে। তিনি বলেছেন যে ফসলের দাম কমা-বাড়ার সাথে সাথে মজুরীর হার ওঠা-নামা করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়বে ও প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে, ফলে খাদ্যশস্যের দাম কমবে। এই জন্য আত্মপোষণ স্তরে (Subsistence Level) চলতি মজুরীর হার কমবে, কিন্তু মুনাফা বাড়বে। এতে মূলধন পুঞ্জীভূত হতে থাকবে। এটা আবার শ্রমিক চাহিদা বৃদ্ধি করবে যা পর্যায়ক্রমে মজুরী বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শস্যের চাহিদাও বাড়বে।

**রিকার্ডোর তত্ত্বের ত্রুটিগুলো হল :** (1) এই তত্ত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অস্তিত্ব কম দেখা যায়। (2) এই মতবাদ খাদ্যশস্যের মূল্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। অথচ জমিতে খাদ্যশস্য ছাড়াও বহুবিধ ফসল জন্মায়। (3) এই তত্ত্বানুসারে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি মজুরী হ্রাস করে। কিন্তু সব সময়ে যে জনসংখ্যা বাড়বে, এমন কোনও কথা নেই। বরং দেখা গেছে আয় বৃদ্ধি জনসংখ্যা হ্রাস করেছে ও মজুরী বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

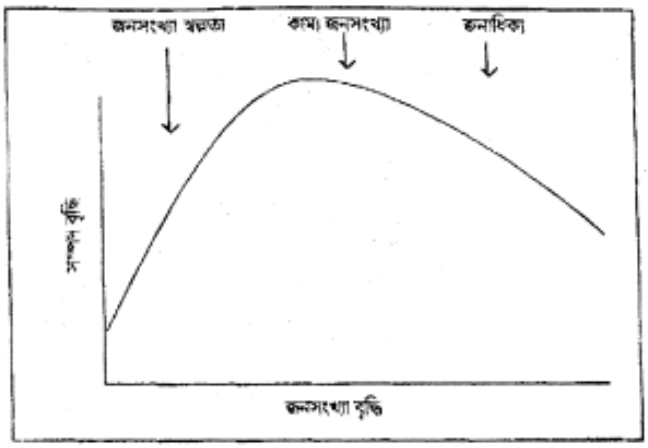


চিত্র 1.1 : কাম্য জনসংখ্যা

## 3.4 কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Theory of Optimum Population)

অধ্যাপক ক্যানান (Cannan) ও সান্ডার্স (Saunders) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের বদলে "কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব" (চিত্র 1.1) নামে একটি বিকল্প জনসংখ্যা তত্ত্ব প্রচার করেন। ম্যালথাসের ন্যায় এই তত্ত্বে শুধুমাত্র খাদ্যের যোগানের সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক বিচারের পরিবর্তে দেশের মোট প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার সমস্যাটিকে বিচার করা হয়েছে। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার করার জন্য একটি নির্দিষ্টসংখ্যক জনসংখ্যার প্রয়োজন হয় যাকে কাম্য বা সর্বোত্তম জনসংখ্যা বলা হয়ে থাকে। যদি কোন দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ওই কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় কম হয়, তবে সেই দেশটি জনস্বল্পতার (underpopulation) সমস্যায় ভুগছে বলা হয়ে থাকে। এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হলে বলতে হবে দেশটি জনাধিক্য (overpopulation) সমস্যায় ভুগছে। যদি কোন দেশে বর্তমান জনসংখ্যা ও কাম্য জনসংখ্যা পরস্পর সমান হয়, তবে বলতে হয় ওই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। ব্যাপারটা একটু ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় যে সম্পদের উপযুক্ত ও পূর্ণ ব্যবহার করে কোন দেশে যতসংখ্যক জনতার জনসংখ্যার পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা যায়, তা ব্যাখ্যা করতে অধ্যাপক থিরল্ওয়াল (Thirlwal) C4-টি উপায়ের কথা বলেছেন—(1) কাম্য জনসংখ্যা বলতে সেই পরিমাণ জনসংখ্যাকে নির্দেশ করা যেতে পারে যার দ্বারা দেশের মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হবে।

বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যদি কোন দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হয়, তবে সেক্ষেত্রে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম রয়েছে বুঝতে হবে (সরখেল, 1994)। এই অবস্থায় জনসংখ্যা বাড়লে তবে তার সাহায্যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানো যাবে। ফলে দেশের মাথাপিছু আয় বাড়বে, অর্থাৎ যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে কোন দেশের মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হবে, সেই পরিমাণ জনসংখ্যাই হল ঐ দেশের কাম্য জনসংখ্যা।

(2) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি সর্বনিম্ন কল্যাণের স্তরের দ্বারা সূচিত হতে পারে। এই ধারণানুসারে যতদূর পর্যন্ত

জনসংখ্যা বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদন (marginal production) সর্বনিম্ন কল্যাণস্তরের (welfare level) সঙ্গে সমান হবে, সেইটি হবে কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ।

(3) যদি আমরা ধরি যে মোট উৎপাদন সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে কাম্য জনসংখ্যা হবে যেখানে সর্বনিম্ন কল্যাণস্তর গড় উৎপাদনের সঙ্গে সমান।

(4) কাম্য জনসংখ্যা হল সেই পরিমাণ জনসংখ্যা যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন হল শূন্য অর্থাৎ যেখানে মোট উৎপাদন হল সর্বাধিক।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বাপেক্ষা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি অপেক্ষাকৃত উন্নত, কারণ এই মতবাদে জনসংখ্যার সমস্যাটি শুধু খাদ্য সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে দেশের সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে।

(i) তবে মুশকিল হল এই যে কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ কত তা নির্ণয় করা কঠিন। স্বভাবতই, আমরা বলতে পারি যে সেই দেশটি জনস্বল্পতা না জনাধিক্য সমস্যায় ভুগছে?

(ii) এই তত্ত্বটি স্থিতিশীল (Static)। কারণ কতকগুলো বিষয় এই তত্ত্বে অপরিবর্তিত আছে তা ধরে নেওয়া হয়। যেমন দেশের উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন ব্যবস্থা বা দেশের মোট সম্পদ অপরিবর্তিত আছে এটা এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়। বাস্তবে কিন্তু এটা ঘটে না।

(iii) এই তত্ত্বে জনসংখ্যা কী হারে বাড়ছে, সে সম্পর্কে কোন রকম আলোকপাত করা হয়নি।

(iv) এই মতবাদানুসারে মাথাপিছু আয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই জনসংখ্যার কাম্যতা নির্ণীত হয়। কিন্তু যদি আয়ের বণ্টন অসম হয়, তবে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হলেই জনতার শ্রীবৃদ্ধি যে যথেষ্ট হবে, তা বলা যায় না। তাই এই তত্ত্বটি কোন অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে না।

সবশেষে বলতে হয় কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব একটি আদর্শ লক্ষ্য মাত্র। দাঁড়িপাল্লার একদিকে ওজন বেশি হলে অন্যদিকে যেমন ভারসাম্য নষ্ট হয় তেমনি জন্মহার, মৃত্যুহার ঘটলে কাম্য জনসংখ্যা স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে। যেহেতু উপরোক্ত উপাদানগুলো গতিশীল, তাই কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ পরিবর্তনশীল।

## 3.5 মানুষ-জমি অনুপাত (Man-Land Ratio)

কোন স্থানের জমির ওপর জনসংখ্যার প্রকৃত চাপ কিরূপ, তা জনবসতির ঘনত্ব দিয়ে জানা যায় না। কোন অঞ্চলের উন্নতির পরিমাপ করতে হলে কার্যকরি জমির হিসেব করতে হবে। কারণ মানুষ ও জমির মধ্যে সুষ্ঠু

$$\text{মানুষ-জমি অনুপাত} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট কার্যকর জমির অনুপাত}}$$

অনুপাত বজায় রাখতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নয়। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নও সম্ভব হবে না, তবে একথাও ঠিক যে সমস্ত জমির ও মনুষ্যবসতির অনুপাত নিয়ে উন্নতির গড় হিসেব করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

মানুষ-জমির অনুপাত বলতে বোঝায় মানুষ ও কার্যকরি জমির অনুপাত। এটি নির্ণয়ের সূত্র হল :

কার্যকরি জমি বলতে বোঝায় যে জমি থেকে মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য বস্তু উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে ব্রাজিল দেশটির মোট জমির পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের মোট জমির চেয়ে বেশি। কিন্তু ঐ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বা মানুষের জীবনযাত্রার মান যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক কম, কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে ব্রাজিলের বেশির ভাগ জমি অনুর্বর ও কৃষির অনুপযোগী।

কার্যকরি জমির হিসেব করতে সামগ্রিক প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে বিশ্লেষণ করতে হবে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে জমির কার্যকারিতা গতিশীল। মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতির সাথে সাথে জমির কার্যকারিতা বাড়ছে। অতীতে জমি ছিল দ্বিমাত্রিক, বর্তমানে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে জমি ত্রিমাত্রিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। স্বভাবতই জমির কার্যকারিতাও বেড়েছে। মানুষ ও জমির অনুপাতের উন্নতি ঘটেছে। যুক্তরাজ্য সম্পর্কে বলা হয় যে দেশটি যদিও আয়তনে ছোট, আর জনঘনত্ব বেশি, তথাপি ঐ দেশের জনসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনে সক্ষম হয়েছে, কারণ যুক্তরাজ্য তার অধীনস্থ উপনিবেশগুলো থেকে সস্তায় খাদ্যশস্য ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করত। আবার যুক্তরাজ্য তার উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য উপনিবেশগুলোতে চড়া দামে বিক্রয় করতে পারত। অর্থাৎ যুক্তরাজ্য তার রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করে তার উপনিবেশসমূহের ওপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে পেরেছিল। প্রভুত্ব দু'প্রকার হতে পারে—(1) রাজনৈতিক ও (2) অর্থনৈতিক। যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক অধিকার কায়েম না করেও অনুন্নত দেশগুলোকে ঋণের ফাঁদে বেঁধে ঐ সব দেশের সম্পদের ওপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম করেছে। ইংল্যান্ডের জমির কথায় আসা যাক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল দিনগুলোতে ইংল্যান্ডের কার্যকরী জমি নিজ ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে উপনিবেশের ভূখণ্ডের মধ্যেও ব্যাপ্ত ছিল। ইংল্যান্ডের কার্যকরি জমির হিসেব করতে গিয়ে উপনিবেশের জমির কার্যকারিতাও বিচার করতে হবে। অতএব কার্যকরী জমি হল :

নিজের দেশের কার্যকরী জমি + অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ + উপনিবেশের কার্যকরী জমি ও সম্পদ।

সামগ্রিক বিচারে মানুষ ও জমির অনুপাত বলতে বোঝায়—

$$\frac{\text{কার্যকরী জমি + অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ + উপনিবেশের কার্যকরী জমি ও সম্পদ}}{\text{লোকসংখ্যা + কর্মক্ষমতা}}$$

জমির মোট আয়তন থেকে অনুর্বর ও ব্যবহার অযোগ্য জমির আয়তন বাদ দিলে কার্যকরী জমি পাওয়া যায়। ব্যবহারযোগ্য জমি বলতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে ব্যবহৃত জমিকে বোঝায়। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আছে খনিজ সম্পদ, বনভূমি ইত্যাদি। লোকসংখ্যা বলতে শুধুমাত্র জনতার সংখ্যা নয়, তাদের বুদ্ধি, শিল্প, প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলো ভাবতে হবে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে জমির কার্যকারিতা কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। যেমন—(i) **জমির অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা** যা তার আয়তন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে। (ii) **জমির বাহ্যিক কার্যকারিতা।** এই বিষয়টি সমাজবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে সৃষ্টি। উপনিবেশের সম্পদ যে পরিমাণে ব্যবহৃত হবে, জমির বাহ্যিক কার্যকারিতা সে পরিমাণে বাড়বে। উভয় প্রকার কার্যকারিতাই দেশবাসীর সাংস্কৃতিক বিকাশের ওপর নির্ভর করে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে জন-জমির অনুপাত নির্ণয় করতে যে কোন সম্পদ উৎপাদনের কাজে

নিয়োজিত জমির মোট আয়তনকে বিবেচনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু পৃথিবীর সব দেশের জনসাধারণের সাংস্কৃতিক স্তর এক নয়, তাই জনসংখ্যাকে ও সংস্কৃতির স্তরানুযায়ী পরিবর্তন করে নিয়ে মানুষ-জমির অনুপাত স্থির করতে হবে। এইভাবে নির্ণীত মানুষ-জমি অনুপাত থেকে দেশের অর্থনীতির অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর নানা অংশের মানুষ-জমির অনুপাত পাঁচটি ধাঁচে বিভক্ত। জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাতের প্রকৃতি নিচে দেওয়া হল :

## 3.6 জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চল (Population-Resource Region)

Ackerman পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্পদ অনুপাত অঞ্চল নির্ণয় করতে তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলো হল— জনসংখ্যা, সম্পদ এবং কারিগরি উপাদান। এদের মধ্যে কারিগরি বিদ্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে সব দেশ কারিগরি বিদ্যায় খুব উন্নত এবং যেখানে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রচুর ব্যক্তি আছেন, সে সব দেশে সম্পদের ব্যবহারও বেশি, যেমন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। এই ভিত্তিতে Ackerman পৃথিবীকে পাঁচটি ..... সম্পদ অঞ্চলে ভাগ করেছেন (চিত্র 1.2)। যথা—

1. **যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচ :** জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাত কম। এই ধাঁচের দেশসমূহ প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত।
2. **ইউরোপীয় ধাঁচ :** জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাত বেশি। এই ধরনের ধাঁচের দেশসমূহও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত।
3. **ব্রাজিলীয় ধাঁচ :** জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাত কম। এই ধাঁচের দেশসমূহ প্রযুক্তিবিদ্যায় অনুন্নত।
4. **মিশরীয় ধাঁচ :** জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাত বেশি। এই ধাঁচের দেশসমূহ প্রযুক্তিবিদ্যায় অনুন্নত।
5. **মরুভূমি মেরুদেশীয় ধাঁচ :** প্রাকৃতি অসুবিধের জন্য জমির কার্যকারিতা কম। এখানকার অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অন্যস্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়। মোটের ওপর বলা চলে যে এই অঞ্চল জনবিরল। বর্তমানে এই অঞ্চলের গুরুত্ব হল এই যে এখান থেকে শিল্পের বিভিন্ন কাঁচামাল যেমন খনিজ তেল, বিভিন্ন আকরিক পদার্থ, পশম, সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

Zelinksy ও জনসংখ্যা সম্পদের সম্পর্কের ভিত্তিতে পৃথিবীকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। তাঁর Type A, Type B, Type C, Type D ও Type E যথাক্রমে **যুক্তরাষ্ট্রীয়, ইউরোপীয়, ব্রাজিলীয়, মিশরীয় এবং মরুভূমি ও মেরুদেশীয় ধাঁচের অনুরূপ।**

**যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচ :** এই ধাঁচের দেশসমূহের বর্তমান বা সম্ভাব্য সম্পদ বেশি। কম জনসংখ্যার এসব দেশ শুধুমাত্র কারিগরি বিদ্যায় উন্নত নয়, দ্রুত বিকাশশীলও বটে। স্বভাবতই কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এইসব দেশে শুধু বেশিই নেই, কারিগরি দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতে পাঠানোর জন্য যথেষ্ট সংখ্যযায় কারিগরি কর্মী পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে এ সব দেশে ভোগবিলাসের জন্য কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট ব্যবহার ঘটেছে। সাধারণভাবে এই সব দেশগুলো আয়তনে বড়। এদের প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট এবং তাদের ব্যবহারও অপরিমিতি।

এইসব দেশের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রুশ ফেডারেশন (রাশিয়া পূর্ব ও

মধ্য), আর্জেন্টিনা ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ভবিষ্যতে এই গোষ্ঠীতে অন্যান্য দেশের অন্তর্ভুক্তিকরণের সম্ভাবনা কম, কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের দেশগুলো ভোগবিলাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। আগামী দিনে হয়তো কোন কোন দেশ এই গণ্ডীর বাইরেও চলে যেতে পারে, যেমন রাশিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাঁচটি ধাঁচের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচ খুব সাম্প্রতিককালে বিকাশ লাভ করেছে। 100 বছর আগেও এটির অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের দেশগুলো তখন ব্রাজিলীয় ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

**ইউরোপীয় ধাঁচ :** কিছু কিছু অঞ্চল আছে যারা এখনও একদিকে জনসংখ্যা ও কারিগরি বিকাশ এবং অপরদিকে সম্পদের বহনক্ষমতার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এদের সম্ভ্রান্ত অঞ্চল (Elite Region)-ও বলে। এইসব দেশগুলো ছোট। সম্পদও সীমাবদ্ধ। জনসংখ্যাও যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের চেয়ে বেশি। ফলে এইসব দেশগুলো স্থানীয় সম্পদকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে। এইসব দেশের কারিগরি জ্ঞান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের দেশগুলোর তুলনায় কোন অংশেই কম নয়।

এইসব অঞ্চলগুলোর সমৃদ্ধি আন্তর্জাতিক স্তরে কারিগরি জ্ঞান ও পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের ওপর নির্ভর করে। যে সব দেশে দক্ষ পরিষেবা বা উন্নতমানের শিল্পদ্রব্যাদির অভাব আছে সেইসব দেশে সেগুলো পাঠানো হয়। এইসব দেশে স্থানীয় সম্পদ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলছে। চিরাচরিত সম্পদ থেকে আরও বেশি উৎপাদন পেতে নতুন নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার চলেছে।

বেশি জনসংখ্যা অথচ সীমাবদ্ধ সম্পদের এই সব অঞ্চলে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের তুলনায় এই ধরনের আর্থ-সামাজিক ধাঁচে ভবিষ্যতে নতুন নতুন দেশের অন্তর্ভুক্ত খুব একটা হতাশাব্যঞ্জক হবে না। এই ইউরোপীয় ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হল পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো (রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, চেকশ্লোভিয়া বাদে), যারা গত 200 বছরের মধ্যে ব্রাজিলীয় ধাঁচ থেকে এই ধাঁচে উন্নীত হয়েছে। ইজরায়েল, জাপানও এই ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত।

**ব্রাজিলীয় ধাঁচ :** এই ধাঁচের দেশগুলো কারিগরি বিদ্যায় একটু পিছিয়ে আছে। এখানে সম্পদ যথেষ্ট। জনসংখ্যা কম থাকায় সম্পদের ওপর চাপ কম। কারিগরি বিদ্যায় অনুন্নত অঞ্চলসমূহের মধ্যে ব্রাজিলীয় ধাঁচের দেশসমূহ বর্তমান জনসংখ্যা ও সম্পদের দিক দিয়ে খুব ভাগ্যবান। এই সব এলাকা সাধারণত বড় আয়তনের। ব্রাজিলীয় ধাঁচ হল ইউরোপীয় ধাঁচ ও মিশরীয় ধাঁচের মধ্যেকার এক পরিবর্তিত অবস্থা। সম্পদের আরও বিকাশ ঘটিয়ে ও এখানকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে এইসব দেশগুলো ইউরোপীয় ধাঁচে পৌঁছবে। কিন্তু জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে সম্পদের যথেষ্ট বিকাশ না ঘটলে এইসব দেশগুলো ব্রাজিলীয় ধাঁচ থেমে মিশরীয় ধাঁচে অবনমিত হবে।

ব্রাজিলীয় ধাঁচের অধিকাংশ দেশসমূহ তিনটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ— ইন্দোচীন, ক্রান্তীয় আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকা। যদিও ইন্দোচীন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ বর্তমানের তুলনায় আরও উন্নত সমাজজীবনের বিকাশ ঘটাতে পারে, তথাপি এখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধা অগ্রগতির পরিপন্থী। অনুরূপভাবে অধিকাংশ ক্রান্তীয় আফ্রিকার দেশসমূহকে ব্রাজিলীয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু এখানকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাধা ব্যাপক অর্থনৈতিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ল্যাতিন আমেরিকা দেশসমূহের মধ্যে ব্রাজিল মালভূমি, বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা, আর্জেন্টিনার মধ্যভাগ ও প্যারাগুয়ের নাম করতে হয়। বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে কিউবা, মধ্য আমেরিকা উল্লেখযোগ্য। আগামী দিনে তৈলসমৃদ্ধ মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলো এই ধাঁচের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

চিত্র 1.2 : বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা / সম্পদের অনুপাত

**মিশরীয় ধাঁচ :** জনসংখ্যা-সম্পদ অঞ্চলের দিক দিয়ে মিশরীয় ধাঁচের মান খুব নিচে। মিশরীয় ধাঁচের দেশগুলোতে জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে বেশ অসাম্য রয়েছে। এই দেশগুলোতে জনঘনত্ব বেশি। এখানে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এখানকার বসত এলাকাগুলো উর্বর উপত্যকায় সীমাবদ্ধ। এখানকার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হল কৃষি। বেশির ভাগ কৃষিজমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। কৃষিজমির আওতায় অধিক জমি আনার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ কম। তাই উৎপাদনও কম। এখানে কারিগরি জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ সীমাবদ্ধ। মূলধনও সীমাবদ্ধ। উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদও এখানে নেই। সামাজিক উন্নতির স্তরও নিচু। জনসাধারণের একটা বড় অংশ অশিক্ষিত। জনগণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশই এক সময় এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে। মিশরীয় ধাঁচের দেশের উদাহরণ মিশর নিজেই। এই দেশটি কারিগরিবিদ্যায় পিছিয়ে আছে। পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশেই এই ধাঁচের দেশ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন আফ্রিকার মিশর, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো দক্ষিণ ইউরোপের গ্রীস, সিসিলি, এশিয়ার চীন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি। চীন ও ভারত যদি অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও একই সাথে সম্পদ উন্নয়ন করতে পারে, তবে ঐ দুটি দেশ ইউরোপীয় ধাঁচের (অর্থনীতির) অন্তর্ভুক্ত হবে।

## 3.7 মানব সম্পদ ও তার গুণগত আয়তন (Human Resource and Its Qualitative Dimensions)

### 3.7.0 ভূমিকা (Introduction)

সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষেরও ভূমিকা আছে, অর্থাৎ মানুষও সম্পদ। আগেকার দিনে মানুষকে সম্পদ বলে না ভাবা হলেও বর্তমানে মানুষকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচনা করা হয়। মানব সম্পদ বলতে মানুষকে বোঝায়। কারণ মানুষের শক্তি ও কায়িক শ্রম (Physical Labour)-ই মানব সম্পদ। মানুষের জন্যই প্রাকৃতিক উপাদানগুলো

সম্পদে পরিণত হয়। মানুষের শক্তি ও শ্রমের সাহায্যে প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগৃহীত হয়। সম্পদ বিকাশে শক্তি ও শ্রমের যোগান এবং তাদের উৎকর্ষতা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এজন্য জিমারম্যান (Zimmermann) বলেছেন ''Man plays a unique role in the overall scheme of resource develpment'', অর্থাৎ সম্পদ বিকাশের সামগ্রিক পরিকল্পনায় মানুষ এক অতুলনীয় ভূমিকা নেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে ধরাপৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানুষ হলেও সব মানুষ-ই কিন্তু সম্পদ নয়। যে মানুষ সংস্কৃতি-মনস্ক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে প্রকৃতির নানা বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে উঠে অসংখ্য নিরপেক্ষ উপাদান (Neutral Stuff) কে অহরহ সম্পদে পরিণত করে চলেছে, সেই মানুষই মানবিক স্তরের মানুষ। পক্ষান্তরে, ভোগী ও জ্ঞানচর্চাহীন মানুষ পশুপদবাচ্য। সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে এই ধরনের মানুষ উন্নততর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার সুযোগ তৈরি করে এবং এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলে। সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের এই অনন্য ভূমিকার জন্য মানবসম্পদ এত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় (Human resources combine the task of production agent with the end object of the entire process. They constitute the end values to be achieved in this process.—Zimmermann)।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে সম্পদ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান Adam Smith-র মতে কোন দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সে দেশের মানুষের শ্রম, দক্ষতা, কর্মনিপুণতা এবং বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতার ওপর। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা তাই বলেন যে মানুষের পেশাগত দক্ষতা, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংগঠনই তাকে সম্পদ সৃষ্টির উপাদান হিসেবে এতখানি উচ্চে স্থান দিয়েছে। তাই বেরী (Brian G.L. Berry) বলেছেন, ''Thes focus of economic system is man, who plays numerous roles : manager, and organiser, labourer in the production and distribution of goods and consumer of those goods'' **(The Geography of Economic Systems)**। প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটি জনবিরল হওয়ায় সেখানকার সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর হয়নি। একই কথা খাটে কানাডা দেশ সম্পর্কেও।

### 3.7.1 মানব সম্পদের গুণগত আয়তন (Qualitative Dimension of Human Resource)

কোন দেশের সম্পদ উন্নয়নে মানুষের ভূমিকা দু'প্রকার— পরিমাণগত ও গুণগত। এই দু'প্রকার ভূমিকায় মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রথমটি হল জনশক্তির (Man Power) সংখ্যা, দ্বিতীয়টি হল জনসাধারণের শ্রম, বুদ্ধি-বিবেচনা, শিক্ষার মান, স্বাস্থ্য, কর্মস্পৃহা ও কর্মদক্ষতা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত জনমিতিবিদরা (Demographer) জনসংখ্যার প্রথমোক্ত ভূমিকাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু গত বিশ বছরের বেশি সময় ধরে জনমিতিবিদরা লক্ষ্য করেছেন যে জনসংখ্যার গুণগতদিকগুলোও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরা দেখেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান প্রকৃতপক্ষে উন্নত হচ্ছে কিনা, তা বোঝার জন্য এই গুণগত দিকগুলোকে জানা দরকার। এখন আমরা সাক্ষরতা ও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিয়ে আলোচনা করব।

### 3.7.2 সাক্ষরতা ও শিক্ষা (Literacy and Education)

''The United Nations has defined literacy as the ability of a person to read and write, understanding a short simple statement on his everyday life.'' (Bhande and Kanitkar , 1985) ভারতীয় জনগণনা দপ্তরের মতে যদি কোন ব্যক্তি যে কোন ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারেন, তবে তাকে সাক্ষর বলা যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও পরিকল্পনা কমিশন ঠিক করেছেন যে 7 বছর ও তার

বেশি বয়সীদের সাক্ষর হিসেবে গণ্য করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল শিক্ষা কি, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, বা পৃথিবীতে বয়স্ক শিক্ষিতের হার কিরূপ ?

শিক্ষা হল মানব সমাজের একটি মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া। শিক্ষা বলতে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে বড় করে তোলা বা সাফল্যের সঙ্গে মানসিকতা গড়ে তোলা ''According to Aristotle, to educate meant to develop man's faculties, especially his mind so that he may be able to enjoy the econtemplation of supreme truth, beauty and goodness.'' (Vidya Bhusan & Sachdeva)। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato)-র মতানুসারে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যে হল জ্ঞানার্জন। দার্শনিক রাসেল (Bertrand Russel)-এর মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের সৎ চরিত্র গঠন করা। স্পেনসার (Herbert Spencer)-এর মতানুসারে, শিক্ষা লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ জীবনের সামগ্রিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার জন্য যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা। ভারতীয় দার্শনিক অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর University Education Commission-র প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছেন, ''The purpose of all education, it is admitted by thinkers of East and West, is to provide a coherent picture of the universe and integrated way of life.''

শিক্ষা মানুষকে স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা দেয়। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বোঝার ক্ষমতা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জন্মায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজের ঐক্য বা সংহতিকে সুদৃঢ় করা। মানব সম্পদের বিকাশের জন্য শিক্ষার অবদান অপরিসীম।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, শিক্ষা আয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা না থাকলে আমোদপ্রমোদ, গণতান্ত্রিক অধিকার, উপার্জন ইত্যাদি সবকিছুরই দরজা বন্ধ। তাই তাদের জীবনকুশলতার পরিমাণ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষার দু'টি দিক আছে—(1) সাধারণ শিক্ষা যা মানুষকে সাধারণভাবে জীবনে চলবার পথে সাহায্য করে। (2) অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্যও শিক্ষা প্রয়োজন হয়। উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু যথেচ্ছভাবে ব্যয় করলেই শিক্ষার প্রসার লাভ হবে এ কথা বলা যায় না।

শিক্ষার স্তরবিন্যাস আছে : (a) প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মানুষ কিছু ভাষা-জ্ঞান, সংখ্যা-গণনা ইত্যাদি আয়ত্ত করে। শৈশবেই এই শিক্ষা শেষ হয়। সেজন্য কোনও দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিনিয়োগ করার সময় সেখানে 6 থেকে 11 বা ওইরকম বয়ঃগোষ্ঠীর বালক-বালিকার সংখ্যা কত তা অবশ্য জানতে হয়।

(b) প্রাথমিক স্তরের পর আসে মাধ্যমিক স্তর। এই স্তরে মোটামুটি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধেই মানুষকে জানতে হয়।

মাধ্যমিক স্তর পেরোলে মানুষ জীবনপথে চলবার কিছুটা পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি এর স্তর পার হয় তাহলেই সেই সমাজ শিক্ষিত সমাজ রূপে পরিগণিত হতে পারে।

(c) মাধ্যমিক স্তরের পরে আসে উচ্চ শিক্ষার স্তর। এখানেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশ্ন ওঠে।

উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীম। দরিদ্র দেশে সাধারণ শিক্ষাস্তর পার হবার সুযোগ অধিকাংশ লোক পান না। তাই অনেকেই এসব দেশে উচ্চশিক্ষার খাতে বেশি ব্যয় করার পক্ষপাতী নন।

শিক্ষার মান ও যোগ্যতার কথা বাদ দিয়ে স্বাক্ষরতাকে যদি শিক্ষার মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়, তবে দেখা যায় যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাক্ষরতা-জ্ঞানসম্পন্ন জনতার হার শতকরা 30 জন মাত্র। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে শিক্ষার এই নিম্নমান সম্পদ সৃষ্টির পথে অন্তরায়। সংখ্যার দিক থেকে সেখানে মানব সম্পদ অনেক ; কিন্তু গুণগত মানের বিচারে তা খুব নগণ্য। সুতরাং মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য সবার আগে যা দরকার তা হল শিক্ষার বিস্তার (গুহ, 1987)।

পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষই নিরক্ষর। অবশ্য সাক্ষরতা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ও নির্ভরশীল পরিসংখ্যান নেই। এমন কি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও পৃথিবীতে সাক্ষরতা বণ্টন নিয়ে কোন মানচিত্র প্রকাশ করে নি (Hussain, 2002)। যাই হোক, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা চলা যে আফ্রিকায় সবচেয়ে কমসংখ্যক মানুষ শিক্ষিত (চিত্র 11.1, 11.2)। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীশিক্ষার হার খুব কম। আফ্রিকার চেয়ে এশিয়ায় সাক্ষরতার হার সামান্য বেশি (চিত্র 11.1, 11.2), যদিও তা 30 শতাংশের কম। দক্ষিণ আমেরিকায় অবশ্য সাক্ষরতার হার তুলনামূলকভাবে বেশি। আবার শহর ও গ্রামের শিক্ষিতের হারেও তফাৎ আছে।

পৃথিবীতে নিরক্ষরের সংখ্যা সম্ভবত ভারতেই সবচেয়ে বেশি (28.1 কোটি)। গোটা বিশ্বের 30 শতাংশ বয়স্ক নিরক্ষরের দেশ এই ভারতভূমি। আবার পৃথিবীর 22 শতাংশ নিরক্ষর শিশুও ভারতীয়। বর্তমান বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগামী দিনে এই অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করে তুলবে। আরও লক্ষ্যণীয় যে, ভারতবর্ষের 60 শতাংশ নারী-ই নিরক্ষর। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে চীন আজ ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। UNESCO-র একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, ভারত 87টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 50তম স্থানে রয়েছে।

নাইজার, নেপাল, সেনেগাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নাইজারে মাত্র 13.6 শতাংশ, নেপালে 27.5 শতাংশ, সেনেগালে 33.2 শতাংশ, পাকিস্তানে 37.8 শতাংশ এবং বাংলাদেশে 38.1 শতাংশ মানুষ শিক্ষিত (সারণি 11.1)। আবার নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

শিক্ষার এই নিম্নমানের জন্য উন্নয়নশীল দেশের লোকেরা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন নন। এবার প্রাথমিক শিক্ষার কথায় আসা যাক। সারণি 11.1 থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেই স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনুপাত, বা শিক্ষক/শিক্ষার্থীর অনুপাত কিংবা মোট সাক্ষরতার হারেই প্রভেদ রয়েছে।

**সারণি 1.1 : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা**

| দেশের নাম | স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনুপাত % | চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা চালাতে পারে % | শিক্ষক/শিক্ষার্থী অনুপাত | মোট সাক্ষরতা হার % |
|---|---|---|---|---|
| মেক্সিকো | 98.0 | 81 | 31 | 87.3 |
| ব্রাজিল | 88.0 | 47 | 23 | 81.1 |
| ইন্দোনেশিয়া | 96.7 | 89 | 23 | 77.0 |
| চীন | 100.0 | 86 | 22 | 73.0 |
| নাইজেরিয়া | 59.3 | 67 | 41 | 50.7 |
| মিশর | 91.0 | 99 | 23 | 48.4 |
| ভারত | 66.3 | 61 | 46 | 48.2 |
| পাকিস্তান | 29.3 | 59 | 41 | 37.8 |
| বাংলাদেশ | 62.9 | 52 | 63 | 38.1 |

**সূত্র : মনোরমা ইয়ারবুক, 1996**

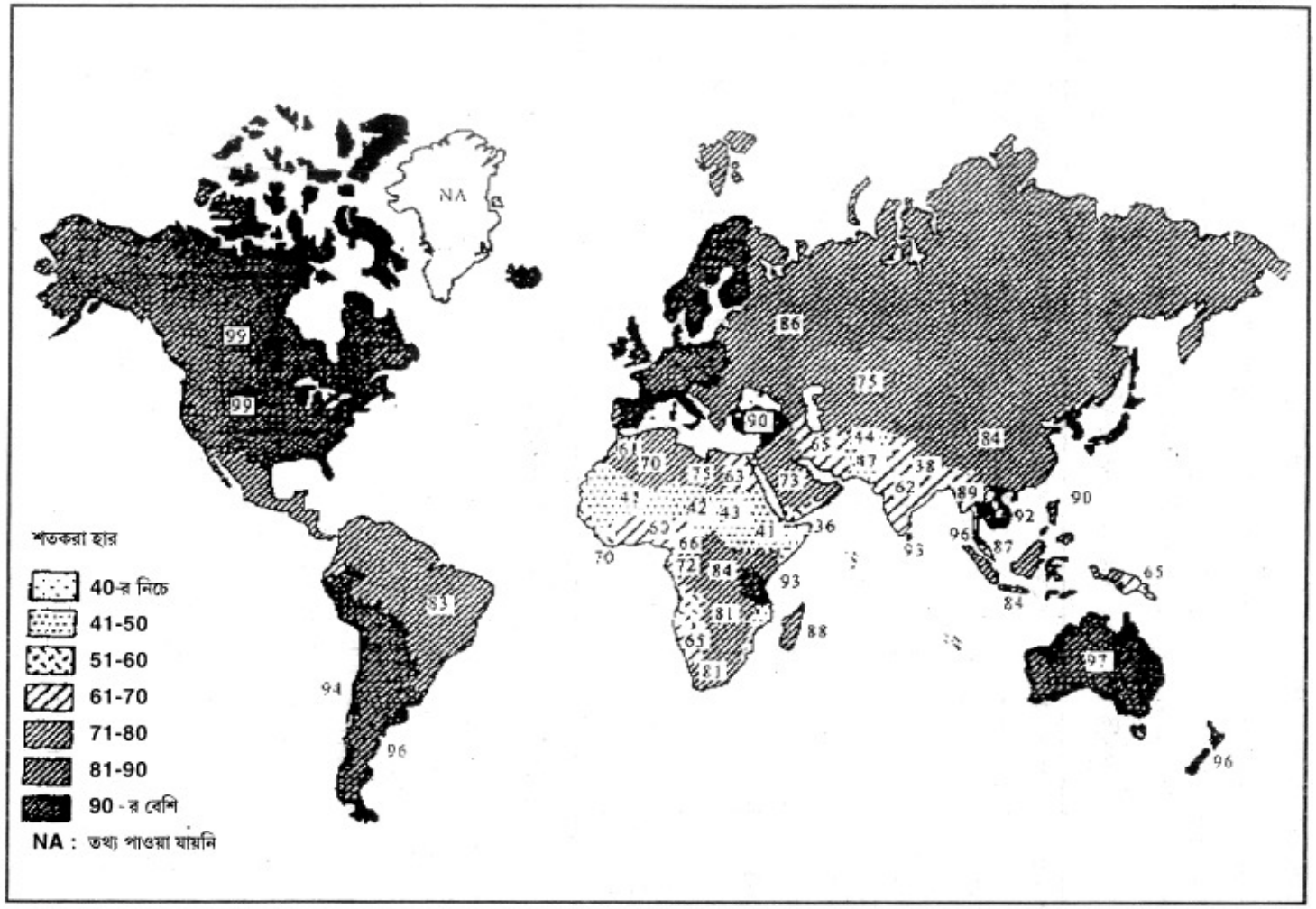


চিত্র 11.1 : পৃথিবী : প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শিক্ষিতের হার, 1995

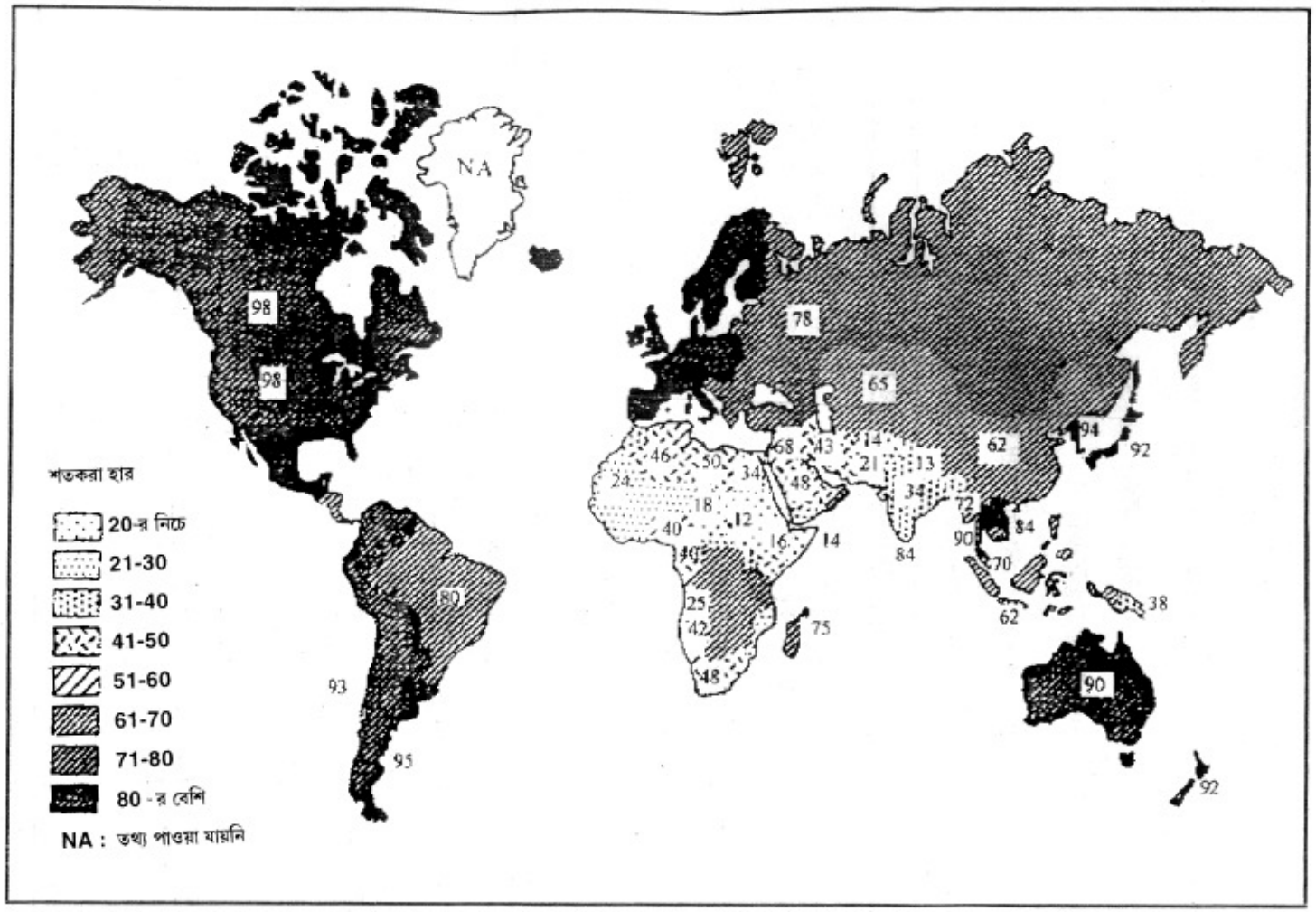


চিত্র 11.2 : পৃথিবী : প্রাপ্তবয়স্ক নারী শিক্ষার হার, 1995

## স্কুল-পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বয়স 6-17 বছর)

| শতাংশ | দেশ |
|---|---|
| 90% বা তার বেশি | কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে। |
| 80-89% | চীন, ইতালি, অস্ট্রিয়া, মেক্সিকো। |
| 70-79% | তুরস্ক, ইরাক, টিউনিশিয়া। |
| 60-69% | ভারত, মায়ানমার, নেপাল, সৌদি আরব |
| 60%-এর কম | পাকিস্তান, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ইথিয়োপিয়া, জাইরে। |

***Source :*** *Atlas of Environment*

## প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে শিক্ষিতের হার

| শতাংশ | দেশ |
|---|---|
| 75% ও তার বেশি | কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে। |
| 80-94% | পর্তুগাল, তুরস্ক, মেক্সিকো, ব্রাজিল। |
| 60-79% | চীন, সৌদি আরব, লিবিয়া। |
| 40-59% | ভারত, মিশর, আলজিরিয়া। |
| 40%-এর কম | পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল। |

***Source :*** *Atlas of Environment*

## প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে শিক্ষিতের হারে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য

| দেশ | প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিতের হার | | |
|---|---|---|---|
| | পুরুষ (%) | নারী (%) | মোট (%) |
| **উন্নত দেশ** | | | |
| জার্মানি | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| ফ্রান্স | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| জাপান | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| **উন্নয়নশীল দেশ** | | | |
| ভারত | 65.5 | 37.7 | 52.0 |
| বাংলাদেশ | 49.4 | 26.1 | 38.1 |
| পাকিস্তান | 50.0 | 24.4 | 37.8 |

***Source :*** *Human Development Report : 1998*

### 3.7.3 বয়স্ক শিক্ষার হার (Adult Literacy Rate)

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেড়ে হয়েছে বর্তমানে গড়ে 70 শতাংশ ; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে 90 শতাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার 51 শতাংশের মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়ে গেছে (চিত্র 11.3)। **নারীশিক্ষার হারে** (Female literacy) প্রচুর উন্নতি করেছে মধ্য আফ্রিকা ও আরবের দেশগুলো (44 শতাংশ)। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার হার বাড়লেও নারীশিক্ষার দিকে এখানকার দেশগুলো এখনও পিছিয়ে আছে (55 শতাংশ)। অপরদিকে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার হার প্রায় 100 শতাংশ, তবে নতুন কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এসব দেশের বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের দক্ষতার হার খুবই কম। কারিগরি শিক্ষায় অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে পারে— সেখানকার অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান পড়ার দিকে ঝোঁকে।

### 3.7.4 স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Health and Nutrition)

WHO-র মতে শুধুমাত্র নিরোগ থাকাই নয়। সম্পূর্ণভাবে শারীরিক ও মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গলও স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। এটি মানুষের গুণাগুণের একটি দিক যা যথোপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবার দ্বারা আরোও বিকাশ ঘটানো যেতে পারে।

জনসংখ্যার কত ভাগ লোক স্বাস্থ্য ও পরিষেবার আওতায় এলেন তার সূচক হল ঐ পরিষেবা ও জনতার অনুপাত। এ বিষয়ে World Bank-র World Development Indicators, 2000-এ যে সূচকগুলোর কথা বলা হয়েছে, তা হল—

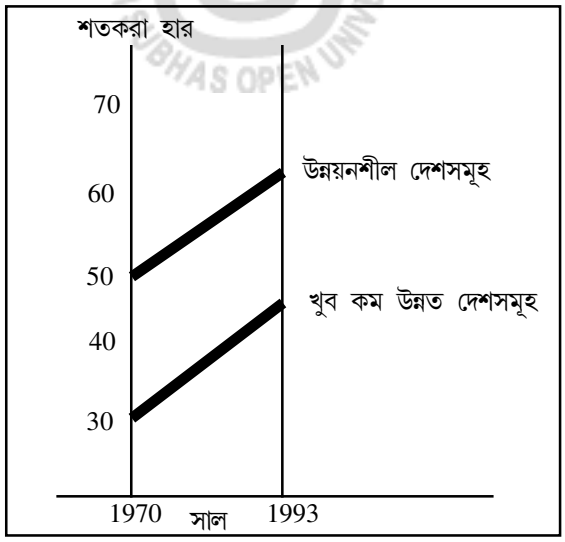


চিত্র 11.3 : প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হারে উন্নতি (Hussain অনুকরণে)

(a) স্বাস্থ্য খাতে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কত শতাংশ খরচ করা হয় ;

(b) স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু খরচের পরিমাণ কত ;

(c) প্রতি 1000 জন পিছু কতজন ডাক্তার আছেন ;

(d) প্রতি 1000 জন-পিছু হাসপাতালে কতগুলো শয্যা পাওয়া যায় ;

(e) রোগী ভর্তির হার কত ;

(f) শিশুদের নিরোগ রাখার প্রকল্পে (Child immunization) যোগদানের হার প্রভৃতি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে— স্বাস্থ্যখাতে প্রতিটি দেশের সরকার বহুভাগে খরচ করে। কেন্দ্রীয় এবং

**সারণি 11.2 : 1990 থেকে 1998 সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা**

| স্বাস্থ্য সূচক | উন্নয়নশীল দেশ | | | উন্নত দেশ |
|---|---|---|---|---|
| | নিম্নবিত্ত দেশ | নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশ | উচ্চ মধ্যবিত্ত দেশ | |
| স্বাস্থ্যখাতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) শতকরা ব্যয়ের পরিমাণ (%) প্রতি বছরে | 4.2% | 5.3% | 6.3% | 9.8% |
| স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু খরচের পরিমাণ প্রতি বছরে | 23 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 1,150 টাকা | 102 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 5,100 টাকা | 335 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 16,750 টাকা | 2.585 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 1 লক্ষ 30 হাজার টাকা |
| প্রতি 1,000 মানুষ-পিছু ডাক্তারের সংখ্যা | 1 জন | 2 জন | 1.5 জন | 2.8 জন |
| প্রতি 1,000 মানুষ-পিছু হাসপাতালের সংখ্যা | 1.8 টি | 5.1টি | 3.2টি | 7.4টি |
| প্রতি 100 জন মানুষ-পিছু রোগী ভর্তির হার (%) | 5 জন | 15 জন | 6 জন | 15 জন |
| 1 বছরের কম বয়সী প্রতি 100 জন শিশুর মধ্যে কত জনকে সংক্রামক রোগ প্রতিহত করার টিকা দেওয়া হয়েছে (%), যেমন হাম, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া | 80 জন | 89 জন | 92 জন | 100 জন |
| টিটেনাস | 82 জন | 89 জন | 82 জন | 100 জন |

***Source :*** *World Development Indicators, 2000*

রাজ্য বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে টাকার বরাদ্দ করা হয়। বিভিন্ন ঋণদান সংস্থা থেকে দরকার বোধে সরকার ধার নেয়। তাছাড়া নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠন বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলার জন্য টাকা খরচ করে। World Bank-এর 2000-এর প্রতিবেদন অনুসারে 1990 থেকে 1998 সালের মধ্যে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনস্বাস্থ্যের মান ভাল ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বার্ষিক মাথাপিছু আয় অনুসারে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(a) নিম্নবিত্ত দেশ, ; (b) নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশ,, ও (c) উচ্চ মধ্যবিত্ত দেশ,,,।

এছাড়া রয়েছে উচ্চবিত্ত উন্নত দেশ যাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় 9,380 ডলারের বেশি।

এবার দেখা যাক্ উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাখাতে কিরকম ব্যয় করে বা উভয় প্রকার দেশগুলোতে পরিষেবার ধরন কিরকম।

সারণি 11.2 থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট ব্যয়ের মাত্র 5.3% স্বাস্থ্যখাতে খরচ করা হয়। অথচ উন্নত দেশগুলোতে এই খরচের পরিমাণ গড়ে 9.8%। পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাতে খরচের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি 13.9%, আর নাইজিরিয়াতে সবথেকে কম (0.7%)। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচের পরিমাণ 5.2%।

WHO-র দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া, টিটেনাস, হুপিং কাশি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। এছাড়া বর্তমানে AIDS-এর মারাত্মক রোগ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সব দেশেই এই রোগ থেকে প্রচুর প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সব দেশে সাধ্যমত ব্যবস্থা নিলেও রোগী প্রতি চিকিৎসকের সংখ্যা এত কম যে, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো ঠিকমত রূপায়ণ করা, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফ্রিকার ইথিয়োপিয়াতে প্রতি 72,000 জনে ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র 1 জন। পক্ষান্তরে, ফ্রান্স, জার্মানির মত উন্নত দেশে প্রতি 500 জনের জন্য এক জন করে ডাক্তার রয়েছে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের ফলেও বিকাশশীল দেশগুলোতে রোগের প্রাদুর্ভাব ও শিশুমৃত্যুর হার বেশি। WHO-র প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পৃথিবীতে প্রতি পাঁচ জনে এক জন অকালে মারা যায়। সুষম খাবার না পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম প্রায় 1 কোটি 10 লক্ষ শিশু মারা যায়।

---

* মাথাপিছু বার্ষিক আয় 760 ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় 38,000 টাকা)।

, , মাথাপিছু বার্ষিক আয় 761-3030 ডলার (38,00-1.5 লক্ষ টাকা, প্রায়)।

, , , মাথাপিছু বার্ষিক আয় 3031-9,360 ডলার (1.5-4.68 লক্ষ টাকা, প্রায়)।

সুতরাং মানব সম্পদের সার্বিক উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রতিষেধক ও চিকিৎসার সুযোগগুলো জনসাধারণের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার (চট্টোপাধ্যায়, 2001)। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা নিচের সারণি (11.3) থেকে ধরা পড়ে।

**সারণি 11.3 : 1995 থেকে 2000 সালের মধ্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা**

| দেশ | স্বাস্থ্য | | | পুষ্টি | |
|---|---|---|---|---|---|
| | গড় আয়ু (বছর) (1995-2000) | শিশু-মৃত্যু (হাজার) | কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা (লক্ষ প্রতি) | প্রয়োজনের তুলনায় ক্যালোরির যোগান (%) | কম ওজনের শিশুর সংখ্যা (Underweight Children (%) |
| **উন্নত দেশ** | | | | | |
| যুক্তরাষ্ট্র | 76.7 | 10 | 0.01 | 138 | × |
| জার্মানি | 76.7 | 7 | | 148 | × |
| যুক্তরাজ্য (%) | 77.1 | 7 | 0.02 | 130 | × |
| ফ্রান্স | 78.8 | 9 | 0.01 | 143 | × |
| জাপান | 80.0 | 6 | 0.26 | 125 | × |
| **উন্নয়নশীল দেশ** | | | | | |
| ভারত | 62.4 | 115 | 0.36 | 101 | 53 |
| বাংলাদেশ | 58.1 | 115 | – | 88 | 67 |
| পাকিস্তান | 63.9 | 137 | – | 99 | 38 |

***Source :*** *World Resources, 1998-99*

এছাড়া শহরাঞ্চলে প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশের সব মানুষ উন্নত পয়ঃপ্রণালী ও শৌচাগারের সুযোগ ভোগ করেন। পক্ষান্তরে, ভারতে 70%, বাংলাদেশে 77% ও পাকিস্তান 77% মানুষ এই সুযোগ পান। এজন্য ঐ সব দেশের মানুষজন খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এজন্য তারা বিভিন্ন সংক্রামিত রোগে আক্রান্ত হন।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শহরবাসীর সংখ্যা কম। আর শহরবাসীরাই উন্নত পরিষেবার সুযোগ ভোগ করে থাকেন (সারণি 11.4)।

**সারণি 11.4 : মানুষের জীবনযাত্রার গুণমানের পার্থক্য**

| সূচক | সাল | যুক্তরাষ্ট্র | জার্মানী | যুক্তরাজ্য | ফ্রান্স | জাপান | রাশিয়ান ফেডারেশন | ভারত | বাংলাদেশ | পাকিস্তান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **শহরবাসী** | | | | | | | | | | |
| সংখ্যা (%) | 1997 | 77 | 87 | 89 | 75 | 78 | 77 | 27 | 19 | 35 |
| **শহরাঞ্চলে** | | | | | | | | | | |
| পয়ঃপ্রণালী ও শৌচাগারের সুযোগ (%) | 1995 | – | 100 | – | 100 | – | – | 70 | 77 | 53 |
| মাথাপিছু ব্যক্তিগত ভোগের বৃদ্ধি | 1980 | | | | | | | | | |
| | 1996 | 1.8 | – | 2.6 | 1.7 | 2.9 | – | .23 | 0.0 | 1.1 |
| শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির প্রাদুর্ভাব (%) | 1990-96 | – | – | – | 3 | – | 66 | 68 | 40 | |

***Source :*** *World Development Report, 1998-99*

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হল যে, পৃথিবীর বিকাশশীল দেশগুলোতে মানব উন্নয়নের হার খুব কম, আর এজন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও জনসংখ্যা-সম্পর্কিত কারণগুলো যে দায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

## 3.8 জনসংখ্যা সমস্যা ও জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতি (Population Problems and Population Policies)

### 3.8.1 জনসংখ্যা সমস্যা : উন্নয়নশীল দেশ (Population Problems : Developing Country)

এবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা বিশ্লেষণ করতে প্রথমেই উন্নয়নশীল দেশ ভারতের কথায় আসা যাক। এখানে স্থলভাগের পরিমাণ পৃথিবীর মোট স্থলভাগের 2.4 শতাংশ, অথচ এখানে বাস করেন পৃথিবীর 16 শতাংশ মানুষ। 1964-65 সাল থেকে 1982-83 সালের মধ্যে এদেশে কৃষির উপযোগী স্থায়ী চাষের জমি বেড়েছে 55 শতাংশ, কিন্তু তৃণভূমি ও পশুচারণ ক্ষেত্র কমেছে 5 থেকে 4 শতাংশ। মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ কমেছে 0.33 হেক্টর (1955) থেকে 0.29 হেক্টর (1971), আর বর্তমানে এই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে 0.13 মিলিয়ন টনের মত মাটি ধুয়ে কৃষিসমৃদ্ধ নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি (Lower Gangetic Plain) থেকে বছরে 132.5 মিলিয়ন টনের মত মাটি ধুয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত সেচ, অত্যধিক পশুচারণ, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস, একই জমিতে বারবার ফসল ফলানো ইত্যাদি কারণে বহু জমি অনুর্বর হয়ে পড়ছে, ফলে পতিত জমি বাড়ছে। ভারতে পশুপালিত পশুর সংখ্যা 300 মিলিয়ন — পৃথিবীর 13 শতাংশ— অথচ পশুচারণ ক্ষেত্র সে তুলনায় খুব কম, মাত্র 13 মিলিয়ন হেক্টর।

লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে বর্তমানে চাষের জন্য প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত 10 মিলিয়ন হেক্টর জমি, জ্বালানি কাঠের জন্য 40 মিলিয়ন হেক্টর জমি, আর পশুখাদ্যের জন্য 10 মিলিয়ন হেক্টর জমি। মনে রাখতে হবে ক্ষয়প্রাপ্ত জমি উদ্ধার ও জমির অপব্যবহার রোধ প্রভৃতির জন্য সুষ্ঠু নীতি রচনা করা গেলে তবেই এই অতিরিক্ত চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। এখানে মাথাপিছু গড় পানীয় জলের পরিমাণ খুবই কম। এখানকার শহরগুলিতে বাস করেন প্রায় 285 মিলিয়ন মানুষ, এদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি লোক (প্রায় 200 মিলিয়ন) জল সরবরাহ ব্যবস্থায় উপকৃত হন। বাকিরা বছরের পর বছর পানীয় জলের অভাবে ভোগেন। তামিলনাড়ু ছাড়া ভারতের প্রায় 38,000 গ্রামে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই নেই। 1986 সালের 13 মে জনসংখ্যা উন্নয়ন নিয়ে এক জাতীয় সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছিলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধিই ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা, আর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা।

এবার আবাসন সমস্যার দিকে তাকান যাক। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী আব্দুল গফরের মতে আমাদের দেশে এই মুহূর্তে 24 কোটি হাউসিং ইউনিট তৈরি করা প্রয়োজন। এর মধ্যে 18 কোটি দরকার গ্রামাঞ্চলে। আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরমুখী যে স্রোত চলে আসছে, তার ধাক্কায় জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঝুপড়ি বস্তিতে ভরে যাচ্ছে কোলকাতা, মুম্বাই ও দিল্লীর মতো মেট্রোপলিটন শহর। বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়া কোলকাতার উন্নয়নের প্রশ্নে বলেছিলেন যে এসব মানুষের জীবিকার সুষ্ঠ ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে শহরকে সুন্দর করে গড়ে তোলা যাবে না।

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব আছে। শিল্পের কাঠামো এখনও অনুন্নত। শিল্পক্ষেত্রে এখনও ভোগ্যপণ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ভারী শিল্প ইদানীং বিকাশ লাভ করেছে। দেশে নানা প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আর তা ব্যবহারের জন্য যত মূলধন প্রয়োজন তা পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অভাবে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

সংক্ষেপে ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব দাঁড়ায় নিম্নরূপ :

প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতে উন্নয়নের কাজ দ্রুত করা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে ভারতে অগ্রগতির হার খুবই কম। দ্বিতীয়ত, ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বেশির ভাগ যেহেতু অপ্রাপ্তবয়স্ক, সেজন্য এরা শ্রমের যোগান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না, পক্ষান্তরে এরা দেশের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়াচ্ছে। ফলে দেশের আয় মূলধন গঠনের কাজে না লেগে উৎপাদন বাড়াতে সরাসরি ভোগের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে। ফলে বিনিয়োগের হার বাড়ছে না। তৃতীয়ত, যেহেতু ভারতের জনসংখ্যার 73 ভাগই কৃষির সঙ্গে যুক্ত, তাই কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে ক্রমশ বেশি পরিমাণ সার ব্যবহার করা হচ্ছে ; অন্যদিকে, তেমনি কৃষকদের মধ্যেও ছদ্মবেশী বেকারত্ব বাড়ছে। চতুর্থত, ক্রমবর্ধমান জনতার চাহিদা মেটাতে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হচ্ছে। অন্যদিকে, কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। পঞ্চমত, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সমস্যাকে ভয়াবহ করে তুলেছে। বেকার সমস্যা অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করে। ষষ্ঠত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন ভারতে শিক্ষার সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে, যার সমাধানে প্রচুর বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। এজন্য অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিনিয়োগ করা যাচ্ছে না। এখন যদি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে, তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভবপর হবে। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। পণ্ডিত নেহেরুর (1959) কথা দিয়ে জনসংখ্যা সমস্যার কথা আবার স্মরণ করছি। তাঁর মতে—''Population control will not solve all problems, but other problems will not be solved without it.''

## 3.9 জনসংখ্যা সমস্যা

উন্নত দেশসমূহ যদিও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জনবসতির আধিক্য যে সব সমস্যার সৃষ্টি করে, তা যেমন ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং সমস্যার সমাধান করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার, উন্নত দেশগুলোর জনবসতির সমস্যাও কিন্তু কিছু কম নয়, যদিও সমস্যার প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। যেমন—

(i) বেশিসংখ্যক বয়স্ক লোক : এইসব দেশে জন্ম ও মৃত্যুর হার উভয়ই কম। ফলে সমাজে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ের তুলনায় প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার সংখ্যা বেশি হয়। এঁদেরকে অবসরকালীন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে প্রদান করতে হয়। ফলে সরকারি রাজস্বের ওপর চাপ পড়ে বেশি।

(ii) অল্পসংখ্যক শ্রমজীবীর সংখ্যা : (ক) জন্মহার কম, (খ) লোকসংখ্যা কম, (গ) প্রৌঢ়- প্রৌঢ়ার সংখ্যা কম, (ঘ) উন্নত দেশ বলে ছেলেমেয়েরা বেশি বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করে। অনেক বেশি বয়সে তারা কর্মজগতে প্রবেশ করে, (ঙ) শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে যে হারে শ্রমের চাহিদা বাড়ে, সে হারে দেশের শ্রমিকসংখ্যা বাড়ে না। ফলে ঐ সব দেশে শ্রমিকদের যথেষ্ট চাহিদা আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের কলকারখানায় কাজের জন্য তুরস্ক, গ্রীস প্রভৃতি দেশ থেকে বহু লোক ছুটে আসে।

(iii) শহর ও গ্রামের জনসংখ্যার পার্থক্য : শহরে কর্মসংস্থান ও ভোগবিলাসপূর্ণ জীবন যাপনের বেশি সুযোগ-সুবিধে থাকার জন্য গ্রাম্য লোকেরা ক্রমশ শহরাঞ্চলে এসে ভিড় করে। ফলে কৃষিকাজ ব্যাহত হয়। অবশ্য ঐ সব দেশে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন শ্রমের সাশ্রয় হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান কিছুটা নিম্নমানের হয়।

### 3. স্বল্প জনবসতির জনসংখ্যা সমস্যা

স্বল্পোন্নত বা উন্নত দেশের জনসংখ্যা সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমনি জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্য কিছু কিছু দেশে সমস্যার সৃষ্টিও হয়। যেমন ঐ সব দেশে লোকসংখ্যার ঘাটতির জন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। শ্রমিক না থাকার জন্য নতুন নতুন শ্রমশিল্প গড়ে উঠতে পারছে না।

কর্মসংস্থান বা বসবাসের জন্য বিদেশ থেকে আগত জনসংখ্যা (Immigrant) বাড়তে থাকে। এসব লোক শহরে এসে ভিড় করে। উপরন্তু, শহরে কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে বেশি পাওয়া যায় বলে সেখানে গ্রামের লোক এসে ভিড় করে। এভাবে ঐ সব দেশে শহর ও গ্রামের জনবন্টনের খুব হেরফের ঘটে।

### 4. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুন্নত দেশ (Population Growth and Undeveloped Country)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির আলোচনা করতে গিয়ে অনুন্নত মহাদেশ আফ্রিকার কথায় আসা যাক। উন্নয়নশীল দেশে যেখানে একজন নারীর সন্তান ধারণের হার হাজারে 5.5 (1970-74) থেকে কমে 4.4 (1980-85) হয়েছে, সেখানে আফ্রিকায় ঐ সময় একজন নারীর গড়পড়তা সন্তানের সংখ্যা 6.3। আবার উন্নয়নশীল দেশে যেখানে মৃত্যুহার হাজার-পিছু 11, আফ্রিকায় সেখানে 20 থেকে 25।

আফ্রিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল দারিদ্র্য। পৃথিবীতে সবচেয়ে গরীব 35টি দেশের মধ্যে 23টি হল আফ্রিকায়। গরীব দেশে দরিদ্র পরিবারে সন্তানের সংখ্যা বেশি হয়। এই সব শিশুর অধিকাংশই ধারাবাহিকভাবে অপুষ্টিতে ভোগে, তাই তারা সহজেই রোগ-ব্যাধির শিকার হয়। মা-বাবারা বেশি সন্তান চান এই আশায় যে ছেলেরা বড় হয়ে মেহনত করে সংসারের বোঝা কিছুটা হাল্কা করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে কর্মক্ষম হওয়ার বহু আগেই অনেকেই মারা যায়। আফ্রিকায় প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে 127 জন তাদের প্রথম জন্মদিন পালনের আগেই মারা যায়। একটি ছেলেও অন্তত বেঁচে থাকবে এই আশায় আফ্রিকায় মায়েরা 5\6টি সন্তানের জন্ম দেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে শিশুমৃত্যুর হার যেখানে বেশি, সেখানে জনবৃদ্ধি ঘটবে কী করে? উত্তর হল জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধে বাড়ার ফলে শিশুমৃত্যুর হার খুব ধীরে ধীরে কমে আসছে। তবে বাড়তি যে সব শিশুদের জন্ম হচ্ছে, তারা যদি সুস্থ-সবল হয়ে একদিন শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আবাসনের সুযোগ করে নেয়, তবে আফ্রিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে কোন সমস্যা আসবে না।

তবে আগামী দিনেও আফ্রিকার অর্থনৈতিক স্বনির্ভর নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আফ্রিকার জমির অধিকাংশই কৃষিযোগ্য নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষিসংস্থার (FAO) হিসেব অনুযায়ী আফ্রিকার শতকরা 40 ভাগেরও বেশি এলাকা খরাপ্রবণ। ফলে এই মহাদেশের বিভিন্ন দেশে খাদ্য-সমস্যা দেখা দিয়েছে। আফ্রিকায় নিয়মিত সেচের জলের অভাব। ফলে বহু চাষীকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। আর ভালো বর্ষা তো প্রকৃতির খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে। এই অবস্থায় আফ্রিকার তরুণ চাষীরা উদয়াস্ত মেহনত করে জমি থেকে তেমন লাভজনক কিছু পান না। তাঁরা বুঝেছেন শহরে কোনও একটা কাজ খুঁজে নিতে পারলে অনেক বেশি উপার্জন করতে পারবেন, ফলে উদ্যোগী যুবকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দিচ্ছেন। 1980 সালে আফ্রিকার মোট জনসংখ্যার শতকরা 30 জনই ছিলেন শহরবাসী। এদিকে গ্রামাঞ্চলে ছেড়ে নিয়মিত শহরে জনস্রোতে অব্যাহত থাকায় ফসল উৎপাদন ব্যবহত হচ্ছে। শহরে বেকারী বাড়ছে। সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত।

সবশেষে শুধু এ কথা বলা চলে যে আমরা সবাই এই পৃথিবীর সন্তান, আর পৃথিবীর বসবাসযোগ্য রাখার দায়িত্ব আমাদেরও কম নেই। যারা জন্মায়নি, তাদের থেকেও যারা জন্মেছে, তাদের চমৎকার আলো-বাতাসের মধ্যে রাখাই এখন বড় কাজ।

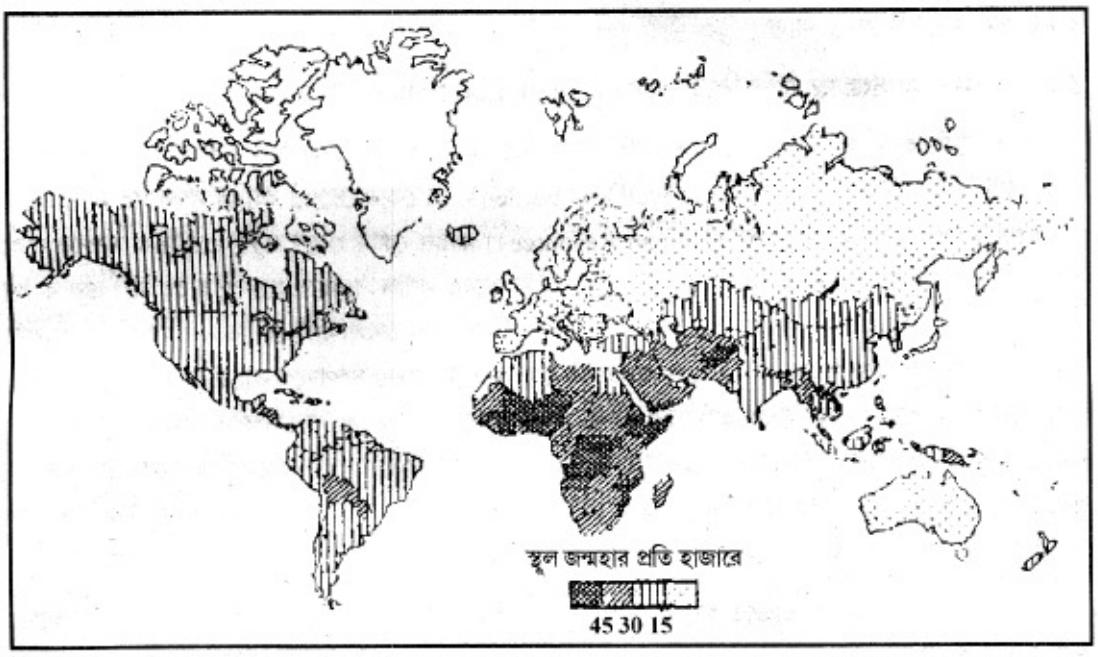


চিত্র 2.1 : পৃথিবীর স্থূল জন্মহার

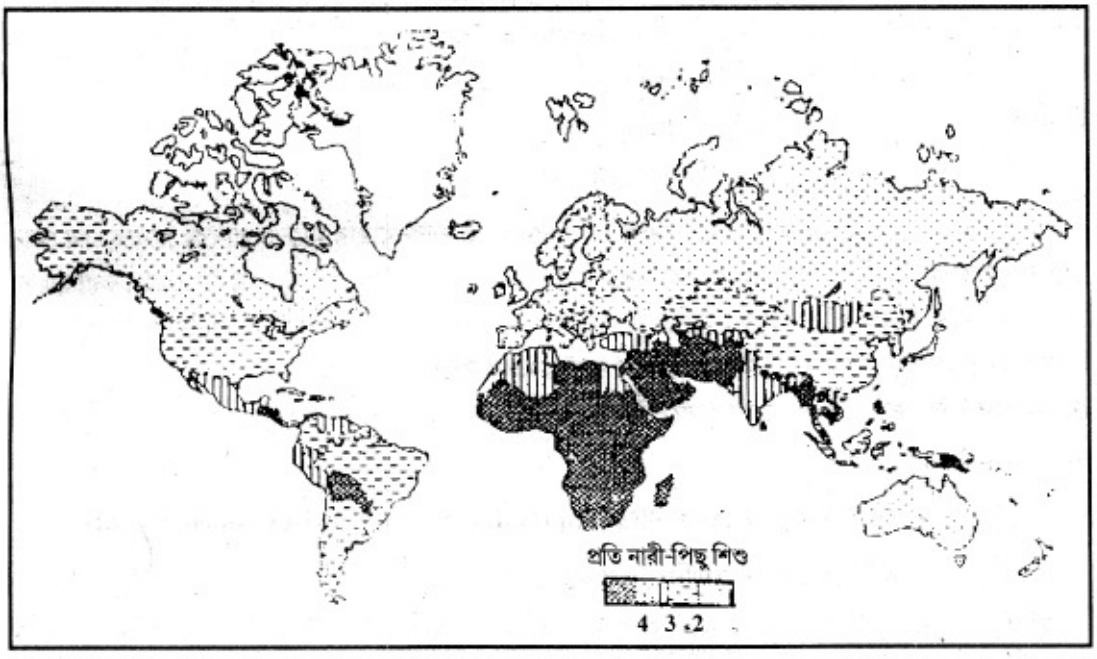


চিত্র 2.2 : সার্বিক প্রজনন ক্ষমতার হার

## 3.10 জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি

### 3.10.1 জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতি কি ও কেন ? (Population Policy : What and Why ?)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যা প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা একদিকে সম্পদ, তেমনি দায়ও বটে (Population is an asset as well as a burden)। যে কোন দেশের বহুবিধ সম্পদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হছে মানবসম্পদ (Human Resource)। কারণ কোন দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যদি যথোপযুক্ত জনবল না থাকে তবে অন্যান্য সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। এর কারণ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল শ্রম, আর শ্রমের উৎসই হল জনসংখ্যা। যে কোন অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ জনগণ দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, জনগণই দেশের প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে যে সব দেশে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, কিন্তু তুলনামূলকভাবে সম্পদ ও মূলধনের পরিমাণ কম, সেখানে জনসংখ্যাবৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলে মাথাপিছু আয় কম হবে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, সঞ্চয়, মূলধন গঠন, বিনিয়োগ ইত্যাদির পরিমাণও কমতে থাকে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা দেখলাম জনবলই হল সকল উন্নয়নের আধার। আর এই জনগণের জন্ম, মৃত্যুর ও পরিযান হল জনসংখ্যা ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই তিনটি উপাদানের ভারসাম্যের অভাব কোন দেশের জনসংখ্যাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। যেমন ধরা যাক জন্মহারের কথা। অনুন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিও তার দরুন ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা ঐ দেশগুলোকে সর্বদা একটা সংকটের মধ্যে রেখেছে। এর ফলে ঐসব দেশ সবুজ বিপ্লবের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার কিছু কিছু উন্নত দেশে প্রয়োজনের তুলনায় লোকসংখ্যা বেশ কম। এখানে শিশুমৃত্যুর হার কম, জনগণ স্বাস্থ্য সচেতন। আমরা আগেই জেনেছি যে অধিকাংশ উন্নত দেশে হার্টের অসুখজনিত রোগ, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। কিছু কিছু উন্নত দেশে লোকসংখ্যা কম থাকায় পরিযানকে (Migration) উৎসাহ দেওয়া হয়।

অতএব আমরা দেখলাম যে দেশে দেশে জনবণ্টনের মত জীবনযাত্রার মানেও পার্থক্য রয়েছে। যে কোন দেশের সুষ্ঠু আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা রচনা করতে সেই দেশের সরকার থেকে কিছু কিছু নীতি গ্রহণ করা হয়, যা "জনসংখ্যা নীতি" নামে পরিচিত। এই নীতির উদ্দেশ্য হল সরকার কর্তৃক জনগণের স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়গুলো লক্ষ্য করা, যা অদূর ভবিষ্যতে দেশ ও রাষ্ট্রের মঙ্গল সূচিত করবে। কারণ আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে মানবসম্পদই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দেশের স্বার্থে উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সম্পদকে কাজে লাগালে রাষ্ট্র ও জনগণ উভয়েরই কল্যাণ হবে।

### 3.11.1 উন্নত দেশের জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতি (Population Policies in Developed World)

পৃথিবীর সবকটি উন্নত দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে। আবার কয়েকটি দেশে আন্তর্জাতিক পরিযান নিয়ন্ত্রণ করতে আইন বলবৎ আছে। তবে এসব ছাপিয়ে যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে, তা হল জনবৃদ্ধি সম্পর্কে পৃথিবীর সবদেশে সুস্পষ্ট জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও তার রূপায়ণ এখনও সম্ভবপর হয়নি। কিছু কিছু ইউরোপীয় দেশে জনসংখ্যা কমে যাওয়ার দরুন তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষেই নীতি গ্রহণ করেছে। উন্নত দেশগুলোতে সুস্থিত (Stable) জনসংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেকে জন্মনিরোধ ব্যবস্থা, বন্ধ্যাকরণ, গর্ভপাত, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পরিবার-ভাতা ও অভিবাসন সম্পর্কে আইন আছে।

*যুক্তরাষ্ট্রের* কোন নির্দিষ্ট জনসংখ্যা নীতি নেই। 1960 সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সুস্পষ্টভাবে জন্মহারের পক্ষে ছিল। 1970 সালে পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা ও জনসংখ্যা গবেষণা আইন (Family Planning Services and the Population Research Act) বলবৎ (enact) হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনে পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। 1972 সালে United States Commission on Population Growth এই সিদ্ধান্তে আসে যে লাগাতার (continued) জনসংখ্যা বৃদ্ধি থেকে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না। সত্যি বলতে কি, অনেক অসুবিধেও দেখা দেয়। এই কমিশন গর্ভপাত ও জনসংখ্যাসংক্রান্ত অনেক আইনকে উদার করার জন্য সুপারিশ করে। উদারভাবে গর্ভনিরোধক বড়ি (Pill) বণ্টন, বন্ধ্যাকরণের ওপর হাসপাতালের বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, যৌনশিক্ষার (Sex Education) প্রসার, প্রজনন-সংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা (health services to fertility), পরিবার পরিকল্পনাকে স্বাস্থ্যবীমার (health insurance) আওতায় আনার জন্য এই কমিশন কড়া সুপারিশ করে। এই কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল সুস্থিত (stabilized) জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতি। দুর্ভাগ্যবশত, সরকারি তরফ থেকে এইসব সুপারিশ কার্যকরি করতে খুব একটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র প্রজনন বিরোধী (antinatalist policies) প্রচারে দ্বিধা করে না, কিন্তু নিজের দেশে আজ পর্যন্ত এই নীতি চালু করেনি।

কানাডার জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতি যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ। ওই দেশে 1969 সালে সরকারি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি চালু হয়। এর জন্য গর্ভনিরোধক বড়ির বণ্টনের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। গর্ভপাত ব্যবস্থা আরও উদার করা হয়েছিল। কানাডার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অভিবাসনের একটা বড় ভূমিকা আছে। তবে অভিবাসীদের আগমন রুখতে কানাডা ইদানীং তার সনাতনী অভিবাসন নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। অধিকাংশ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোতে সরকারিভাবে কোন জনসংখ্যা নীতি নেই। তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লোকক্ষয় হওয়ায় তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে। জন্মনিরোধক বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে ইউরোপে একটা দীর্ঘদিনের সনাতনী ধারা চলে আছে।

ইউরোপে চিরাচরিত জন্ম-নিরোধ পদ্ধতিগুলো চালু থাকলেও সাম্প্রতিককালে সেখানে জন্মনিরোধক বড়ির ব্যবহার বেড়েছে। ইউরোপের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমী দেশ সুইডেনে 1930 থেকে একটি নিজস্ব জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতি আছে। ওই দেশের জন্মহার খুব কম। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির অঙ্গ হিসেবে সুইডেনের বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা দান, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গর্ভপাত ও পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবার পক্ষে ঐ দেশ কর্মসূচি বহাল রেখেছে। এছাড়া সেখানে শিশু জন্মাবার পর প্রসূতি মায়ের কর্মস্থলে ছুটির সময় সরকার মাহিনা দেয়। সেখানে জনবৃদ্ধিতে উৎসাহ দিতে আরও কয়েকটি ভাতা চালু আছে।

1974 সাল থেকে ইংল্যান্ডে জন্মনিরোধ ও গর্ভপাত সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। অধিকাংশ ক্যাথলিক দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবৈধ বলে গণ্য হয়। যদিও বেশি বয়সে বিয়ে, অবৈধ গর্ভপাত ইত্যাদি ওই সব দেশে জনসংখ্যা রোধে সাহায্য করেছে।

1939 সালে Code de la Familee অনুযায়ী ফ্রান্স জনসংখ্যা বৃদ্ধি নীতির সপক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যাদের দুটো বাচ্চা আছে তাদেরকে পরিবার-ভাতা (family allowance) দেওয়া হয়। তৃতীয় শিশু জন্মালে ভাতার পরিমাণ আরও বেশি হয়। চতুর্থ সন্তানের ক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ আগের চেয়ে বেশি দেওয়া হয়। যেসব পরিবার একজন মাত্র উপার্জনশীল সদস্য আছেন, তাঁদেরকে প্রথম সন্তান জন্মাবার পর ভাতা দেওয়া হয়। পরবর্তী সন্তানের ক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী সরকারি ঋণ (Loan) পাওয়া ছাড়াও ট্যাক্সের ছাড় ও পণ্য মাশুলে ছাড় (relief) পান। সরকার থেকে স্কুল ক্যান্টিনে, আবাসিক স্কুলে, অবসরকালীন শিবিরে (vacation camp) ও নার্সারী স্কুলে ভরতুকি দেওয়া হয়। Code de la Familee অনুযায়ী গর্ভপাত ও

জন্মনিরোধ আইনত অবৈধ ছিল। তবে জনসাধারণের চাপে 1960-এর দশকের শেষ থেকে জন্মনিরোধ ব্যবস্থা আইনত স্বীকৃতি পেয়েছে (Bhande, et. al. 1985)।

স্পেন, পর্তুগাল ও আয়ারল্যান্ডে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি (device) এখনও অবৈধ। চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইতালি জন্মনিরোধক (Pill) বড়ির ব্যবহার আইনসিদ্ধ করেছে।

পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকার থেকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যেমন—রাশিয়া সরকার 1970 সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রবর্তন করে ''The Mother Lenin Award'', বিশেষ করে ইউরোপীয় রাশিয়ায় এই পুরস্কারে বলা হয়, যে মাতা 12টি সন্তানের জন্ম দেবেন তাঁকে একটি গাড়ি, প্রচুর টাকা এবং একটি মানপত্র দেওয়া হবে (Hussain, 2002)। জার্মানিতে জন্মের হার মৃত্যুর হারের তুলনায় কমে যাওয়ায় জার্মান সরকার বৃহৎ পরিবার গঠনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। বৃহৎ পরিবার গঠনের জন্য জার্মান সরকার মায়েদের কিছু সুবিধে প্রদানের ব্যবস্থা করেন। যেমন দ্বিতীয় সন্তান জন্মের সময় প্রসূতি মা একবছরের ছুটি এবং মাসের মাইনের আশি শতাংশ বেতন পাবেন। বিয়ের সময় এবং প্রতি শিশু জন্মাবার পর কম সুদে বাড়ি করার জন্য ঋণ পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড হল বিরল জনবসতির দেশ। তাই এই দুটি দেশের নীতি হল জন্ম ও অভিবাসনের পক্ষে। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানেই গর্ভপাতকে বৈধকরণ করা হয়েছে। সেখানকার সরকারি নীতি একটি শিশু জন্মাবার পক্ষে। এশিয়ার মধ্যে জাপানই একমাত্র দেশ যে সফলভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে ও উন্নত দেশগুলোর সমকক্ষ হতে পেরেছে। গর্ভপাতকে বৈধকরণের মাধ্যমে জাপান জনসংখ্যাকে কমাতে পেরেছে। জাপানের জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতি-ই হল দু'য়ের বেশি বাচ্চার বিপক্ষে। এজন্য তারা 1950 সাল থেকে শিক্ষা ও সমাবেশ করে আসছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে 1970-র দশকে জাপানে শিল্প শ্রমিকের অভাব দেখা যায় এবং জাপানের শিল্পসমূহ বড় পরিবারের পক্ষে প্রচার চালায়। সৌভাগ্যবশত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে সব শিশু জন্মেছিল, তারা এই অবস্থা সামাল দেয়।

### স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতি (Population Policies in Less Developed Countries)

যেহেতু অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জনবিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে, তাই তারা সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, কোরিয়া, টিউনিশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশগুলোতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সাথর্ক করতে তার সঙ্গে সামাজিক দিকটাকেও যুক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ দেশগুলোর লক্ষ্যই হল জন্মহার শতকরা 1 ভাগে নামিয়ে আনা।

পৃথিবীর মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশি জনবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় (চিত্র 2.1 ও 2.2)। খুব সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ আফ্রিকার দেশগুলোতে দ্রুত জনবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে। যেহেতু আফ্রিকার অনেক দেশে মৃত্যুহার খুব বেশি, তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা কমই দেখা যায়। সাহারার দক্ষিণের দেশগুলোতে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে উন্নয়নের জন্য আরও লোকের প্রয়োজন। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল যে আফ্রিকার পূর্বতন ইংরেজ উপনিবেশগুলোতে (দেশ) প্রথম পরিবার পরিকল্পনা নীতি চালু হয়। পক্ষান্তরে, আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশগুলো এ ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। কেনিয়া ও ঘানার পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সবচেয়ে পুরোনো ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল দেশ নাইজেরিয়া 1970-এর দশকের শেষভাগ থেকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির প্রতি মনোযোগী হয়েছে। *মিশর, টিউনিশিয়া ও মরক্কোর* মত উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে জনবৃদ্ধি রোধ করার নীতি চালু আছে। টিউনিশিয়ার

মত ইসলামিক রাষ্ট্রে বহুবিবাহ ও গর্ভপাতকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। আফ্রিকার পূর্বতন ফরাসী, পর্তুগীজ ও স্প্যানিশ উপনিবেশগুলো পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

যদিও অধিকাংশ *ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে* জন্মবৃদ্ধির হার বেশি, তবুও এইসব দেশগুলো জনবৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণে অনিচ্ছুক। এর কারণ হল রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব ও ওই মহাদেশের অনাবিষ্কৃত বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি সর্বজন বিশ্বাস। ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলো প্রধানত স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ কর্মসূচি ও অবৈধ গর্ভপাত কমানোর উপায় হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে গ্রহণ করেছে। দেরীতে হলেও কিছু কিছু দেশ এখন জনসংখ্যা কমানো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। *চিলি, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, ক্যারিবীয় ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর* সরকারি নীতি হল জন্মবৃদ্ধির সপক্ষেই। ব্রাজিল বেসরকারি পরিবার পরিকল্পনা সংস্থাকে কাজ করতে অনুমতি দেয় না।

এশিয়া মহাদেশের সবদেশেই কিন্তু এই ধরনের জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতি অনুসৃত হয় না। চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, হংকং, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলোতে পরিবার পরিকল্পনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সন্দেহ নেই যে এইসব দেশে জন্মহার বেশ কিছুটা কমেছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনস্ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি নিয়েছে। কিন্তু এইসব দেশের কাজের অগ্রগতি এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনক নয়। মায়ানমার, কামপুচিয়া, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে সরকারি নীতি হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে। তুরস্ক ও ইরান ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। আফগানিস্তান, ইরাক, জর্ডন, লেবানন ও সিরিয়াতে পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা কর্মসূচিতে ওই সব দেশের নারীদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের দিকে নজর রাখা হয়েছে। সৌদি আরবে জন্মনিরোধক ওষুধ আমদানি আইনত অসিদ্ধ।

## 3.12 চীনের জনসংখ্যা নীতি (Population Policy in China)

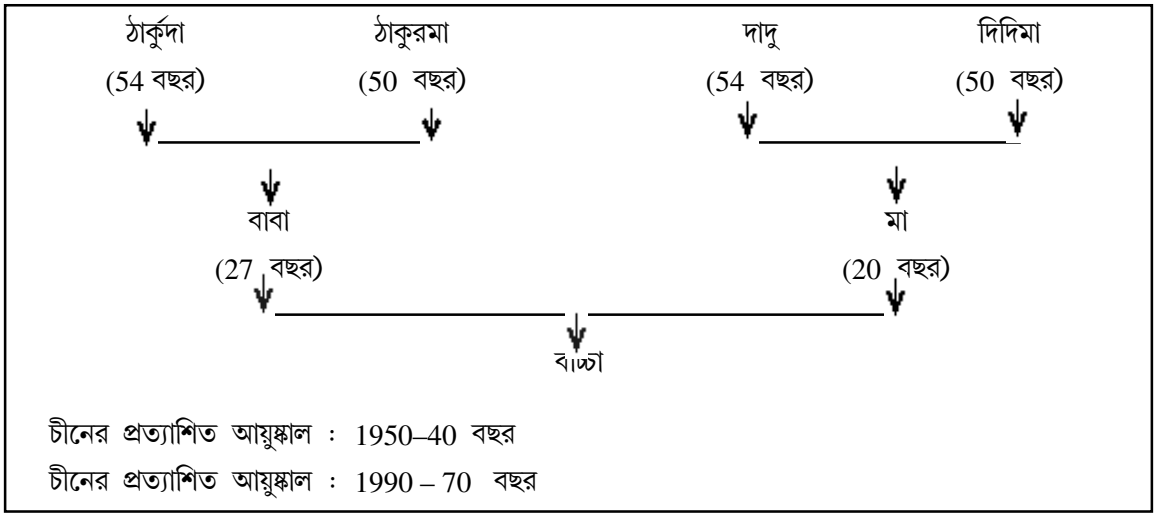


চিত্র 2.3 : চীনে 'এক সন্তান' পরিবারের মডেল

2001 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীনের লোকসংখ্যা ছিল 1,273.3 মিলিয়ন। জনসংখ্যাকে স্থিতাবস্থায় নিয়ে আসার জন্য চীনে নানা ধরনের নাগরিক বন্দোবস্ত ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে 0.7 শতাংশ এবং মহিলা-প্রতি সন্তান জন্মের হার অর্থাৎ ফারলিটিলি রেট (fertility rate) 1.8 শতাংশ।

চীনের সংবিধানের 25 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হারের সাথে সম্পর্ক রেখে পরিবার পরিকল্পনার নীতিগুলো চালু করতে হবে। এজন্য অনেকদিন থেকেই চীনে নগর ও শহর এলাকায় পরিবার-প্রতি একটি সন্তান এবং গ্রামীণ এলাকায় কৃষিকাজের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে, কায়িক শ্রমের যোগান অব্যাহত রাখার জন্য, পরিবার পিছু দু'টি সন্তানের নীতি চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে সারা দেশে "একটি পরিবার একটি সন্তান" নীতি চালু রয়েছে।

চীনে সারা দেশ জুড়ে গর্ভনিরোধক বড়ি বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা ক্লিনিকগুলোতে গর্ভপাত করার সুবিধে আছে। উচ্চ সরকারি পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা কার্যকরি করার জন্য সংগঠিত নেটওয়ার্ক (Network) কর্মসূচি রয়েছে। মহিলাদের বন্ধ্যাকরণ ও প্রজনন রেকর্ড প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা "এক শিশুর" পক্ষে বারবার দম্পতিদের পরামর্শ দেন। এছাড়া এক শিশুর নীতি বলবৎ করতে প্রথম শিশু জন্মাবার পর দম্পতিকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শিশু জন্মালে ঐ শিশুকে দূরের স্কুলে ভর্তি করানো বাধ্যতামূলক হয়েছে।

## 3.13 ভারতের জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতি (Population Policy in India)

ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা জনমিতি প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। গোয়ার কথা ধরা যাক। এখানে 1994 সালে জন্মহার ও মৃত্যুহার ছিল যথাক্রমে 35.4 ও 11.0 শতাংশ। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহারের মত বড় বড় রাজ্যগুলোতে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়েই বেশি, যথাক্রমে 32.8 ও 11.5, 33.77 ও 8.9, 32.5 ও 10.4। বিভিন্ন রাজ্য জন্মহারের পার্থক্যের হেতু হল মহিলাদের বিয়ের বয়সের পার্থক্য, দু'টি সন্তানের জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান, মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পার্থক্য, শিশু-মৃত্যুহার ইত্যাদি কারণ।

যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারত-ই প্রথম জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছিল, ,তবুও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এই দেশের কৃতিত্ব সন্তোষজনক নয়। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী তিনটি দশকে আমাদের দেশে জন্মহার ছিল 1.3 শতাংশ। 1961-71 দশকে তা গিয়ে দাঁড়াল 2.25 শতাংশ। অবশ্য বর্তমানে জন্মহার সামান্য কমে হয়েছে 2.08 শতাংশ।

দেশে জনসংখ্যার চাপ ও বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের আপামর জনসাধারণকে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন ও কৌশল (technique) সম্বন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করা হল। এই সময় "ওরাল পিল" ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ওই একই নীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও অনুসৃত হয়, তবে এর সঙ্গে

স্বেচ্ছায় বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি চালু হল। প্রথম দু'টি যোজনায় পরিবার পরিকল্পনা নীতি খুব একটা কার্যকর হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনা থেকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ ঘটতে থাকে।

**প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (1951-56)** জনসংখ্যা নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল জন্মের হার নিয়ন্ত্রণ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ কমিয়ে আনা। এর জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে নিয়মিত আলোচনা, পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ-সুবিধে দান করা, হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা-সংস্থার মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই সময় "ওরাল পিল' ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

**দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (1956-61)** প্রধান কাজ ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন ব্যবস্থাসমূহকে চালু রাখা।

**তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (1961-66)** পূর্বেকার জনসংখ্যা নীতি বাতিল করে পরিবার পরিকল্পনার জন্য বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। এই সময়কার প্রধান নীতিগুলো হল ঃ (1) সীমিত পরিবার গঠনের জন্য সামাজিক পরিবেশ গঠন, (2) তাৎক্ষণিক সেবাদানের ব্যবস্থা, (3) দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, (4) প্রচলিত সামাজিক প্রথায় পরিবর্তন, যেমন কম বয়সে বিয়ে নিষেধ করা, বিয়ের বয়স বাড়ানো, শিক্ষাদান, স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া, মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সামগ্রিক আর্থিক উন্নতি, নিরন্তর গবেষণা ও তার ফলাফল প্রচার করা ইত্যাদি।

**চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (1969-74)** জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। (1) *"ছোট পরিবার সুখী পরিবার"* গঠনের কাজে প্রচারের ব্যবস্থা ও সামাজিক কর্মী নিয়োগ, (2) পরিবার পরিকল্পনার নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা, (3) বিবিধ সাজ-সরঞ্জাম স্বল্প বা বিনামূল্যে সরহবরাহের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ও শিশু-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে জনসংখ্যা কমানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

**পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (1974-79)** পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা ও জনকল্যাণ পরিষেবাকে একসাথে যোগ করে জনসংখ্যা-সংক্রান্ত নীতিতে একটা পরিবর্তন আনা হল। এই পরিকল্পনায় 500 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, যা আগের চারটে পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের চেয়ে বেশি। এই পরিকল্পনায় শিশু ও প্রসূতি মায়ের পুষ্টির ব্যবস্থা ছাড়াও পরিবারকে আর্থিক সাহায্য, গর্ভপাতকে আইনসিদ্ধ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

**সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (1985-90)** কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। যেমন—(a) মহিলাদের বিয়ের গড় বয়স কুড়ি বছরের বেশি করা, (b) দু'টি সন্তান নীতি চালু করা, (c) 42 শতাংশের বেশি বৈধ দম্পতিকে বিভিন্ন ধরনের জন্মনিরোধক ব্যবস্থার অধীনে আনা, (d) শিশু ও প্রসূতি মাকে রোগমুক্ত করা যাতে শিশুমৃত্যুর হার কমানো যায়, (e) স্থূল জন্মহার প্রতি হাজারে 29.1 ও মৃত্যুহার 10.4-এ নামিয়ে আনা, (f) স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, (g) 11 থেকে 15 বয়সপুঞ্জের সমস্ত কিশোরদের জনসংখ্যা-সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা, (h) আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৈরি করে জন্মহার তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি।

### 3.13.1 ভারতের জনসংখ্যা নীতি, 2000 (Population Policy of India)

দেশের জনসংখ্যা নীতি নির্ধারণ করতে অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথন-এর নেতৃত্বে এক কমিটি গঠিত হয়।

1994 সালের জুন মাসে এই কমিটি তার বক্তব্য পেশ করে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 2000 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তা অনুমোদন করে। এই নীতিতে ভারত সরকার জনগণের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার স্থিতাবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

2000 সালের 11-ই মে ভারতের লোকসংখ্যা 100 কোটিতে পৌঁছেছে। বর্তমানে দেশে প্রতিবছর 1.55 কোটি লোক বাড়ছে। 2001 সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা ছিল 102 কোটি 75 লক্ষ 15 হাজার 247 জন। আলোচ্য নীতি অনুযায়ী 2026 সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় পৌঁছাবে বলে আশা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মোট প্রজনন হার 1.6 হলে লোকসংখ্যা স্থির বা স্থিতাবস্থায় পৌঁছায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের মোট প্রজনন হার যথাক্রমে 3.5, 2.8 এবং 2.0। সুতরাং, ভারতের এই তিনটি জনবহুল রাজ্যে সরকারের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তামিলনাড়ু, কেরল ও পাঞ্জাবের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য শতাংশে পৌঁছে যাবে বলে সরকারি মহল আশা করছেন। তাছাড়া, 2031 সাল থেকে তামিলনাড়ুর জনসংখ্যা কায়রো, সনদের প্রকৃত বাস্তবায়নের পথ অনুসরণ করে দ্রুত হ্রাস পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জনসংখ্যার এই অসম বৃদ্ধি হারের পরিপ্রেক্ষিতে 2051 সালে ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় 164 কোটি।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয় যে আমাদের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি দেশের জনবৃদ্ধির ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষের মনে কিছুটা সাড়া ফেলেছে। তবে আমাদের অনেক কর্মসূচিই এখনও কাগজে-কলমে রয়ে গেছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে 1961 থেকে 1994 সাল অর্থাৎ 33 বছরে জনবৃদ্ধির হার কমছে মাত্র 13.1 অর্থাৎ প্রতি হাজারে 41.7 থেকে কমে 28.6 হয়েছে। মোট কথা, ভারতের পরিবার পরিকল্পনার ব্যর্থতার পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। পরিকল্পনার কর্মসূচিতে রাজনীতির স্পর্শ ঘটেছে। পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য চিকিৎসক, কর্মীবৃন্দ ও আর্থিক উৎসাহের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়ায় চিকিৎসক সমাজ আবার পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। বস্তুত, সমস্ত পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব চিকিৎসক সমাজ থেকে সরে গিয়ে আমলাদের ঘাড়ে পড়েছে। আমলারা যে কোন প্রকারে পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রসর হয়েছে বলে সাফল্যের পরিমাণ কম।

পরিবার পরিকল্পনাকে বাণিজ্যিক রূপ দেওয়া হয়েছে। যাতে সহজভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়। প্রায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সন্তানধারণ ক্ষমতার বয়স অতিক্রম করে গেলেও অনেক ব্যক্তি শুধুমাত্র টাকার লোভে নির্বীযকরণ করিয়েছে।

উপসংহার ঃ এতক্ষণ আমরা লক্ষ্য করলাম যে জনসংখ্যা সমস্যা দেশকাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়। উন্নত দেশগুলোর সমস্যা এরকম, অনুন্নত দেশগুলোর আরেক প্রকার। প্রথমোক্ত দেশগুলোর জনসংখ্যার স্বল্পতা হল এক সমস্যা আর শেষোক্ত দেশগুলো জনাধিক্য সমস্যায় ভুগছে। প্রথমটিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার থেকে বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক গ্রহণ করা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই হল সরকারের অন্যতম নীতি। অনুন্নত দেশগুলোতে শুধুমাত্র স্বেচ্ছামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা উচিত। শেষোক্ত ব্যবস্থা দু'ভাবে নেওয়া যেতে পারে—(i) শাস্তিমূলক, (ii) উৎসাহমূলক কোন দম্পতিকে বেশি সন্তান জন্মদানের জন্য শাস্তি ( যেমন চীনে কোন দম্পতির প্রথম সন্তানকে কাছের স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে) দেওয়া হয়, তবে তাকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলে। অন্যদিকে, কমসংখ্যক সন্তান জন্মদানের জন্য যদি কোন দম্পতিকে পুরস্কার

দেওয়া হয়, তবে তাকে উৎসাহমূলক ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে দম্পতিকে নগদ টাকা ছাড়াও কিছু সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পরোক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে সরকারি তরফ থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা ও জীবনের মানোন্নয়নের কথা ভাবা হয়ে থাকে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে জনসাধারণ ছোট পরিবারের দিকে ঝুঁকবেন। এর ফলে স্বভাবতই জনসংখ্যা কমে আসবে। আবার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটলে মানুষ আপনা থেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহী হয়ে উঠবে।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয় যে সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশ একই প্রকার জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করতে হবে তার মানে নেই। কারণ কিছু কিছু অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, যেমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে যাদের জনসংখ্যা 5 কোটি বা তার কম। অন্যদিকে, ভারত, পাকিস্তান, চীন, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে মোট জনসংখ্যা ও জনবৃদ্ধির হার দুই-ই বেশি। এইসব দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হবে।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

# পরিভাষা (Glossary)

**অভিক্ষিপ্ত জনসংখ্যা (Projected Population)**

বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে ভবিষ্যতে গিয়ে দাঁড়াবে তার পরিমাপের যে পূর্বাভাস দেওয়া হয় তাকে সাধারণভাবে জনসংখ্যার অভিক্ষেপ বলা হয়েছে। সুতরাং জনসংখ্যার অভিক্ষেপ বলতে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ অভিক্ষেপকে বোঝায়। এর মাধ্যমে প্রকৃত জনসংখ্যার অবস্থানের কথা জানা সম্ভব হয়। এই পূর্বাভাস কিছুটা অনুমানভিত্তিক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করে তা নির্ণয় করতে হয়। এই অভিক্ষেপ দৃঢ়ভাবে বলতে পারে না যে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার প্রকৃত অবস্থা কি হবে। এই অভিক্ষেপের মধ্যে যে পূর্বাভাস দেওয়া থাকে তা ঘটতে পারে, আবার নাও ঘটতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে ধরে নেওয়া হয় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি একইভাবে চলতে থাকে তাহলে জনসংখ্যা একটি বিশেষ সময়ের পরে একটি সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছাবে।

**শিশুমৃত্যুর হার (Infant Mortality Rate)**

কোন বছরে প্রতি 1,000 জন এক বছর বয়সী জীবিত শিশুপিছু যতসংখ্যক একবছর বয়সী শিশু মারা যায়, তাকে শিশু মৃত্যুর হার (Infant Mortality Rate) বলে। শিশুমৃত্যুর হার থেকে কোন জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়।

**সার্বিক প্রজনন হার (Total Fertility Rate)**

সারাজীবন ধরে বিভিন্ন বয়সী মায়েরা মাথাপিছু গড়ে যতজন শিশুর জন্ম দেন, তাকে সার্বিক বা মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate) বলে। এই পদ্ধতিতে প্রতি বয়ঃক্রমিক শ্রেণির প্রজনন ক্ষমতার হারকে যোগ করে প্রাপ্ত যোগফলকে 5 দিয়ে গুণ করতে হয়। আবার প্রতিটি মহিলার গড় সন্তান-সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য এই গুণফলকে 1,000 দিয়ে ভাগ করতে হয়। উন্নত দেশগুলোতে এই হার কম। কিন্তু বিকাশশীল দেশগুলোতে এই হার দ্বিগুণ, ক্ষেত্রবিশেষে তিন গুণ। এ থেকে বোঝা যায় কেন বিকাশশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে।

**প্রত্যাশিত জীবনসীমা (Life Expectancy at Birth)**

প্রত্যাশিত জীবনসীমা বলতে বাঁচার জীবনসীমার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যাশিত জীবনসীমা দীর্ঘ হলে বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা নিম্নমুখী হয়। এই নিম্নমুখী কর্মক্ষম জনসংখ্যা আবার সম্পদ সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে পড়ে। জাপান, কানাডা, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন প্রভৃতি উন্নত দেশে প্রত্যাশিত জীবনসীমা 76 বছরের বেশি। উন্নয়নশীল দেশে এই প্রত্যাশিত জীবনসীমা কম হওয়ার কারণগুলো হল চিকিৎসার অভাব, অর্থনৈতিক দূরবস্থা, পরিবেশ দূষণ।

**জনবিবর্তন (Demographic Transition)**

''Dictionary of Human Geogrpahy'' থেকে জনসংখ্যার বিবর্তন সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হল—''A general model describing the evolution of levels of fertility and mortality over time. It has been devised with particular reference to the experience of developed countries.'' জনসমষ্টির

বিবর্তন তত্ত্বটির মূল কথা হল কোন দেশের সমাজ ও অর্থনীতি অর্থাৎ মানব উন্নয়নের অবস্থার সাথে ঐ দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে।

### বয়স গ্রন্থনা (Age Composition)

জনসমগ্রকের গঠন প্রকৃতি বলতে আমরা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যার বয়স ও লিঙ্গাভিত্তিক বিন্যাসকে বোঝায়। গঠনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ— বয়স ও নারী-পুরুষের অনুপাত। সোজা কথায় বয়স ও লিঙ্গ অনুসারে জনসংখ্যার গঠনকে বলে বয়স গ্রন্থনা বা Age Composition। এইজন একে বয়স এবং লিঙ্গ গঠনও বলে। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য, জন্ম, মৃত্যু পরিমাপের ন্যায় কয়েকটি মৌলিক দিক নিয়ে বিবেচিত হয়।

### নারী-পুরুষ অনুপাত (Sex Ratio)

প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীর সংখ্যাকে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত বলে। ভারতে 2001 সালের আদমসুমারী অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত 933 অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষে 933 জন স্ত্রী। সাধারণভাবে শিল্পশহর, মহানগরী, বন্দর শহর ও কারখান নির্ভর অঞ্চলে স্ত্রী অনুপাত কম। এই অনুপাত জনসংখ্যার গঠন সম্বন্ধে এক ধারণা প্রকাশ করে।

জনসংখ্যার বর্তমান বয়স বিশেষত গঠন ও স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতের উপর ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার আয়তন নির্ভরশীল। কারণ এই দুটি বৈশিষ্ট্যই বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করে। স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতের ভারসাম্যের অভাব হলে সমাজ-এ তার প্রতিফলন ঘটে। যদি পুরুষরা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম থাকেন তবে নারীকে বহির্জগতে বেশি কাজের দায়িত্ব নিতে হয়। একটি পুরুষ একাধিক বিবাহও করে থাকেন। আবার যেখানে স্ত্রীলোকেরা সংখ্যায় খুব কম, সেখানে সামাজিক জীবনযাত্রায় বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম জীবনযাত্রা প্রণালী দেখা যায়।

### মরসুমী পরিযান (Seasonal Migration)

পার্বত্য অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য পশুপালকরা শীতের প্রারম্ভে পাহাড়ের নিচু এলাকায় নেমে আসে। আবার, গ্রীষ্মের শুরুতে পাহাড়ের উপরের ঢালে বরফ গলে গেলে কচি ঘাসে ঢাকা তৃণক্ষেত্রে তাদের পোষা প্রাণীদের নিয়ে আবার ফিরে যায়। একে ট্রান্সহিউম্যান্স (Transhumance) বলে।

মানুষের যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে অন্য কোন উপায়ে লাভজনক পার্বত্য অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না তখন একমাত্র সেই প্রান্তিক পরিস্থিতিতেই ঋতুগত পরিব্রাজনভিত্তিক পেশায় মানুষ অংশগ্রহণ করে (যেমন, পাহাড়ি এলাকায় পশুচারণ)।

### সার্বিক নির্ভরতার অনুপাত (Total Dependency Ration)

প্রজননের প্রকৃতি এবং বয়স বিভাজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হল 'মোট নির্ভরতার অনুপাতের (Total Dependency Ratio) প্রকৃতি'। মোট নির্ভরতার অনুপাত হল একদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং অন্যদিকে বৃদ্ধ ও তরুণদের অনুপাত। 1980 সালে পৃথিবীতে এই নির্ভরতার অনুপাত ছিল 70.6। অনুন্নত দেশগুলিতে এই অনুপাত ছিল 77.8, আর উন্নত দেশগুলিতে 52.6। মোট নির্ভরতার অনুপাত প্রজননের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে পৃথিবীর কম উন্নত অঞ্চলগুলোতে 15 বছরের কম বয়সের জনসংখ্যার অনুপাত বেশি। বয়স্ক লোকেদের অনুপাত কম এবং তাদের বেশি প্রজনন ক্ষমতার জন্য মোট নির্ভরতার অনুপাতও বেশি। অন্যদিকে অতি উন্নত দেশগুলোতে এর বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

### প্রজনন (Fertility)

''The Dictionary of Human Geography''-র (ed. by Johnston) মতে, প্রজনন হল—''The number of live births produced by a woman.'' প্রজনন শব্দটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যায় জীবিত নবজাতকের সংখ্যা সূচিত করে। Tara Kanitkar-এর মতে, প্রজনন হল—''Actual reproductive performance whether applied to an individual or a group''.

### বয়স-লিঙ্গ পিরামিড (Age-Sex Pyramid)

যে লেখচিত্রের সাহায্যে কোন দেশ বা অঞ্চলের জনসাধারণের বয়স অনুসারে, নারী-পুরুষের জন্ম-মৃত্যুর আয়তন ও গঠন বিন্যাস প্রকাশ করা যায়, তাকে Age Sex Pyramid বা বয়স-লিঙ্গ Pyramid বলে। এই পিরামিডকে বয়সভিত্তিক স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত সূচক পিরাডিম বা বয়োগোষ্ঠীর পিরামিডও বলা যায়।

### গাণিতিক ঘনত্ব (Arithmetic Density)

প্রতিবর্গ পরিমাপ স্থানে মোট জনসংখ্যা ও মোট জমির আয়তনের অনুপাত হল গাণিতিক বা সাধারণ ঘনত্ব। ভৌগোলিক ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা সচরাচর এই পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। কারণ হল পরিসংখ্যান পাওয়ার সুবিধে। জনসংখ্যা-সম্পদ সম্পর্কে এই সহজ অথচ খুব ব্যবহারযোগ্য পরিমাপকে জমির ওপর জনসংখ্যার চাপের পরিমাপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না, কারণ এটি শুধুমাত্র মানুষ ও জমির সহজ পরিমাত্রিক সম্পর্ককে বোঝায়।

### কৃষি ঘনত্ব (Agricultural Density)

কৃষি ঘনত্ব হল কৃষিতে নিয়োজিত জনতা ও জমির অনুপাত। কৃষিপ্রধান দেশে এই পরিমাপ খুব সন্তোষজনক ফল দেয়। তবে এই সব দেশে কৃষির বাইরেও অন্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি থাকেন। আবার কৃষিজমির পরিমাণ বা কত লোক কৃষিতে নিয়োজিত আছেন এ সম্বন্ধে পরিসংখ্যান পাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

### শারীরবৃত্তীয় ঘনত্ব (Physiological Density)

Demoko-র মতে গাণিতিক জনঘনত্বের তুলনায় পুষ্টি ঘনত্ব বা শারীরবৃত্তীয় ঘনত্ব একটু উন্নততর পরিমাপ। কারণ এতে মোট জনসংখ্যা ও মোট কৃষিজমির আয়তনকে গণ্য করা হয়। প্রতিবর্গ পরিমাপ কৃষি-জমিতে কত সংখ্যক লোক বাস করেন তা দিয়ে এই ঘনত্ব প্রকাশ করা হয়। কৃষিপ্রধান দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল—(a) এতে সমস্ত অকৃষিজমিতে উৎপাদনহীন ধরে নেওয়া হয় এবং (b) এই ব্যবস্থায় সমস্ত কৃষিজমির উৎপাদিকা শক্তি একই প্রকার ধরে নেওয়া হয়।

### নিশ্চল জনবৃদ্ধি (Zero Population Growth)

আদর্শ অবস্থায় কোন দেশ বা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার পরিমাণ যখন অপরিবর্তিত থাকে, কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, তখন তাকে জনসংখ্যার শূন্য বৃদ্ধি (Zero Population Growth) বা স্থিতিশীল জনসংখ্যা বলে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষাবিস্তার বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনার সুফল সম্বন্ধে জনগণের উদাসীনতা দূর করা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি।

### জন বিস্ফোরণ (Population Explosion)

বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে জন্মের তুলনায় মৃত্যুহার অনেক কমে গেছে। এছাড়া, সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ বাড়ায় জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। বর্তমান বিশ্বে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, তাতে করে আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এই হারে যদি জনসংখ্যা বাড়ে তা হলে অনুমান করা হয় যে আগামী ( ) সাল নাগাদ পৃথিবীর জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে 725 থেকে 800 কোটিতে। বর্তমানে জনসংখ্যার এই বিপুল বৃদ্ধিকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বলা হয়েছে।

### অন্তঃঅভিবাসন (Immigration)

''A person entering a country for the purpose of living there,''—Majid Hussain অর্থাৎ কোন দেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির প্রবেশ। নানা কারণে এক ব্যক্তি অন্য কোন দেশে গিয়ে বাস করেন। যেমন—

(1) উন্নত ধরনের প্রযুক্তি ও শিল্প শহরাঞ্চলে বহু লোককে যেমন টেনে আনে তেমনি চাষবাসে ট্রাকটার বা পাওয়ার টিলার ব্যবহার বহু কৃষিশ্রমিককে অন্যত্র কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য করে।

(2) কিছু কিছু সরকারি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ফলে চাষের জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের ফলে বহু লোক যেমন চাষবাসের বিকল্প সন্ধান করছে, আবার উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের ফলে অনেকেই স্থানান্তরে যেতে উৎসাহী হয়।

(3) উন্নত জীবনযাত্রার প্রতিশ্রুতি যেমন অনেককে আকর্ষণ করে তেমনি জীবনযাত্রার মান ঊর্ধ্বগামী হওয়ায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকেরা স্থানান্তরে যেতে আগ্রহী হয়।

(4) আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতি যেমন অনেককে বাসস্থান নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, অনেকেই আবার নিকট আত্মীয়দের থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করে।

### বর্হিপরিযান অভিবাসন (Immigration)

''A person who leaves a homeland to settle in another country'' অর্থাৎ অন্য কোন দেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির স্বদেশ ত্যাগ। নিম্নলিখিত কারণে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দেশত্যাগ করে থাকেন।

(i) লোকসংখ্যা দ্রুত স্বাভাবিক বৃদ্ধির (natural increase) ফলে প্রাকৃতিক সহায় সম্পদের ওপর সীমাতিরিক্ত চাপ।

(ii) বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে (যেমন, বন্যা, ধ্বংস, ভূমিক্ষয়) প্রাকৃতিক সহায় সম্পদের দ্রুত অবলুপ্তি।

(iii) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বছর বছর বন্যার তাণ্ডব, উপর্যুপরি খরা বা আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তন।

(iv) সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় জীবনে গভীর অস্থিরতা।

(v) ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কাজের অভাব।

### বাধ্যতামূলক পরিযান (Forced Migration)

মানুষ যখন কোন রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মান্ধতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে এমনকি, দূরদূরান্ত থেকে কর্মক্ষেত্রে নিত্যযাত্রী হিসেবে পৌঁছানোর জন্য বা কষ্ট লাঘবের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিব্রাজনে বাধ্য হয় তখন তাকে বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন (Forced Migration) বলে।

স্কেল বা পরিব্রাজনের এলাকা অনুসারে বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন দু'ধরনের। যথা, অন্তর্দেশীয় পরিব্রাজন (Internal Migration) ও আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন (International Migration)।

**অবৈধ পরিযান (Illegal Immigration)**

Illegal Immigration বা অবৈধ পরিযান হল কোন দেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ। বৈধ পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্র ছাড়া যদি অন্য দেশের নাগরিক কোন এক দেশে প্রবেশ করেন তবে তা অবৈধ অভিবাসন বলে গণ্য হবে। সাধারণত আর্থিক দিক দিয়ে সঙ্গতিপূর্ণ দেশগুলোতে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। এছাড়া ধর্মীয় সহনশীল দেশগুলোতেও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রথমটির উদাহরণ হল যুক্তরাষ্ট্র আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হল ভারতবর্ষ।

**আকর্ষক উপাদান (Pull Factor)**

বিভিন্ন প্রকার অসাম্যই হল পরিযানের প্রাথমিক কারণ। এ রকম একটি ধারণা থেকে 'আকর্ষণ' (Pull)

সূত্রটি হল — $\text{Crude Birth Rate} = \frac{\text{এক বছরের জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$

মতবাদ জন্ম নিয়েছে। 'আকর্ষণ' উপাদানগুলো হল গন্তব্যস্থলের (আকাঙ্ক্ষিত স্থল) প্রতি প্রলোভন, তা সে বাস্তবই হোক বা কাল্পনিক হোক। এগুলির মধ্যে আছে উচ্চ বেতন, সস্তায় জমি, বসবাসের পক্ষে কাম্য আকর্ষণীয় অবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ-সুবিধে।

**বিকর্ষক উপাদান (Push Factor)**

'প্রয়াস' উপাদানগুলো হল সেইসব প্রভাব যা পরিযান সৃষ্টি করে। এগুলো হল সেইসব প্রতিকূল অবস্থা যা কোন ব্যক্তির অন্য কোন স্থানে গিয়ে বাস করার কারণ।

**জনগণের নৃতাত্ত্বিক গঠন (Ethnic Composition of Population)**

জনগণের নৃতাত্ত্বিক গঠন বলতে পুরাতাত্ত্বিক যুগের মানুষের বিভিন্ন জাতীয় গোষ্ঠীকে বোঝায়। নৃতাত্ত্বিক গঠন অনুসারে মনুষ্যগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, যেমন নেগ্রিটো, মঙ্গোলয়েড, অষ্টোলয়েড ইত্যাদি। এইসব মূল আদিমগোষ্ঠী কালক্রমে সংমিশ্রণের ধারায় মিশে গিয়ে বিভিন্ন জাতির মানুষে পরিণত হয়েছে।

**জন্ম হার (Birth Rate)**

প্রতি এক হাজার জন মাথাপিছু প্রতি বছর যতজন জীবন্ত শিশুর জন্ম হয়, তাকে বার্থ রেট বা স্থূল জন্মহার বলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয় করার জন্য এই পদ্ধতি সবচেয়ে প্রচলিত।

**মৃত্যু হার (Death Rate)**

একে স্থূল মৃত্যুহার বা ক্রুড ডেথ রেটও বলা হয়। প্রতি বছর কোন জায়গায় প্রতি হাজারে যতজন লোক মারা যায় তাকে মৃত্যুহার বা স্থূল মৃত্যুহার বলে। অর্থাৎ, কোন বছরে কোন জায়গায় মোট মৃত মানুষের সংখ্যাকে ঐ এলাকার বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ঐ ভাগফলকে 1,000 দিয়ে গুণ করলে স্থূল মৃত্যুহার পাওয়া যায়।

**কাম্য জনসংখ্যা (Optimum Population)**

কাম্য জনসংখ্যা হল এমন এক আদর্শ লোকসংখ্যা যা কোন দেশের সম্পদের পরিমাণের ওপর বিবেচনা করে গড়ে ওঠে। কোন দেশের লোকসংখ্যা ও সেই দেশের কার্যকরি জমির অনুপাত যদি সমান হয়, তবে তাকে আদর্শ লোকবসতি বলে। একে কাম্য জনবসতিও বলে। এ কথা বলা হয় যে কোন দেশের উৎপন্ন সম্পদের সাহায্যে সেই দেশের মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যতক্ষণ পর্যন্ত বজায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশে আদর্শ লোকবসতি আছে। ইউরোপ, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি এবং উত্তর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মোটামুটি কাম্য সংখ্যা বিরাজ করছে।

**উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা (Over Population)**

দেশের জনসংখ্যা যদি বাড়ে আর তার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ যদি কমে যায়, তবে সেই দেশে বাড়তি জনসংখ্যা দেখা দেবে। এই বাড়তি জনসংখ্যাকে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা বলে। যেমন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে এই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

**অপ্রতুল জনসংখ্যা (Under Population)**

যদি কোন দেশে সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা কম থাকে বা লোকসংখ্যার অভাবে যদি সম্পদ সৃষ্টি না হয়, তবে সে দেশের লোকবসতি আদর্শ নয়। এই জনসংখ্যা অপ্রতুল বা ঘাটতি জনসংখ্যা নামে পরিচিত। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা খুব কম।

**নির্ভরশীল জনসংখ্যা (Dependent Population)**

নির্ভরশীল জনতা বলতে পরনির্ভর জনসংখ্যাকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণত শিশুকাল থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত এবং 60 বছরের বেশি জনসংখ্যাকে **পরনির্ভর জনসংখ্যা** বলে। কারণ এই জনসংখ্যা উপার্জনকারী নয়। এরা পরের শ্রমের ওপরই প্রধানত নির্ভর করেন। ভরণ-পোষণের জন্য এই জনতা পরের ওপর নির্ভরশীল হবার জন্য এদেরকে **নির্ভরশীল জনতা** বলে।

**ভারতে আন্তরাজ্য পরিযানের ধাঁচ, 1991**

| পরিযানের দিক | মোট | পুরুষ | স্ত্রী |
|---|---|---|---|
| গ্রাম থেকে গ্রামে | 28.40% | 18.02% | 36.71% |
| গ্রাম থেকে শহরে | 32.83% | 41.42% | 25.95% |
| শহর থেকে গ্রামে | 7.17% | 6.67% | 7.58% |
| শহর থেকে শহরে | 31.60% | 33.90% | 29.75% |
| মোট আন্তরাজ্য পরিযায়ী ব্যক্তি = | 26,484,521 | 11,780,504 | 14,704,017 |
| মোট আন্তরাজ্য পরিযায়ী ব্যক্তির হার | 100.00 | 44.48% | 55.52% |

## গ্রন্থপঞ্জী
## (Bibliography)


দে, মনোরঞ্জন, 2004 : জনবিজ্ঞান এবং জনসংখ্যা বিশ্লেষণ, ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

গুহ, সবিতা, 1987 : **জনসংখ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকা)** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, অনীশ, 2001 : **অর্থনৈতিক ভূগোল ও সম্পদ শাস্ত্রের পরিচয়,** টি.ডি. পাবলিকেশনস্, কলকাতা।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, 1988 : **অর্থনীতিক ভূগোল : বিশ্ব ও বাংলাদেশ,** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

পাল, অরুণশঙ্কর, 2000 : **সম্পদ সমীক্ষা,** বুকস্ অ্যান্ড অ্যালায়েড, কলকাতা।

বাকী, মোঃ আবদুল, 1994 : **গ্রামীণ বসতি, ভৌগোলিক পরিচয়,** কাশবন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাসার, এম. এস., 1985 : **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা,** মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ভট্টাচার্য, অণিমা ও ভট্টাচার্য, বিমলেন্দু, 1977 : **সমাজ বিজ্ঞানীর ভূগোল,** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

মজুমদার, প্রভাতরঞ্জন, 1991 : **জনসংখ্যাতত্ত্বের গোড়ার কথা, প্রথম খণ্ড,** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

সরখেল, জয়দেব, 1994 : **উন্নয়নের অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,** বুক সিন্ডিকেট, কলকাতা।

সেন, অমর্ত্য, 1397 B.S. : **জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি**—অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭, আনন্দ, কলকাতা।

সিকদার, জহিরুল ইসলাম, 2003 : **জনবিজ্ঞান ও** —অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭, আনন্দ, কলকাতা

হক, মহম্মদ জিয়াউল, 1986 : **উন্নয়নের অর্থনীতি ও পরিকল্পনা,** তৃতীয় সংস্করণ, বুক সোসাইটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Ahmad, Kazi S., 1941 : Environment and the Distribution of Population in India, **Indian Geographical Journal, Vol. 16.**

Baker, O.E., 1928 : Population, Food Supply and American Agriculture, **Geographical Review, Vol. 18.**

Bala, R., 1986 : **Trends of Urbanisation in India ,** Rawat Pub., Jaipur.

Beaujeu-Garnier, J. 1966 : **Geography of Population,** Longman, London.

Benjamin, B., 1970 : **The Population Census,** Heinemann, London.

Bhande, Asha and Tara Kanitkar, 1985 : **Principles of Population studies,** 2nd Edn., Himalayan Pub. Co., Bombay.

Blache, P. Vidal de la., 1926 : **Principles of Human Geography,** Constable & Co., London.

Brunhes, J., 1952 : **Human Geography,** Rand Mcnally & Co., New York.

Chandna, R. C., 1970 . **Changes in the Demographic Characteristics of Rohtak and Gurgaon Districts (1951-61) : A Geographical Analysis** (Unpublished Ph.D. Thesis), Punjab University, Chandigarh.

-2002 : **A Geography of Population : Concepts, Determinants and Patterns,** 5th Edn., Kalyani Pub., New Delhi.

-and

M.S.Sidhu,1980 : **Introduction to Population Geography,** Kalyani Pub., New Delhi.

Chandna, R. C., and Kant, Surya, : Distribution and Density of population in **Asian Profile, Vol. 13, No. 4, Hong Kong.**

Chatterjee, S. P., 1961 : Physical Features and Population Distribution in West Bengal, **Calcutta Geog. Review, Vol. 23, Calcutta.**

———' 1962 : Regional Pattern of Density and Distribtion of Population in lndia, **Geog. Rev. of India, Vol. 24.**

Clarke, John 1., 1965 : **Population Geography,** 1st Edn., Pergamon Press, Oxford.

———, 1972 : op. cit., 2nd Edn.

———, 1971 : **Population Geography and Developing Countries,** Pergamon Press, Oxford.

Cressey, George B., 1963 : **Asia's Lands and Peoples, A Geography of One-third of the Earth and Two-Third of its People,** 3rd Edn., McGraw Hill, New York.

Demko, G. J. et. al., 1963 : **Population Geography :** A Reader, McGraw Hill, New York.

Dicken, S. and Pitt, F.R.,1963 : **Introduction to Human Geography,** Blaisdell Pub. Co., London.

Doubleday, Thomas. 1847 : **The True Law of Population Shown to be connected with food of People**, 2nd Edn., George Pierce, London.

Finch, V. C., and U. T. Trewartha., 1957 : **Elements of Geography, Physical and Cultural.,** McGraw Hill, New York.

Fitzerald, Walter., 1967 : **Africa**, Tenth Edn., Methuen, London.

Franklin, S. H:, 1965 : The Pattern of Sex Ratio in New Zealand, **Economic Geography, Vol. 32.**

Geddess, Arthur., 1942 : The Population of India, Variability of change as a regional Demographic Index, **Geographical Review, Vol.32.**

Ghosh, S., 1970 : Physical and Economic Factors in the Population Distribution of Bihar, **The National Geographical Journal of India, Vol.16.**

Gosal, G. S., 1956 : **A Geographical Analysis of India's Population** (Unpublished Ph.D. Thesis), University of Wisconsin, Wisconsin, U.S.A.

Heer, David M. and Grigsby, J. S., 1994 : **Society and Population,** 3rd Edn., Prentice Hall of India, New Delhi.

Hudson, F.S., 1976 : A Geography of Settelments, 2nd Edn. Macdonald and Evans Ltd., Phymouth.

Hundington, E. and E. B., Shaw 1956 : **Principles of Human Geography, Modern** Asia Edn., John Wiley, New York.

Hussain, Majid, 2002 : **Human Geography**, Rawat, Jaipur.

James, Preston, E., and Jones, C.F., 1954 : **Geographic Study of Population in American and American Geography : Inventory and Prospects,** University Press, Syracuse.

Kellog, C. E., 1950 : Food, Soil and People, The Manhattan Pub. Co., New York.

Kirk, Dudley, 1968 : **The Field of Demography in International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. XII,** Macmillan and Free Press, London.

Knowles, R., and Wareing, G. 1976 : **Economic and Social Geography**, Made **Simple,** W. H. Allen, London. .

Krishnan, Gopal,1968 : **Distribution and Density of Population in Orissa, The National Geographical Journal of India, Vol. 14.**

1968 : **Changes in the Demographic Character of Punjab's Border Districts of Amritsar and Gurudaspur, 1951-61** (Unpublished Ph. D. Thesis, Punjub University, Chandigarh.

Kuriyan, George, 1938 : **Population and its Distribution in Kerals, Journal of Madras " Geographers Asscn., Vol. 13.**

Lee, E.S., 1970 : **The Theory of Migration in Population Geography, A Reader, ed. by Demko, G.J., et. al, McGraw Hill, New York**.

Leong, Goh Cheng and Morgan, G.C., 1982 : Human and Economic. Geography, 2nd Edn., Oxford University Press, Oxford.

Lowry, J.H., 1976 : **World population and Food Supply,** Edward Arnold, London.

Marx, K. 1929 : **Capital, Vol.** I, International Publisher, New York.

Mehta, B.C., 1973 : Spatial Distribution of Population in Rajasthan, **The National geographical Jour. of Inida, Vol. 19.**

Mehta G., 1967 : **Some Aspects of Changes in the Demographic Characteristics of Bist Doab,1951-61** (Unpublished Ph.D. Thesis), Punjab University, Chandigarh.

Mukherjee, R.K. 1948 : **The Changing Face of Bengal, A Study in Riverine Economy,** Calcutta University, Kolkata.

Negi, B.S., 1993-94 : **Human Geography, An Ecological Approach,** Seventh Edn., Kedar Nath Ram Nath, Meerut.

Prakash, O., 1970 : **Pattern of Population in Uttar Pradesh, The National Geographical Jour, of India, Vol. 16.**

Ravenstein, E. 1889 : **The Laws of Migration, Journal, Royal Statistical Society, Vol. 49.**

Ricardo, David,1951 : **Principles of Political Economy, Cambridge University Press, London.**

Rubenstein, James M. : **The Cultural Landscape, An Introduction**
and Bacon, Robert, 1990 **to Human Geography,** Prentice-Hall of India, New Delhi.

Sen, J., 1988 : **Land Utilisation and Population Distribution, A Case Study of West Bengal (1850-1985),** Daya Pub. House, Delhi.

Sen, S. 1989. : **Evolution of Rural Settlements in West**
and J. Sen -, 1978 Bengal, 1850-1985 (A Case Study), Daya Pub. House, Delhi:

: Phuia, A Study in Settlement Geography, **Landscape Systems, Vol. I:, No. I & 2.**

Shaw, E.B., 1955 : **World Economic Geography,** John Wiley, New York.

Sinha, B.N., 1958 : **Population Analysis of Orissa, The National Geographical Jour. of India. Vol. 4.**

Shryock, H.S., et. at.,1976 : **The Methods and Materials of Demography,** Academic Press, New York.

Stamp. L.D., 1950 : **Our Developing World,** Faber & Faber, London.

Stazeswski, J., 1957 : **Vertical Distribution of World Population, Polish Academy of Science Geographical Studies, No. 14.**

Taylor, Griffth, 1959 : **Australia, A Study of Warm Environment and their on British Settlement,** 7th Edn, Methuen, London.

| | | |
|---|---|---|
| Trewartha, G.T., 1953 | : | A Case for Population Geography, **Annals of the Asscn. of American Geographers, Vol. 43:** |
| 1969 | : | **A Geography of Population : World Patterns,** John Wiley, New York. |
| United Nations, 1951 | : | Principles and Recommendations for National Population Censuses, **Statistical Papers, Series M, No. 27.** |
| Verma, S.D:, 1956 | : | **Density and Pattern of Population in Punjab, The National Geographical Joun. of India, Vo1. 2.** |
| Wegner, P.L., 1964 | : | **The Human Use of the Earth,** The Free Press of Glence, New York. |
| Woods; Robert, 1979 | : | **Population Analysis in Geography,** Longman, London. |
| Zelinsky, Wilbur, 1966 | : | A Prologue to Population Geography, Prentice Hall, N.J. |


## রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী

**(প্রতিটি ৬০০ শব্দের মধ্যে)**

১। জনসংখ্যা ভূগোলের সংজ্ঞা দিন। এই ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
২। জনসংখ্যা ভূগোলের সাথে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করুন।
৩। জনসংখ্যা পরিসংখ্যানের বিভিন্ন উৎসগুলি কি কি? এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আলোচনা করুন।
৪। ভারতে 'জনসংখ্যা ভূগোল' বিষয়টির বিবর্তন সম্বন্ধে একটি নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।
৫। অতীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন কেমন ছিল?
৬। বর্তমান যুগের (১৬৫০-র পর) জনবৃদ্ধি গতি প্রকৃতি ও ধাঁচ সম্বন্ধে আলোচনা করুন। বৃদ্ধির কারণগুলি উল্লেখ করুন।
৭। বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রটি আলোচনা করুন।
৮। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জনসংখ্যা বন্টনের অনৈক্যের কারণ উল্লেখ করুন।
৯। উপযুক্ত উদাহরণ সহ জনসংখ্যা সম্পদ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।
১০। জনসংখ্যা নীতি কি এবং কেন? উন্নত দেশসমূহের জনসংখ্যা নীতি সম্পর্কে ধারণা দিন।
১১। ভারতের জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

## মাঝারি মানের প্রশ্নাবলী

**(প্রতিটি ১৫০ শব্দের মধ্যে)**

১। জনসংখ্যা ভূগোলের বিষয়সূচী কি কি?
২। জনসংখ্যা ভূগোল ও জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৩। জনসংখ্যা ভূগোলের প্রগতির ধারা নির্ণয় করুন।

৪। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তিনটি মূখ্য কারণ কি কি ?

৫। তৃতীয় বিশ্বের জনবিষয়ক প্রধান সমস্যা কি কি ?

৬। শিশু মৃত্যুহার কি ?

৭। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের দৈনিক ভিন্নতার কারণ নির্ণয় করুন।

৮। জন্মহার কমানোর জন্য চীন দেশে গৃহীত দুটি পরিকল্পনার উল্লেখ করুন।

৯। অধিক জনসংখ্যার সংজ্ঞা লিখুন।

১০। কাম্য জনসংখ্যার সংজ্ঞা লিখুন।

১১। জনসংখ্যার অভিক্ষেপ বলতে কি বোঝায় ?

১২। মৃত্যুহার পরিমাপের বিভিন্ন উপায় কি ?

১৩। শিশু মৃত্যুর হার উন্নয়নশীল দেশে সাধারণত বেশী দেখা যায় কেন ?

১৪। মৃত্যুহার কিভাবে ঘটে ?

১৫। জনসংখ্যা বন্টনের পরিমাপগুলির (measures) বিশ্লেষণ করুন।

১৬। মানুষ জমি অনুপাত বলতে কি বোঝায় ?

১৭। মানব উন্নতির সাথে শিক্ষাস্তর কিভাবে সম্পর্কিত ?

১৮। ম্যালথাসের জনসংখ্যা বৃদ্ধি তত্ত্বের গুণাগুণ নির্ণয় করুন ?

১৯। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি ?

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

**(প্রতিটি ৫০ শব্দের মধ্যে)**

(ক) জনাধিক্য বা উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা।

(খ) শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

(গ) প্রত্যাশিত আয়ু।

(ঘ) নির্ভরশীলতার অনুপাত।

(ঙ) শারীরবৃত্তীয় অনুপাত।

(চ) কৃষি ঘনত্ব।

(ছ) প্রজনন।

(জ) সার্বিক প্রজনন হার।

(ঝ) প্রত্যাশিত জীবনসীমা।

(ঞ) শিশু মৃত্যুর হার।

(ট) নিশ্চল জনবৃদ্ধি।

(ঠ) জন বিস্ফোরণ।

# BLOCK – 2

# একক 4 ❐ জনসংখ্যা গঠন (Population Composition)

গঠন


**4.0** প্রস্তাবনা

**4.1** উদ্দেশ্য

**4.2** তথ্যের গুণমান

**4.2.1** লিঙ্গাভিত্তিক গঠন

**4.3** নারী-পুরুষ সমাহারের পার্থক্য

**4.3.1** পৃথিবীব্যাপী লিঙ্গ অনুপাদের বন্টন

**4.4** বয়স গ্রন্থনা

**4.5** বয়স বিশ্লেষণ পদ্ধতি

**4.5.1** বয়স পিরামিড

**4.5.2** বয়সপুঞ্জ

**4.5.3** বয়স নির্দেশক

**4.6** পৃথিবীতে বয়স পুঞ্জের বন্টন

**4.7** অর্থনৈতিক গঠন

**4.8** বিশ্বের ভাষা

**4.9** বিশ্বের ধর্ম

**4.10** জাতি

**4.10.1** ভারতের জাতিগত গঠন

**4.11** সাক্ষরতা ও শিক্ষা

**4.12** অনুশীলনী


NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

## 4.0 প্রস্তাবনা

জনসংখ্যা গঠনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে লিঙ্গাভিত্তিক গঠন (sexcomposititon), বয়স গ্রন্থনা (Age composition) ও অর্থনৈতিক গঠন জনসংখ্যা ভূগোলে এক বিরাট জায়গা জুড়ে আছে। বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা ছাড়া জন্ম, মৃত্যু, পরিব্রজন (Migration), বিবাহিত / অবিবাহিত ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য আলাদা আলাদাভাবে নারী ও পুরুষের পরিসংখ্যান দরকার। লিঙ্গের ভারসাম্য জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। নারী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গই সমাজ ও অর্থনীতিতে কিছুটা বিপরীত ও কিছুটা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। তাই লিঙ্গাভিত্তিক গঠন আলোচনা জনসংখ্যা ভৌগোলিকের (Population Geographer) কাছে বেশি গুরুত্ব পায়। ফ্রাঙ্কলিন (Franklin) নিউজিল্যান্ডের নারী-পুরুষ অনুপাত বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে এই অনুপাত কোন

এলাকার সেই সময়কার অর্থনীতি সূচক (Economic index) ও আঞ্চলিক বিশ্লেষণের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিবাহের হার ও অন্যান্য জনমিতি (Demography) উপাদানের—যেমন বৃত্তি বা পেশাগত কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নারী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের অনুপাতের প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে। কোন জাতির কর্মসংস্থান ও ব্যয়ের বহর সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে সেই জাতির লিঙ্গ অনুপাত (Sex ratio) সম্পর্কে জানতে হবে। Trewartha যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে উভয় লিঙ্গের অনুপাত কোন এলাকার ভৌগোলিক বিশ্লেষণের মূলকথা। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে সমাজবিজ্ঞানীদেরও বয়স গ্রন্থনা বিশ্লেষণে এক বিশেষ আগ্রহ আছে। কারণ কোনও জাতির সমাজিক সম্পর্ক সেই জাতির বয়স কাঠামো দিয়ে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়। শুধু তাই নয়, অনেক ধরনের পরিকল্পনা, বিশেষ করে কোনও জাতিগত প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক কার্যকলাপ, কর্মী সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়গুলো কোন জনগোষ্ঠীর বয়স গ্রন্থনা দিয়ে নির্ণীত হয়। সম্ভাব্য স্কুল-ছাত্রছাত্রী, সম্ভাব্য ভোটদাতা, সম্ভাব্য কর্মক্ষমব্যক্তি আগাম জনসংখ্যা সম্পর্কে অনুমান (Estimate) ছাড়াও, শিক্ষক, ডাক্তার, কারিগরি ব্যক্তি ও সৈনিকের প্রয়োজন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ করতে বয়স কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা খুব দরকার। জন্ম, মৃত্যু ও নির্ভরশীল জনতার অনুপাত নির্ণয় করতেও বয়স কাঠামো বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

ধর্ম, জাতিগত বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যার গঠনকে প্রভাবিত করে। কোনও ধর্মে একাধিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, যেমন ইসলাম ধর্মে। ঐ ধর্মে সন্তান ঈশ্বরের দান বলে গণ্য করা হয়। তাই ঐ ধর্মে ভ্রূণ হত্যা, পাপ বলে গণ্য হয়। খ্রিস্টান ধর্মও জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে নয়। তবে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে মুসলিমরা জনসংখ্যার সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

আবার জাতিতে জাতিতে যে দৈহিক আকৃতিগত পার্থক্য, তার মূলে রয়েছে জলবায়ুগত হেরফের। আফ্রিকার নিগ্রো জাতি বেশি পরিশ্রম করতে পারে না। পক্ষান্তরে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শ্বেতকায় জাতি কঠোর পরিশ্রম করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, জাতিতে জাতিতে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পার্থক্য,তার মূলে আছে শিক্ষা, সংস্কৃতির পার্থক্য। এজন্য দেখা যায় আফ্রিকায় কোন পুরুষ কর্মের সন্ধানে যখন শহরে চলে আসেন তখন স্ত্রীকে চিরকালের জন্য গ্রামে রেখে আসেন, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে নারী-পুরুষ (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণী) একসাথে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। উভয়েই কারিগরি ও বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে দু'জনেই অতি সহজে শহরে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারে। আর এই পটভূমিতেই কোন জনগোষ্ঠীর লিঙ্গ ও বয়স গঠন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ জনসংখ্যা ভৌগোলিকের কাছে এক বিশেষ বার্তা বয়ে নিয়ে আসে।

## 4.1 উদ্দেশ্য

- আপনারা এই এককটি পড়ে জানতে পারবেন—
- নারী-পুরুষ অনুপাত বলতে কী বোঝায়?
- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্ত্রী-পুরুষ অণুপাতে কি ধরনের পার্থক্য রয়েছে?
- বয়স গ্রন্থনা কী?
- বয়স পিরামিড কী?
- বয়স পুঞ্জ বলতে কী বোঝায়?
- পৃথিবীতে নৃতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাসটি কীরূপ?
- ভারতের নৃতাত্ত্বিক বন্টনের ধারা কীরূপ?
- পৃথিবীতে কয়টি ভাষা আছে?
- পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার ধর্ম কী কী?

## 4.2 তথ্যের গুণমান (Quality of Data)

অধিকাংশ দেশে যেখানে বেশ কিছুকাল যাবৎ লোকগণনা চলে আসছে, সেখানে জনগণনা প্রতিষ্ঠান (Census organisation) লিঙ্গভিত্তিক গঠন কাঠামো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আসছে। সে যাই হোক, কতকগুলো মৌলিক সমস্যা থেকে যায়। লিঙ্গ ভিত্তিক গঠনের চেয়ে বয়স গ্রন্থনা তথ্যে বেশি ভুল থাকে কারণ নারী-পুরুষের পার্থক্য চোখে পড়ার মত এক স্বাভাবিক ব্যাপার। যা হোক, লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্যের প্রধান সমস্যা হল নারী সম্পর্কিত পরিসংখ্যানকে (data) কম করে দেখানো (Underestimation)। এ প্রসঙ্গে Shrylock লিখেছেন যে কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে কন্যা সন্তান বেশি মারা যায় বলে তা নথিভুক্ত (record) করা হয় না। আবার কোন কোন দেশে এমন অন্ধবিশ্বাস চালু আছে যে জনগণনার সময়ে বালকদের বালিকা হিসেবে দেখালে অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচানো যাবে। বয়সের পরিসংখ্যান নিয়েও অনেক সমস্যা আছে। তাই গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী কাজে এই সব তথ্য ব্যবহারে খুব সাবধান হওয়া দরকার। বয়স সম্বন্ধে তথ্য হয় জন্মতারিখ কিংবা যথার্থ বয়স (actual age) জিজ্ঞাসা করে সংগ্রহ করা হয়। জন্ম তারিখ (date of birth) সম্বন্ধে প্রশ্ন আরও সঠিক তথ্য জোগায়, কিন্তু ঐ সম্পর্কে অভিভাবকরা ভুল তথ্য দিলে সমস্যা থেকে যায়। সাধারণত (i) নিরক্ষরতা, (ii) জন্ম তারিখ না জানা বা (iii) সেই সম্বন্ধে উদাসীন থাকা, (iv) বয়সের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শেষের সঙ্গে 0, 5 ইত্যাদি যোগ করা, (v) জোড় সংখ্যার (pair no.) বয়স পছন্দ, (vi) বিভিন্ন ধরণের বর্ষ ভিত্তি (Calender year) চালু থাকা, (vii) 3, 7, 13 ইত্যাদি কিছু অশুভ সংখ্যার প্রতি কিরূপ মনোভাব (viii) কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ নিতে জনগণনাকারীদের (census enumerator) উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সঠিক তথ্য না দেওয়ার জন্য পরিসংখ্যানে বয়স সংক্রান্ত ভুল থেকে যায়। এদেশে অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, তাই তাদের সন্তানদের নির্দিষ্ট জন্মতারিখ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আশা করা যায় না। ভারতে গ্রামবাসীদের বিশেষ করে বয়স্কদের, বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করলেই তারা কোন যুদ্ধ, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ঘটনার কথা টেনে তাদের বয়স অনুমান করার চেষ্টা করেন। আবার এও দেখা যায় যে কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সুবিধে নিতে মানুষ কম বেশি করে বয়স দেখান। যেমন অনেকে বাবা মা ভালো জামাই পাবার জন্য বা ক্ষেত্রবিশেষে ভালো বিয়ে দেবার জন্য মেয়েদের বয়স কম/বেশি করে বলেন। আবার ছেলেরা হয় চাকরি পাওয়ার জন্য বা ভোটের অধিকার পাবার জন্য বয়স কম বা বেশি করে দেখান (Chandna, 1992)।

এছাড়া লোকগণনার সময় ঠিক বয়স জিজ্ঞাসা করলে কেউ কেউ গত জন্ম তারিখের বয়স উল্লেখ করেন। আবার কেউ বা আগামী জন্মতারিখে বয়স কত হবে তা বলেন। জনগণনাকারীরা এ বিষয়ে সতর্ক না হলে উভয় ক্ষেত্রেই বয়সের শ্রেণিবিভাগ (age group) ভুল থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। যে সব দেশের লোকজন শিক্ষিত বা যেসব দেশে বহুদিন ধরে লোকগণনা হয়ে আসছে, সেখানে পরিসংখ্যানে ভুল কম থাকে। এছাড়া একটা ভুল তথ্য বা ইচ্ছাকৃতভাবে লোকগণনায় দেওয়া হয়, তা হল মহিলাদের বয়স। সব দেশেই মহিলাদের বয়স কম করে বলার একটা প্রবণতা আছে। উপরে যে দুধরণের ভুল তথ্য পরিবেশন সম্বন্ধে বলা হল তার ফলে (a) কোনও বয়সপুঞ্জে (age group) জনসংখ্যা বেশি হয়ে যায়, কোনওটাতে কম হয়ে যায় (b) পাশাপাশি দুই বয়সপুঞ্জের মধ্যে পার্থক্যটা খুব চোখে পড়ে, বিশেষ করে কয়েকটি বয়সপুঞ্জের মধ্যে পার্থক্যটা খুব চোখে পড়ে।

### 4.2.1 লিঙ্গভিত্তিক গঠন (Sex Composition)

কোনও জনগোষ্ঠীর লিঙ্গভিত্তিক সমাহারের সংখ্যা (number) পরিমাপ (counter) সাধারণত নারী পুরুষের অনুপাতের (sex ratio) ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়। এক এক দেশে এক এক পদ্ধতিতে এই অনুপাত ঠিক করা হয়। রাশিয়ায় পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যার শতকরা হিসেবে এই অনুপাত প্রকাশ করা হয়।

যেমন, $\frac{Pm}{Pt} \times 100$ বা $\frac{Pf}{Pt} \times 100$

এক্ষেত্রে Pm হল পুরুষের সংখ্যা, Pf হল মহিলার সংখ্যা ও Pt হল মোট জনসংখ্যা।

যুক্তরাষ্ট্রেও প্রতি একশ মহিলাতে পুরুষের সংখ্যা হিসেবে নারীপুরুষ অনুপাত প্রকাশ করা হয়। সূত্রটি হল ঃ

$$\frac{Pm}{Pf} \times 100$$

নিউজিল্যান্ডে প্রতি শতক পুরুষে নারীর সংখ্যা দিয়ে নারী-পুরুষ অনুপাত ঠিক করা হয় ঃ

$$\frac{Pf}{Pm} \times 100$$

আমাদের দেশে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা দিয়ে এই অনুপাত প্রকাশ করা হয়। পদ্ধতিটি হল ঃ

$$\frac{Pf}{Pm} \times 1000$$

জনসংখ্যা ভূগোলে তিন ধরনের নারী-পুরুষ অনুপাত আছে। যেমন—

প্রাথমিক (Primary), গৌণ (Secondary) এবং তৃতীয় পর্যায় নারী-পুরুষ (tertiary sex ratio)। প্রাথমিক নারী-পুরুষ অনুপাত হল গর্ভাবস্থায় উভয় লিঙ্গের অনুপাত, গৌণ নারী-পুরুষ অনুপাত হল জন্মের সময় উভয় লিঙ্গের অনুপাত ও তৃতীয় পর্যায় অনুপাত হল লোকগণনার সময়কার দুই লিঙ্গের অনুপাত। এদের মধ্যে প্রথমটির ব্যবহার কম। কারণ তা অনুমান-সাপেক্ষ ব্যাপার।

## 4.3 নারী-পুরুষ সমাহারের পার্থক্য (Difference between Female-Male Ratio)

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রতি 100 জন মহিলাতে পুরুষের সংখ্যা দিয়ে নারী-পুরুষ সমাহার নির্ণয় করা হয়। Trewartha -র মতে জন্মের সময় কোন জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত থাকে প্রায় 105, কারণ মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের জন্ম হার বেশি। যেহেতু বাচ্চা ছেলেদের মৃত্যুর হার বেশি, তাই 4 বছরের মাথায় নারী-পুরুষ অনুপাতে তারতম্য এসে যায়। 4 বছরের পর থেকে জন-সংখ্যায় পুরুষ অনুপাত কমতে থাকে। আর 95 বছর বয়সে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের অর্ধেক হয়ে দাঁড়ায়। নারী পুরুষ অনুপাত 90-র কম বা 110 -র বেশি হলে তাকে অসম অনুপাত বলে। জনমিতি ও অন্যান্য কারণে নারী-পুরুষ অনুপাতে হেরফের ঘটে। কোনও দেশে পরিব্রাজন যদি কম হয়, তবে জনমিতি বৈশিষ্ট্য জন্ম ও মৃত্যুর হারের ওপর নির্ভর করে। যে সব দেশে জন্ম-মৃত্যু দুই-ই বেশি, সেইসব দেশে নারী-পুরুষ অনুপাতে একটা সাম্য থাকতে পারে। জন্ম-মৃত্যু উভয় হার কম হলে জনগোষ্ঠীকে "প্রৌঢ়" (mature) আখ্যা দেওয়া হয়। পরিযান, যুদ্ধ, সমাজ বিশেষে নারী ও পুরুষদের প্রতি অসম ব্যবহার নারী-পুরুষ অনুপাতে তারতম্য ঘটায়। এ প্রসঙ্গে United Nations-র Human Development Report -এ উল্লেখ করা হয়েছে "In no society do women enjoy the same opportunities as men." (পৃঃ 2)। এই Report -এ আরও বলা হয়েছে, "Every country has made progress in developing women's capabilities, but women and men still live in unequal worlds." তবুও বলতে হয় অনুন্নত দেশে এই সমস্যা তীব্র। অনুন্নত দেশে মহিলাদের হীন মর্যাদা ও সন্তানধারণজনিত

ঝুঁকি তাদেরকে বেশি সংখ্যায় মৃত্যুর দিলে ঠেকে দিয়েছে। এ কারণে ঐ সব দেশে নারী-পুরুষ অনুপাতে হেরফের বেশি ঘটে। পরিযান (migration) প্রায়শই নারী-পুরুষ অনুপাতে অসাম্য ঘটায়। লম্বা দূরত্ব বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অভিবাসনে (international migration) পুরুষেরা জড়িত থাকেন। অন্তর্অভিবাসনের (immigration) ফলে লিঙ্গ অনুপাত বাড়ে, কিন্তু বহির্অভিবাসনের (emigration) ফলে কমে। বহু বছর ধরে আলাস্কা ছিল প্রচুর সংখ্যায় পুরুষদের অন্তর্অভিবাসন স্থল। সেখানে প্রতি 100 জন স্ত্রীলোকে পুরুষের সংখ্যা ছিল 150 -র বেশি। দেখা গেছে মহিলারা সাধারণত কম দূরত্বে পরিযানের পক্ষপাতী। অবিবাহিত পুরুষেরা কিন্তু ভারী শিল্প, খনি ও কাষ্ঠ-কর্তন শিল্পে কাজ করতে ভালবাসেন। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, পেশাভিত্তিক নগরগুলো পুরুষদের বেশি আকর্ষণ করে।

### 4.3.1 পৃথিবীব্যাপী লিঙ্গ অনুপাতের বন্টন (World Distribution of Sex Ratio)

আগেকার আলোচনার সূত্র ধরে এবার পৃথিবীর নারী-পুরুষ অনুপাত নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে গোটা পৃথিবীর গড় নারী-পুরুষ অনুপাত সামান্য অসাম্য রয়েছে। তা হল 97 ও 100 -র মাঝামাঝি। প্রথমে ইউরোপের কথায় আসা যাক।

#### ● ইউরোপ

United Nations Demographic Year Book, 1983 থেকে দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপের পাঁচটি ছোট দেশ ফ্যারো আইল্যান্ড (917), অ্যানডোরা (861), জিব্রাল্টার (987), আইসল্যান্ড (985) ও আয়ারল্যান্ড (989) ছাড়া এই মহাদেশের প্রতি দেশেই পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের হার বেশি।

**ইউরোপ ঃ নারী-পুরুষ অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত সংখ্যা)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অ্যানডোরা | 861 | জিব্রাল্টার | 987 | নরওয়ে | 1020 |
| অস্ট্রিয়া | 1111 | গ্রিস | 1035 | পোল্যান্ড | 1052 |
| বেলজিয়াম | 1047 | হাঙ্গেরি | 1066 | পোর্তুগাল | 1110 |
| বুলগেরিয়া | 1008 | আইসল্যান্ড | 985 | রোমানিয়া | 1027 |
| চ্যানেল আইসল্যান্ড | 1074 | আয়ারল্যান্ড | 989 | আন মেরিনো | 1005 |
| চেকোশ্লোভাকিয়া | 1054 | আই অফ্ ম্যান | 1093 | স্পেন | 1038 |
| ডেনমার্ক | 1029 | ইতালি | 1048 | সুইডেন | 1020 |
| ফ্যারো আইল্যান্ড | 917 | লিসটেনস্টিন | 1025 | সুইজারল্যান্ড | 1054 |
| ফিনল্যান্ড | 1068 | ল্যাক্সেমবার্গ | 1042 | ইংল্যান্ড | 1055 |
| ফ্রান্স | 1041 | মাল্টা | 1062 | ওয়েল্‌স, নর্দান আয়ারল্যান্ড | 1042 |
| জার্মানি | 1091 | মনাকো | 1148 | স্কটল্যান্ড | 1078 |
| | | নেদারল্যান্ড | 1017 | যুগোশ্লাভিয়া | 1030 |

## ● উত্তর আমেরিকা

উত্তর আমেরিকার ছ'টি দেশ কোস্টারিকা (994), কিউবা (980), হন্ডুরাস (995), মেক্সিকো (980), পানামা (960) এবং গ্রীনল্যান্ডে (81) পুরুষদের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম। এদের মধ্যে আবার গ্রীনল্যান্ডে নারীর সংখ্যা সবচেয়ে কম।

**উত্তর আমেরিকা ঃ নারী-পুরুষ অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত সংখ্যা)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বাহামাস | 1013 | পানামা | 960 | গুয়াতেমালা | 972 |
| পুর্টোরিকো | 1053 | বারমুডা | 1050 | হাইতি | 1056 |
| সেন্ট ক্রিস্টোফার | | কানাডা | 1020 | হন্ডুরাস | 995 |
| ও নেভিস | 1080 | কেম্যান আইল্যান্ড | 1056 | জামাইকা | 1016 |
| সেন্ট লুসিয়া | 1117 | কোস্টারিকা | 994 | মার্টিনিক | 1062 |
| সেন্টপিয়ার ও মিকুইলন | 1025 | কিউবা | 980 | মেক্সিকো | 980 |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | 1004 | ডোমিনিয়ান রিপাব্লিক | 1004 | মন্টসেরাত | 1068 |
| যুক্তরাষ্ট্র | 1058 | গ্রীনল্যান্ড | 841 | নিকারাগুয়া | 1042 |
| ভার্জিন আইল্যান্ড | 1090 | | | | |

## ● দক্ষিণ আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকার কেবলমাত্র ভেনেজুয়েলা (999), ও পেরুতে (963), পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম। নীচের সারণিতে দক্ষিণ আমেরিকার লিঙ্গ অনুপাত দেওয়া হল ঃ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আর্জেন্টিনা | 1032 | ফরাসি গিনি | 1002 | পেরু | 963 |
| বলিভিয়া | 1027 | গুয়ানা | 1015 | উরুগুয়ে | 1026 |
| ব্রাজিল | 1001 | প্যারাগুয়ে | 1005 | ভেনেজুয়েলা | 999 |
| | | চিলি | 1019 | ইকুয়েডোর | 1002 |

## ● ওশিয়ানিয়া

ওশিয়ানিয়ার টোকলাউ-এ নারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (1,108)। অন্যান্য দেশগুলো হল ওয়ালিশ ও ফুটুনা আইল্যান্ড (1,047), নরফোক আইল্যান্ড (1,038), কিরিবাটি (1,027), নিউজিল্যান্ড (1,011)। নীচের সারণিতে ওশিয়ানিয়ার দেশগুলোর স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত দেখানো হল ঃ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আমেরিকান সামোয়া | 971 | নিউ ক্যালিডোনিয়া | 923 | সামোয়া | 933 |
| অস্ট্রেলিয়া | 1004 | নিউজিল্যান্ড | 1011 | সোলোমান আইল্যান্ড | 915 |
| ক্রীস্টম্যান আইল্যান্ড | 496 | নাইন | 984 | টোকলাউ | 1108 |
| বাকোস (কিলিং আইল্যান্ড) | 862 | নরফোক আইল্যান্ড | 1038 | টোবা | 957 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কুক আইল্যান্ড | 936 | প্যাসিফিক আইল্যান্ড | 951 | ওয়ালিশ ও ফুটুনা | |
| ফিজি | 981 | পাপুয়া নিউগিনি | 935 | আইল্যান্ড | 1047 |
| ওয়াম | 916 | পিটকাইবান | 833 | | |
| কিরিবাটি | 1027 | | | | |

## ● এশিয়া

এশিয়ার মধ্যে জাপান (1,032), ইয়েমেন (1,012), মায়ানমার (1,012), ইন্দোনেশিয়া, (1,012) ও ইজরায়েল (1,003) ছাড়া অন্যান্য সব দেশগুলোতে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা কম। এখানকার সবচেয়ে কমসংখ্যক নারীর দেশ হল কুয়াতার (572) এর আগের স্থান হল বাহারিন (713) ও কুয়েত -এর (748)।

**এশিয়া ঃ লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত সংখ্যা)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আফগানিস্তান | 944 | ইন্দোনেশিয়া | 1,012 | নেপাল | 952 |
| বাহারিন | 713 | ইরান | 937 | পাকিস্তান | 906 |
| বাংলাদেশ | 941 | ইরাক | 941 | ফিলিপাইনস্ | 993 |
| ব্রুনি | 873 | ইজরায়েল | 1,003 | কুয়াতার | 572 |
| মায়ানমার | 1,012 | জাপান | 1,032 | সিঙ্গাপুর | 962 |
| চীন | 948 | জর্ডন | 913 | শ্রীলঙ্কা | 962 |
| সাইপ্রাস | 994 | কোরিয়া গণতন্ত্র | 982 | সিরিয়া আরব গণতন্ত্র | 958 |
| গণতন্ত্র ইয়েমেন | 1,012 | কুয়েত | 748 | থাইল্যান্ড | 989 |
| হংকং | 923 | মালয়েশিয়া | 991 | তুরস্ক | 939 |
| ভারত | 933 | মালদ্বীপ | 899 | | |

## ● আফ্রিকা

আফ্রিকার অবস্থা এশিয়ার চেয়ে একটু ভাল। এখানকার আইভরি কোস্ট (931), চাদ (942), মিশর (961), দক্ষিণ আফ্রিকা (966), ইথিওপিয়া (982) গাম্বিয়া (975), রেডোরিগুন (985), টিউনিশিয়া (991), আপার ভোল্টা (994), মারিটানিয়া (995), সুদান (995), সিচিলিস্ (997), মরক্কো (998) ছাড়া অন্যান্য দেশগুলোতে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। তাই United Nations Development Programme -র Human Development Report (1995), Page 79) -এ মন্তব্য করা হয়েছে "In most countries in sub-Saharan Africa, gender inequality is less severe than in Latin America."

**আফ্রিকা ঃ লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত সংখ্যা)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আফগানিস্তান | 1,007 | লাইবেরিয়া | 1,004 | সেনেগাল | 1,021 |
| বেনিন | 1,086 | মাদাগাস্কার | 998 | সিচিলিস্ | 997 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বটসওয়ানা | 1,064 | মালাবি | 1,075 | সিয়েরা লিওন | 1,012 |
| বুরন্ডী | 1,064 | মালি | 1.048 | দঃ আফ্রিকা | 966 |
| ক্যামেরুন | 1,004 | মারিটানিয়া | 995 | সুদান | 995 |
| সেন্ট্রাল আফ্রিকা | | মরিশাস | 1,041 | সোয়াজিল্যান্ড | 1,132 |
| রিপাবলিক | 1,085 | রেডোরিশুন | 985 | টিউনিশিয়া | 991 |
| চাদ | 942 | মরক্কো | 998 | ইউনাইটেড রিপাবলিক | |
| ইথিওপিয়া | 982 | মোজাম্বিক | 1,059 | অফ্ টানজানিয়া | 1,039 |
| গাম্বিয়া | 975 | | | টাঙ্গানাইকা | 1040 |
| গিয়ানা বিসাউ | 1,074 | নাইজার | 1,001 | জাঞ্জিবার | 1,012 |
| আইভরি কোস্ট | 931 | রিইউনিয়ন | 1,039 | আপার ভোল্টা | 994 |
| কেনিয়া | 1,010 | রাউন্ডা | 1,044 | জায়ের | 1,031 |
| মিশর | 961 | সেন্ট হেলেনা | 1,047 | জাম্বিয়া | 1,031 |
| লেসোথো | 1,072 | টিস্রান ডি কুইনা | 1,084 | জিম্বাবোয়ে | 1,031 |

আগের আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়েছে যে অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় এশিয়া মহাদেশে পুরুষের সংখ্যা বেশি। আয়তন বা লোকসংখ্যার অনুপাতে এশিয়ায় নারীর সংখ্যা কম রয়েছে। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল এই যে এশিয়ায় পুরুষদের চেয়ে নারীদের মৃত্যুহার বেশি। কিছুটা ধর্ম, কিছুটা সংস্কৃতির জন্যে এই দেশের নারীরা কঠোর জীবন যাপন করেন। ফলে, তাঁরা বেশি সংখ্যায় মারা যান। এশিয়ার অনেক দেশে সব বয়েসের নারী জাতির প্রতি তাচ্ছিল্য ও সমাজে তাদের কম মর্যাদার দরুন এই মহাদেশে নারীর সংখ্যা কম। এক সময়ে ভারতে 'সতীদাহ' প্রথা নারীর সংখ্য কম হওয়ার জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল। একই কথা খাটে আফ্রিকার উত্তরের দেশগুলোর ক্ষেত্রে। এখানেও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মত নারীর সংখ্যা কম। মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড-এ পুরুষাধিক্যের কারণ হল সেখানকার উন্নতমানের বাণিজ্যিক কৃষি যা তরুণদের আকৃষ্ট করে।

এশিয়ার ঠিক বিপরীতে রয়েছে ইউরোপ মহাদেশের এক বিরাট অংশ (ইউরোপীয় রাশিয়াসহ) যেখানে পুরুষদের সংখ্যা কম, যা বিশেষভাবে রাশিয়া (82.7%), মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের (জার্মানী, 90.4%) ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এই সব দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বহু পুরুষ মারা গিয়েছিলেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশে যুদ্ধজনিত জীবনহানি কম হয়েছিল। তাই সেইসব দেশের নারী-পুরুষ অনুপাত রাশিয়া বা জার্মানীর মত অত কম নয়।

ইউনাইটেড নেশনস্ ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুক (1983) -র পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীতে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা হল 993 জন। কারণ হিসেবে বলা হয় যে পৃথিবীতে শিশুকন্যার চেয়ে পুত্রসন্তানের জন্মহার বেশি। এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় নারীর সংখ্যা বেশী। ওশিয়ানিয়া ও এশিয়ায় নারীর সংখ্যা কম। উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে উন্নত ও অনুন্নত মহাদেশগুলোর মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাতের পার্থক্য খুব একটা নজর কাড়ার মত নয়। উত্তর আমেরিকার মতন খুব উন্নত মহাদেশ ও আফ্রিকার মত খুব পিছিয়ে থাকা মহাদেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী। মজার ব্যাপার হল যে দুই মহাদেশেই পুরুষ-মৃত্যুর হার বেশি, যদিও এই দুই মহাদেশে মৃত্যুর কারণ ভিন্ন ভিন্ন। আফ্রিকায় পুরুষদের কঠোর জীবনযাত্রা ও উপজাতিতে উপজাতিতে সংঘর্ষ এবং উত্তর আমেরিকায় অত্যধিক পথ দুর্ঘটনা পুরুষ-মৃত্যুর জন্য দায়ী। এছাড়া, পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানদের সমানভাবে যত্ন নেওয়া হলেও পুত্রসন্তানের মৃত্যুহার কন্যাসন্তানের

মৃত্যুহারের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। ল্যাটিন আমেরিকা (পেরু) এবং ওশিয়ানিয়ার কয়েকটি দেশে (বাকোস, পিটকাইরান) নারীর সংখ্যা কম। কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে ওইসব দেশে অন্য প্রদেশ থেকে লোক (বিশেষ করে পুরুষেরা) এসে বসবাস করছেন।

## 4.4 বয়স গ্রন্থনা (Age Composition)

**বয়স গ্রন্থনা ও তার নির্ধারক ঃ** বয়স গ্রন্থনা ব্যাপারটি তিনটে মূল উপাদানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। জন্ম (natality), মৃত্যু ও গতিশীলতা (mobility)। এ প্রসঙ্গে ক্লার্ক (Clarke, 1992) যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে বয়স গ্রন্থনার এই তিনটে উপাদান পরস্পর নির্ভরশীল। এর একটির পরিবর্তন অন্য দুটো উপাদানকে প্রভাবিত করে এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানসমূহ বয়স কাঠামোকে প্রভাবিত করে। প্রজননে হার (Rate of Fertility) বিভিন্ন বয়ঃশ্রেণিতে (age categoreis) জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারণ করে। এ কারণে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার মত উচ্চ জন্ম হারের দেশগুলোতে তরুণ বয়সপুঞ্জের (age group) অনুপাত বেশি লক্ষ্য করা যায়। এইসব দেশের লোকদের গড় আয়ু কম হওয়ায় বয়স্ক শ্রেণির আনুপাতিক হার কম। এইসব মহাদেশের অধিকাংশ দেশগুলোর জনসংখ্যার প্রায় দুই-পঞ্চমাংশের গড় বয়স 15 -এর নীচে। এর বিপরীতে যে সব দেশের প্রজনন হার কম এবং মানুষের আয়ষ্কাল (life span) অনেক বেশি, সে সব দেশের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ তরুণ বয়সের, আর বয়স্ক শ্রেণির আয়ুষ্কাল তুলনামূলকভাবে বেশি।

ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশগুলো জনমিতিক পরিবৃত্তকাল (demographic transition) পূর্ণ করেছে। বয়স গ্রন্থনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওইসব দেশে তরুণ বয়সের জনসংখ্যা কম, কিন্তু বয়স্ক গোষ্ঠীর জনসংখ্যাই বেশি। প্রজননের ক্রমঃনিম্নমুখী গতি বয়স্ক গোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাত বাড়াতে সাহায্য করে। যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও জাপানে এটা দেখতে পাওয়া যায়।

কোন জনগোষ্ঠীর বয়স গ্রন্থনাকে মৃত্যুহারও প্রভাবিত করে, কিন্তু বয়স কাঠামোর ওপর এর প্রভাব অনেকাংশ নির্ভর করে। সাধারণভাবে, শৈশবকালে যদি শিশুদের বেঁচে থাকার হার বাড়ে, তবে তাদের আনুপাতিক সংখ্যা বাড়বে, আয় বয়স্ক লোকদের আনুপাতিক সংখ্যা কমবে। আবার যদি কেবলমাত্র বৃদ্ধদের জীবিতকালের (life span) হার বাড়ে, তবে তাদের আনুপাতিক সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু সেক্ষেত্রে শিশুদের আনুপাতিক হার কমবে।

অনুরুপভাবে, যদি তরুণ ও বৃদ্ধদের মৃত্যুহার কম হয়, তবে উন্নত দেশগুলোর মত অনুন্নত দেশে পরবর্তী বয়সপুঞ্জে লোকসংখ্যা সেই আনুপাতিক হারে বাড়বে। বিপরীতভাবে, অপেক্ষাকৃত বেশি (বয়স্ক) বয়সপুঞ্জের তুলনায় কম বয়সপুঞ্জের মৃত্যুহার যদি কমে যায়, তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো অনুন্নত দেশে কম বয়সপুঞ্জের জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে বেড়ে যাবে। জনসংখ্যার বয়স গ্রন্থনার ওপর পরিযানের একই রকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বয়সপুঞ্জের ওপর জন্ম ও মৃত্যুর প্রভাব পরিব্রাজনের থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। কারণ, অভিবাসনকারীদের একটা নিজস্ব বয়স ধাঁচ (age pattern) ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার আছে। যেহেতু অধিকাংশ স্থানান্তরকারীরা (emigrant) যুবা বয়সের হন এবং যেহেতু এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বেশি, তাই জনসংখ্যার ওপর এদের স্বল্পকালীন প্রভাব থাকে ঃ তা হল নবজাতকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সেই অনুপাতে বয়স্কগোষ্ঠীর জনসংখ্যা হ্রাস। যদি পরিযানের হার বজায় থাকে, তবে বয়স গ্রন্থনায় তরুণদের প্রাধান্য বজায় থাকে। যদি অভিবাসীদের (immigrant) আগমন বন্ধ হয়ে যায় বা কমে যায় অথবা বেশি বয়সের অভিবাসীরা সেই স্থানে আসেন, তবে বয়স গ্রন্থনায় তরুণদের প্রাধান্য থাকবে না। তাই বলা চলে যে বয়স কাঠামোর ওপর পরিযানের প্রভাব মূলত বয়স-নির্ভর। যেহেতু 15-30 বছরের কর্মক্ষম লোকেরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সপুঞ্জের তুলনায় বেশি সচল, তাই পরিযানের মাধ্যমে দুই স্থানের জনতার বয়স কাঠামোয় খুব বেশি রকম পরিবর্তন আসে।

জন্ম, মৃত্যু ও প্রব্রজন ছাড়া যুদ্ধ (যাতে পুরুষেরা অংশ নেন,), আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা নীতি (Population policy) দিয়ে বয়স কাঠামো বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বয়স কাঠামোর ওপর যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এতে প্রচুর যুবকের মৃত্যু ঘটে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পুরুষদের মৃত্যু প্রজননের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে, যা পরোক্ষভাবে বয়স কাঠামোর ওপর ছাপ ফেলে। যুদ্ধের ফলে কোন জনসংখ্যার বয়স বিন্যাসে (Distribution) অনিয়ম দেখা যায়। এই অনিয়ম এক বয়সপুঞ্জ (age group) থেকে অন্য বয়সপুঞ্জে স্থানান্তরিত হতে থাকে, যতদিন না ঐ বয়সপুঞ্জ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়। একইভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি বয়স বিভাজনের ওপর প্রভাব ফেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ প্রভাবিত বয়সপুঞ্জের আয়ুষ্কাল শেষ হয়। কোনো দেশের সুদূরপ্রসারী কতকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ জনসংখ্যা নীতি আছে যা সেখানকার বয়স গঠনের ওপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই জাপানে গর্ভপাতকে (abortion) বৈধ করায় সে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসখ্যায় 0–4 বয়সপুঞ্জের লোকসংখ্যার (অর্থাৎ শিশু) অনুপাত কমতে থাকে।

## 4.5 বয়স বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Methods of Age Analysis)

জনসংখ্যা ভৌগোলিকদের বয়সের সংখ্যাতত্ত্ব (statistics) বিশ্লেষণে এমন কিছু পদ্ধতি আছে যেগুলো বয়স সম্পর্কিত তথ্যের ভুল কমিয়ে দেয়। এভাবে তারা বয়স সম্পর্কিত সংখ্যাতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দেন। সাধারণত জনসংখ্যা ভৌগোলিকরা বয়স গ্রন্থনা বিশ্লেষণে তিনটে আলাদা আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এগুলো হল বয়স পিরামিড (Age Pyramid), বয়সপুঞ্জ (Age group) ও বয়স সূচক (Age indices)।

### 4.5.1 বয়স পিরামিড (Age Pyramid)

বয়স গ্রন্থনা বিশ্লেষণ করার সবচেয়ে চলতি পদ্ধতি হল বয়স পিরামিড যা সচরাচর লিঙ্গ পিরামিড (Sex Pyramid) নামে পরিচিত। কোন জনসংখ্যার বয়স কাঠামো দেখানোর জন্য বয়স পিরামিড গঠন করা হয় এবং এগুলো উলম্ব অক্ষে (vertical axis) একটি নির্দিষ্ট বয়সের (5 বছর) ব্যবধানে (যেমন 0–4 বছর থেকে শুরু করে যে বয়সসীমা পর্যন্ত পর্যালোচনা করতে হবে সে পর্যন্ত) দেখানো হয়। এই পিরামিডের অনুভূমিক অক্ষে (Horizontal axis) প্রতিটি বয়সপুঞ্জের (age group) স্ত্রী ও পুরুষের মোট সংখ্যা বা আলাদা আলাদাভাবে নারী ও পুরুষের সংখ্যা বা দুই লিঙ্গের শতকরা হার দেখানো হয়। যদি অনুভূমিক অক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ আলাদাভাবে দেখানো হয় তবে পিরামিডকে সমান দুটি ভাগে ভাগ করতে হয়, যার ডানপক্ষ স্ত্রী ও বামপক্ষ পুরুষকে নির্দেশ করে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরবর্তী বছরের লোকসংখ্যা পূর্ববর্তী বয়সপুঞ্জের লোকসংখ্যা থেকে কম হয়। এইভাবে যে বয়স গ্রন্থনা পিরামিড আমরা আঁকি, তার আকার দেশবিশেষে ভিন্ন রূপ নেয় (চিত্র 1.1, 1.2)। এটা নির্ভর করে সেই দেশের জনমিতিক পরিবৃত্তকালের ওপর। পিরামিডের এই আকৃতি যুদ্ধমহামারী, স্থানান্তর গমন, শিশু জন্মের আধিক্য ইত্যাদি কারণে পরিবর্তিত হতে পারে।

যে সব দেশে জন্ম ও মৃত্যুর হার দুই-ই বেশি সেইসব দেশ জনমিতিক পরিবৃত্তকালের প্রথম অবস্থায় থাকবে। এইসব দেশের বয়স গ্রন্থনায় যে পিরামিড হবে, তার ভিত্তি (base) হবে খুব চওড়া, কিন্তু তার ওপরের দিকটা খুব তাড়াতাড়ি সরু হয়ে আসবে। এর ফলে ত্রিভুজের দুই দিক অবতলাকৃতি দেখতে হবে। যে সব দেশ জনমিতিক পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে, সেই সব দেশের বয়স গ্রন্থনা পিরামিডের ভিত্তি (base) বড় হয়। পিরামিডের এই বড় ভিত্তি (broad base) আরও কিছু বয়সপুঞ্জ পর্যন্ত চলে। তারপর আয়ুষ্কালের পরিধি কম হওয়ার দরুন পিরামিডের ওপর দিকটা কম চওড়া হতে থাকে। তুলনামূলকভাবে, যে সব দেশ পরিবর্তনের তৃতীয় স্তরে রয়েছে সে সব

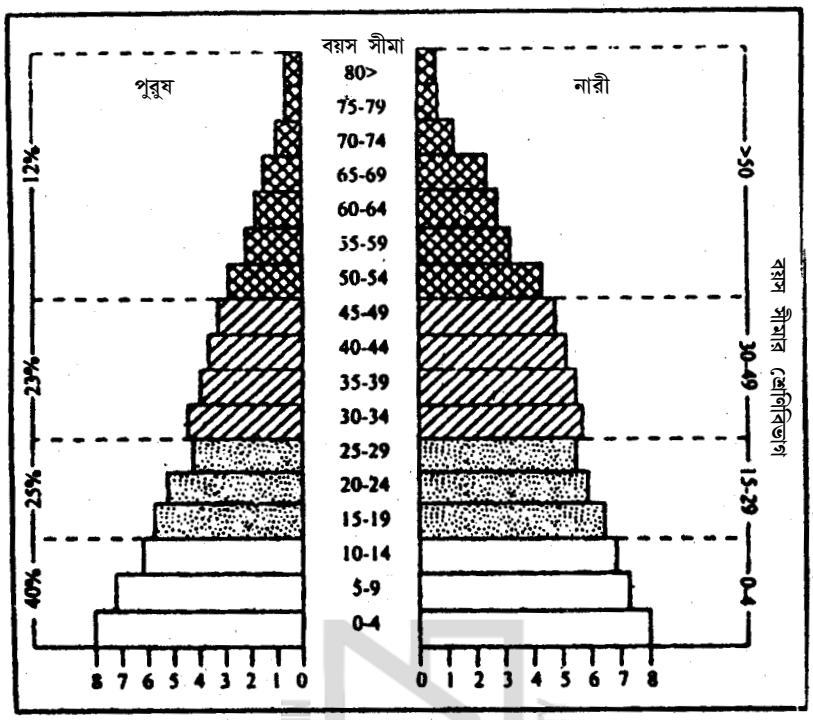


চিত্র 1.1 ঃ ভারতের জনসংখ্যা পিরামিড

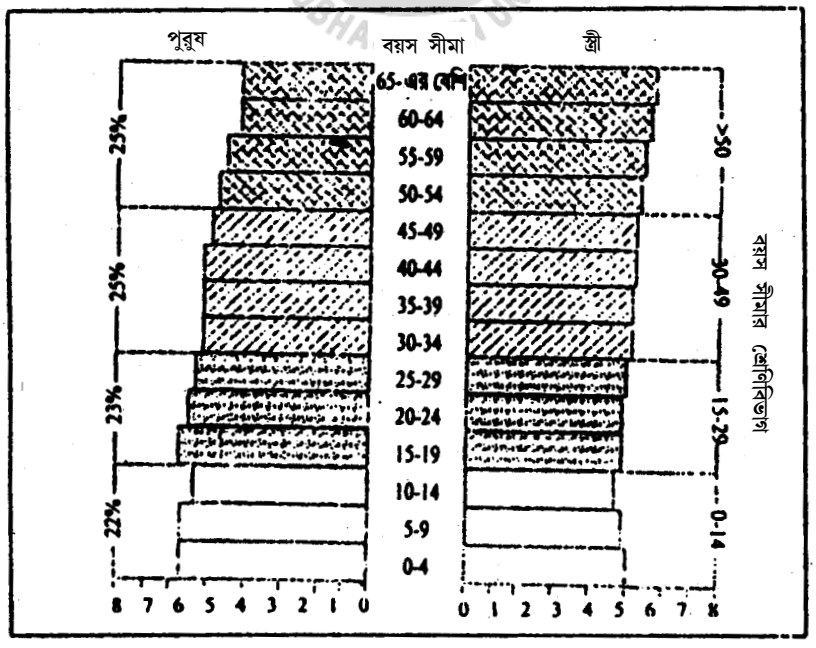


চিত্র 1.2 ঃ বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের পিরামিড

দেশের  পিরামিডের ভিত্তি সরু হয়। এই অবস্থা আরো কিছু বয়সপুঞ্জ পর্যন্ত চলতে থাকে। আর পিরামিডটি আস্তে আস্তে সরু হয়ে যায়।

যুদ্ধ, মহামারী, স্থানান্তর গমন ও শিশু জন্মাধিক্য বয়স পিরামিডের আকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধ সাধারণত কোন জনগোষ্ঠীর বয়স গ্রন্থনার ওপর দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব জন্ম হার কমার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যুদ্ধ অনেক যুবকদের প্রাণহানি ঘটায়, আর তার ফলাফল বয়স পিরামিডের আকৃতিতে ধরা পড়ে। অনুরুপভাবে, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের ফলে অনেক অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ও তা বয়স পিরামিডের আকৃতিকে বিকৃত করে। দৈবদুর্বিপাকে বিভিন্ন বয়সের মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়। স্বভাবতই পিরামিডের আকৃতি কিছুটা বদলায়। এছাড়া পরিযান, যা বয়স ও লিঙ্গ নির্ভর, তা পিরামিডের স্বাভাবিক আকৃতিকে বিকৃত করে। পরিযানের ফলে দুটি স্থানের মধ্যে (গ্রহীতা অঞ্চল ও বাস্তুত্যাগকারী অঞ্চল) জনবন্টনের পার্থক্য ঘটে, যার প্রভাব পিরামিডের ওপর পড়ে।

তবে কোনও কোনও সময় বয়স পিরামিডের অসঙ্গতি শুধুমাত্র একটি কারণের ওপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন দেশের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জনমিতি ইতিহাসের কারণে বয়স পিরামিডের আকৃতি বিভিন্ন হতে পারে। পিরামিডের বিভিন্ন স্তম্ভের (bar) বিকৃতির কোন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। যেমন বলা চলে, কোন দেশে (যেমন সুইডেনের ক্ষেত্রে হয়েছে) বহুদিন ধরে জন্ম ও মৃত্যু হার কম থাকলে, সেই দেশের বয়স পিরামিডের আকৃতি পিপার (barrel) মতন দেখতে হতে পারে। প্রথম (1914-1918) ও দ্বিতীয় (1939-1945) বিশ্বযুদ্ধের ফলে জন্ম ও মৃত্যুর হঠাৎ হ্রাস-বৃদ্ধির দরুন বয়স পিরামিডে অসঙ্গতি দেখা দেয় (যেমন ফ্রান্সের ক্ষেত্রে হয়েছে)। গর্ভপাত বৈধকরণের ফলে জন্মের হার কমতে পারে (যেমন জাপানের ক্ষেত্রে হয়েছে)। এক্ষেত্রে পিরামিডের ভিত্তির (base) আয়তন পরবর্তী স্তম্ভের (bar) তুলনায় ছোট হতে পারে। যে সব দেশে অভিবাসন ঘটেছে বা যে সব দেশ থেকে লোকজন বাইরে চলে গেছেন, সেইসব দেশে বয়স পিরামিডের মাঝের স্তম্ভ বা ওপরের স্তম্ভ যথাক্রমে বেশ লম্বা বা বেঁটে হতে পারে।

বয়স পিরামিড চিত্র থেকে আমরা কোন দেশের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে (i) সক্রিয় ও (ii) অ-কর্মী জনগোষ্ঠীর (non-working population) বয়সপুঞ্জের একটা সুন্দর রেখাচিত্র পাই, যা কিনা বয়স কাঠামো ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের চিত্রটিই তুলে ধরে। তবে আন্তঃরাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক স্তরে বয়স গ্রন্থনা সমাহারের তুলনা খুব একটা ফলপ্রসু হয় না। ইদানীং জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা বয়স পিরামিডের বিভিন্ন ব্যবহার করছেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সক্রিয় ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অকার্যকারী কোন জনগোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট বয়সপুঞ্জের প্রকৃত ভোগ ও উৎপাদনের নমুনা বর্তমানে পিরামিডের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই ধরনের পিরামিডে কোন একটি জনগোষ্ঠীর বয়স কাঠামো ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি সুন্দর রেখাচিত্র ফুটে ওঠে। এগুলোকে "অর্থনৈতিক বয়স পিরামিড" (Economic Age Pyramid) -ও বলা হয়।

আগেকার আলোচনা জনমিতিক বিশ্লেষণে বয়স ও লিঙ্গ পিরামিডের গুরুত্বকে প্রকাশ করে। অবশ্য এতে কতকগুলো মারাত্মক অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। বয়স ও লিঙ্গ পিরামিডের কোন স্থানিক (spatial) উপাদান নেই। যদি কেউ আন্তঃরাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক স্তরে বয়স গ্রন্থনার সমাহারের আঞ্চলিক বিশ্লেষণে উৎসাহী হন, তবে এক্ষেত্রে বয়স পিরামিড তার উপকারে খুব কমই আসবে।

### 4.5.2 বয়স-পুঞ্জ (Age Group)

জনসংখ্যা ভূগোলবিদ্‌রা বয়স কাঠামো আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে বয়সপুঞ্জ নামে আর একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। ছায়াপাত (choropleth) মানচিত্রের সাহায্যে বয়সপুঞ্জের এই আঞ্চলিক তুলনা সম্ভবপর হয়। সাধারণত

জনসংখ্যাকে তিনটি বয়সপুঞ্জে ভাগ করা হয় ঃ (i) তরুণ (young), (ii) প্রাপ্তবয়স্ক (adult) ও (iii) বৃদ্ধ (old)। যদিও বয়স বিভাজনের নির্ধারিত মান নেই, তবুও বয়সকে 15 এবং 60 বছরে ভাগ একটি সাধারণ চলতি রীতি। এইভাবে যে তিনটি প্রধান বয়সপুঞ্জ পাওয়া যায়, তা হল 0–14, 15–59 এবং 60 ও তার বেশি। এই তিনটি বয়সপুঞ্জের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য এবং তাদের বন্টনে ভৌগোলিক তারতম্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

**তরুণ ঃ** 15 বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েরা এই শ্রেণিতে পড়ে। কোন দেশের এই বয়স-পুঞ্জের জনসংখ্যার অনুপাত নির্ভর করে সেই দেশের জনমিতিক পরিবৃত্তকালের পর্যায়ের ওপর। যদি কোন দেশ জনমিতি পরিবৃত্তকালের (i) প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরে থাকে তবে এই বয়সপুঞ্জের অনুপাত বেশি হবে। (ii) কিন্তু যদি সেই দেশ জনমিতি পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় স্তরের শেষে উন্নীত হয়, তবে সেই অনুপাত কমবে। (iii) আবার যদি কোন দেশ জনমিতি পরিবৃত্তকালের শেষ ধাপে পৌঁছায়, তবে এই অনুপাত ন্যূনতম হবে। গোটা পৃথিবীর 35.6 শতাংশ জনতার বয়স হল 15-র নীচে। পক্ষান্তরে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে এই হার হল যথাক্রমে 23 ও 40 শতাংশ (চিত্র 1.3)। বিভিন্ন দেশে জন্মহারের তারতম্যই এই আনুপাতিক হারের হেরফেরের কারণ, যেমন ইউরোপের ক্ষেত্রে এই হার 25, আফ্রিকায় 50, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রায় 40 শতাংশ। যে সব দেশে জন্মহার বেশি, সেইসব দেশে জনসংখ্যায় তরুণদের আনুপাতিক হার বেশি। অন্যদিকে, যে সব দেশে জন্মহার কম সেই সব দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তরুণরা অনুৎপাদক ও সবচেয়ে ব্যয়বহুল বয়সপুঞ্জ, কারণ প্রাপ্তবয়স্করা এদের খাদ্য-পোশাক-শিক্ষার ভার নেন। সৌভাগ্যক্রমে, এই বয়সপুঞ্জ জৈবিক (biologically) দিক দিয়ে অনুৎপাদক এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এই শ্রেণির ভূমিকা নেই, বিশেষ করে ছেলেদের।

**প্রাপ্তবয়স্ক ঃ** যদিও 15 থেকে 59 বছর পর্যন্ত এই বয়সপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত, তবুও আয়ুষ্কালের ওপর ভিত্তি করে তা 55 থেকে 65 -র মধ্যে ওঠানামা করে। Trewartha যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে এই বয়সপুঞ্জের লোকজনরা জৈবিক দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রজননক্ষম ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে সচল। এই শ্রেণি অপর দুই বয়সপুঞ্জের লোকদের সব ভার বহন করেন।

তরুণদের খাওয়ানো-পড়ানো ও শিক্ষার ব্যয় বহন করা ছাড়াও এরা বৃদ্ধদের দেখাশোনা করার সম্পূর্ণ দায়ত্ব বহন করেন। পৃথিবীতে প্রাপ্তবয়স্কের অনুপাতে আঞ্চলিক হেরফের খুব একটা চোখে পড়ে না, তবে অনুন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উৎপাদনশীল এই বয়সপুঞ্জে জনসংখ্যার অনুপাত সামান্য বেশি হয়। অতি উন্নতশীল দেশে এই হার হল 65.6 শতাংশ, আর অনুন্নত দেশে এই হার 56.2 (United Nations, 1983)। জন্ম ও মৃত্যুহারের মাত্রা এবং প্রাপ্তবয়স্ক অনুপাতের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক দেখা যায়। পরিযানের ফলে জনসংখ্যা যথেষ্ট বাড়লে এই সম্পর্ক বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। যেহেতু পরিযান বয়স-নির্ভর তাই এই ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কের অনুপাত প্রব্রজনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই প্রাপ্তবয়স্ক বয়সপুঞ্জকে অনেক সময় আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (i) 16 থেকে 34 বছর ও (ii) 35 থেকে 59/64 বছর। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রথম উপবিভাগকে দ্বিতীয় উপবিভাগের তুলনায় বেশি সক্ষম বলে মনে করা হয় (Chandna, 1992)।

**বৃদ্ধ ঃ** 60 ও তার বেশি বয়সের লোকজনদের সাধারণত বৃদ্ধের পর্যায়ে ফেলা হয়, যদিও কোন কোন দেশে এঁদেরকে জ্যেষ্ঠ নাগরিক (Senior Citizens) বলা হয়, যেমন যুক্তরাষ্ট্রে। কয়েকটি উন্নত দেশ ছাড়া এই বয়সপুঞ্জে সাধারণত পুরুষদের তুলনায় (মৃত্যুহার বেশি বলে) মহিলার সংখ্যা বেশি থাকে। আবার এরা অধিকাংশই অনুৎপাদক এবং বংশবিস্তারে অক্ষম। দেখা গেছে যে এই বয়সপুঞ্জে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বেশি থাকে। সব বয়সপুঞ্জেই মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মৃত্যুহার বেশি হয়। এইভাবে বৃদ্ধ পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায় যে মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

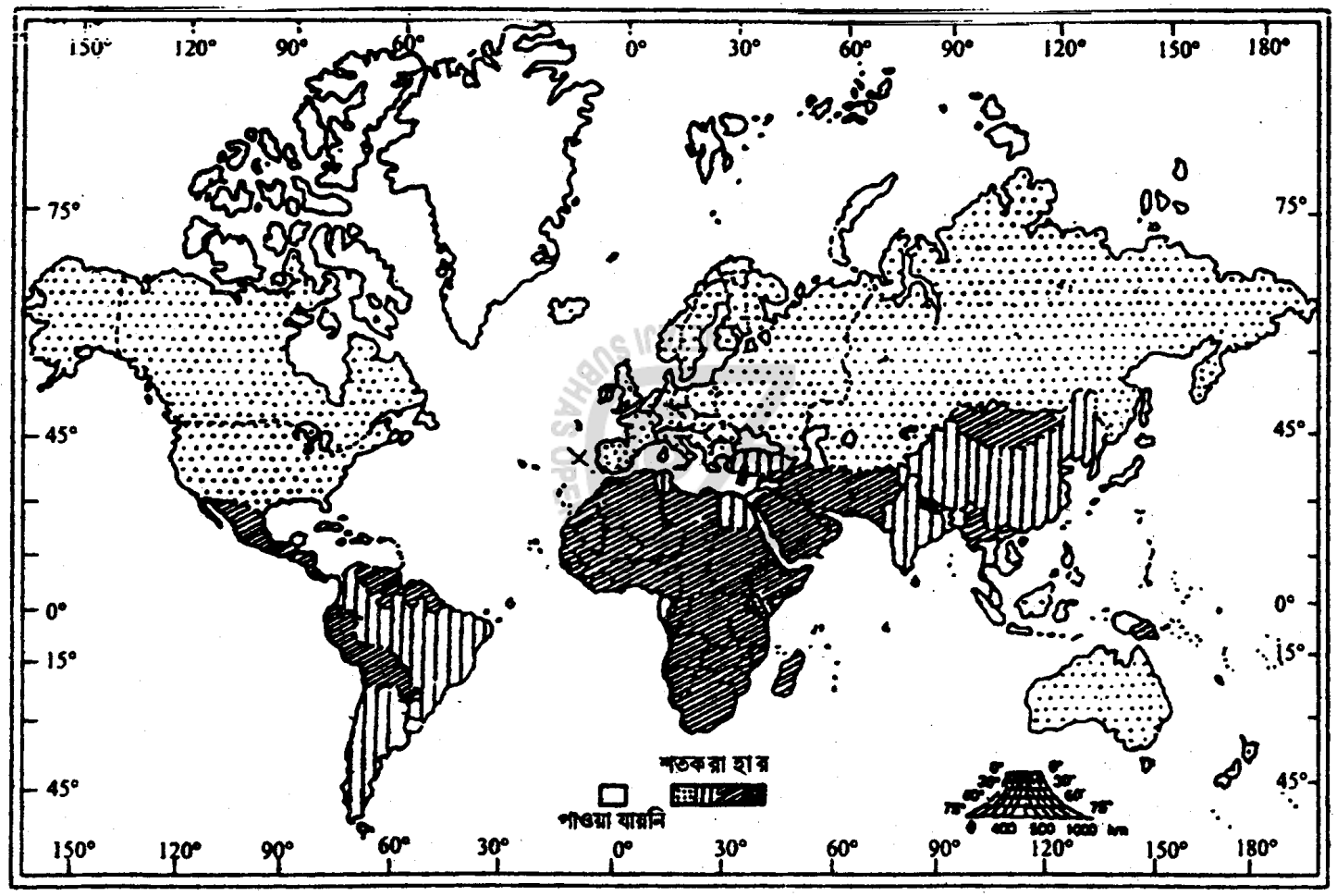


চিত্র 1.3 পৃথিবী ঃ 14 বছরের কম জনসংখ্যা (%), 1984

এই বয়স শ্রেণির জনসংখ্যার অনুপাত অঞ্চলভেদে হেরফের হয়। স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোতে এর অনুপাত কম, আর উন্নত দেশগুলোতে বেশি। এই বয়সের মহিলা ও পুরুষেরা প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে বোঝাস্বরূপ, যেহেতু এঁদের (বৃদ্ধদের) খাবার, পোশাক ও স্বাস্থ্যের দিকে প্রাপ্তবয়স্কদের নজর রাখতে হয়।

এবার ভারতের বয়স পিরামিডের (1991) দিকে একটু চোখ বোলানো যাক। 1991 সালের বয়স পিরামিড থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদেশে 14 বছর বা তার কম বয়সী মানুষ ভারতের মোট জনসংখ্যার 42 শতাংশ। পক্ষান্তরে, বয়স্ক (বৃদ্ধ) জনসংখ্যা 6 শতাংশ এবং মধ্যবর্তী বছরের (15-19 বছর) জনসংখ্যা মোট জনতার 52 শতাংশ। এই কর্মক্ষম জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে আছেন প্রথম দুই শ্রেণির জনতা অর্থাৎ 48(42+6) শতাংশ জনতা। অন্যভাবে বলতে হয় এদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেশি। উক্ত পিরামিড থেকে আমরা আরও বলতে পারি যে এদেশে জনসংখ্যার গঠন 'তরুণ' (young) প্রকৃতির, পাশ্চাত্য দেশের মতন প্রৌঢ় নয়। এ ধরনের জনসংখ্যার প্রাধান্যের দরুণ মানুষের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। যেহেতু সম্পদের বেশির ভাগ অংশ মানুষের ভোগের জন্য ব্যয় হয়, তাই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি আশানুরূপ ঘটে না। দারিদ্র্য ও বেকারী বাড়ে, যা পরোক্ষভাবে জনসংখ্যাকে বাড়িয়ে তোলে।

যেহেতু 15-60 বছর পর্যন্ত জনসংখ্যা এদেশে সর্বাধিক (52 শতাংশ), তাই প্রজননক্ষম জনসংখ্যাও বেশি, যা লোকসংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে। এদেশে যুবকদের অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার দরুন জন্মহারও বেশি হয়। ভারতে বয়স পিরামিডের আকৃতি (নীচের দিকে অধিক বিস্তৃতি ও ওপরের দিকে ক্রমশ সরু) ও অধিক জনসংখ্যার হারকে সূচিত করে।

### 4.5.3 বয়স নির্দেশক (Age Indices)

বয়স নির্দেশকের সাহায্যেও বয়স গ্রন্থনার বিশ্লেষণ করা যায়। বয়স নির্দেশক নির্ণয় ও তার সাহায্যে বায়োগোষ্ঠীর সমাহারের বিশ্লেষণে খুব একটা চলতি নয়। যা হোক, বয়স নির্দেশক শ্রমশক্তি প্রকল্প (labour force project), জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিশ্লেষণ, পরিযান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। বয়স নির্দেশক অনুপাত নির্ণয় নানাভাবে করা যায়—যেমন বৃদ্ধ ও প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে, বৃদ্ধ ও যুবক শ্রেণির মধ্যে, যুবক ও প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে, যুবক বনাম প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধের মধ্যে, বৃদ্ধ বনাম প্রাপ্তবয়স্ক ও যুবকদের মধ্যে অনুপাত। একদিকে প্রাপ্তবয়স্ক, অন্যদিকে যুবক ও বৃদ্ধের অনুপাতকে "নির্ভরতার অনুপাত" (dependency ratio) বলে। এই অনুপাত কোন দেশের সম্ভাব্য শ্রমশক্তির সূচক। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক দরিদ্র ও অনুন্নত দেশে তরুণদের প্রাধান্যের দরুনই এই অনুপাত বেশি। বয়স পিরামিডের মতই বয়স নির্দেশককে মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়, আর এতে করে আঞ্চলিক তারতম্য বুঝতে সুবিধে হয়।

## 4.6 পৃথিবীতে বয়স-পুঞ্জের বন্টন (World Patterns of Age Group Distribution)

1980 সালের একটা মোটামুটি হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার মধ্যবর্তী বয়স (median age) হল 22.4। অনুন্নত দেশের তুলনায় উন্নত দেশের এই মধ্যবর্তী বয়সের হিসেবটা একটু বেশি, উন্নত দেশের ক্ষেত্রে 31.4 বছর, আর অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে 19.8 বছর। যখন বৃদ্ধ জনসংখ্যার অনুপাত বাড়ে, তখন তাকে "প্রৌঢ়" জনসংখ্যা বলে। জন্মহার কমলে তরুণ বয়সের অনুপাত কমে যায় বলে এটা সম্ভবপর হয়। উন্নত দেশগুলোতে এই জিনিস অনেক দিন ধরে চলছে। অপরদিকে, অনুন্নত দেশগুলোতে এটা নতুন। সাধারণত, বয়সের ক্ষেত্রে মৃত্যুহারের প্রবণতা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু, উন্নত বিশ্বে মৃত্যুহার কমে যাওয়া নিশ্চিতভাবে তাদের জনসংখ্যার বয়সকে বাড়িয়ে দেবে। অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে তরুণ বয়স শ্রেণির মৃত্যুহার কম হয়ে যাওয়ায় বৃদ্ধশ্রেণির তুলনায় তরুণশ্রেণির অনুপাত বেশি হয়। মধ্যবর্তী বয়স আফ্রিকা মহাদেশে সবচেয়ে কম (17.3 বৎসর), আর সবচেয়ে বেশি ইউরোপ মহাদেশে (33 বৎসর)। এটা প্রজনন ক্ষমতার

সঙ্গে নেতিবাচক সম্পর্ক (negative relation) স্থাপন করে। প্রজনন কম হলে মধ্যবর্তী বয়স বেশি হয়। এ কারণে কম উন্নত ও অতি উন্নত দেশগুলোর মধ্যবর্তী বয়সের বৈপরীত্য তাদের প্রজনন হারের অসমতা থেকে সৃষ্টি হয়।

বয়স গ্রন্থনা বয়সপুঞ্জের সাহায্যেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তরুণ জনসংখ্যা ও বৃদ্ধ জনসংখ্যার অনুপাত একে অন্যের সঙ্গে বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত। বৃদ্ধ জনসংখ্যার অনুপাতে খুব কম পরিবর্তন দেখা যায়। স্বভাবতই, তরুণ জনসংখ্যার অনুপাতের আঞ্চলিক পরিবর্তনকে জনমিতিক বিবর্তনে অধিক সংবেদনশীল সূচক (sensitive index) বলে মনে করা হয়। 1980 সালে পৃথিবীর জনসংখ্যার 35.6 শতাংশ ছিল 15 বছরের কম বয়সের। উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলে 15 বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়ে শতকরা হার ছিল যথাক্রমে 23 এবং 40 তরুণ বয়সের অনুপাতের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের বৈষম্যের কারণ হল তাদের প্রজননের হেরফের।

আমরা আগেই দেখেছি যে যদিও উন্নত দেশগুলো জনমিতিক পরিবৃত্তকালের শেষস্তরে পৌঁছেছে বলে তাদের প্রজনন হার কমে এসেছে, কিন্তু এ খনও অনেক অনুন্নত দেশ জনমিতিক পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে। ফলে প্রতি বছর অনেক শিশু জন্ম নিচ্ছে। চিত্র 1.3 থেকে দেখা যাচ্ছে যে 14 বছর ও তার কম শিশু জনসংখ্যার অনুপাত আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য আমেরিকার অধিকাংশ দেশ, ইকোয়োডার, পেরু, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, নেপাল, বাংলাদেশ, মায়ানমার, ল্যান্ডস, ভিয়েতনাম ও মঙ্গোলিয়ায় বেশি (40 শতাংশের বেশি)। জনসংখ্যার এই চিত্রের সঙ্গে পৃথিবীর মোট প্রজনন হারের চিত্র তুলনা করলে দেখা যাবে যে এই সব অঞ্চলে গড় পড়তা প্রতি নারীর 4 থেকে 5 জন, এমনকি তার বেশি সন্তান জন্মায়। এই বিপরীত চিত্রে দেখা যায় 15 বছরের কম জনসংখ্যার অনুপাত সবচেয়ে কম হল উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ (রাশিয়া সমেত), ওশিয়ানিয়া ও জাপানে—90 শতাংশেরও কম, এইসব অঞ্চলে প্রতি নারীর গড়ে একটি করে সন্তান হয়।

প্রজননের প্রকৃতি এবং বিভাজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হল "মোট নির্ভরতার অনুপাতের (total dependency ratio) প্রকৃতি"। মোট নির্ভরতার অনুপাত হল একদিকে প্রাপ্তবয়স্ক এবং অন্যদিকে বৃদ্ধ ও তরুণদের অনুপাত। 1980 সালে পৃথিবীতে এই নির্ভরতার অনুপাত ছিল 70.6। অনুন্নত দেশগুলোতে এই অনুপাত ছিল 77.8, আর উন্নত দেশগুলোতে 52.6। মহদেশগুলোর মধ্যে আফ্রিকায় নির্ভরতার অনুপাত সবচেয়ে বেশি (93.4), আর উত্তর আমেরিকায় সবচেয়ে কম (50.7)। দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ায় নির্ভরতার অনুপাত বেশি, কিন্তু ইউরোপ ও ওশিয়ানিয়ায় কম। এভাবে দেখা যায় যে উন্নত ও অনুন্নত পৃথিবীতে প্রজনন হার হেরফেরের মতোই নির্ভরতার হারের ক্ষেত্রেও বৈষম্য আছে। মোট নির্ভরতার অনুপাত প্রজননের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে পৃথিবীর কম উন্নত অঞ্চলগুলোতে 15 বছরের কম বয়সের জনসংখ্যার অনুপাত বেশি, বয়স্ক লোকদের অনুপাত কম এবং তাদের বেশি প্রজনন ক্ষমতার জন্যে মোট নির্ভরতার অনুপাতও বেশি।

এইসব অঞ্চলগুলোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হল যে জন্মহার কম হলে নির্ভরতার বোঝা কমবে। এই প্রবণতা ভবিষ্যতে অনুন্নত দেশগুলোতে কাজের সুযোগ সৃষ্টির পক্ষে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে, অতি উন্নত দেশগুলোতে 15 বছর বয়সের নীচে লোকসংখ্যার অনুপাত কম, নির্ভরতার হারও কম। এসব দেশগুলোতে ভবিষ্যতে ক্রমশ বয়স্ক জনসংখ্যার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে, কারণ এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে যুবক শ্রেণির অনুপাত আরও কমবে (2000 সালের মধ্যে প্রায় 20.8 শতাংশ)।

ভারতে এখনও জন্মহার বেশি ও মৃত্যুহার কম। বলা যেতে পারে ভারতের জনসংখ্যার বয়স গ্রন্থনা অনুন্নত দেশের মতন। এদেশের 39.7 শতাংশ জনসংখ্যা 15 বছরের কমবয়স্ক, মাত্র 3.2 শতাংশ জনসংখ্যার বয়স 65 বছরের ওপরে। ভারতের ক্ষেত্রে নির্ভরতার হার 73.6। স্বভাবতই স্ত্রীলোকের গড় প্রজনন ক্ষমতা 4 -এর বেশি এখানে গড়পড়তা (1986-91সাল) জন্মহার প্রতি হাজারে 30.9 আর মৃত্যুহার প্রতি হাজারে 10.8।

## 4.7 অর্থনৈতিক গঠন

**ভূমিকা ঃ** যে কোনো দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ হল তার মানব সম্পদ। আবার জনসংখ্যার যে অংশ কোনও অর্থনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণ করে তাকে অর্থনৈতিক সক্রিয় (economically active) জনসংখ্যা বলে।

**অর্থনৈতিক গঠন ঃ** জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যার 15-59 বছর এই অংশটিকে সক্রিয় বা কর্মক্ষম অংশ (active part) বলা হলেও এদের সকলেই যে অর্থকরী বৃত্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই কোনও দেশেই এই বয়স সীমার অন্তর্গত সকল ব্যক্তি উপার্জন করে না। জনসংখ্যা তত্ত্বে যাদের আমরা বৃদ্ধ বা প্রবীণ নাগরিক বলি (60 বঃ ও তার ঊর্ধ্ব) তাদের সকলেই অবসরপ্রাপ্ত জীবনযাপন করেন না। অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে অর্থকরী বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকে। উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত বা বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই 15/26 বৎসরের পূর্বে কোন বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করে না। অনগ্রসর কৃষি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় 10/12 বছরের বালক বালিকারা চাষবাস, গোপালন ইত্যাদি কাজ থেকে আয় করতে শুরু করে। সুতরাং জনসংখ্যার ঠিক কত অংশ উপার্জনশীল, কত অংশই বা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তার সঠিক হিসেব যে কোন দেশেই দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গ্রামাঞ্চলে (কিছুটা শহরাঞ্চলেও) যে সব পরিবারের উপার্জনের কোন স্থায়ী উৎস নেই অথবা যেসব পরিবারে মাথাপিছু উপার্জন খুবই কম, সেই সব পরিবারেই উপার্জনকারীদের সংখ্যা সব থেকে বেশি। এইসব পরিবারের 15 বছরের কম বয়সের বালকদের মধ্যে 15-20% কিছু না কিছু উপার্জন করে। বলাই বাহুল্য, গ্রামাঞ্চলে পুরো সময়ের বা সারা বছরের কাজ আছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা শহরাঞ্চলের তুলনায় কম।

1991 এর জনগণনা অনুযায়ী, এদেশে 314013 এদের মধ্যে আবার 25.93 মিলিয়ন প্রবীন কর্মী এবং অবশিষ্ট প্রান্তিক কর্মী। জনমিতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কাঠামো ভারতে কম পরিমাণ শ্রমশক্তির উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

নীচের সারণিতে ভারতীয় শ্রমশক্তির পেশাগত বণ্টন তথা পেশাগত পরিবর্তন দেখানো হল—

ভারতের শ্রমশক্তির পেশাগত বণ্টন ও পরিবর্তন ঃ

| পেশা | 1901 | 1951 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রাথমিক ক্ষেত্র (1+2+3) | 71.8 | 72.1 | 72.1 | 68.7 | 65.5 | 64.0 |
| (i) কৃষক | 50.6 | 50 | 43.4 | 41.6 | –– | –– |
| (ii) কৃষিশ্রমিক | 16.9 | 19.7 | 26.3 | 24.9 | –– | –– |
| (iii) পশুপালন অরণ্য পালন মৎস্য শিকার ইত্যাদি | 4.3 | 2.4 | 20.4 | 2.2 | –– | –– |
| **মাধ্যমিক ক্ষেত্র** | 12.6 | 10.6 | 11.2 | 13.5 | 14.3 | 16.0 |
| **সেবাক্ষেত্র** | 15.6 | 17.3 | 16.7 | 17.8 | 20 | 20.0 |
| মোট | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**উৎস ঃ** India Basic Economic Information
National Publishing House, 1986
Economic Times, March 9, 1991

কর্মসংখ্যক শ্রমশক্তির জন্য যে সমস্ত কারণ দায়ী তার মধ্যে প্রধান হল উচ্চ জন্মহার, 15 বছরের নীচে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে অবিচার এবং তাদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা।

বসতি, বয়স এবং লিঙ্গের উপর নির্ভর করে শ্রম শক্তি গড়ে ওঠে। কর্মজগতে নিয়োগের বা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে অসমতা চোখে পড়ার মত। 1991 সালের আদমসুমারী অনুযায়ী, শ্রমশক্তির 5% হল পুরুষ সেখানে নারীদের সংখ্যা মাত্র 16% । এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে নারীদের উপর অবিচারের জন্য। শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে আর একটি পার্থক্য দেখা যায় শহর ও গ্রামের মধ্যে। 1991 সালের হিসেব অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের 35.84% জনসংখ্যা কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত সেখানে শহরাঞ্চলে 29.48% শ্রমক্ষেত্রে নিযুক্ত। শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এই যে পার্থক্য রয়েছে তার প্রধান কারণ হিসেবে দেখানো যায় শহর ও গ্রামের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্য। শহরাঞ্চলের কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী দক্ষতা ও শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়।

যে কোনও বিষয়ে দক্ষতা অর্জন ও শিক্ষালাভের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন। সেই কারণেই শহরাঞ্চলে ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে যোগদানে দেরি হয়। এছাড়া শহরাঞ্চলের জনগণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সচেতন এবং শহরে শিশু শ্রমিক সংখ্যা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অনেক কম।

বিপরীত ভাবে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও দক্ষতা খুব বেশি গুরুত্ব পায় না এবং শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে 1991 সালের একটি হিসাব দেখায় যে, ঐ সালে গ্রামাঞ্চলে যেখানে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 18.75% সেখানে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র 8.51%। শহরাঞ্চলে এই হার কম হলেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক গ্রাম থেকে শহরে প্রবেশ করে।

Age-sex specific Labour force participation rate for India :

Table per 100 persons

| Age group | Male | Female |
|---|---|---|
| 0-14 | 5.96 | 3.21 |
| 15-19 | 53.30 | 26.46 |
| 20-24 | 79.09 | 29.22 |
| 25-29 | 92.59 | 32.14 |
| 30-39 | 97.16 | 35.50 |
| 40-49 | 97.54 | 36.00 |
| 50-59 | 93.27 | 29.81 |
| 60+ | 32.49 | 14.02 |

Source : Census of India 1981, Series 1, India Part 2

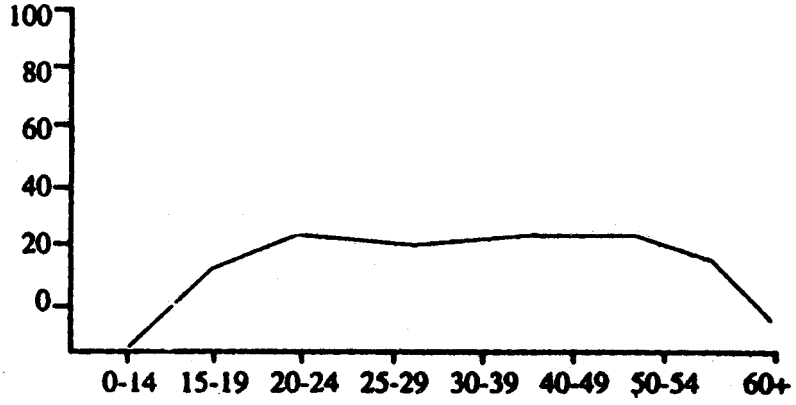

1971 সালের আদমসুমারী অনুযায়ী সম্পূর্ণ শ্রম শক্তিকে মোট নয় ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। 1991 সালের আদমসুমারীও তা গ্রহণ করেছিল। রাজ্য ও জেলাস্তরে শ্রমশক্তির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শ্রমশক্তির পরিমাণ অনেক বেশি। উদাহরণ স্বরূপ 1991 সালে অরুণাচলপ্রদেশে মূল শ্রমিক ছিল 45.22%। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলি যেমন—মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, এবং সিকিমেও 40% এর উপরে শ্রমশক্তি ছিল। এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল হয়তো এই কারণেই যে, এই সকল অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। এছাড়া আসাম ও ত্রিপুরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। এই দুই রাজ্যের প্রধান শ্রমিকের হার যথাক্রমে 8.21 এবং 29.02%। উত্তর ভারতের প্রধান রাজ্যগুলি যেমন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে শ্রমশক্তির হার জাতীয় শ্রমশক্তির হারের থেকে অনেক কম। সেদিক থেকে দঃ ভারতের রাজ্যগুলি অনেক এগিয়ে আছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুতে শ্রমশক্তির হার বেশি। বিস্ময়কর তথ্য এই যে, জনমিতির দিক দিয়ে উন্নত রাজ্য কেরালাতে শতকরা মাত্র 28.31 জন মানুষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে দমন দিউ শ্রমশক্তির দিক দিয়ে এগিয়ে আছে। সেখানে শতকরা 43.91 জন মানুষই শ্রমশক্তিতে নিযুক্ত। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জে এই হার 23.96%।

জেলাস্তরে সর্বোচ্চ শ্রমশক্তির হার অরুণাচলপ্রদেশের তাওয়াং জেলায় 55.25% এবং সর্বনিম্ন হার মাহে জেলায় 21.08%। কেরালা রাজ্য বাদে দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমগ্র অঞ্চল, আসাম, ত্রিপুরা বাদে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল উত্তর প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চল এবং হিমাচল প্রদেশের শ্রমশক্তির হার জাতীয় হারের চেয়ে বেশি।

দেশের পাহাড়ি এবং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে 38% এর বেশি মূল শ্রমশক্তি দেখা যায় যেমন—হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চল, সিকিম, অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয়, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বেশির ভাগ অংশে এই হার তামিলনাড়ুর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বেশি। শ্রমশক্তির হার কম দেখা যায় সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমি, রাজস্থান, কেরালায়।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ রাজ্য এই সারণিতে পড়ে যেখানে প্রধান শ্রমশক্তি রয়েছে যথাক্রমে 30.01-34.00 এবং 30.00 এবং তার নীচে। এই অবস্থা দেখা যায় প্রধানত ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি, রাজস্থান, গুজরাট এবং কেরালায়। মধ্যপ্রদেশের বেশিরভাগ এবং কর্ণাটকের দক্ষিণাঞ্চল ও মহারাষ্ট্র মূল শ্রমশক্তির 34.01-38.00 এর মধ্যে অবস্থান করে।

**উপসংহার ঃ** উপসংহারে বলা যায় যে আমাদের দেশের কর্মীর একটা বড় সংখ্যা হল শিশু শ্রমিক। এর মূল কারণ হল দারিদ্র্য। দরিদ্র সমাজে অর্থ রোজগারের উপায় হল মানব সমাজ। পরিবারের আয়তন যত বড় হবে পরিবারের আয় তত বেশি হবে। অথচ সন্তানদের লেখাপড়া শেখাবার সামর্থ পিতামাতাদের নেই। এই অবস্থায় তারা একটু বড় হলেই শিশুকে চায়ের দোকান, লোকের বাড়িতে কাজ দেন।

**দ্বিতীয়ত,** আমাদের দেশে নারী শ্রমশক্তির পরিমাণ কম (women working force)। এটাকে নারীদের উপর অবিচার বলা চলে।

**তৃতীয়ত,** শ্রমশক্তির গুণগত মানের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাগত দক্ষতা খুব একটা গুরুত্ব পায় না।

## 4.8 বিশ্বের ভাষা (Languages of The World)

মনুর সন্তান মানুষ* ও ইংরেজি ম্যান 'একই ধাতু' থেকে উৎপন্ন, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মননশীলতার ধর্ম। ঐ মননশীলতার মনোভাব প্রকাশের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে মানুষের মধ্যে। মানুষ তার মনের ভাষা প্রকাশ করে—(i) ইঙ্গিত, (ii) লিপির মাধ্যমে। ব্যাকরণের সংজ্ঞানুসারে স্পষ্ট উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি তথা শব্দের সাহায্যে মানুষ যখন পরস্পরের মধ্যে মনের ভাব বিনিময় করে তখন তাকে ভাষা বলে। "Language is such expression and communication to or from human beings by means of speech and hearing, the sound uttered of heard being so combined in systems evolved, conventionalised and recognized by common usage at any given period in the history of human race, within a given community of within communities that they are mutually intelligible to all approximately normal members there of" (gray, 1939), ভাষা হল প্রথম সাংস্কৃতিক আবিষ্কার আর ভাষাই হল সবচেয়ে জটিল ও মৌলিক সংযোগ ব্যবস্থা।

ভাষাসমূহের স্থানিক বন্টন কিছুটা জটিল প্রকৃতির, আর একটি মানচিত্রে তাদের দেখানো খুব মুশকিল। ভাষা মানচিত্রের বিশ্লেষণে আরও কিছু সমস্যা আছে, যেমন (i) ভাষার সংজ্ঞা। ভাষাবিদদের মধ্যে ভাষার একক সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। (ii) ভাষা মানচিত্রে স্থানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে বহু প্রকার ভাষা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনবরত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ভাষাবিদদের মতে, পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা অগুনতি, এছাড়া অনেক ভাষা সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান নেই। (iii) পরিবর্তনশীল অঞ্চলগুলোতে একের বেশি ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়। প্রতি দেশেই ভাষার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। যুগযুগান্তর ধরে মৌখিক তথা কথাভাষা, সাধুভাষা, উপভাষা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ তার ভাব-বিনিময় করে আসছে। এছাড়া কথোপকথনের ক্ষেত্রে রকমারী মিশ্র ভাষা বা সংস্কৃত ভাষাও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্থান ও কালভেদে ভাষার নিয়ত পরিবর্তন ঘটে বলে কোনও অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষার ক্ষেত্রেও বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

### প্রধান ভাষাসমূহের স্থানিক বন্টন (Special Distribution of Major Languages)

পৃথিবীর ভাষাসমূহের স্থানিক বন্টন খুব জটিল। পৃথিবীর 95 ভাগ মানুষ 100-টি চলতি ভাষার মধ্যে যে কোনও একটিতে কথা বলেন। আরও একটু বিশদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই 95 শতাংশের মধ্যে মধ্যে আবার 50 শতাংশ জনতা 10-টি প্রধান ভাষার একটিতে কথা বলেন।

এইসব ভাষা ভূ-পৃষ্ঠের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে। ভাষার স্থানিক বন্টনে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। (1) জনসংখ্যার আয়তন অঞ্চলের আয়তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদিও চীনা ভাষা পৃথিবীর এক বৃহৎ সংখ্যক জনতার প্রথম ভাষা, কিন্তু চীনা ভাষাভাষী এলাকা পৃথিবীর ইংরেজি ভাষাভাষীর মোট এলাকার তুলনায় কম। (2) ভাষা-ভিত্তিক অঞ্চল দেশের সীমারেখার সাথে খাপ খায় না। কোনও কোনও ভাষা একের বেশি দেশে চালু আছে। যেমন ইউরোপের অনেক দেশে জার্মান ভাষায় কথা বলা হয়। মানচিত্র 1.4 থেকে দেখা যাচ্ছে যে চীনা, রাশিয়ান এবং হিন্দি যথাক্রমে চীন, রাশিয়া ও ভারতের প্রধান ভাষা। ঐ তিনটি দেশে অবশ্য অন্যান্য ভাষায়ও বহু লোক কথা বলেন। দশটি প্রধান ভাষার মধ্যে জাপানি ভাষা কেবলমাত্র একটি দেশেই চালু আছে।

---

মানুষ কথাটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় মন + হুশ অর্থাৎ যার মন ও হুশ দুই আছে তাকে বলে মানুষ।

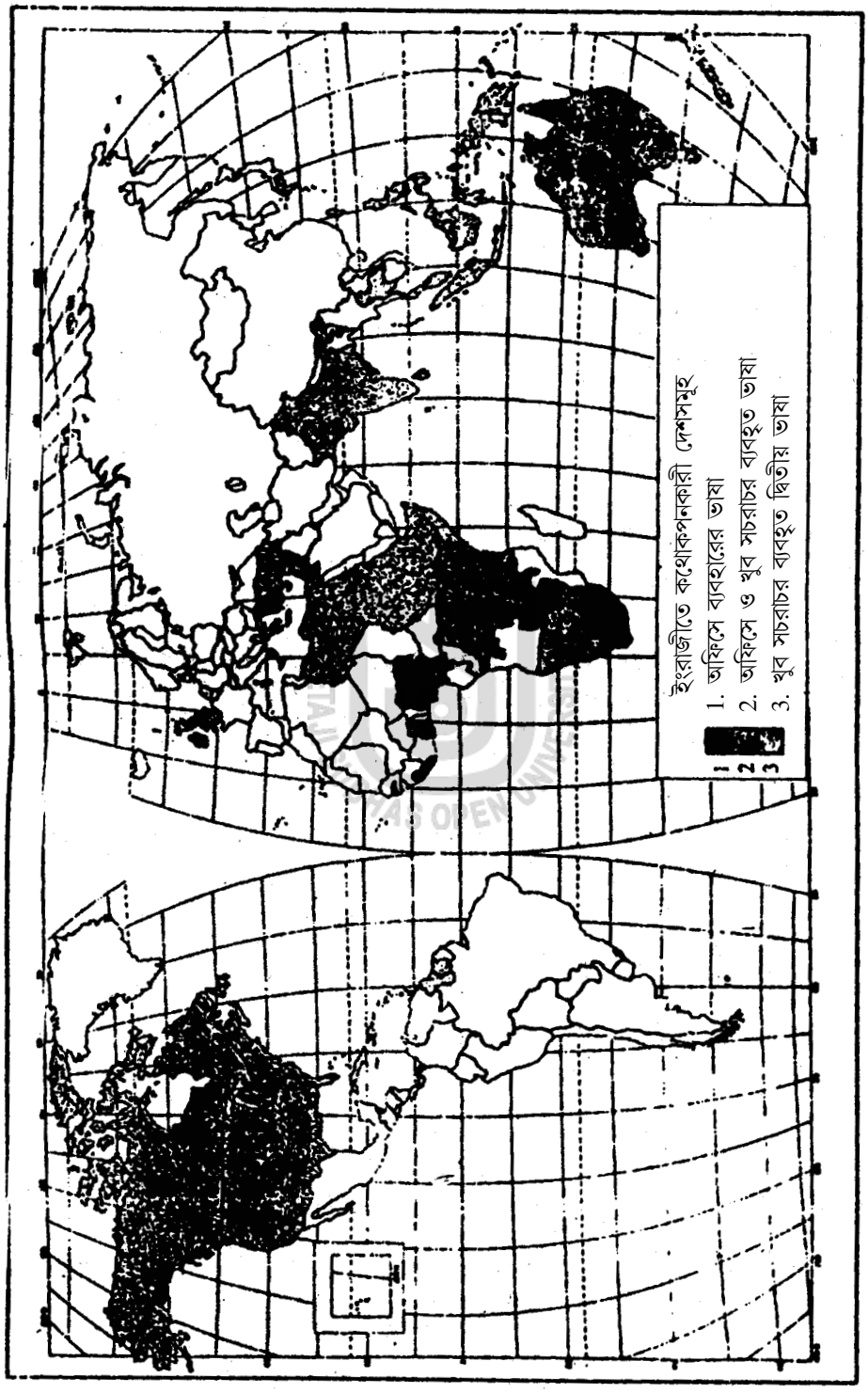
ইংরাজীতে কথোপকথনকারী দেশসমূহ
1. অফিসে ব্যবহারের ভাষা
2. অফিসে ও খুব সচরাচর ব্যবহৃত ভাষা
3. খুব সচরাচর ব্যবহৃত দ্বিতীয় ভাষা
1
2
3

নীচের সারণিতে (নং 1.1) পৃথিবীর দশটি প্রধান ভাষা দেখানো হল।

**সারণি— 1.1**
**পৃথিবীর প্রধান ভাষাসমূহ**

| শ্রেণি | ভাষা | জনসংখ্যা (মিলিয়ান) |
|---|---|---|
| (1) | চীনা | 1,015 |
| (2) | ইংরেজি | 360 |
| (3) | স্প্যানিশ | 265 |
| (4) | হিন্দি | 230 |
| (5) | রাশিয়ান | 210 |
| (6) | আরবি | 165 |
| (7) | বাংলা | 165 |
| (8) | পোর্তুগিজ | 150 |
| (9) | জাপানি | 120 |
| (10) | জার্মান | 100 |

**সূত্র ঃ Fellman : Human Geography**

ভৌগোলিকরা মানচিত্রে ভাষার বন্টন দেখান। এইসব মানচিত্রে গৌণ ভাষা ও উপভাষা বণ্টনের মাত্রাও (degree) দেখানো হয়। উপরোক্ত ভাষা মানচিত্র ভাষার গুণগত বিষয় ব্যক্ত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কোনও জাতির প্রথম ভাষা বা দেশী ভাষায় দক্ষতা এইরকম মানচিত্রে দেখা যায় না। ভারতে ইংরেজি কথোপকথনকারীর মোট সংখ্যা অস্ট্রেলিয়া ও নাইজেরিয়ায় ইংরেজিতে কথোপকথনকারীর চেয়ে বেশি (চিত্র 1.4)। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ মানচিত্র গোটা পৃথিবীর খুব ছোট ভাষাভাষী অঞ্চল দেখায় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বাসিন্দা চীনা ভাষা-ভাষী। যদি আর এ বিশদ তথ্য জানার প্রয়োজন হয়, তবে আরও বড় মাপের মানচিত্র তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইসব মানচিত্র নাড়াচাড়া করতে(handle) অসুবিধে হয়।

সারণি 1.2 থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে 29-টি প্রধান ভাষা রয়েছে। এগুলোর প্রতিটিতে 40 মিলিয়ানের বেশি লোক কথাবার্তা বলেন। আবার 29-টির মধ্যে 12-টি ভাষার (চীনা, ইংরেজি, হিন্দি, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, আরবি, বাংলা, পোর্তুগিজ, মালয়-ইন্দোনেশিয়া, জাপানি, জার্মান, ফার্সী প্রত্যেকটিতে 100 মিলিয়ানের বেশি লোক কথাবার্তা চালান। উর্দু ও পাঞ্জাবি ভাষাভাষীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

**সারণি—1.2**
**40 মিনিয়ান বেশি লোকের ভাষার সংখ্যা**

| ভাষা | জনতার সংখ্যা | ভাষা | জনতার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| মান্দারি (চীনা) | 402 | তেলেগু (ভারত) | 64 |
| ইংরেজি | 425 | তামিল (ভারত, শ্রীলঙ্কা) | 63 |
| হিন্দি (ভারত) | 315 | মারাঠি (ভারত) | 61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| স্প্যানিশ | 310 | ক্যান্টোনীয় (চীন) | 64 |
| রাশিয়ান | 225 | ইতালীয় | 59 |
| আরবি | 185 | য়ু (চীন) | 59 |
| বাংলা (বাংলাদেশ, ভারত) | 175 | জাভানী | 52 |
| পোর্তুগিজ | 163 | ভিয়েতনামী | 52 |
| মালয়-ইন্দোনেশিয়া | 131 | তার্কিস | 51 |
| জাপানি | 123 | মিন (চীন) | 46 |
| জার্মান | 117 | থাই | 45 |
| ফরাসি | 114 | ইউক্রেনীয় | 45 |
| উর্দু (পাকিস্তান ভারত) | 86 | পোলিশ | 41 |
| পাঞ্জাবি (ভারত, পাকিস্তান) | 74 | মাহিলি (পূর্ব আফ্রিকা) | 40 |
| কোরিয়ান | 66 | | |

## ভাষার শ্রেণিবিভাগ (Linguistic Classification)

আগেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা আছে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনও পরিসংখ্যান নেই। আজও ভাষাবিদরা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা নিউ গিনি ও অন্যত্র বসবাসকারীদের ভাষার চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণিবিভাগ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এমনকি, এসব সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা গেলেও ভাষাগুলোকে সুস্পষ্ট ও পৃথক পৃথক স্বত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যেমন হচ্ছে মান্দারিন, ক্যান্টোনীয় ও অন্যান্য ভাষার সমষ্টি হচ্ছে চীনা ভাষা যা ইউরোপীয় ভাষা যেমন, স্প্যানিশ, ইতালীয়, ফরাসি, রোমানীয়র মতই পরস্পর থেকে পৃথক। চীনা ভাষাসমূহের মধ্যে একটাই সাদৃশ্য। তা হল, তারা একই রকমভাবে লিখিত হয়। এর কারণ হল এত বেশি সংখ্যক ও ছোট ছোট পার্থক্য আছে যে ভাষার শ্রেণিবিভাগ করা কষ্টকর।

ভাষার বৈচিত্র্য সহজ হয়ে যায় যখন আমরা ভাষা সম্পর্কিত পরিবারকে স্বীকৃতি দিই। ভাষা পরিবার হল স্বতন্ত্র পরিবারের সমষ্টি যারা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত আদি বা মূল ভাষার ভিত্তিতে। পৃথিবীর হাজার হাজার ভাষাকে কিছু সংখ্যক ভাষা পরিবারের শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে। সারা পৃথিবীতে এরকম 30-100-টি ভাষা পরিবার আছে। ভাষা পরিবারকে আবার উপপরিবার, শাখা, আর নিবিড়—সম্পর্কিত উপভাষাতে ভাগ করা যেতে পারে। 2000 বছর আগে রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র ল্যাটিন ভাষায় কথা বলা হত। খ্রিঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের ঐক্য ভেঙ্গে গেল। পরবর্তী কয়েকশ বছরে আধুনিক ইউরোপে এই ল্যাটিন ভাষা থেকে পৃথক পৃথক রোমান্স ভাষাসমূহ যেমন—ইতালীয়, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, পোর্তুগিজ, রোমানিয়া এবং এদের উপভাষা যেমন—ক্যাটলিন, সার্ডিনিয়া, মলডারিন প্রভৃতি রোমান্স পরিবারের ভাষার বিকাশ হল।

ভাষাবিদরা ভাষাসমূহের মধ্যে পরিবার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। ভাষার শব্দকোষ ও ব্যাকরণের সাহায্যে তারা এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণের পরিবর্তন অনুসন্ধান করে ভাষাবিদরা শব্দের আদি কাঠামো পুনর্গঠন করতে সক্ষম হন এবং শেষমেষ শব্দের একটি পরিবর্তনও তৈরি করেন। এ ধরনের আদিকাঠামো আকারকে প্রোটো ল্যাঙ্গুয়েজ (Proto-Language) বলা হয়। রোমান পুনর্গঠিত ভাষাসমূহের ক্ষেত্রে নামকরা ভাষা ছিল ল্যাটিন। এর কোনও পুনর্গঠনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্যভাষা পরিবারের ক্ষেত্রে অনুরূপ শব্দ-সম্পর্ক খুব কম। তাদের প্রোটোল্যাঙ্গুয়েজ (বা মূল ভাষা চিহ্নিত করা যায়। যেমন, ইংরেজি, জার্মান, ডাচ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষার সমষ্টি হল

জার্মানিক ভাষা যা প্রোটো-জার্মান ভাষা থেকে আগত। দক্ষিণ স্ক্যান্ডিনেভিয়া, উত্তর সাগর (North Sea) ও বাল্টিক উপকূল সংলগ্ন নেদারল্যান্ডস থেকে পশ্চিম পোল্যান্ড পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা এই ভাষায় কথা বলতেন।

নীচের সারণি (1,3) ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন ভাগ, উপ-বিভাগগুলো দেখানো হল। ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের মধ্যে জার্মানিক উপপরিবার উল্লেখযোগ্য, এতে জার্মান, ইংরেজি, নরেওজিয়ান ও ডাচ ভাষা আছে। পুরনো ও নতুন বিশ্বে এর পরের স্থান হল ল্যাটিন ভাষা পরিবারের যার মধ্যে আছে ফরাসী, ইতালীয়, স্প্যানিশ, পোর্তুগিজ, ক্যাটালন ও রোমানি ভাষা। ইউরোপের বাল্টো-স্লেভিক ভাষাসমূহ যেমন স্লেভিক, বুলগেরিয়ান, চেক, পোলিশ, রাশিয়ান ও সার্ভো-ক্রেট ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় উপ-পরিবারের মধ্যে আছে সংস্কৃত, বাংলা উর্দু, হিন্দুস্তানি, পাঞ্জাবি ও অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

**সারণি—1.3**

**ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ভাষাসমূহ**

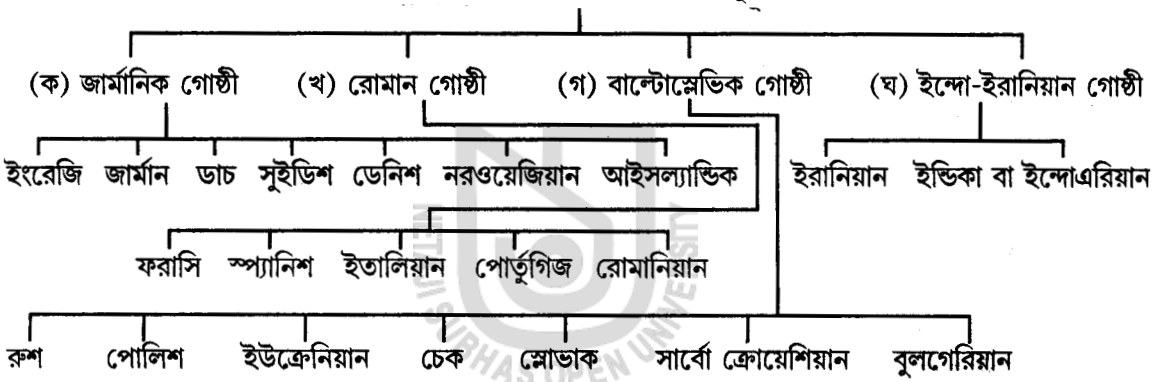


ভাষার শ্রেণিবিভাগের কয়েকটি ভিত্তি (Base) রয়েছে যেমন—

(i) ভাষার ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী।

(ii) গোত্র বা বংশানুযায়ী।

(iii) মহাদেশ অনুযায়ী যেমন—এশিয়া ভাষা পরিবার, ইউরোপীয় ভাষা পরিবার।

(iv) দেশ ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, যেমন ভারতীয় ভাষা পরিবার, জাপানী ভাষা পরিবার।

(v) ধর্মীয় শ্রেণিবিভাগ যেমন হিন্দু ভাষা, আরবি ভাষা ইত্যাদি।

(vi) কালগত শ্রেণিবিভাগ যেমন—প্রাগ-ঐতিহাসিক ভাষা, আধুনিক ভাষা।

**ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার**—ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ভাষায় পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক কথা বলেন। যেহেতু এই ভাষা পরিবার অন্য ভাষা পরিবারের থেকে বেশি আলোচিত হয়েছে, তাই এর শ্রেণিবিভাগ খুব সঠিক ও নিশ্চিত বলা চলে। এই পরিবারের অনেক ভাষার তুলনা থেকে পূর্বেকার ভাষার (প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয়) উপস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। কোন অঞ্চল থেকে এই ধরনের ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল তা ঠিক করতে এই ভাষা পরিবারের বিভিন্ন ভাষা থেকে নেওয়া বাক্যগুলোকে তুলনা করা হয়েছিল। ভাষাবিদরা দেখিয়েছেন যে, শীত, ঠান্ডা এবং বরফ কথাগুলো

প্রায় একই রকম ছিল, কিন্তু ক্রান্তীয় গাছ বা প্রাণী ইত্যাদি বাক্যগুলো একই রকম ছিল না। এগুলো এবং অন্যান্য সূত্র থেকে ভাষাবিদরা অনুমান করেছিলেন যে, এই ভাষা পরিবারের বিকাশ উষ্ণ জলবায়ুর তুলনায় শীতল জলবায়ু অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল এবং মধ্য ইউরোপ অর্থাৎ এলব ও ভিশ্চুলা এই দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে এই ভাষা পরিবারের উৎপত্তি হয়েছিল। সেখান থেকে এই ভাষা পরিবারের বিভিন্ন লোকজন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

এই ভাষা পরিবারে কম করে 9-টি বিভাগ স্বীকৃত ; ইন্দো-ইরানীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক, আলবানিয়ান, রোমান্স, কেলটিক, টিউটনিক, বাল্টিক ও স্লেভিক (চিত্র 1.5)।

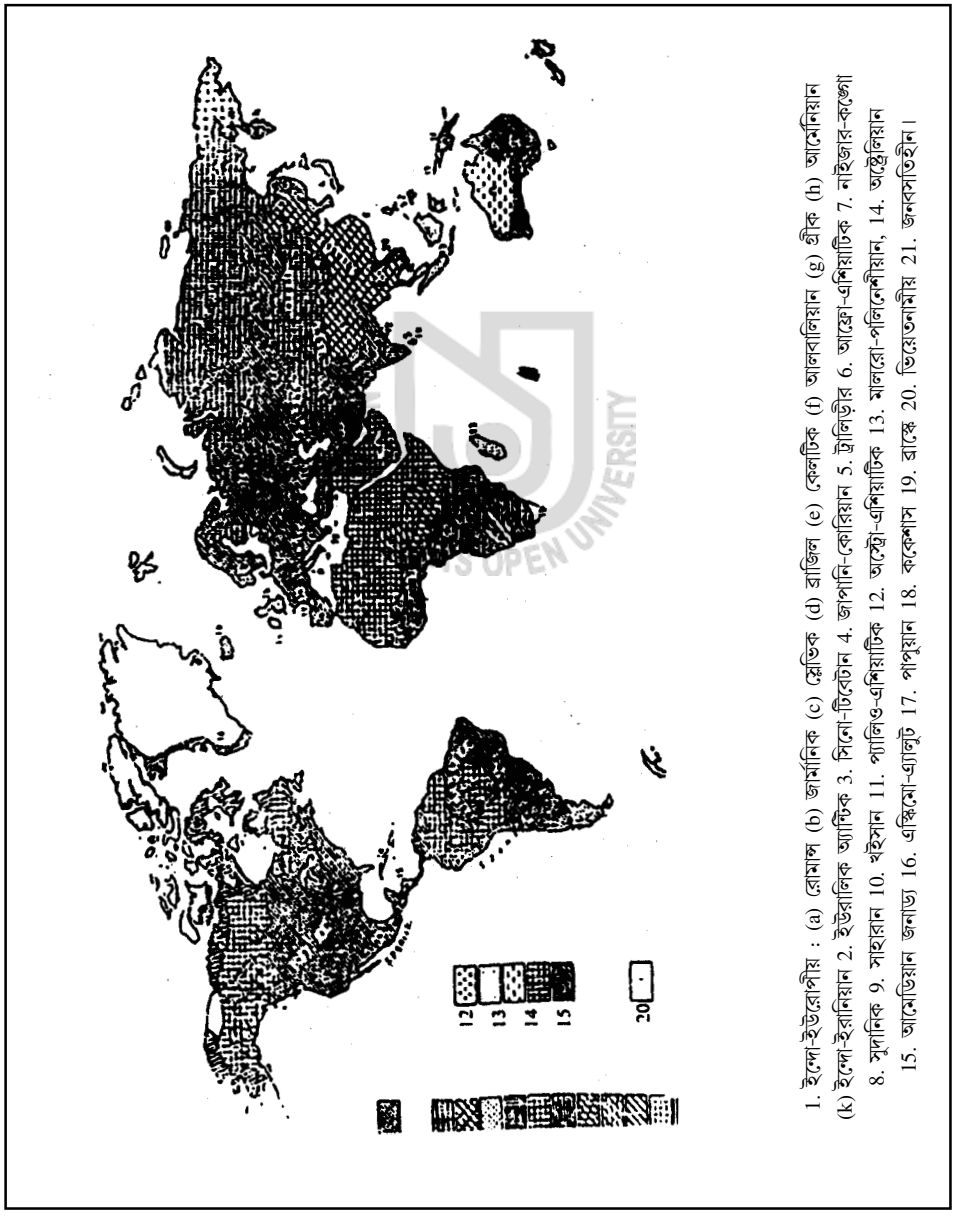


1. ইন্দো-ইউরোপীয় : (a) রোমান্স (b) জার্মানিক (c) স্লেভিক (d) ব্রাজিল (e) কেলটিক (f) আলবানিয়ান (g) গ্রীক (h) আর্মেনিয়ান (k) ইন্দো-ইরানিয়ান 2. ইউরালিক অ্যাল্টিক 3. সিনো-টিবেটান 4. জাপানি-কোরিয়ান 5. ট্রালিড়ীর 6. আফ্রো-এশিয়াটিক 7. নাইজার-কঙ্গো 8. সুদানিক 9. সাহারান 10. খইসান 11. প্যালিও-এশিয়াটিক 12. অস্ট্রো-এশিয়াটিক 13. মালয়ো-পলিনেশীয়ান, 14. অস্ট্রেলিয়ান 15. আমেডিয়ান জনাড্য 16. এস্কিমো-এ্যালুট 17. পাপুয়ান 18. ককেশাস 19. ব্রাস্কে 20. ভিয়েতনামীয় 21. জনবসতিহীন।

চিত্র 1.5 ঃ বিশ্বের ভাষা পরিবার (Majid Hussain : Human Geog.) অবলম্বনে

ইন্দো-ইরানীয় বা ইন্দিক ভাষাসমূহ প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। উক্ত ভাষাভাষীর মানুষ খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ভারতে চলে এসেছিলেন। সেই থেকে ভারতে এই ভাষা চালু আছে। সেই সময় ভারতে অনার্যরা বাস করতেন। পরে এঁরা দক্ষিণ ভারতে সরে যান। দক্ষিণ ভারতে এদের ভাষায় (দ্রাবিড়) কথা বলা হয়। তবুও ভারত ও পাকিস্তানের অবশিষ্ট ভাষাসমূহ হল ইন্দো-ইউরোপীয়। অন্যান্য ভাষা পরিবারের তুলনায় এই ভাষা পরিবারের অনেক আলাদা আলাদা ভাষা আছে। এই ভাষা পরিবার পূর্ব (ইন্ডিক) ও পশ্চিম (ইরানীয়) উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং নেপালের প্রায় সব অধিবাসী উর্দু, ভারতের 4.5 ভাগ এবং শ্রীলঙ্কার বেশিরভাগ বাসিন্দা ইন্দিক উপগোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলেন। পাকিস্তানের প্রধান মাতৃভাষা তথা সরকারি ভাষা, উর্দু বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বাংলা সরকারি ভাষা। ভারতবর্ষে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, পাঞ্জাবি, রাজস্থানী, মারাঠি, গুজরাটি, ওড়িয়া, অসমীয়া ও যথাক্রমে ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, ওড়িশা ও আসাম রাজ্যের বাসিন্দাদের মাতৃভাষা (চিত্র 1.6)। ভারত ছাড়া মরিশাস

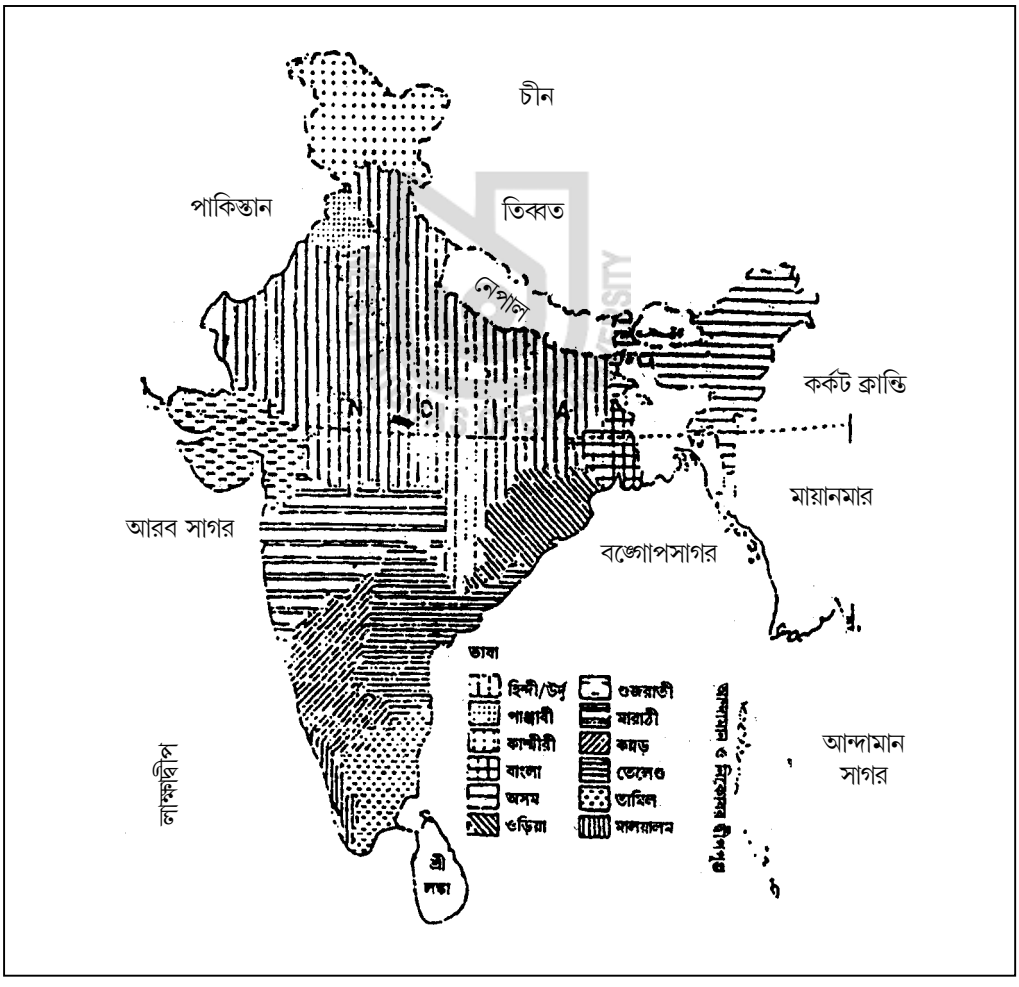


চিত্র 1.6 ঃ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষাসমূহ

ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জের বেশ কিছু অধিবাসীর ভাষা হল হিন্দি। জিপসিদের ভাষা রোমানি প্রধানত ভারতবর্ষের বাইরে চালু আছে। মনে করা হয় যে বর্তমান জিপসিদের পূর্বপুরুষরা নবম ও পঞ্চাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছিলেন। জিপসিরা স্পেন ও ইউরোপের দেশগুলোতে এখন বাস করেন।

ইরানী উপগোষ্ঠীর ভাষাগুলো হল ইরানি ও আফগানিস্তানের পারসী। পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক ও পুর্বতন রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত পাশতো (Pashto), বালুচি (Baluchi), তাদজিক (Tadzhik) ও কুরদিশ (Kurdish) ভাষা চালু আছে।

**আর্মেনিয়, গ্রিক ও আলবেনিয়**—উপরোক্ত প্রতিটি ভাষাই একটি গোষ্ঠীর সমষ্টি। আর্মনীয় আর্সেনীয়, গ্রিস ও সাইপ্রাসে গ্রিক ও আলবানিয়ায় আলবেনিয় ভাষায় কথা বলা হয়। গ্রিস রাষ্ট্র যখন ক্ষমতার শীর্ষে ছিল, তখন বলতে গেলে সারা পৃথিবীতেই গ্রিক ভাষায় কথা বলা হত। রোম গ্রীসকে রাজনৈতিক দিক থেকে অতিক্রম করে যাবার পরও গ্রীস সাহিত্য ভাষা হিসেবে থেকে গেল। আদি New Testameng-গ্রিক ভাষাতেই লিখিত হয়েছিল।

**রোমান**—রোমান ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হল ল্যাটিন। এই গোষ্ঠী সাধারণভাবে পূর্ব ও পশ্চিম উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। পূর্ব উপগোষ্ঠীর ইতালীয় ভাষা শুধুমাত্র ইতালী উপদ্বীপের ভাষা নয়। ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, যুগোশ্লাভিয়া, সুইজারল্যান্ডে বসবাসকারী ইতালীয়রাও এই ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষার অনেক উপভাষা আছে। এদের মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে এক উপভাষাভাষী অন্য উপভাষাভাষীর কথা বুঝতে পারেন না। তাঁরা চলতি ইতালীয় ভাষায় কথা বলেন। সার্দিয়ানা ও কার্সিকান আলাদা ভাষা হিসেবে গণ্য হয়। রাত্রতো-রোমানিক ভাষা (Rhaeto-Romantic) ল্যাটিনের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। যদিও এই ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, তবুও সুইজারল্যান্ডের কিছু কিছু এলাকার ও অস্ট্রিয়া, ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্তের মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন।

পূর্ব উপগোষ্ঠীর চেয়ে পশ্চিম উপগোষ্ঠীতে বেশি ভাষা আছে। স্পেন এবং মেক্সিকো, কিউবা, পুটোরিকো, ক্যারিবীয় ডোমিনিয়ান রিপাবলিক, ফিলিপাইনস মরক্কো ও আফ্রিকার স্প্যানিশ উপনিবেশগুলো ইত্যাদি। 18টি ল্যাটিন আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের মানুষ স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষার অনেক উপভাষা আছে। এদের মধ্যে ক্যাস্টিলিয়া (Castilian) আদর্শ স্থানীয় ভাষা বলে বিবেচিত হয়। উচ্চারণ ও শব্দকোষের দিক থেকে ল্যাটিন আমেরিকার স্প্যানিশ ভাষা থেকে এটি আলাদা।

পর্তুগাল এবং ব্রাজিল ও আফ্রিকার পর্তুগিজ উপনিবেশ যেমন আঙ্গোলা, মোজাম্বিক, তিমোর ও ম্যাকাও-এ পর্তুগিজ ভাষা চালু আছে ক্যাটালোনিয়া ও দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি অংশে ক্যাটালন উপভাষায় কথা বলা হয়। সেফারডিক (Sephardic) ইহুদিরা যারা স্পেন থেকে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে চলে এসেছিলেন, তাঁরা ল্যাডিনো (Ladino) উপভাষায় কথা বলেন। ইডিশের (Yeddish) অনুরূপ এই উপভাষা পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্প্যানিশ-হিব্রু, গ্রিক ও তুর্কির সংমিশ্রণে বিকাশ লাভ করেছিল।

ফ্রান্স, দক্ষিণ বেলজিয়াম, ল্যাক্সেমবার্গ ইত্যাদি দেশগুলোতে ফরাসি ভাষায় কথা বলা হয়। আফ্রিকা, আলজেরিয়া ও পূর্ববর্তী ফরাসি উপনিবেশগুলোতে ফরাসি ভাষায় কথা বলা হয়। পশ্চিম গোলার্ধে কানাডায়, বিশেষ করে কুইবেক, নোভাস্কাটিয়া ও ম্যানিটোবার অনেক লোক ফরাসি ভাষায় কথা বলেন। কানাডায় বসবাসকারী অনেক ফরাসি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও নিউ ইংল্যান্ড প্রদেশে অভিবাসন গ্রহণ করেছেন। এখানেও তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষায় কথা বলেন। লুইসিয়ানা ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জেও এই ভাষা চালু আছে। 21টি স্বাধীন দেশের এটি সরকারি ভাষা। 18টি আফ্রিকাস্থ জাতিরও (যাঁরা আগে ফরাসি বা বেলজিয়ামের উপনিবেশের বাসিন্দা ছিলেন) এটি সরকারি ভাষা। ইংরেজির পরই এটি দ্বিতীয় বিদেশি

ভাষা যা পৃথিবীর বহুস্থলেই পড়ানো হয়। জাতিপুঞ্জের 5টি সরকারি ভাষার এটি অন্যতম ভাষা। ফরাসি ও বিভিন্ন আফ্রিকার ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট ফ্রেঞ্চ ক্রোল (French creole) ভাষায় হাইতি দ্বীপপুঞ্জে কথা বলা হয়।

**কেলটিক**—এককালে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের বহুস্থানে এবং এশিয়া মাইনরে এই ভাষায় কথা বলা হলেও বর্তমানে এই ভাষাভাষীর সংখ্যা কম। আয়ারের (Eire) পশ্চিম ও উত্তর কাউন্টিসমূহ এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে এই ভাষায় কথা বলা হয়। উত্তর আইরিশদের এটি সরকারি ভাষা। আয়ার-এ ইংরেজির সাথে যুগ্মভাবে এটি একটি সরকারি ভাষা। উত্তর পশ্চিম স্কটল্যান্ডের উচ্চভূমি ও দ্বীপপুঞ্জে এবং কানাডার প্রিন্স এডওয়ার্ড ও কেপ ব্রেটন দ্বীপপুঞ্জে স্কটিশ গেলিক (Scottish Gaelic) ভাষায় কথা বলা হয়। ওয়েলস-এ ওয়েলশ উপভাষা জনপ্রিয় যদিও ঐ দেশের অধিকাংশ মানুষ দ্বিভাষী। ব্রিটানীতে (Brittany) ব্রিটন উপভাষা চালু আছে।

**টিউটোনিক**—টিউটোনিক গোষ্ঠী চারটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত, যথা ইংরেজী, ডাচ, জার্মান ও স্কান্ডিনেভিয়ান। সারা পৃথিবীতেই ইংরেজি ভাষা চালু আছে। পশ্চিম গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও অনেক ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের ইংরেজি হল সরকারি ভাষা। আফ্রিকার অনেক দেশেই যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, তানজানিয়া, নাইজেরিয়া ও ঘানাতে এই ভাষা চালু আছে। ভারতে এটি একটি সহযোগী সরকারি ভাষা। এশিয়ার মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনস এবং ওশিয়ানিয়ার অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই ভাষায় অনেকে কথা বলেন। জাহাজ, বিমান ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে এই ভাষা সর্বজনস্বীকৃত। জাতিপুঞ্জের অন্যতম সরকারি তথা কাজের ভাষা ইংরেজি। এছাড়া ইংরেজিতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পত্রিকার সংখ্যা পৃথিবীতে সর্বাধিক।

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, আমেরিকান ইংরেজি ও ব্রিটিশ ইংরেজির মধ্যে উচ্চারণ, শব্দকোষ ও কিছু কিছু বাক্যের ক্ষেত্রে তফাৎ আছে। পূর্বে ব্রিটেনে স্ট্যান্ডার্ড ভাষায় উচ্চশ্রেণির লোকেরা কথা বলতেন। এখন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (BBC) এটি ব্যবহার করে। ব্রিটেনের স্কুলে বেশি করে এই ভাষা শেখানো হয়। ব্রিটেনে 20-টির বেশি উপভাষা আছে। যেমন পিডগিন (Pidgin), ফ্রিসিয়ান (Frisiun), ইংরেজি। জার্মানভাষা জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, লিটটেনস্টিন ও সুইজারল্যান্ডের কিছু অংশে এবং ডেনমার্ক ও ফ্রান্সের সীমান্ত এলাকায় চালু আছে। এর অস্ট্রিয়া, লিটনেটস্টিন ও সুইজারল্যান্ডের কিছু অংশে এবং ডেনমার্ক ও প্রান্সের সীমান্ত এলাকায় চালু আছে। এর উপভাষা ইডিশ (Yiddish) মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে চালু আছে। তবে এটির ব্যবহার কম।

নেদারল্যান্ডসে ডাচ এবং এর থেকে একটু আলাদা ফ্লেমিশ (Felmish) বেলজিয়াম দেশে প্রচলিত আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ বসবাসকারীদের ডাচ ভাষা ও তার সাথে মিশ্রত অনেক বাণ্টু (Bantu) শব্দ থেকে উৎপত্তি আফ্রিকানস (Afrikaans) উপভাষা দক্ষিণ আফ্রিকা, বটসোয়ানা ও লেসোথোতে চালু আছে।

চারটি প্রধান স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষা আইসল্যান্ডিক, সুইডিশ, নরেওযোগিয়ান ও ডানিশ সর্বজনীন পথিকৃৎ ভাষা ওল্ড নরস (Old Norse) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বিচ্ছিন্নতার দরুন আইসল্যান্ডিক (Icelandic) ভাষা কম প্রভাবিত হয়েছে। অপর 3-টি ভাষা পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা দিয়েও তারা প্রভাবিত হয়েছে। নরওয়েগিয়ান হল কথ্য ও লিখ্য ভাষা। প্রতিটি স্ক্যান্ডিনেভীয় ভাষায় সেই দেশেও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কথা বলা হয়। অনেক স্ক্যান্ডিনেভিয় অধিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছেন। সেখানে তাঁরা পৃথকভাবে বসবাস করেন ও নিজেদের ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু তাদের সন্তান সন্ততিরা ইংরেজি ভাষাকেও গ্রহণ করেছেন।

**বাল্টিক**—বাল্টিক গোষ্ঠীর দু'টি উপভাষা হল ল্যাটিভিয়া ও লিথুনিয়া, যা ঐ দু'টি দেশে (Latvin S. S. R. ও Lithunian S. S. R.) প্রচলিত আছে।

**স্লেভিক**—স্লেভিক গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ মধ্য ইউরোপ থেকে রাশিয়া (C.I.S.)-র মধ্য দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভাষাগুলোর মধ্যে খুব সাদৃশ্য আছে। তাই এক গোষ্ঠীর ভাষাভাষীরা অন্য ভাষাভাষীর ভাষা বোঝেন।

মস্কো অঞ্চলের আদি ভাষা গোটা সাবেকী রাশিয়ায় (C.I.S.) চালু আছে। বর্তমানে এটি জাতিপুঞ্জের একটি সরকারি ভাষা। ইউরোপের অনেক কমিউনিস্ট দেশে এই ভাষা শেখানো হয়। ইউক্রেনিয়ান ও বাইলোরশিয়ান ভাষা স্ব স্ব দেশে (Ukrainian S. S. R. ও Byclorassian S. S. R) কথা বলা হয়। সাবেক চেকোশ্লোভিয়ায় খুব ঘনিষ্ঠ দু'টি ভাষা হল চেক ও স্লোভাক। সাবেক পূর্ব জার্মানিতে লুসটিয়া ও সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় তিনটি সরকারি ভাষা আছেঃ সার্বোক্রেটিয়া, স্লোভেনিয়া ও ম্যাকিডোনিয়া। এদের মধ্যে প্রথমটি একটি মাত্র ভাষা।

**চীন-তিব্বতীয় ভাষাসমূহ—**

এই ভাষা পরিবারে আছে প্রজাতন্ত্রী চীন (পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক ছোট ছোট দেশের ভাষা। চীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হল মান্দারিন (Mandarin) যা চীনের তিন-চতুর্থাংশ লোকের ভাষা। জাতিপুঞ্জের এটি একটি সরকারি ভাষা। চীনে আরও চারটে ভাষা আছে। যেমন—ক্যান্টোস (Cantonese), মিন (Min), য়ু (Wu) ও হাক্কা (Hakka)। ভারতের তুলনায় চীনে কম সংখ্যক ভাষার কারণ হল জাতীয় শক্তি ও একতার প্রভাব।

চীনা ভাষাগুলো ছাড়াও চীন-তিব্বত ভাষা পরিবারে একটি দ্বিতীয় শাখা আছে। তিবেতো-বার্মা (Tibeto-Burman) নামে পরিচিত এই শাখাটি দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এর দু'টি প্রধান ভাষা হল থাই ও বর্মী। এ-ছাড়া জাপানী কোরিয়া ভাষা চীনা ভাষার সংস্পর্শে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে।

**সেমিটো-হামোটিক ভাষা—**

এর মধ্যে আরবি ও হিব্রু ছাড়াও রয়েছে উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ায় বর্তমানে কম ব্যবহৃত কিছু ভাষা। এই ভাষা পরিবারের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব হল যে এই ভাষা দু'টিতে পৃথিবীর চারটি প্রধান ধর্মের মধ্যে দু'টি পবিত্রতম গ্রন্থ লেখা হয়েছিল—বাইবেল ও কোরান। এই পরিবারের সবচেয়ে ব্যবহৃত ভাষা হল আরবি। এটি আবার দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা ও উত্তর আফ্রিকার 19-টি দেশের মরক্কো থেকে আরব উপদ্বীপ পর্যন্ত সরকারি ভাষা। ইস্রায়েলে দেশীয় ভাষা হিব্রুতে প্রায় তিন মিলিয়ান লোক কথা বলেন। Old Testament-এর প্রায় বেশিরভাগ অংশ হিব্রুতে লেখা হয়েছিল। চতুর্থ শতকে এই ভাষাটি লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু 1948 সালে ইস্রায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে এই ভাষার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছ।

**আফ্রিকার ভাষাসমূহ—**

আফ্রিকায় কতগুলো ভাষা রয়েছে তা গোনা হয়নি বা বিভিন্ন ভাষাকে কতগুলো গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেতে পারে, এই নিয়েও কোনও ঐক্যমত হয়নি। আফ্রিকায় প্রায় 1000-টি সুস্পষ্ট ভাষা ও প্রায় কয়েক হাজার উপভাষা আছে বলে জানা গেছে। এটা অনুমিত হয়েছে যে, প্রায় 40টির মত ভাষায় এক মিলিয়ানের বেশি মানুষ কথা বলে। উত্তর আফ্রিকার ভাষা চিত্রটি খুব পরিষ্কার। এখানে আরবি ভাষার চলন বেশি। সাহারার দক্ষিণ দিকে চিত্রটি খুব জটিল। এই অঞ্চলের ভাষার শ্রেণিবিভাগ করা শক্ত। এখানকার প্রধান ভাষা হল পরিবার নিগ্রো-কঙ্গো (Negro-Congo) যার মধ্যে মাণ্ডে (Mande), গুর (Gur), কা (Kwa), আদামারা (Adamawa) ও বেনেউ-কঙ্গো নামে দু'টি শাখা আছে।

**নীলো সাহারা ভাষাসমূহ—**

উত্তর মধ্য আফ্রিকা অর্থাৎ মাইজার কঙ্গো এলাকার দক্ষিণে ব্যবহৃত হয়। কইসান (Khoisan) ভাষা দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকায় চালু আছে। শুধুমাত্র নাইজেরিয়ায় দুশোর বেশি ভাষা আছে। এখানকার সবচেয়ে চালু ভাষা হল হাউসা (Hausa)। এখানকার অন্য দু'টি উল্লেখযোগ্য ভাষা হল উয়োরবা (Yourba) ও ইবো (ibo)। তানজানিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় সাইলি (Swahili) সরকারি ভাষা। আরব বণিকরা প্রথমে এই ভাষার বিকাশ ঘটিয়েছিল। ফলে এতে আরবীয় প্রভাব রয়েছে। এই ভাষার সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট।

## 4.9 বিশ্বের ধর্ম (Religions of the world)

ধৃ (ধারণ করা, পোষণ করা) + ম (ত্ত্ব) = যে সকলকে ধারণ বা পোষণ করে। প্রত্যেক জীব, বস্তু বা বিষয়ের নিজস্ব গুণ থাকে, যার অভাবে সেই সেই বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না। যেমন অগ্নির ধর্ম উত্তাপ এবং জলের তারল্য ও শৈত্য। দেশ ভেদে জাতি বিশেষের পরকাল প্রভৃতির অলৌকিক পদার্থ বিষয়ক বিশ্বাস এবং উপাসনা প্রণালী হল ধর্ম।

ভৌগোলিকরা বিভিন্ন ধর্মের বণ্টন নিয়ে বেশি আগ্রহী। এঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বেশিরভাগ ধর্ম প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ থেকে জন্ম নিয়েছে এবং ভূ-দৃশ্য সৃষ্টিতে বড় রকমের অবদান রেখেছে। ভৌগোলিকরা ভূ-দৃশ্য (landscape) ও ধর্মের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঈশ্বরের পূজোর স্বীকৃতি প্রেম এবং আনুগত্য বস্তু (Object) হিসেবে ধর্ম প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর গভীর ছাপ ফেলেছে। ধর্মকে একটি ভৌগোলিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা যেতে পারে, কারণ তার উৎপত্তির ইতিহাসে একটা ধারাবাহিকতা আছে এবং ভূ-পৃষ্ঠে বণ্টনের একটা হদিস দেয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ককে ভৌগোলিকরা বিশ্লেষণ করেন। একদিকে ধর্মের বিবিধ বিষয়যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশের ঘটনাবলী থেকে উৎপত্তি হতে পারে, তেমনি মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপান্তরের ফলে ধর্মীয় ধারণাসমূহেরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে পারে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মত ধর্মও মানুষের গর্বের বিষয় এবং পৃথক সংস্কৃতিরও পরিচয় বহনকারী। ধর্মের সাথে এই নিবিড় যোগ (close relation) বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে এবং ধর্ম ও ধর্ম নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে।

একটু বিশদভাবে দেখলে দেখা যাবে, পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ধর্মের অনুরাগীর সংখ্যা বেশি (চিত্র 1.7)। প্রতিটি ধর্ম একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্দিতে বিরাজ করছে। পৃথিবীতে দু ধরনের ধর্ম রয়েছে—সর্বজনীন (universal) ও জাতিগত। আরও লক্ষণীয় যে সর্বজনীন ধর্মের অবদান সমস্ত মানুষের কাছে রয়েছে, কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানের বাসিন্দাদের কাছে নয়। জাতি ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল তা ভূ-পৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্বভাবতই বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের কাছে ঐ ধর্মের আবেদন রয়েছে।

ভূগোলবিদদের একটি অন্যতম কাজ হল প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা। এর মাধ্যমে তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখান কীভাবে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ধর্মের বিকাশ ঘটে। এর ফলে একটি স্থানিক বন্টন সৃষ্টি হয়। এটা খুব স্বীকৃত ব্যাপার যে, স্থানিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া (spatial interaction) কোনও একটি বিশেষ ধর্মের বিকাশে সহায়তা করে। নির্দিষ্ট যোগাযোগের পথ ধরে উৎপত্তিস্থল থেকে ধর্মের ব্যাপ্তি (চিত্র. 1.8) ঘটে (diffusion)। ধর্মের এই ব্যাপ্তি প্রক্রিয়া ভৌগোলিকদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ থেকে আলোচ্য দু'টি স্থানের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। পৃথিবীতে 3-টি প্রধান সার্বজনীন ধর্ম রয়েছে যাদের অনুরাগীর সংখ্যা অগুনতি। ধর্মগুলো হল খ্রিস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ। প্রত্যেক ধর্মের একজন স্রষ্টা (প্রতিষ্ঠাতা) আছেন। এঁদের প্রচারিত বাণী তাঁদের অনুরাগীরা গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যস্থানে তাঁদের স্বীয় ধর্ম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিটি সার্বজনীন ধর্ম পরবর্তীকালে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জাতিগত ধর্মের ক্ষেত্রবিচারে সবচেয়ে বেশি অনুরাগী রয়েছেন হিন্দুধর্মে। এই ধর্মের অনুরাগীর সংখ্যা হল 481 মিলিয়ান। এটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম। এই ধর্মের শতকরা 99 ভাগ অনুরাগী একটি দেশে সীমাবদ্ধ রয়েছেন। দেশটি হল ভারত। যেহেতু একটি বিশেষ স্থানে এই ধর্মের শেকড় জাল বিস্তার করেছে। তাই পৃথিবীর অন্যত্র এই ধর্মের বিস্তার ঘটা কঠিন। যে সব দেশে এই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে, সেইসব দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা পাল্টালে জাতি ধর্মের বৈশিষ্ট্যও পাল্টাবে। এইসব ধর্মের বহুসংখ্যক অনুগামী পাওয়া মুশকিল।

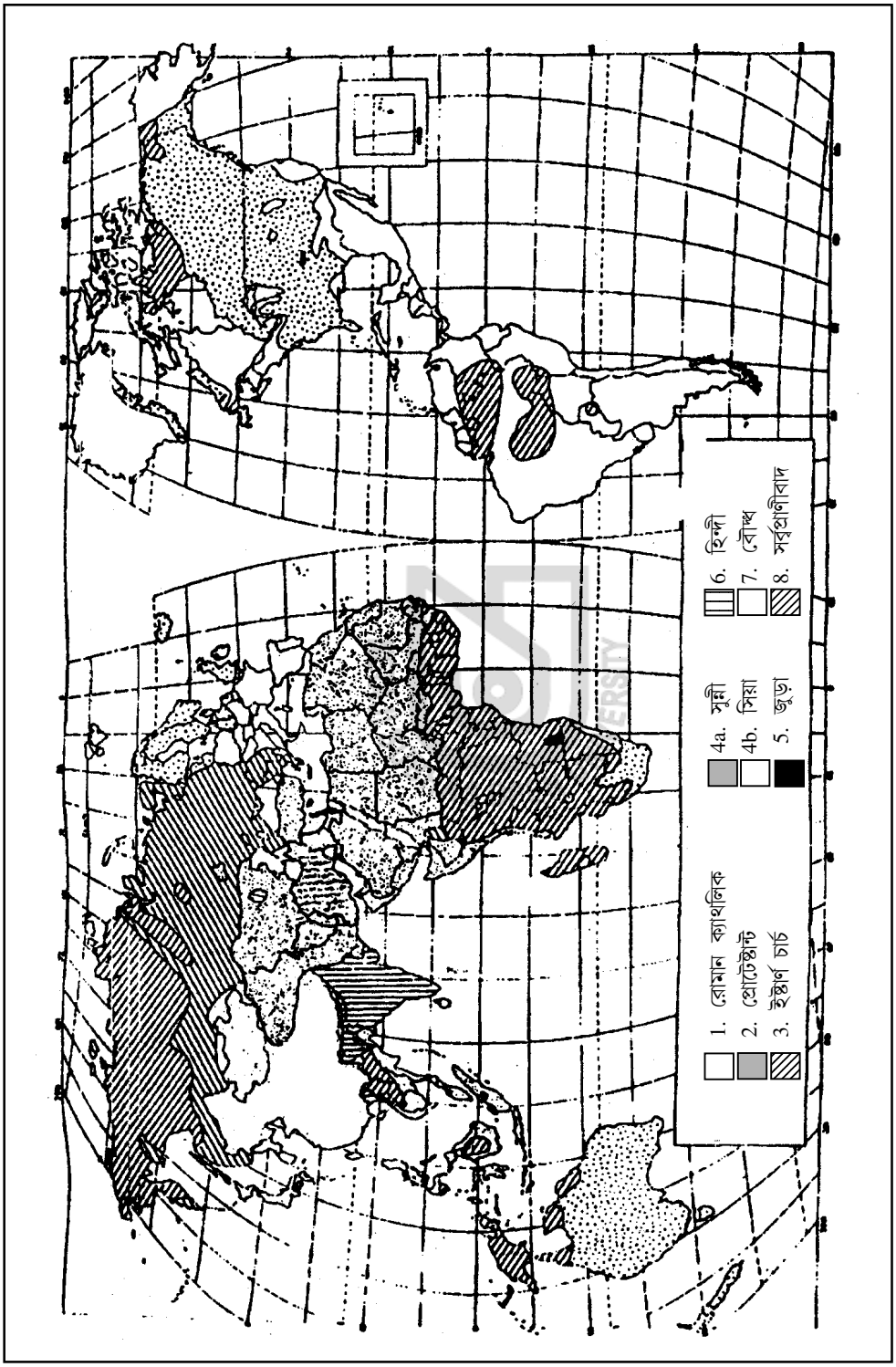


চিত্র 1.7 ঃ পৃথিবীর ধর্মসমূহ

যেহেতু তিনটি সর্বজনীন ধর্ম ও অন্য কয়েকটি জাতি ধর্মের নির্দিষ্ট ইতিহাস আছে, তাই তাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও স্থানীয় বণ্টন লিপিবদ্ধ আছে। বণ্টনের ধাঁচ থেকে আমরা বিভিন্ন ধর্ম ও ভূ-দৃশ্য সম্পর্কে ধারণা পাই।

**খ্রিস্টধর্ম**—এই ধর্মের প্রায় এক মিলিয়ান (কোটি) অনুরাগী আছেন। পৃথিবীতে এই ধর্মের অনুরাগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় এটিই প্রধান ধর্ম। এ সব মহাদেশের দেশগুলোতে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশি। এই ধর্মের মত অন্য কোনও ধর্মে এত ব্যাপক বণ্টনলক্ষ্য করা যায় না।

**উৎপত্তি ও বিকাশ**—এখন প্রশ্ন হল কীভাবে খ্রিস্টধর্ম পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বিস্তৃত ধর্ম হিসেবে পরিচিত হল? রোম সাম্রাজ্যের প্যালেস্টাইনে এই ধর্মের উৎপত্তির সময় থেকে খ্রিস্ট ধর্মের পরিব্যাপ্তি লিপিবদ্ধ আছে। স্থান, কাল ও প্রক্রিয়া নিয়ে অধ্যয়নরত ভৌগোলিকদের কাজ হল এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুখ্রিস্টের সময় থেকে কীভাবে ও কোন পথে এই ধর্ম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল তা দেখা।

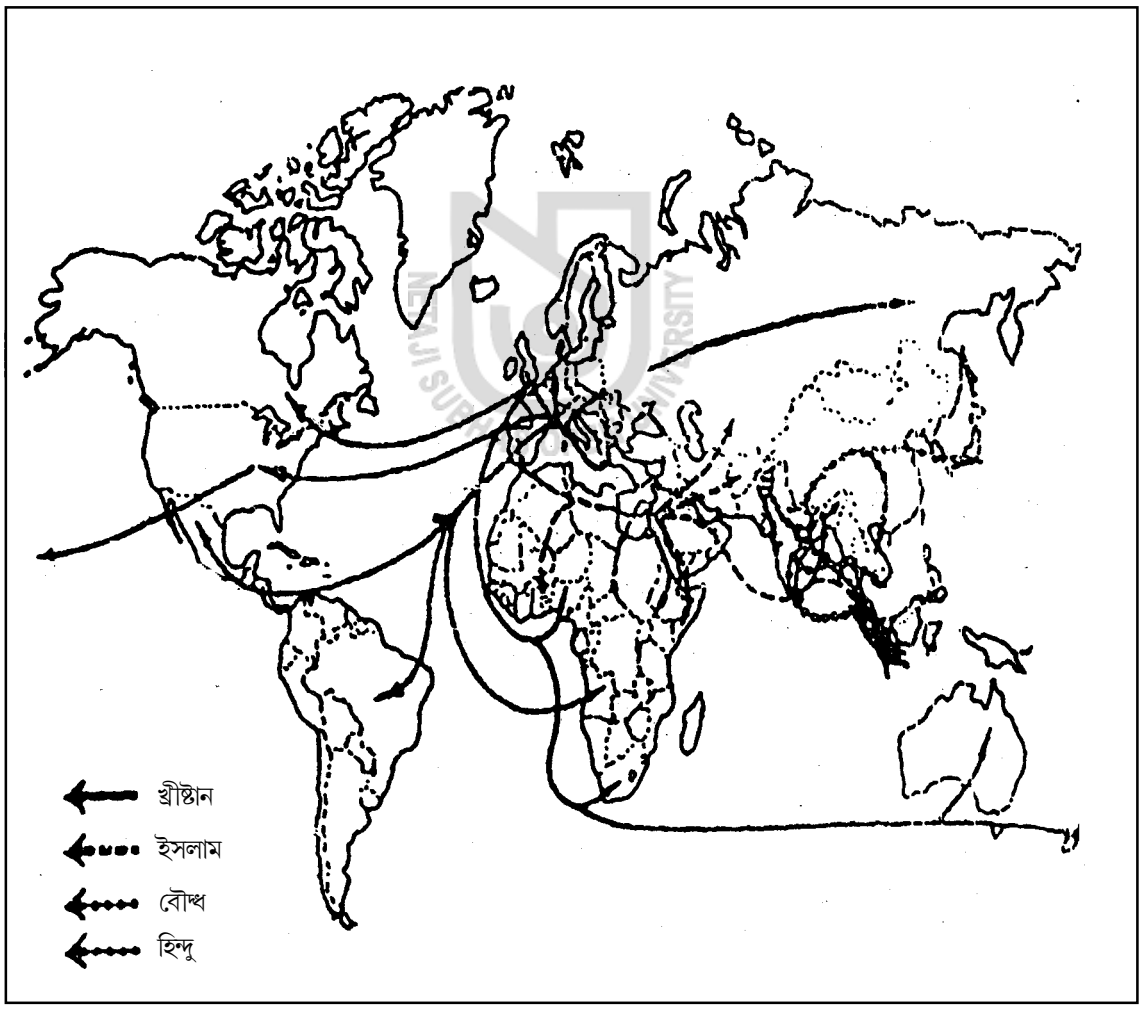


চিত্র 1.8 ঃ পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান ধর্মের উৎপত্তিস্থল ও ব্যাপ্তির পথ

প্যালেস্টাইনে সৃষ্ট খ্রিস্টধর্মের পরিব্যাপ্তি সম্ভব হয়েছিল রোম সাম্রাজ্যের মাধ্যমে। চতুর্থ শতকে এটি রাষ্ট্রীয় ধর্মের স্বীকৃতি পায়। যীশুর শিষ্যরা এই ধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও প্রচার করেছিলেন। আর এটা সম্ভব হয়েছিল সমুদ্রপথ ও রোম সাম্রাজ্যের উন্নত সড়কপথের দৌলতে। বাণিজ্য ও সামরিক শহরগুলোতে এই ধর্মের বিস্তার সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুন এটা সম্ভব হয়েছিল। 1500 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ইউরোপীয়দের বহির্বাসনের দরুন খ্রিস্টধর্ম অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দুই, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের দরুন ঐ সব স্থানে খ্রিস্টধর্ম প্রধান ধর্মে পরিণত হল। দেশীয় লোকদের খ্রিস্টধর্ম রূপান্তর ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিয়ে এই ধর্মের আরও বাড়-বাড়ন্ত ঘটিয়েছিল।

**শাখাসমূহ**—খ্রিস্টধর্ম প্রথমে এককভাবে যাত্রা শুরু করলেও পরে পরে তা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। রোমের পোপের অধীন ওয়েস্টার্ন গির্জা ও আণ্টিওচ, আলেকজান্দ্রিয়া এবং কনষ্ট্যান্টিনোপলের অধীন ইস্টার্ন গির্জা। এরপর রোমান গির্জা আবার ভাঙে ও প্রোটেস্ট্যান শাখার সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে, ইস্টার্ন গির্জার অধীন ইউরোপীয়, রুশ, ইতালীয় ও আর্মোনিয় সম্প্রদায়েরা নিজেদের গোষ্ঠী তৈরি করে।

পৃথিবীর মোট খ্রিস্টান জনগণের (1 মিলিয়ান) মধ্যে প্রায় 58 শতাংশ হলেন রোমান ক্যাথলিক, 34 শতাংশ প্রোটেষ্ট্যান এবং 8 শতাংশ ইস্টার্ণ অর্থডক্স (গোঁড়া)। সাধারণত রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা দক্ষিণ ইউরোপে সবচেয়ে বেশি, উত্তর ইউরোপে প্রোটেস্ট্যানদের বসবাসের এলাকা মোটামুটিভাবে চিহ্নিত, যদিও এই সীমানা কয়েকটি দেশের মাঝখান দিয়ে গেছে, যেমন নেদারল্যান্ডস্ ও সুইজারল্যান্ডে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টানদের সংখ্যা সমান সমান। তবে ঐ দুই দেশের উত্তর দিক দিয়ে প্রোটেস্টান ধর্মাবলম্বী ও দক্ষিণ দিক দিয়ে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বেশি। ইউরোপের মধ্যে আয়ারল্যান্ডে ধর্মীয় সীমানা নিয়ে গণ্ডগোল রয়েছে। আয়ারল্যান্ড রিপাবলিকের 90%-এর বেশি মানুষ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। প্রোটেস্ট্যানরা যুক্তরাজ্যের (U. K.) অংশ হিসেবে থাকতে পছন্দ করেন। কিন্তু উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের অধিকাংশ ক্যাথলিক আয়ারল্যান্ড রিপাবলিকের সাথে সংযুক্তি পছন্দ করেন। আইরিশ রিপাবলিক সৈন্যরা যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীন হবার জন্য মাঝে মাঝে হিংসায় মেতে ওঠেন। অন্যদিকে, প্রোটেস্ট্যান চরমবাদীরা যারা বিপরীত মত পোষণ করেন, তারা এ ধরনের খেলায় মেতে ওঠেন।

**পশ্চিম গোলার্ধ**—ল্যাটিন আমেরিকা মূলত ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের দেশ, কারণ এখানে স্পেনীয় ও পর্তুগাল থেকে অধিবাসীরা এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ইংল্যাণ্ডবাসীরা এসে বসবাস শুরু করেছিলেন, তাই ঐসব দেশে প্রোটেস্ট্যানদের সংখ্যা বেশি। তবে কানাডার কুইবেক প্রদেশে ক্যাথলিক ফরাসি, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যাণ্ড প্রদেশে ক্যাথলিক ইতালি, আয়ারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে পরিযায়ী মানুষ এসে বসবাস শুরু করায় উক্ত দেশগুলোতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ভীড় দেখা যায়। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের তিনটি বড় অংশ হল ব্যাপিস্ট, লুথেরান ও মেথোডিষ্ট। দক্ষিণ পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা থেকে টেকসাস পর্যন্ত জনসংখ্যার অর্ধেকই হল ব্যাপিষ্ট। উইসকনসিন থেকে ডাকোটা পর্যন্ত উত্তর পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে লুথেরান এবং ডেলাওয়ারি থেকে টেনেসি পর্যন্ত মেথোডিস্টদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে স্থানিক বণ্টনের মূলে রয়েছে পরিযারী ব্যক্তিদের ধর্ম, কারণ ঐ সব ধর্মানুরাগীরা সর্বপ্রথম ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরপর তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়েন।

**ইষ্টার্ন অর্থোডক্স**—আলবানিয়া, জর্জিয়া, গ্রিস, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া (C. I. S), সার্বিয়া ও সিনাই প্রভৃতি স্থানের স্বয়ং-

শাসিত গির্জার সমষ্টি হল ইষ্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিস্ট সম্প্রদায়। 1453 সালে মুসলিমরা ইস্টার্ন অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের কেন্দ্রবিন্দু কন্সটান্টিনোপল দখল করে নেবার পর ইস্টার্ন অর্থোডক্স গির্জা স্বাধীনভাবে প্রতিটি অঞ্চলে কাজ শুরু করল।

ইস্টার্ন অর্থোডক্স গির্জা ছাড়াও আরও কয়েকটি ইস্টার্ন খ্রিস্ট গির্জা আলাদা আলাদাভাবে গড়ে উঠেছিল। উত্তর পূর্ব আফ্রিকায় কোপটিক চার্চ অফ্ মিশর (Goptic church of Egypt) ও ইথিওপিয়া চার্চ নামে দু'টো গির্জা রয়েছে। শেষোক্তটি চতুর্থ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল। এর অধীনে 10 মিলিয়ান ভক্ত রয়েছেন।

আর্মেনিয়ান গির্জা সিরিয়ার এ্যান্টিওকে (Antioch)-এ গড়ে উঠেছিল। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় খ্রিস্টধর্ম প্রসারে এই গির্জার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই গির্জার অনুগামীরা কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় ও লেবাননে বসবাস করছেন।

**ইসলাম**—প্রায় 600 মিলিয়ান লোকের ধর্ম ইসলাম পৃথিবীর একটি বলয়ে (প্রধানত উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়া অর্থাৎ মরক্কো থেকে পাকিস্তানে) বেশি মাত্রায় বিস্তারলাভ করেছে। এই বলয়ের বাইরে অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হল বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া।

**উৎপত্তি ও বিকাশ (Origin & Development) ঃ** ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির গল্প খ্রিস্টধর্মের মতোই। খ্রিস্টধর্মের মতো ইসলাম ধর্মেও আদমকে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসাবে আর আব্রাহামকে তার অন্যতম বংশধর মনে করা হয়। আব্রাহামের সাথে সারার বিয়ে হয়। সারার কোনও সন্তান ছিল না। তাই হাগারের (Hagar) সাথে আব্রাহামের পুনরায় বিয়ে হয়। হাগারের গর্ভে ইসমায়েল (Ismael) নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। এরপর সারার গর্ভেও ইসাক (Isaac) নামে এক পুত্রসন্তান জন্মায়। সারার চাপে আব্রাহাম ইসমাইল ও হাগারকে নির্বাসন দেন। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মের উৎপত্তি ইসাক এবং মুসলিমরা ইসমাইলের মাধ্যমে এসেছে বলে মনে করে। ইসমাইল ও হাগার আরব মরুভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ও অবশেষে মক্কায় এসে পৌঁছলেন। ইসমাইলের বংশধর হজরত মহম্মদ (571-634 খ্রিঃ) ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

মহম্মদের উত্তরাধিকারীরা মুসলিম ধর্মকে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অংশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন (চিত্র 1.9)। মহম্মদের মৃত্যুর একশ' বছর পর সেনারা প্যালেস্টাইন, পারস্য সাম্রাজ্য ও ভারতের বহু অংশ জয় করেছিলেন। এর ফলে অনেক অ-আরবীয়রা ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। মুসলিমরা পশ্চিম উত্তর আফ্রিকা অধিকার করেছিলেন এবং জিব্রাল্টারে ভুমধ্যসাগর অতিক্রম করে 1492 সাল পর্যন্ত ইউরোপের কিছু অংশ দখল করে রেখেছিলেন, যদিও পরবর্তীকালে খ্রিস্টানরা ঐসব মুসলিম অধিকৃত স্থানের পর তাদের আধিপত্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলিম ধর্মপ্রচারকরা ক্রান্তীয় আফ্রিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ঐ ধর্ম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ পূর্ব সর্বপ্রধান মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হল ইন্দোনেশিয়া। আরব ধর্মপ্রচারকরা ঐ দেশে মুসলিম ধর্মপ্রচার করেছিলেন। 1993 সালের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীতে 97 কোটি ইন্দোনেশিয়ায়, ভারতে 18 কোটি, পাকিস্তানে 13 কোটি, বাংলাদেশে 11 কোটি, নাইজেরিয়ায় 6.2 কোটি, রাশিয়ায় 6 কোটি ও চীনে 5 কোটি মুসলিম বাস করেন।

**শাখাসমূহ—**মুসলিমরা দু'টি ভাগে বিভক্ত, সুন্নী (শতকরা 90 ভাগ) ও শিয়া (10 ভাগ)। বেশিরভাগ শিয়া সম্প্রদায় ইরানে বাস করেন। ইরাক, সিরিয়া ও সৌদি আরবে সংখ্যালঘিষ্টদের মধ্যে শিয়ারা অন্যতম।

শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মের শুরু থেকেই রয়ে গেছে। হজরত মহম্মদের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। তার শিষ্যদের মধ্যে নেতা হবার মত দৃঢ়চেতা সম্পন্ন কেউ ছিলেন না। মহম্মদের উত্তরাধিকারী ছিলেন আবু বকর। তিনি হলেন খলিফা পয়গম্বর-এর উত্তরাধিকারী। এর পরবর্তী দু'জন খলিফা (Caliph) হলেন লেমার (Lemar) (634-

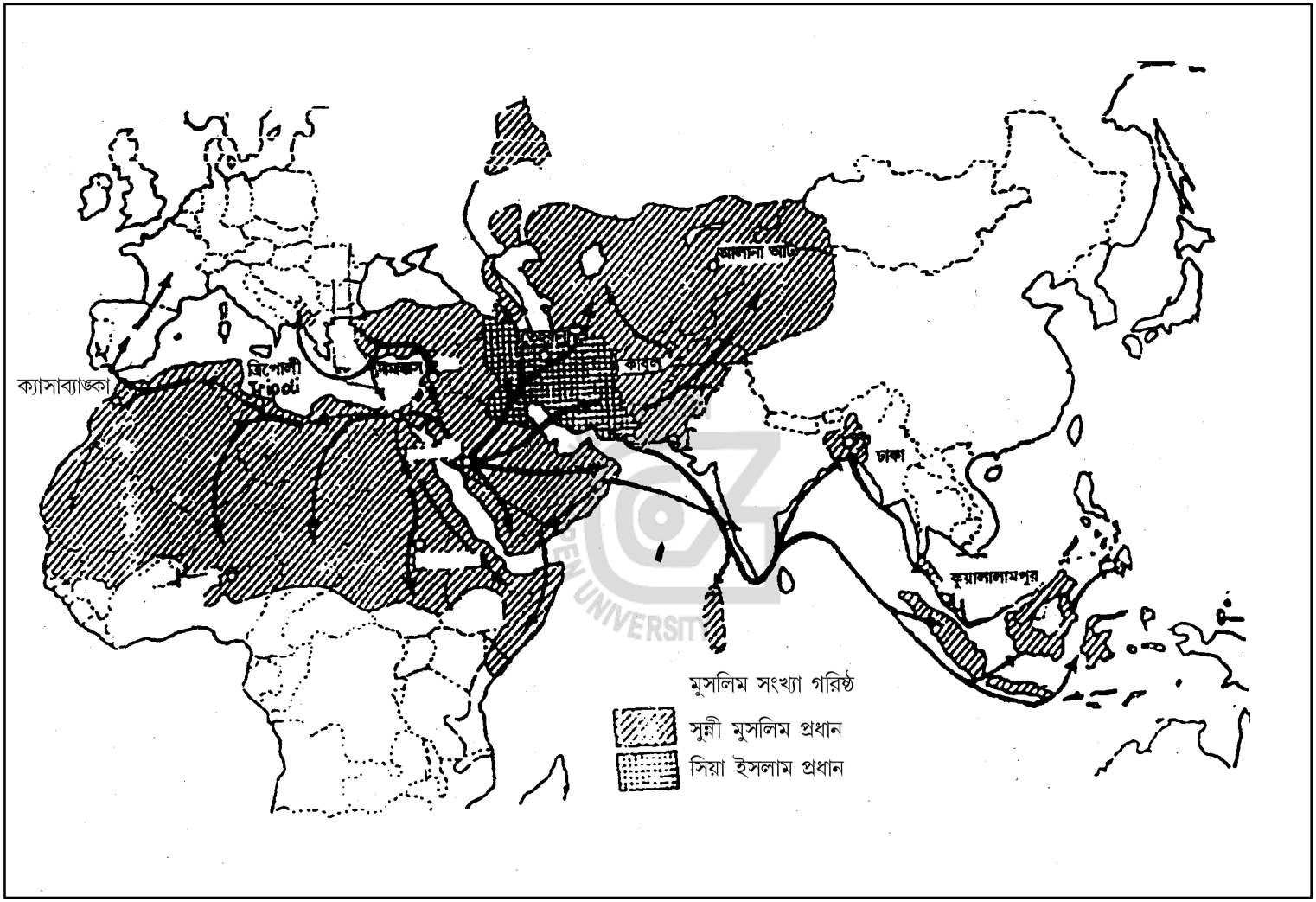


চিত্র 1.9 ঃ মুসলিম ধর্মের ব্যাপ্তি

644 খ্রিঃ) ও উতমা (Uthman, 644-656 খ্রিঃ)। এঁরা মুসলিম ধর্মকে মিশর ও পারস্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মূর্তি পুজোয় বিশ্বাসীদের সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য ইতমাকে হিংসুটে মুসলমানরা সমালোচনা শুরু করলেন। উতমার বিরোধীরা আলির মধ্যে এক নেতাকে খুঁজে পেলেন। আলি ছিলেন মহম্মদের ভাইপো ও তার জামাতা অর্থাৎ মহম্মদের নিকটতম পুরুষ উত্তরাধিকারী। আলির অনুগামীরা উতমাকে হত্যা করে 656 সালে আলিকে খলিফা ঘোষণা করলেন। 661 সালে উতমার ভাই মুয়াবিগা (Muawiga) আলিকে হত্যা করেছিলেন।

শিয়া সম্প্রদায় আলির উত্তরাধিকারিদের ইসলাম নেতা বলে মানেন। শিয়ারা স্বীকার করেন যে, মহম্মদ ও আলির মধ্যেকার উত্তরাধিকাদের সুস্পষ্ট ধারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যদিও বিভাজনের তারিখটা তর্কের বিষয়। বর্তমান সময়ে ইরানের শাহ ও সদ্য প্রয়াত আয়াতুল্লা খোমেইনি আল্লা কর্তৃক নিযুক্ত ইসলামের বাণী প্রচারক বলে নিজেদের মনে করতেন। ইরানের জনগণের কাছে আয়াতুল্লার একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল, কারণ তিনি ইসলামদের প্রাচীন গ্রন্থ কোরানের অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতেন।

**বৌদ্ধধর্ম**—এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ নেপালের লুম্বিনী উদ্যানে 563 খ্রিঃ পূঃ (তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শুদ্ধোধন ছিলেন শাক্য বংশের রাজা। ভোগবিলাসময় জীবন, এমন কি সুন্দরী স্ত্রী ও পুত্রের উপস্থিতি গৌতম বুদ্ধকে সংসারে বেঁধে রাখতে পারেনি।

নগর পরিক্রমণের প্রথম দিনে বৃদ্ধ, অথর্ব মানুষ, দ্বিতীয় দিনে রোগগ্রস্ত মানুষ, তৃতীয় দিনে শব ও চতুর্থ দিনে সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। তিনি ভাবলেন, দুঃখক্লিষ্ট পৃথিবী থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল সংসারধর্ম ত্যাগ। তাই ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র ও বিলাসবহুল জীবনের মোহ ত্যাগ করে মাত্র 29 বছর বয়সে তিনি বোধির সন্ধানে ঘর ছাড়লেন। এরপর 6 বছর যাবৎ কঠোর তপস্যার পর তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী নামে পরিচিত হলেন। তাঁর জীবনের 45 বছর পর্যন্ত তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার করে বেড়ালেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম নামে প্রচারিত হল। উল্লেখ্য যে উত্তর-পূর্ব ভারতে এই ধর্মের উৎপত্তিস্থল থেকে বৌদ্ধধর্ম দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। মগধের সম্রাট অশোকের চেষ্টায় এই ধর্ম দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাট অশোক এই ধর্ম গ্রহণ করেন ও তা প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা নেন। তাঁর পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) ধর্ম মিশন প্রেরণ করেন। ঐ দেশের রাজা ও তাঁর প্রজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে কাশ্মীর, ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) ও ভারতের অন্যান্য স্থানে ধর্ম মিশন প্রেরিত হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বণিকরা বাণিজ্য পথ ধরে এই ধর্মকে চীনে নিয়ে যান। বহু চীনা ভাষাভাষী এই ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে এই ধর্ম চীন থেকে ভিয়েতনাম, কোরিয়া ও জাপানে পরিব্যাপ্ত হয়। ঐ একই সময়ে বৌদ্ধধর্ম তার মূল উৎপত্তিস্থল ভারতে অনেকখানি প্রভাব হারাল।

**শাখাসমূহ**—বুদ্ধের মৃত্যুর দুই বা তিন শতাব্দী পরে বৌদ্ধরা হীনযান (ছোটতরী) ও মহাযান (বড়তরী) ; মহা = বড়, যান = তরী) এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যান। প্রথমোক্তরা বুদ্ধের মূল শিক্ষার ধারক বলে দাবি করেন। আর মহাযানরা বুদ্ধকে এক চিরায়ত ও পরমাধ্য দেবতা বলে মনে করেন। তাঁর ওপর এই জগৎ শাসন ও ভক্তদের পরিত্রাণের ভার রয়েছে বলে মনে করেন। মহাযানরা পূর্ব এশিয়ার তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা ও হীনযানরা মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস ও কাম্পুচিয়ায় ছড়িয়ে আছেন। বৌদ্ধধর্ম মতাবলম্বীর সংখ্যা বর্তমানে 3,14,939 জন (1993) অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 5.78% অংশ। চীন ও জাপানের অধিকাংশ ব্যক্তি বৌদ্ধ ও শিন্টোধর্ম এই দুই ধর্মের প্রতি অনুরক্ত।

**হিন্দুধর্ম**—উপরোক্ত তিনটি সর্বজনীন ধর্মের মত কিন্তু হিন্দু ধর্মের কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা নেই। হিন্দুধর্ম কথাটা বলতে ভারতের ধর্মীয় ব্যবস্থা বোঝায়। এই ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে প্রাচীন লিখিত কোনও প্রমাণাদি নেই।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে লিখিত প্রাচীনতম প্রমাণাদি মিলেছে খ্রিঃ পূঃ 1500 সাল নাগাদ। অবশ্য প্রত্নতত্ত্ব খনন থেকে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে এর চেয়েও প্রাচীন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। 1400 খ্রিঃ পূঃ নাগাদ আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে

এসেছিলেন। তাই দেখা যায় ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পুরনো অবশিষ্ট ভাষা হল ভাষাগত পরিবার। ভাষা ছাড়াও আর্যরা তাদের ধর্মকে এদেশে নিয়ে এসেছিলেন।

আর্যরা প্রথমে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পঞ্চনদের তীরে (পাঞ্জাবে) এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে এঁরা পূর্বদিকে গঙ্গা উপত্যকা ধরে বাংলাদেশ পর্যন্ত বসবাস করতে থাকেন। এখানকার প্রাচীন বাসিন্দা দ্রাবিড়দের সঙ্গে মেলামেশার দরুন আর্য ধর্মে পরিবর্তন এসেছিল।

**হিন্দু ধর্মের বৈচিত্র্য**—হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে একের বেশি পথ আছে। "যত মত তত পথ" ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই কথাই সম্ভবত হিন্দুধর্মের সারকথা। তবে দেবদেবীর পুজো অর্চনা কিছুটা বর্ণের ওপর নির্ভর করে। ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রমতে পুজো করেন। আবার গ্রামীণ অশিক্ষিত ব্যক্তি পুজোর নিয়মের কঠোরতা সম্পর্কে অজ্ঞ। তবে একটা ব্যাপারে প্রত্যেকেই সহমত পোষণ করেন ; তা হল বর্ণ আলাদা হলেও দেবদেবী এক।

হিন্দু ধর্মের তিনটি ভাগ হল, শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত, যদিও সারা ভারতে বিভিন্ন দেবদেবী পূজিত হন। ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পথ প্রচলিত আছে। তবুও কিছু ভৌগোলিক বণ্টন লক্ষণীয়। উত্তর ভারতে শৈব বিস্তার উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া পূর্ব ভারতে শক্তি ধর্ম ছাড়াও আছে বৈষ্ণব ধর্ম। পশ্চিম ভারতে শৈব ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে কিছু বৈষ্ণব ধর্মের অনুগামীও আছেন।

উপরোক্ত প্রধান প্রধান ধর্ম ছাড়া পৃথিবীতে আরও কয়েকটি ধর্ম রয়েছে যাদের অনুগামীর সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তবে লক্ষণীয় যে, তারা এক একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। নিম্নে ঐ সব ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হল—

**জরাথুস্টীয়বাদ**—এই ধর্মের প্রবক্তা জরাথুস্ট খ্রিঃপূর্ব 660 সালে মেদিয়ায় (এখনকার ইরানে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মতে জীবন হল শুভ ও অশুভ শক্তির দ্বন্দ্বের সমন্বয়। আহুরা মাজদা ও তাঁর সহযোগী মিথ্রস বা আলো প্রথমটির, আর আরো মাইনু (আহরমিন) বা মিথ্যার দৈত্য হল অশুভ শক্তির প্রতীক। মানুষ এই দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। সত্যের জন্য তাকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ও সত্যনিষ্ঠ জীবনযাপন করতে হবে। সত্যনিষ্ঠ জীবনযাপনকারীরা অমরলোকে স্থান পায়। যাঁরা এই জীবনযাপন করেন না, তাঁদের স্থান হয় নরকে। জরাথুষ্টীয়বাদ মেদিয়া ও পারস্যের প্রধান ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় (মনোরমা ইয়ারবুক, 2002)।

জরাথুস্টের বাণী নিয়ে আভেস্তা বা জেন্দ আভেস্তা নামে একটি বই রচিত হয় যা পারসিকদের বাইবেল হিসেবে পরিচিত।

মনে করা হয় যে, অষ্টম শতাব্দীতে যে সব জরাথুস্টীয়রা ভারতে পালিয়ে আসেন, তাঁরাই এখানকার পার্সি সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষ।

ইহুদি ধর্ম হল হিব্রুদের ধর্ম। আদিগুরু ও আইন প্রণেতা মোজেসের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকে এঁদের ধর্ম চালু ছিল। হিব্রুদের মধ্যে প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হলেন আব্রাহাম। তিনি খ্রিঃ পূঃ 2000 বছর আগে হিব্রু উপজাতিদের নিয়ে শ্যালডিয়ার উর ছেড়ে যাত্রা শুরু করেন। আরবের মরুভূমিতে বহুদিন ঘোরাঘুরির পর এঁরা মিশরে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু ফারাওরা-র চক্রান্তে তাঁরা ক্রীতদাসে পরিণত হন।

এরপর মোজেস হিব্রু জাতিকে মিশরীয়দের দাসত্ব মুক্ত করেন এবং তাঁদের নিয়ে ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত দুধ ও মধুর দেশের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রওনা হন। পথে মাউন্ট সিনাই (Mt. Sinai)-তে তিনি জিহোভার (ভগবান) কাছ থেকে Ten Comments (দশটি অনুশাসন) লাভ করেন।

খ্রিস্ট-জন্মের 1,000 বছর আগে হিব্রুরা ইজরায়েল রাজ্য গড়ে তোলেন। খ্রিঃ পূঃ 586-তে নেবুকাডনেজার ইজরায়েল দখল করে হিব্রুদের ব্যাবিলনে বন্দী করেন। সাইপ্রাস প্যালেস্তাইন জয় করার পর হিব্রুরা ইজরায়েলে পুনরায় বাস করতে থাকে। এই সময় তাঁদের আদি গুরুর শিক্ষা ও প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করা হয়।

খ্রিস্টের সময়ের আগে পর্যন্ত আইন, প্রার্থনা ও গুরুবাণী আলাদা আলাদা বইতে লেখা ছিল। খ্রিস্ট্রের সময় সেই সবকে একসাথে করে Old Testament (হিব্রু বাইবেল) রচনা হয় (মনোরমা ইয়ারবুক, 2002)।

ইহুদি ধর্ম হল একটি সরল ধর্ম যার লক্ষ্য হল নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপন। সৎ আচরণ, সৎ বিশ্বাস ইহুদিদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক ভাল মানুষ নিশ্চিতভাবে স্বর্গে বাস করেন। এই ধর্মে ভাব প্রবণতা, আলস্য বা কৃচ্ছ সাধনের কোনো স্থান নেই। জেরুজালেম হল ইহুদিদের পবিত্র শহর।

**শিণ্টোবাদ**—জাপানিদের জাতিগত ধর্ম হল শিণ্টো যার মানে হল আত্মার পথ, পূর্বপুরষদের পূজোর মূল নীতিসমূহ। বহুদিন ধরে এই মত আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে। সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন উপাদান সংগ্রহ করে এই মত আরও দৃঢ় হয়েছে। কোনও সংস্কারক (reformer) এই ধর্মমতে নতুন নির্দেশ দেননি বা পরিবর্তন সাধন করেননি। এই ধর্ম নিয়ে কোনও পবিত্র গ্রন্থ রচিত হয়নি।

জাপানি সম্রাট মিকাদোর অনুগামীদের ধর্ম হল শিণ্টো। এই ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু হলেন মিকাদো—একমাত্র ঈশ্বর। এই ধর্মে দেবদেবীর সংখ্যা অনেক। একমাত্র যুগ যুগ ধরে চলে আসা আচার (Custom) ছাড়া এই ধর্মে তেমন কোনও ধর্মীয় তত্ত্ব নেই। শিণ্টোধর্মের কেন্দ্রীয় ধর্মীয় কাঠামো মধ্য জাপানের ইসে-তে অবস্থিত। এখানে ধর্মপ্রাণ জাপানিরা যান। 1947 সালে জাপানি সম্রাট ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বের দাবি ছেড়ে দেওয়ার পর এই ধর্মের অনুরাগীর সংখ্যাও কমে গেছে (মনোরমা ইয়ারবুক, 2002)।

**তাওবাদ**—খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ধর্মের প্রবক্তা লাওৎসে চীনে জন্মগ্রহণ করেন। লাওৎসের শিক্ষা নিয়ে তাও তেকিং নামে একটি বই রচিত হয়েছিল যা তাও (প্রকৃত অর্থ রাস্তা)-দের বাইবেলে পরিণত হয়। তাও শব্দের মানে রাস্তা হলেও পরে এটির নাম দাঁড়ায় বাস্তবতা। এই ধর্মের শিক্ষা হল প্রাত্যহিক জীবনে সারল্য, পবিত্রতা ও নম্রতা। এই ধর্মের ত্রিরত্ন হল দয়া, সংযম ও বিনয়। লাওৎসে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যীশুখ্রিস্টও সেই একই শিক্ষা দেন, যার মোদ্দা কথা হল খারাপের জবাব ভাল হয়ে দেওয়া। "যখন কেউ তোমার ক্ষতি করবে তা নিয়ে উত্তেজিত হয়ো না, দয়ালু ও উদার হও এবং প্রতিদান আশা কোরো না।"

লাওৎসের উচ্চমার্গীয়ে দর্শন সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। লাওৎসের শিষ্যরা তাও-তেকিং-কে যাদুর উৎস হিসাবে ব্যবহার করতেন আর তাওবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আচারসর্বস্ব। খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকেই তাওবাদ তার মূল থেকে সরে এসেছিল এবং লাওৎসের পুজোতে বলিদান প্রথা চালু হয় (মনোরমা ইয়ারবুক, ২০০২)।

**শিখ ধর্মের** প্রতিষ্ঠাতা হলেন গুরু নানক (1469-1539 খ্রিঃ)। হিন্দু ও মুসলমানদের ক্রমাগত আত্মকলহে তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, হিন্দু ও মুসলমানদের ঈশ্বর আসলে একই। তিনি এই দুই ধর্মের মধ্যে মিলন ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ধর্মপ্রচারকের অল্প সময়ের মধ্যে বহু শিষ্য জুটে যায়। মক্কা ছাড়াও তিনি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মের সাধু সন্তদের সংস্পর্শে তিনি আসেন। নানকের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা এক এক করে গুরু হন। এই গুরুরা বর্তমান শিখ-সম্প্রদায়কে গড়ে তোলেন। শিখদের পঞ্চম গুরু প্রথম পবিত্র গ্রন্থ আদিগ্রন্থ রচনা করেন। এই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বিখ্যাত গুরু অর্জুনদের (1581-1606 খ্রিঃ) হলেন গুরু গোবিন্দ। ইনি শিখদের সামরিক সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তোলেন। শিখদের মধ্যে ছোরা দিয়ে জল ছিটিয়ে দীক্ষাদান (পাহুল) তিনি-ই চালু করেছিলেন। যাঁরা দীক্ষিত হতেন তাঁদের মনে করা হত খালসা (পবিত্র)। শীঘ্রই মহারাজ রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে লড়াকু খালসা বাহিনী এক রাজ্য (শিখ রাজ্য) গড়ে তুলল। শিখ ধর্মের রীতির অনুসারে, প্রত্যেক খালসা সদস্যকে কেশ, কাঙ্গি (চিরুনি), কৃপাণ, কচ্ছ ও কড়া (বালা) ধারণ করতে হয়। বেশিরভাগ শিখরা থাকেন পাঞ্জাব ও দিল্লিতে। এঁদের পবিত্র ধর্মস্থান হল অমৃতসর।

**জৈন ধর্ম** নামটি এসেছে জৈন (বিজয়ী) কথাটি থেকে, যা বর্ধমান মহাবীরের আরেক নাম। বৈশালীর এক রাজপরিবারের

সন্তান মহাবীর মাত্র 30 বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে বারো বছর যাবৎ কঠোর তপস্যা ও সংযমের পর 42 বছর বয়সে এক অশোক গাছের তলায় বসে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন ও জৈন বা বিজয়ী নামে পরিচিতি হন।

এই ধর্মের শিক্ষা হল তিনটি পথ বা ত্রিরত্ন (যথা সৎ বিশ্বাস, সৎ চেতনা ও সৎ আচরণ) অনুসরণ করলে সকল আত্মা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাবে এবং প্রকৃত শান্তির আবাসে পৌঁছে যাবে।

82 খ্রিস্টাব্দের পর জৈনরা দু'টি শাখায় ভাগ হয়ে যায়—একটি শাখা হল *দিগম্বর*, ও অপরটি *শ্বেতাম্বর*। দিগম্বররা কোনও পোশাক পরতেন না। শ্বেতাম্বরা সাদা পোশাক পরতেন। তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয় জয় করা যায় বলে দুই শাখার বিশ্বাস।

বিহারের পরেশনাথের কাছে সমতা পাহাড় জৈনদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র। এখানে পার্শ্বনাথ নির্বাণলাভ করেন বলে কথিত আছে। অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রগুলো হল পাবাপুরী (যেখানে মহাবীরের মৃত্যু হয়), রাজস্থানের মাউন্ট আবু ও কর্ণাটকের শ্রবণগোলা যেখানে তীর্থঙ্কর, আদিনাথ ও বহুবলীর মন্দির ও ঋষভের পুত্র গোমতেশ্বরের মূর্তি আছে।

**উপজাতি ধর্ম (Tribal Religion) ঃ**

উপজাতি ধর্ম এক বিশেষ ধরনের জাতিধর্ম। বস্তুতপক্ষে, উপজাতিরা সামাজিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে নবীন প্রস্তরযুগের পর্যায়ে রয়ে গেছেন। আদিম মানুষ ধর্মের স্বরূপ বুঝতেন না। তাঁরা প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন। ফলে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা যেমন বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত, জলোচ্ছ্বাস তাঁদের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করত। অজানার প্রতি ভয় ও জয় করার চেষ্টা থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছিল। উপজাতিরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর ওপর দেবত্ব আরোপ করেন। তাঁরা মনে করেন পাথর, গাছ, পুষ্করিনী প্রভৃতিতে প্রাণ আছে। এগুলো হল মৃত আত্মা বা ঈশ্বরের বাসস্থান। শামানিজম হল এক প্রকার উপজাতি ধর্ম যাতে ধর্মীয় নেতা শামানের স্বীকৃতি আছে। মনে করা হয় শামান যাদুবিদ্যা (Magic) ও বিশেষ ক্ষমতার মাধ্যমে ভূত ও প্রেতের আত্মার জগৎকে (spirit world) সন্তুষ্ট ও ব্যাখ্যা করতে পারেন।

আফ্রিকার প্রায় 150 মিলিয়ান মানুষ হলেন প্রাণীবাদী।

## 4. 10 জাতি (Race)

ফ্রেডিক ব্লুমেনবাক গোটা মানবজাতিকে নৃকুলগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—ককেশীয় বা শ্বেতকায় জাতি, মঙ্গোলীয় বা পীতজাতি, ইথিওপীয় বা কৃষ্ণকায় জাতি, রেড ইন্ডিয়ান বা রক্তবর্ণ জাতি ও মালয়ী বা বাদামীবর্ণ জাতি। পরবর্তীতে সমুদয় মানবজাতিকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়—ককেশীয় বা শ্বেতকায় জাতি, মঙ্গোলীয় বা পীত জাতি ও নিগ্রো বা কৃষ্ণকায় জাতি। এরূপ শ্রেণিবিন্যাস বিজ্ঞানসম্মত হলেও বিশদ আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট নহে। পৃথিবীর জনতার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মূল সাদৃশ্যের মধ্যে বহুবিধ বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এই প্রধান তিনটি শ্রেণি ভাগকে একাধিক উপ-বিভাগে ভাগ করা যায়।

যুগ যুগ ধরে পরিযান ও সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান জগতে মানবজাতির নৃতাত্ত্বিক মূল বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে বিলুপ্তির পথে। তা সত্ত্বেও গায়ের রঙ, মুখের চেহারা, মাথার গড়ন, চুলের বৈচিত্র্য, শরীরের গঠন ও রক্তের ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞান সম্মতভাবে মানবজাতির নৃতাত্ত্বিক বিন্যাস সম্ভব। নৃকুলের এইরূপ শারীরিক বিশ্লেষণে জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার অবদান উল্লেখযোগ্য (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)।

বর্তমান বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে প্রধান সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

**ইউরোপীয় জাতি ঃ** ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী ইউরোপীয় মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

পরবর্তীকালে এই ইউরোপীয় জাতি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এরা প্রধানতঃ শ্বেতকায় ও ককেশীয় জাতি।

**আফ্রিকা নিবাসী জাতি ঃ** সাহারার দক্ষিণে এই শ্রেণির মানবজাতির বসবাস ইউরোপীয়দের মত আমেরিকাতেও এরা ছড়িয়ে পড়েছে। এরা প্রধানতঃ কৃষ্ণকায় নিগ্রোজাতি।

**এশীয় জাতি ঃ** মায়ানমার থেকে জাভা, ফিলিপাইন, জাপান ও চীন পর্যন্ত এই জাতির বসবাস। এরা প্রধানত পীতকায় জাতি বা মঙ্গোলীয় জাতি।

**ভারতীয় জাতি ঃ** ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাবেশে এক বিশিষ্ট কৃষ্ণকায় জাতির উদ্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে ককেশীয় ও নিগ্রোজাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

**অস্ট্রেলীয় জাতি ঃ** এই জাতি অস্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে সীমাবদ্ধ। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যানুসারে এদের অনেক সময় আদিম শ্বেতজাতি বলে কল্পনা করা হয়।

**মেলানেশীয় জাতি ঃ** নিউগিনি ও মেলানেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে এই জাতির বাস। এই জাতির গায়ের রং ও চেহারার সাথে নিগ্রো জাতির মিল লক্ষ্য করা যায়।

**রেড ইন্ডিয়ান জাতি ঃ** আলাস্কার দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত এই জাতির বাস। এশিয়ার মঙ্গোল জাতির সাথে এদের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

আমরা আগেই বলেছি যে পূর্বোক্ত প্রধান তিনটি শ্রেণি বিভাগ (ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো) ভৌগোলিক বিচারে যথেষ্ট নহে। আফ্রিকার বুশম্যান, হটেনটট ও জাপানের আইনুরা স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এছাড়া প্রতিটি ভৌগোলিক জাতি স্থানীয় একাধিক জাতির সমাহার। যেমন ফিনল্যান্ডের ল্যাপরা একটি বিশিষ্ট জাতি। এরূপ অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীরা বহুদিন ধরে আলাদা আলাদা ভাবে বাস করার ফলে একক বংশধারার সৃষ্টি করে আলাদা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়েছে।

অনেক জাতি আজকের দিনে আর নেই। পক্ষান্তরে বর্তমান জগতে অবাধ সংমিশ্রণের ফলে অনেক নতুন নতুন জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যেমন নিও হাওয়াই জাতি, লাডিনো আমেরিকার কৃষ্ণকায় জাতি প্রভৃতি।

তথ্যগত বিচারে দেখা যায় যে পৃথিবীতে প্রকৃতির খেয়ালে আলাদা আলাদাভাবে নানা জাতির সৃষ্টি হয়েছে। এটি জীবজগতে একটি স্বাভাবিক নিয়ম। এমনকি বর্তমানে দেখা যায়—বহুদূরে বসবাসকারী নৃকূলের পারস্পরিক আকৃতিগত তফাৎ যথেষ্টই রয়েছে।

অন্যান্য জীবকূলের মত বিভিন্ন জাতির শারীরিক গঠনের হেরফের লক্ষ্য করার মত নৃকূলের দেহগত পার্থক্য অনুধাবনযোগ্য। এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশভেদ হেতু গড়ে ওঠে। যেমন দেখা যায়, ক্রান্তিয় অঞ্চলে প্রচুর সূর্যতাপের জন্য গায়ের চামড়ায় রঞ্জক পদার্থের মাত্রা সর্বাধিক। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরা লম্বা আকৃতির। উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলের হাত-পা অপেক্ষাকৃত বড় হয়। সাধারণ বিচারে এরকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেলেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনেক বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। এর প্রধান কারণ মানুষের পরিযান ও মানুষের বুদ্ধি দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ। যেমন বাসগৃহ তৈরি ও উপযোগী পোশাকের মাধ্যমে মানুষ বাহিরের শীত ও উত্তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। পরিশেষে বলা চলে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও তার গায়ের রং, রক্তের ধারা ও চুলের বৈচিত্র্য প্রভৃতিতে পার্থক্য দেখা যায়।

## 4.10.1 ভারতের জাতিগত গঠন (Ethnic Composition of India)

**ভূমিকা ঃ** বর্তমানে নৃতত্ত্ব চর্চায় বিভিন্ন নৃকূলীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সর্বপ্রধান শাখা। মানব সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও

বিবর্তন সর্বত্র কৌতূহলোদ্দীপক। অনুন্নত মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন পার্থক্যের মাঝে এমন কতকগুলো ঐক্যসূত্রের সন্ধান মেলে যা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে চমকিত করে। নৃতত্ত্বে নৃকুলীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অনুধাবনে প্রধানত বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জীবিকা, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাত্রা, বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, দলগত ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদের ধারা, আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণকে বোঝায়।

নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের দেশ ভারতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সমন্বয় গড়ে উঠেছে বর্তমান জনসংখ্যা। জল বা স্থলপথের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন। ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল প্রকার প্রধান প্রধান জাতি ও উপজাতি দেখা যায় এই উপমহাদেশে।

Taylor পৃথিবীর জাতিসমূহকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হল—

**সারণি**

**Taylor-এর শ্রেণিবিভাগ**

| শ্রেণি | মাথার গড়ন | চুল | গায়ের রং | বসতি |
|---|---|---|---|---|
| সর্বশেষ পরিযান (পরবর্তী আল্পীয় মঙ্গোলীয়) | ৮৮-৮৩ | সোজা | হাল্কা বাদামি ও হলদে | সুইস আল্পস্ থেকে মাঞ্চুরীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। |
| পূর্ববর্তী আল্পীয় (মঙ্গোলীয়) | ৮৩-৮০ | সোজা ঢেউ | হালকা বাদামী খেলানো ও সাদা | এশিয়ার বেশির ভাগ অংশ ও মধ্য ইউরোপ। |
| ভূমধ্যসাগরীয় | ৮০-৭৭ | ঢেউ খেলানো ও কোঁকড়ানো | হালকা বাদামী থেকে সাদা | উঃ আফ্রিকা, দঃ আফ্রিকা গোটা ইউরেশিয়া |
| অস্ট্রেলিয় | ৭৬-৮৩ | ঢেউ খেলানো ও কোঁকড়ানো | ঘন কালো থেকে কালো | উপদ্বীপিয় ভারতের প্রান্তভাগ ও অস্ট্রেলিয়া |
| নিগ্রো | ৭৪-৭০ | কোঁকড়ানো | ঘোর কালো | দঃ আফ্রিকা, মালানসিন ও কাঠালাভি |
| নেগ্রিটো | প্রায় ৮০ | কোঁকড়ানো | সাধারণত কালো | আফ্রিকা ও দঃ পূঃ এশিয়ার দুর্ভেদ্য অংশ। |

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

বর্তমানে প্রধানত যে সব আদিম জাতি ও উপ-জাতির সমন্বয়ে ভারতের জনসংখ্যা গড়ে উঠেছে সেগুলো হল—

**1. নেগ্রিটো (Negrito) :**

Hutton-এর মতে, ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী হল নেগ্রিটো জাতি। S. K. Chatterjee ও S. M. Katre মনে করেন যে, নেগ্রিটোরা আফ্রিকা থেকে এদেশে এসেছিলেন এবং তাঁদের ভাষা এদেশে চালু করেছিলেন।

(i) **ভারতীয় উপজাতি :** নেগ্রিটো জাতি থেকে উদ্ভূত বংশধরদের মধ্যে উত্তর পূর্বের আঙ্গামী নাগা ও বিহারে রাজমহল পাহাড়ের বাগদী, আন্দামানের জারোয়া, দঃ ভারতের কাদার, ইরুলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(ii) **বসতি :** এ সব উপজাতি সাধারণত আন্দামনা দ্বীপপুঞ্জ, নীলগিরি পর্বত, কোচি, পালনি পর্বত প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে।

(iii) **দৈহিক গঠন :** নেগ্রিটো জাতির চেহারার বৈশিষ্ট্য হল—খর্বাকৃতি, গায়ের রং কালো, বা ঘন বাদামী, উঁচু কপাল, কুঞ্চিত চুল, মোটা-চওড়া নাক, মোটা ওল্টানো ঠোঁট ও চওড়া মাথা।

**2. প্রোটো-অস্ট্রেলিয় জাতি (Proto-Austroloid) :**

Hutton-মনে করেন যে, প্রোটো-অস্ট্রেলিয়রা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন। নেগ্রিটোদের পরেই তারা এদেশে আসেন। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, প্রোটো অস্ট্রেলিয়রা ভূমধ্যসাগরীয় অধিবাসীদের সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। ভারতে প্রবেশ করে এই জাতি নেগ্রিটো জাতির মানুষদের তাড়িয়ে দেন ও দুর্গম অঞ্চলে তাদের বাস করতে বাধ্য করেন।

**ভারতীয় উপজাতি :** বেদ, মালবেদ, ইরুলা ও শোলাগা হল প্রোটো-অস্ট্রেলিয়দের প্রকৃত বংশধর। এছাড়া, ভীল, কোল, বাদাগা, কোরবা, মুণ্ডা, ভূমজী, মালপাহাড়ী, চেঞ্চু, কুরুম্বা, মালয়ান, এরুভা, সাঁওতাল, ওঁরাও, বীরহোর, শবর, লোধা প্রভৃতি উপজাতি প্রধান।

**বসতি :** মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে প্রোটো-অস্ট্রেলিয়দের আধিক্য দেখা যায়। সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি উপজাতি ছোটনাগপুর অঞ্চলে, মধ্য ভারতে চেঞ্চু, শবর, বীরহোর উপজাতি, দঃ ভারতে কুরুম্বা, মালয়ান প্রভৃতি উপজাতি বসতি স্থাপন করেছেন।

**দৈহিক গঠন :** প্রোটো-অস্ট্রেলিয়দের চেহারা নেগ্রিটোদের সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্যযুক্ত। তবে তাঁদের চুল নেগ্রিটোদের মত কুঞ্চিত নয়। এছাড়া উঁচু কপাল, চওড়া মোটা নাক, খর্বাকার আকৃতি, চওড়া মাথা ও সুস্পষ্ট ভ্রু এঁদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য। এঁদের গায়ের রং কালো বা বাদামী।

**3. মঙ্গোলীয় জাতি (Mongoloid) :**

Risley-বলেছেন যে "On its northern and eastern frontier, India marches with the great Mongoloid region of the earth." বেশিরভাগ নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন যে চীন থেকে মঙ্গোলীয় জাতি উত্তর ও পূর্ব হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিপথ দিয়ে এদেশে এসেছেন। Hutton-এর মতে, মাঙ্গোলীয়দের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে মায়ানমারে। এছাড়া ওশিয়ানিয়া থেকে কেরালা ও তামিলনাড়ুতে মঙ্গোলীয়দের প্রবেশের প্রমাণ মেলে।

মঙ্গোলীয় জাতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) **প্যালিও মঙ্গোলীয় :** প্যালিও মঙ্গোলীয়দের আবার দু'টি উপবিভাগে ভাগ করা যায়—(a) চওড়া মাথাযুক্ত (লেপচা, টোডা, রাভা প্রমুখ) ও (b) লম্বা মাথাযুক্ত (নাগা, খাসি, লিম্বু)। হিমালয়ের আসাম ও মায়ানমার সীমান্তে এঁদের দেখা মেলে।

(iii) **তিব্বতী মঙ্গোলীয় :** এঁরা প্রধানত তিব্বত থেকে এসেছে। প্রধানত ভূটান ও সিকিম অঞ্চলে, উত্তর-পশ্চিম হিমালয় ও ট্রান্স হিমালয় অঞ্চলে এঁরা বসবাস করেন।

**ভারতীয় উপজাতি :** গারো, খাসি, জয়ন্তীয়া, লেপচা, চাকমা, নাগা ও ডাফলা মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্গত।

**বসতি :** লাদাক, সিকিম, অরুণাচলপ্রদেশ ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এঁদের বসতি রয়েছে।

**দৈহিক গঠন :** মঙ্গোলীয়দের চেহারার বিশেষত্ব হল—গোল ও চওড়া মাথা, চ্যাপ্টা মুখ, উঁচু গাল, মাথার চুল সোজা, রং ফর্সা, চোখে মঙ্গোলীয় ভাঁজ ও মুখে বা গায়ে লোমের অভাব।

4. **দ্রাবিড় জাতি (Dravidians) :**

Risley-র মতে দ্রাবিড় জাতি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ও আদিম জাতি। বিন্ধ্য পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন পর্বত, মালভূমি ও বন্ধুর সমভূমি অঞ্চলে দ্রাবিড়রা বসবাস করতেন। ইন্দো আর্য বা মঙ্গোলীয়দের সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও তাঁদের জাতি বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ছিল।

**বসতি :** পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল, উপদ্বীপিয় অঞ্চল, আরাবল্লী পর্বত, রাজমহল পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলে দ্রাবিড়েরা বর্তমানে বাস করেন। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষদের একটি নিজস্ব ভাষা আছে, যা দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত।

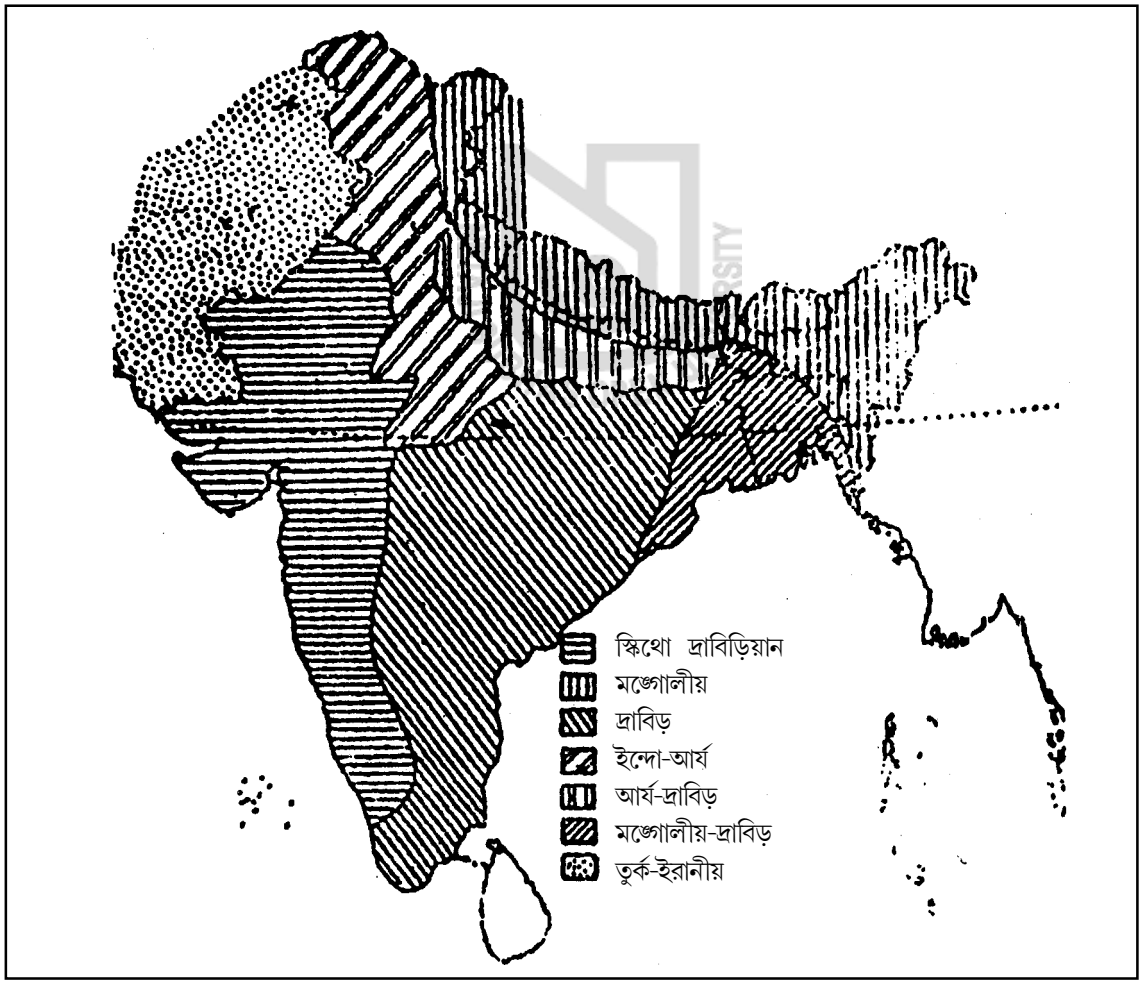


চিত্র 1.10 : রিসলের মতানুসারে ভারতে জাতির বন্টন

**5. ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতি (Meditereranean) :**

২য় ও ৩য় খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক গঠনের ক্ষেত্রে এই জাতির অবদান অপরিসীম। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার আদি রূপ এঁদের দ্বারাই সৃষ্ট এঁরা ভারতে হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতা খনন করে জানা যায় যে ভূমধ্যসাগরীয়রা সিন্ধু সভ্যতার প্রধান স্থপতি। তারা প্রথমে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে কৃষিকার্য শুরু করেন।

**দৈহিক গঠন :** এঁদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য হল—মাঝারি গঠন, লম্বা মাথা ও গায়ের রং কালো।

**6. ব্র্যাসিসেফেলস্ :**

ব্রাসিসেফেলস্ জাতিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) অ্যালপিনয়েড

(ii) দিনারিক

(iii) আর্মেনয়েড

এই জাতির মানুষেরা বড় মাথাযুক্ত। কুরগি ও পারসি উপজাতির লোকেরা এই প্রজাতিভূক্ত।

**7. নর্ডিক জাতি (Nordics) :**

বহিরাগত বিভিন্ন জাতির মধ্যে নর্ডিকরাই সর্বশেষে ভারতে প্রবেশ করেছেন। তাঁরা ২য় খ্রিস্টপূর্বাব্দে এদেশে এসেছিলেন। তারা ছিলেন আর্য ভাষাভাষী। ভারতের প্রধানত উত্তর-পশ্চিমাংশে এঁদের বসতি গড়ে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী পাকিস্তান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানে এই জাতির প্রাধান্য দেখা যায়। সাধারণত উত্তর ভারতের, বিশেষ করে পাঞ্জাবের উচ্চবর্ণের মানুষেরা নার্ডিক জাতির বংশধর। এঁদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হল—লম্বা মাথা, ফর্সা রং, উঁচু নাক এবং সুগঠিত দেহ।

**উপসংহার :** ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন "ভারত নৃতত্ত্বের যাদুঘর।" রবীন্দ্রনাথের কথায়ও তার প্রতিধ্বনি আমরা পাই—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, এসো শক হুন

..........................................................................

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

বস্তুতপক্ষে, ভারতে বহুবিধ জাতি দেখা যায়। সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ভাষা সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে এক সংস্কৃতি দেখা যায়, যদিও আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন বঞ্চনার কারণে আমাদের জাতীয় সংহতিতে আঘাত হানার চেষ্টা চলছে।

## 4.11 সাক্ষরতা ও শিক্ষা (Literacy and Education)

The United Nations has defined literacy as the ability of a person to read and write, understanding a short simple statement on his everyday life" Bhande and Kanitkar, 1985, ভারতীয় জনগণনা দপ্তরের মতে যদি কোন ব্যক্তি যে কোন ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারেন তাকে সাক্ষর বলা যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবসমাজ উন্নয়ন মন্ত্রক ও পরিকল্পনা কমিশন ঠিক করেছে যে 9 বছর ও তার বেশি

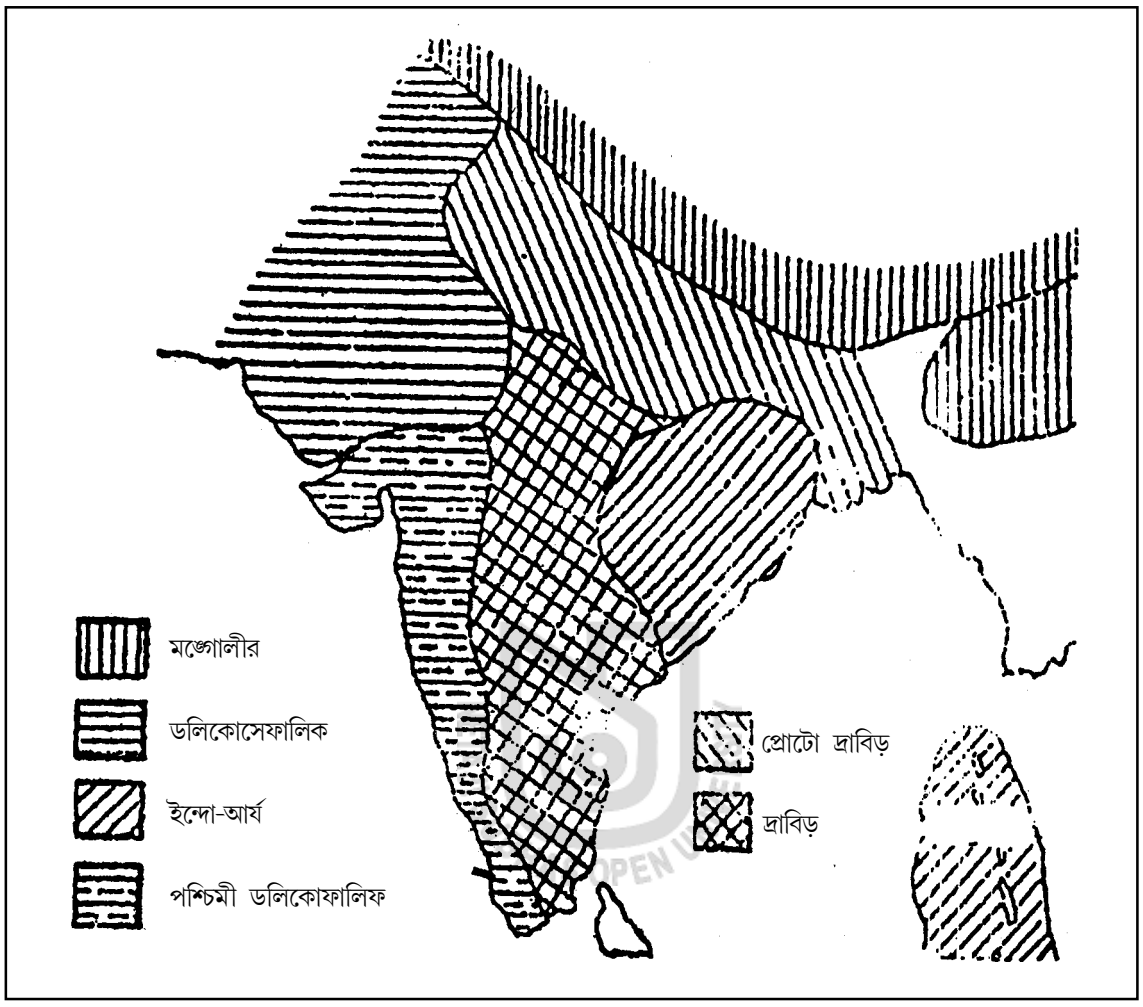


চিত্র 1.11 : হ্যাটনের মতে ভারতে জাতির বণ্টন

বয়সীদের সাক্ষর হিসেবে গণ্য করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল শিক্ষা কি, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, বা পৃথিবীতে বয়স্ক শিক্ষিতের হার কিরূপ?

শিক্ষা হল মানব সমাজের একটি মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া। শিক্ষা বলতে অ্যারিস্টটল বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে বড় করে তোলা বা সাফল্যের সঙ্গে মানসিকতা গড়ে তোলা "According to Aristotle, to educate meant to develop man's faculties, especially his mind so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, beauty and goodness" (Vidy Bhusan & Sachdeva)। প্রিয় দার্শনিক প্লেটো (Plato)-র মতানুসারে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন। দার্শনিক রাসেল (Bertrand Russel)-র মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের সৎ চরিত্র গঠন করা। স্পেনসার (Herbert Spencer)-এর মতানুসারে, শিক্ষার লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ জীবনের সামগ্রিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব কিছু করার জন্য যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা।

ভারতীয় দার্শনিক অধ্যাপক সর্বপল্লীরাধাকৃষ্ণণ তাঁর University Education Commission-র প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছেন, "The purpose of all education, it is admitted by thinkers of East and West, is to provide a coherent picture of the universe and integrated way of life."

শিক্ষা মানুষকে স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা দেয়। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বোঝার ক্ষমতা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জন্মায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজের ঐক্য বা সংহতিকে সুদৃঢ় করা। মানব সম্পদের বিকাশের জন্য শিক্ষার অবদান অপরিসীম।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, শিক্ষা আয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা না থাকলে আমোদপ্রমোদ, গণতান্ত্রিক অধিকার, উপার্জন ইত্যাদি সব কিছুরই দরজা বন্ধ। তাই তাদের জীবনকুশলতার পরিমাণ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষার দু'টি দিক আছে। (1) সাধারণ শিক্ষা যা মানুষকে সাধারণভাবে জীবনে চলবার পথে সাহায্য করে। (2) অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন হয়। উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু যথেচ্ছভাবে ব্যয় করলেই শিক্ষা প্রসার লাভ করবে একথা বলা যায় না।

**শিক্ষার স্তর বিন্যাস আছে :** (a) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মানুষ কিছু ভাষা জ্ঞান, সংখ্যা গণনা ইত্যাদি আয়ত্ত করে। শৈশবেই এই শিক্ষা শেষ হয়। সেজন্য কোনও দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করার সময় সেখানে 6 থেকে 11 বা ওইরকম বয়ঃগোষ্ঠীর বালক বালিকার সংখ্যা কত তা অবশ্য জানতে হয়।

মাধ্যমিক স্তর পেরোলে মানুষ জীবন পথে চলবার কিছুটা পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি এই স্তর পার হয় তাহলেই সেই সমাজ শিক্ষিত সমাজ রূপে পরিগণিত হতে পারে। (c) মাধ্যমিক স্তরের পরে আসে উচ্চ শিক্ষার স্তর। এখানেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশ্ন ওঠে।

উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীম। দরিদ্র দেশে সাধারণ শিক্ষাস্তর পার হবার সুযোগ অধিকাংশ লোক পান না। তাই অনেকেই এসব দেশে উচ্চশিক্ষার খাতে বেশি ব্যয় করার পক্ষপাতী নন।

শিক্ষার মান ও যোগ্যতার কথা বাদ দিয়ে সাক্ষরতাকে যদি শিক্ষার মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়, তবে দেখা যায় যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাক্ষরতা-জ্ঞানসম্পন্ন পরিমাণ জনতার হার শতকরা ৩০ জন মাত্র। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে শিক্ষার এই নিম্নমান সম্পদ সৃষ্টির পথে অন্তরায়। সংখ্যার দিক থেকে সেখানে মানবসম্পদ অনেক; কিন্তু গুণগত মানের বিচারে তা খুব নগণ্য। সুতরাং মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য সবার আগে দরকার শিক্ষার বিস্তার (গুহ 1987)। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষই নিরক্ষর। অবশ্য সাক্ষরতা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত নির্ভরশীল পরিসংখ্যান নেই। এমন কি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও পৃথিবীতে সাক্ষরতা বন্টন নিয়ে কোন মানচিত্র প্রকাশ করে নি (Hussain, 2002)। যাই হোক, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা চলে যে আফ্রিকায় সবচেয়ে কম সংখ্যক মানুষ শিক্ষিত। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারী শিক্ষার হার খুব কম। আফ্রিকার চেয়ে এশিয়ায় সাক্ষরতার হার সামান্য বেশি, যদিও তা 30 শতাংশের কম। দক্ষিণ আমেরিকায় অবশ্য সাক্ষরতার হার তুলনামূলকভাবে বেশি (চিত্র 1.12)। আবার শহর ও গ্রামের শিক্ষিতের হারেও তফাৎ আছে।

পৃথিবীতে নিরক্ষরের সংখ্যা সম্ভবত ভারতেই সবচেয়ে বেশি (28.1 কোটি)। গোটা বিশ্বের 30 শতাংশ বয়স্ক নিরক্ষরের দেশ এই ভারতভূমি। আবার পৃথিবীর 22 শতাংশ নিরক্ষর শিশুও ভারতীয়। বর্তমান বাৎসরিক জনসংখ্যা

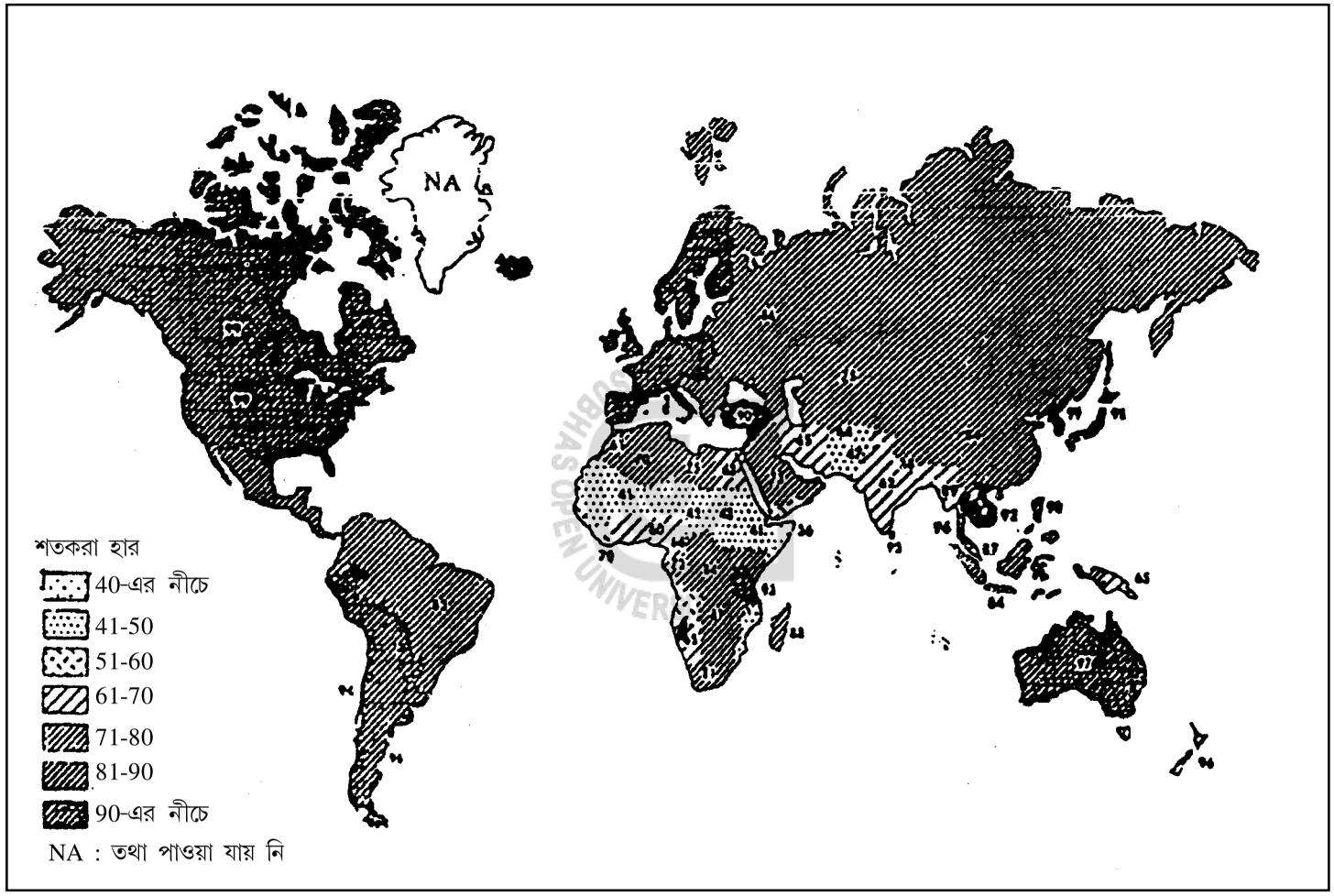


চিত্র 1.12 : প্রাপ্তবয়স্কপুরুষ শিক্ষিতের হার, 1995

বৃদ্ধির হার আগামী দিনে এই অবস্থাকে আরও সঙ্গীণ করে তুলবে। আরও লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষের 60 শতাংশ নারী-ই নিরক্ষর। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে চীন আজ ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। UNESCO-র একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, ভারত 87টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 50 তম স্থানে রয়েছে।

নাইজার, নেপাল, সেনেগাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নাইজারে মাত্র 13.6 শতাংশ, নেপাল 27.5 শতাংশ, সেনেগালে 33.2 শতাংশ, পাকিস্তানে 37.8 শতাংশ এবং বাংলাদেশে 38.1 শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। আবার নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের পার্থক্য লক্ষণীয় (সারণি 1)। শিক্ষার এই নিম্নমানের জন্য উন্নয়নশীল দেশের লোকেরা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন নন।

**সারণি**

**স্কুল-পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বয়স ৬-১৭ বছর)**

| শতাংশ | দেশ |
|---|---|
| 96% বা তার বেশি | কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে। |
| 86-89% | চিন, ইতালি, অস্ট্রিয়া, মেক্সিকো। |
| 76-79% | তুরস্ক, ইরাক, টিউনিশিয়া। |
| 60-69% | ভারত, মায়ানমার, নেপাল, সৌদি আরব। |
| 60%-এর কম | পাকিস্তান, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ইথিওপিয়া, জাইরে। |

*Source : Atlas of environment, year*

**প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে শিক্ষিতের হার**

| শতাংশ | দেশ |
|---|---|
| 75% বা তার বেশি | কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে। |
| 80-94% | পর্তুগাল, তুরস্ক, মেক্সিকো, ব্রাজিল। |
| 60-79% | চিন, সৌদি আরব, লিবিয়া। |
| 40-59% | ভারত, মিশর, আলজিরিয়া। |
| 40%-এর কম | পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল। |

*Source : Atlas of Environment, year*

প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে শিক্ষিতের হারে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে

| দেশ | প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিতের হার | | |
|---|---|---|---|
| | পুরুষ (%) | নারী (%) | মোট (%) |
| উন্নত দেশ | | | |
| জার্মানি | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| ব্রি. যুক্তরাজ্য | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| ফ্রান্স | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| জাপান | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| উন্নয়নশীল দেশ | | | |
| ভারত | 65.5 | 37.7 | 52.0 |
| বাংলাদেশ | 49.4 | 26.1 | 38.1 |
| পাকিস্তান | 50.0 | 24.4 | 37.8 |

*Source : Human Development Report : 1996*

এবার প্রাথমিক শিক্ষার কথায় আসা যাক।

**সারণি 1.11.1**

**উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা**

| দেশ | স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার অনুপাত % | চতুর্থশ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা চালাতে পারে % | শিক্ষক/শিক্ষার্থী অনুপাত | মোট সাক্ষরতার হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| মেক্সিকো | 98.0 | 81 | 31 | 87.3 |
| ব্রাজিল | 88.0 | 47 | 23 | 81.1 |
| ইন্দোনেশিয়া | 96.7 | 89 | 23 | 77.0 |
| চিন | 100.0 | 86 | 22 | 73.0 |
| নাইজিরিয়া | 59.3 | 67 | 41 | 50.7 |
| মিশর | 91.0 | 99 | 23 | 48.4 |
| ভারত | 66.3 | 61 | 46 | 48.2 |
| পাকিস্তান | 29.3 | 59 | 41 | 34.8 |
| বাংলাদেশ | 62.9 | 52 | 63 | 35.3 |

*(সূত্র : মনোরমা ইয়ারবুক, 1996)*

সারণি (নং 1.11.1) থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেই স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার অনুপাত, বা শিক্ষক/শিক্ষার্থীর অনুপাত কিংবা মোট সাক্ষরতার হারেই প্রভেদ রয়েছে।

বয়স্ক শিক্ষার হার (Adult literacy rate) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেড়ে বর্তমানে গড়ে 70 শতাংশ; কিন্তু দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে 90 শতাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার 51 শতাংশের মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়ে গেছে (চিত্র 1.13)।

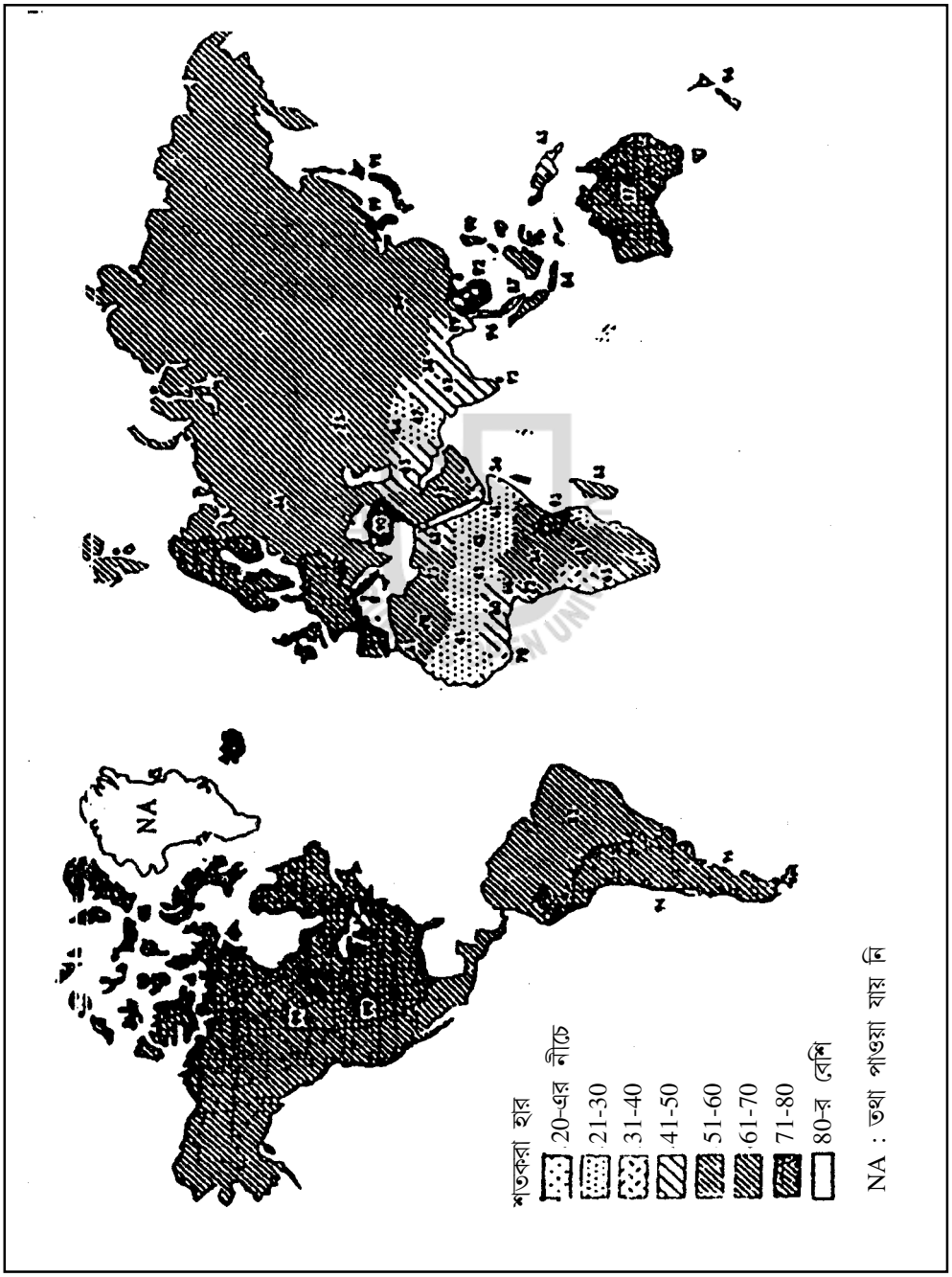


চিত্র 1.13 পৃথিবী : প্রাপ্তবয়স্ক নারী শিক্ষার হার, 1995

নারী শিক্ষার হারে (female literacy) প্রচুর উন্নতি করেছে মধ্য আফ্রিকা ও আরবের দেশগুলো (44 শতাংশ)। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার হার বাড়লেও নারী শিক্ষার দিকে এখানকার দেশগুলো এখনও পিছিয়ে আছে (55 শতাংশ)। অপরদিকে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার হার প্রায় 100 শতাংশ, তবে নতুন কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এসব দেশের বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের দক্ষতার হার খুবই কম। কারিগরি শিক্ষায় অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে পারে—সেখানকার অর্ধেক ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান পড়ার দিকে ঝোঁকে।

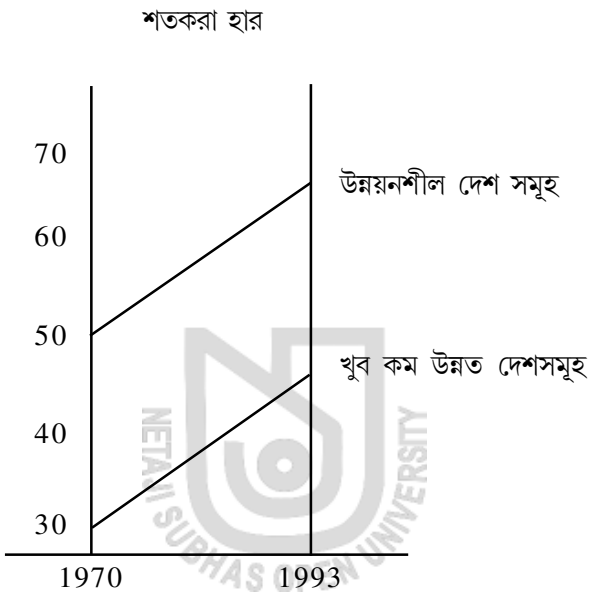


চিত্র 1.14 : প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হারে উন্নতি

## 4.12 প্রশ্নাবলী

(১) লিঙ্গ অনুপাত বলতে কী বোঝায়? পৃথিবীর লিঙ্গ অনুপাত বণ্টনের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

(২) বয়স গ্রন্থনা বলতে কী বোঝায়? বয়স গ্রন্থনাকে কী কী উপাদান প্রভাবিত করে?

(৩) বয়স গ্রন্থনা বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কী কী?

(৪) বয়স পিরামিড কী? কী কী উপাদান বয়স পিরামিডের আকৃতিকে প্রভাবিত করে?

(৫) জনসংখ্যার অর্থনৈতিক গঠন সম্পর্কে আলোচনা করুন। কর্মশক্তির (Working force) আয়তন (Magnitude) নির্ধারক জনমিতি উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(৬) পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম সম্বন্ধে একটি ধারণা দিন।

(৭) পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।

## মাঝারি প্রশ্নাবলী

**নীচের বিষয়গুলির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :**

১। লিঙ্গ অনুপাত

২। বয়স গ্রন্থনা

৩। বয়স পিরামিড

৪। সক্রিয় জনতা

৫। কর্মশক্তি

৬। পেশাগত গঠন

৭। জনসংখ্যা গঠনের উপাদান হিসাবে ভাষা।

৮। লিঙ্গ পরিমাপের বিভিন্ন সূত্র।

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

**নীচের বিষয়গুলি কী?**

১। অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনতা

২। বয়স গ্রন্থনা

৩। লিঙ্গ অনুপাত

৪। বয়স লিঙ্গ পিরামিড

৫। লিঙ্গ পরিমাপে।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

[পাঠোপকরণের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়/একক থেকে উত্তরগুলি সংগ্রহ করুন।]

# একক 5 ❑ পরিযান (Migration)

গঠন


**5.1** প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

**5.2** সংজ্ঞা

**5.3** পরিযান পরিসংখ্যান

**5.4** পরিযানের প্রকাভেদ বা শ্রেণিবিভাগ

**5.4.1** জনবসতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে

**5.4.2** মাত্রা অনুসারে

**5.4.3** দিক অনুসারে

**5.4.4** স্থায়িত্ব অনুসারে

**5.4.5** পরিযায়ী জনগণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে

**5.4.6** বাধ্যবাধকতা অনুসারে

**5.4.7** সাংস্কৃতিক ধরন অনুসারে

**5.4.8** অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনুসারে

**5.5.** প্রব্রজন ও মানুষ

**5.6** পরিযানের সূত্রসমূহ

**5.6.1** **Revenstein**-র মতবাদ

**5.6.2** **Lee**-র মতবাদ

**5.6.3** **Zelinsky**-র মডেল

**5.7** পরিযানের বিভিন্ন কারণসমূহ

**5.8** পরিযানের প্রয়াস-আকর্ষণ মতবাদ

**5.9** প্রবহমানতার ফলাফল

**5.10** অনুশীলনী


## 5.1 প্রস্তাবনা

পৃথিবীতে সম্পদের বণ্টনে অসাম্য রয়েছে, তেমনি প্রকৃতি পৃথিবীকে কত সাজে না সাজিয়েছেন, সুযোগ সুবিধের পরিমাণও এক এক স্থানে এক একরকম। তাই দেখি ঋতুভেদে ও উচ্চতানুযায়ী মানুষ বছরের এক সময় এক স্থানে

আশ্রয় নিচ্ছেন, অন্য সময় আরেক স্থানে। কিংবা কপর্দকহীন মানুষ সম্পদশালী হওয়ার আশায় বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। এক বিদেশী লেখকের লেখনীতে সুন্দরভাবে এই চিত্রটি ধরা পড়েছে।

"To the west, to the west, to the land of the free"
Where mighty Missouri rolls down to the sea :
Where a man is a man if he's willing to toil,
And the humblest may gather the fruits of the soil.
Where children are blessings and he who hath most
Has aid for his fortune and riches to boast.
Where the young may, exult and the aged may rest.
Away far away, to the land of the west.
Away, far away, let us hope for the best.
And build up a home in the land of the west"

কিংবা রবিকবির লেখাতে জ্ঞান পিপাসা মেটাবার এই চিত্রটিও মনকে খুব নাড়া দেয়।

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি রয়ে গেল অগোচরে।

এককথায় পরিযান হল মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ খাদ্য, নিরাপত্তা, সুযোগ সুবিধে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজে, জ্ঞান পিপাসা মেটাবার জন্য কিংবা বিভিন্ন ঋতুতে ফসলের সুযোগ নিতে এত স্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমণ করেছেন। উদ্দেশ্যহীনভাবে মানুষ বিচরণ করে না। এমন কী, যাযাবর বৃত্তির পেছনেও একটা উদ্দেশ্য কাজ করে, তা হল পালিত জীবদের জন্য জল ও খাদের সন্ধান, কারণ পালিত পশুগুলোই হল তাদের জীবিকার মাধ্যম।

**উদ্দেশ্য :**

আপনারা এই এককটি পড়ে জানতে পারবেন—

- পরিযান কাকে বলে?
- পরিযান কত প্রকার হয়?
- বিশেষ বিশেষ পরিযান কী কী?
- মানুষ কী কী কারণে পরিযান করে?
- এ সম্পর্কে কী কী মতবাদ আছে?
- পরিযানের ফলাফল কী কী?

## 5.2 সংজ্ঞা

The Dictionary of Human Geography-র মতে পরিব্রাজন হল—"Permanent or semi-permanent change of residence of an individual or a group of people." পরিব্রাজন বা Migration বলতে সাধারণত কোন জায়গায় বহুদিন স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে মানুষের স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচলন বা বিচলনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। "Migration is the act or process of moving from one

place to another with the intent of staying at the destination permanently or for a relatively long period of time." সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে পরিযাজন হল—"Change of usual place of residence with a view to permanently reside elsewhere (স্থায়ীভাবে থাকবার উদ্দেশ্য এক স্থান থেকে আর এক স্থানে সচরাচর ব্যবহৃত বাসস্থানের পরিবর্তন)। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, তাকেই প্রব্রজন আমরা বলব যখন কোন শক্তি স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে পূর্বের বাসস্থান ও প্রশাসনিক অঞ্চল ত্যাগ করে নতুন প্রশাসনিক অঞ্চলে আগমন করেন। আমরা তাদেরকেই বিচলনকারী বলব যারা বাসস্থান পরিবর্তন করেন এবং এই পরিবর্তন করতে গিয়ে তাঁরা পুরাতন প্রশাসনিক অঞ্চলেই থেকে গেলেন না নতুন প্রশাসনিক অঞ্চলে এলেন তা বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ সব প্রব্রজনই বিচলন, কিন্তু কিছু কিছু বিচলনই প্রব্রজন।

বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এবং প্রথাগত বৃত্তির পরিবর্তে মানুষ আধুনিক বৃত্তি গ্রহণে অধিক মাত্রায় আগ্রহান্বিত হবার ফলে প্রতিটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে প্রব্রজনের মাত্রা বেড়েছে। এই সব কারণে সাধারণ চলাচল বা বিচলন (movement) এবং প্রব্রজনের মধ্যে একটি ভেদরেখা টানা প্রয়োজন।

## 5.3 পরিযান পরিসংখ্যান (Migration Data)

পরিযানের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝলাম যে এটি হল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে মানুষের স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধা। কিন্তু কত সংখ্যক মানুষ এর সঙ্গে জড়িত বা কোথা থেকে তাদের এখানে আগমন বা কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল, এই ধরনের পরিসংখ্যান নিয়ে এবার আলোচনায় আসা যাক। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে এই ধরনের তথ্য পাওয়া আর বিশ্লেষণের জন্য তার ব্যবহারে অসুবিধে আছে। কারণ একটি সমস্যা হল স্বল্পস্থায়ী ও অস্থায়ী প্রবহমানতার মধ্যে পার্থক্য টানা। যেমন কোন নবাগত ব্যক্তিকে (newcomer) স্থায়ী বাসিন্দা বলে গণ্য হতে গেলে তাঁকে কতদিন ধরে নতুন স্থানে বাস করতে হবে? সত্যি বলতে কি, প্রবাসী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (statistics) ব্যবহারে খুব সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কারণ পরিযানের সংজ্ঞা ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এক এক দেশে এক এক রকম।

পরিযান পরিসংখ্যান ব্যবহারে অনেক বাধা আছে। বিশেষ করে সেইসব প্রবাসীকে নিয়ে যাঁরা দেশের মধ্যেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বাস করেন। এইসব ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকৃত প্রবহমানতাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা মুশকিল। যে সব দেশ প্রতিটি নাগরিক সম্পর্কে তথ্য রাখে, কেবলমাত্র তারা দেশের সব লোকের গতি-প্রকৃতির হদিশ দিতে পারেন। যে সব দেশের লোকগণনার (census) পরিসংখ্যান নির্ভুল ও বিশদ, সেখানকার জনগণনা-দপ্তরের প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে পরিযান সম্পর্কে ধারণা করতে পারা যায়। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই এই ধরনের তথ্য প্রতি ১০ বছর অন্তর প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১০ বছরের মধ্যবর্তী কোন বছরের পরিযান সম্বন্ধে তথ্য পাওয়ার জন্য অনুমানের আশ্রয় বা নমুনা সমীক্ষা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কিছু কিছু তথ্যের ব্যবহার এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, যেমন সময় সময় প্রকাশিত ভোটদাতাদের তালিকা, কৃষক সমিতির সদস্য তালিকা বা পাশ্চাত্য দেশে সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান (Social Security Organisation) থেকে প্রাপ্ত তথ্য। কিন্তু এই সব তালিকা থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মস্থান ও চলতি বা পুরোনো ঠিকানা ছাড়া অন্য কিছু হদিশ পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করলে বোধ হয় বেশি বলা হবে না যে নরওয়েতে প্রতি কমিউনে (commune) একটি নিবন্ধগ্রন্থ (register) আছে। তাতে কোন ব্যক্তি কোন জেলা ছেড়ে যাচ্ছেন বা কোন জেলায় বাস করতে আসছেন, তা নথিভুক্ত (registration) করা থাকে, কিন্তু অন্য দেশে এই রকম সরাসরি গণনার ঘটনা দুর্লভ।

## 5.4 পরিযান বা পরিব্রাজনের প্রকারভেদ (Type of Migration)

জনগণ কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছেন (শহর থেকে না গ্রাম থেকে শহরে না গ্রাম থেকে গ্রামে), কতদূর যাচ্ছেন, কতদিনের জন্য যাচ্ছেন, কি ধরনের অর্থনৈতিক কাজের জন্য লোক বাইরে যাচ্ছেন, পরিব্রাজনকারীরা স্বেচ্ছায় বাইরে যাচ্ছেন না বাধ্য হয়ে বাইরে যাচ্ছেন ইত্যাদির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আমরা পরিযানকে নিম্নলিখিত আটটি প্রধান ভাগ ও কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করতে পারি। নীচে সেই ভাগগুলো দেখানো হল।

**পরিব্রাজনের শ্রেণিবিভাগ**

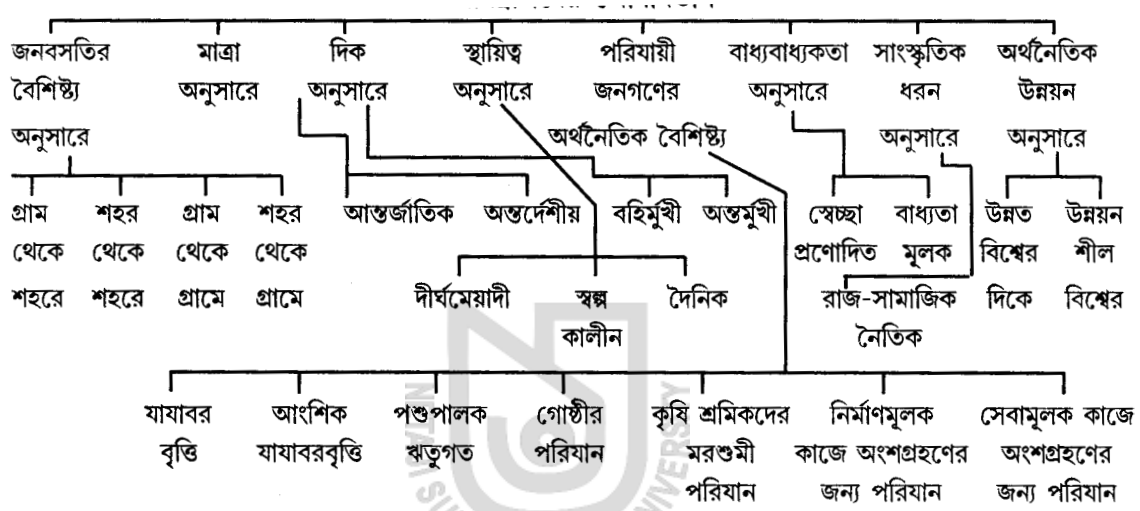


| ভারত : জন্মস্থান অনুযায়ী পরিযানকারী, 1981 | | | |
|---|---|---|---|
| প্রবাহ | মোট পরিযায়ীদের কত শতাংশ | মোট পরিযায়ীদের % পুরুষ | মোট পরিযায়ীদের % মহিলা |
| গ্রাম থেকে গ্রাম | 65.24 | 13.30 | 51.94 |
| গ্রাম থেকে শহর | 17.60 | 8.77 | 8.83 |
| শহর থেকে শহর | 11.20 | 5.07 | 6.13 |
| শহর থেকে গ্রাম | 5.96 | 2.04 | 3.92 |
| | 100.00 | 29.18 | 70.82 |

(১) **গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজন (Rural-Urban migration) :** বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি জমান। এই প্রকার পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয়, স্বল্পমেয়াদী বা ঋতুভিত্তিক হতে পারে। সাধারণ জীবিকার উদ্দেশ্যে বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলোতে এই ধরনের পরিব্রাজন লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে প্রায় 60% পরিব্রাজন এই শ্রেণির অন্তর্গত।

**গ্রাম থেকে শহরে** (Rural–Urban migration) : পরিব্রাজনের কারণগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

**(ক) অর্থনৈতিক কারণ :**

(১) প্রান্তিক কৃষি এবং ছদ্ম বেকারত্ব গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে পরিব্রাজনে সাহায্য করে।

(২) শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঋতুগত তারতম্য এবং ফসল কাটার পরে সাময়িক কর্মহীনতা গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজনের অন্যতম কারণ।

(৩) গ্রামাঞ্চলে জীবিকা অর্জনের অল্প সুযোগ এবং টার্সিয়ারি (বা তৃতীয় স্তরের) অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্বল্প আশা গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজনে সাহায্য করে।

**(খ) সামাজিক কারণ ঃ** বিয়ে এবং বিয়ের পরের পারিবারিক অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে শহরাভিমুখী পরিব্রাজন ঘটায়।

**(২) শহর থেকে শহরে পরিব্রাজন (Urban to Urban migration) :** এর দ্বারা এক শহর থেকে অন্য শহরে মানুষের পরিব্রাজনকে বোঝায়। এই প্রকার পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয় বা আন্তঃরাজ্য, স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী বা ঋতুভিত্তিক ও ধারাবাহিক হতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং নতুন নতুন অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষ এক শহর থেকে আর এক শহরে পরিযান করেন। ভারতবর্ষে প্রায় 10% শতাংশ পরিব্রাজন এই ধরনের। উন্নত দেশগুলোতে শহর থেকে শহরে পরিব্রাজনের প্রবণতা বেশি। শহর থেকে শহরমুখী পরিব্রাজন কারণগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

**(ক) অর্থনৈতিক কারণ ঃ**

(১) এক শহর থেকে অন্য শহরে বেশি আয়ের সুযোগ পাওয়া যায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ও ব্যবসায়ীরা এই ধরনের পরিব্রাজনে অংশগ্রহণ করেন।

(২) এক শহর থেকে অন্য শহর অনেক সময় সুবিধাজনক শর্তে বসবাসের সুযোগ মেলে।

(৩) যে শহরে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধে বেশি, সেখানে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের সুযোগ স্বাভাবিক ভাবেই বেশি। তাই মানুষজন সেখানে পরিযান করেন।

**(খ) সামাজিক কারণ ঃ**

(১) অনেক সময় সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যান। ডাক্তার, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী শ্রেণির মানুষজনের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা বেশি।

(২) উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক সময় মানুষ জন এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিব্রাজন করেন।

(৩) বৈবাহিক সূত্রেও এই পরিযান ঘটে।

**(গ) রাজনৈতিক কারণ ঃ** রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা শহর থেকে শহরাঞ্চলে পরিব্রাজন করে।

**(৩) গ্রাম থেকে গ্রামে পরিব্রাজন (Rural to Rural migration) :** এর দ্বারা এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে পরিব্রাজনকে বোঝায়। এই ধরনের পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয়, স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী বা ঋতুভিত্তিক হতে পারে। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলোতে গ্রাম থেকে গ্রামমুখী পরিব্রাজন লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর পরিব্রাজন প্রায় 10%। এক্ষেত্রে পরিব্রাজনের কারণ হল নিম্নরূপ—

**(ক) অর্থনৈতিক কারণ ঃ** কৃষিভিত্তিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ যে গ্রামে বছরের যে সময়ে বেশি প্রান্তিকভাবে অনগ্রসর গ্রামাঞ্চল থেকে বছরের সেই সময়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পরিব্রাজন ঘটে। যেমন, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে কৃষিশ্রমিক পাঞ্জাব, হরিয়ানা অঞ্চলে গম কাটার জন্য বছরের নির্দিষ্ট সময়ে চলে যান। প্রতি বছরই এরকম ঘটনা ঘটে, যাকে আমরা স্বল্পমেয়াদী ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজন বলি।

**(খ) সামাজিক কারণ ঃ** বিয়ের দরুণ মেয়েরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘরসংসার পাততে চলে যান। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের পরিব্রাজনের চিত্রটি এর বিপরীত; উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসিয়া, নাগা উপজাতি সমাজে ছেলেরা বিয়ের পরে মেয়ের বাড়ি চলে যান।

● **শহর থেকে গ্রামে পরিব্রাজন (Urban to Rural Migration) :** এটির দ্বারা শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে পরিব্রাজনকে বোঝায়। এটি অন্তর্দেশীয়, স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী বা ঋতুভিত্তিক হতে পারে। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নতশীল দেশগুলোতে বিশেষ পরিস্থিতিতে শহর থেকে গ্রামমুখী পরিব্রাজন ঘটে। সরকারি আদেশে বদলি (transfer) অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার পরিব্রাজনের অনুঘটক। ভারতের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিব্রাজন 10 শতাংশ মত।

**শহর থেকে গ্রামে পরিব্রাজনের কারণ :**

**(ক) অর্থনৈতিক কারণ :**

(১) গ্রামাঞ্চলে সেবামূলক কাজকর্মের সুযোগ।

(২) চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর গ্রামের বাড়িতে আয়ের চেষ্টা।

(৩) কৃষি সম্পর্কিত ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ।

(৪) খালি-পা ডাক্তারদের (bare-foot doctor) ক্ষেত্রে গ্রামে আয় বৃদ্ধির সুযোগ।

**(খ) সামাজিক কারণ :**

(১) সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রামে চলে আসা।

(২) বিয়ের কারণে পরিব্রাজন।

(৩) উচ্চ শিক্ষার শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য।

(৪) গ্রামে স্বল্প খরচ ও সহজ, সরল, দূষণমুক্ত জীবন যাত্রার সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

(৫) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য।

**(গ) রাজনৈতিক কারণ :**

(১) রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে পরিব্রাজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু লোক কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।

(২) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য।

**(ঘ) অন্যান্য কারণ :**

(১) দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য।

(২) প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। (চট্টোপাধ্যায়, 2000)।

**আন্তর্জাতিক প্রবহমানতা (International Migration)**

যখন প্রবহমান জনগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশে গিয়ে বসবাস শুরু করেন তখন তাকে আন্তর্জাতিক প্রবহমানতা বলে। দেশে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ না থাকা, যুদ্ধ কিংবা দেশের সীমা বদল, কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা, উপনিবেশ স্থাপনের মনোগত বাসনা, খনি—বিশেষ করে সোনার খনির আবিষ্কার, বিদেশে জমি পাওয়ার সুযোগ কিংবা বিদেশে বেশি পারিশ্রমিকের জন্য দেশত্যাগ এসবই আন্তর্জাতিক পরিযানের মধ্যে পড়ে। আন্তর্দেশীয় প্রবহমানতার ফলে যেমন দেশের জনবণ্টনে রদবদল ঘটে, তেমনি আন্তর্জাতিক পরিযানের ফলে কোন দেশে মোট জনসংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। আরও লক্ষ্য করার মত যে আন্তর্জাতিক প্রবাসীদের অনেক সময় নিজের

দেশ ছেড়ে বসবাসের উদ্দেশ্যে বহুদূরের নতুন দেশে যেতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের নতুন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে গিয়ে ঘর বাঁধতে হয়। স্থায়ী বাসিন্দা ও নবাগতদের মধ্যে অনেক ব্যাপারে মিল হয় না। অন্তর্দেশীয় প্রবহমানতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই ধরনের পরিযান স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রবহমানতা দীর্ঘস্থায়ী, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী। অতীতে দেখা গেছে যে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক দেশের লোকেরা অন্য দেশে যাচ্ছেন। ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকেরা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের ঔপনিবেশিক লালসা চরিতার্থ করতে শুরু করেছেন। এছাড়া, উত্তর আমেরিকা, ওশেনিয়া, লাতিন আমেরিকায় তাঁরা উপনিবেশ বিস্তার করেছিলেন। এককালে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে কিছু কিছু জাতি ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ করতেন, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্রুত রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ফলে এই ধরনের বাস্তুত্যাগ কমে গেছে। এ ছাড়াও বর্তমান দিনে আন্তর্জাতিক আইন ও বর্ণপ্রথার কড়াকড়ির সাথে সাথে এই ধরনের প্রবহমানতা অনেকাংশে কমে গেছে (Beaujeu-Garnier, 1966)।

সূচী ঃ

অ ঃ আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীদের উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পরিব্রাজন
ই ১ ঃ ইউরোপীয়দের উত্তর আমেরিকায় পরিব্রাজন
ই ২ ঃ ইউরোপীয়দের পূর্ব রাশিয়ার দিকে পরিব্রাজন
ই ৩ ঃ ইউরোপীয়দের দক্ষিণ আমেরিকার দিকে পরিব্রাজন
ই ৪ ঃ ইউরোপীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় পরিব্রাজন
ভ ১ ঃ ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিব্রাজন
ভ ২ ঃ ভারতীয়দের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিব্রাজন
চ ১ ঃ চীনাদের মাঞ্চুরিয়ায় পরিব্রাজন
চ ২ ঃ চীনাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিব্রাজন

চিত্র 2.1 : আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন

বর্তমান দিনে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক আদান-প্রদানের তাগিদে বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলো বিশেষজ্ঞ আদান-প্রদান করে থাকেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ধরনের আদান-প্রদানের বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ এতে করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিক প্রবহমানতা দেশের অর্থনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে বিপুলসংখ্যক আগত শরণার্থীরা এদেশের অর্থনীতির ওপর প্রথম কয়েক বছর চাপ সৃষ্টি করেন। উদ্বাস্তু কৃষকরা বন্ধ্যা ও পতিত জমি চাষবাস করতে লাগলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হল কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার। ফলে কৃষিতে দারুণ পরিবর্তন এল। এছাড়া দেশ বিভাগের

পর পশ্চিমবঙ্গের এক বিরাট পরিমাণ পাট এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে আগত চাষিদের অভিজ্ঞতা এদেশকে পাটচাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলেছে।

যুদ্ধোত্তরকালে ইজারায়েলের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি আন্তর্জাতিক প্রবহমানতার একটি উল্লেখযোগ্য নজীর। 1948-1957—এই দশ বছরের মধ্যে চাষের জমির পরিমাণ শতকরা 124 ভাগ, সেচভূমি শতকরা 400 ভাগ, শিল্প শতকরা 60 ভাগ ও জলবিদ্যুৎ শতকরা 300 ভাগ বেড়েছে। জার্মানী থেকে আগত দক্ষ ও কারিগরি-জ্ঞানসম্পন্ন ইহুদীদের ইজরায়েলে বসবাস ও তাদের চারিত্রিক গুণই এই উন্নতির মূলে।

নীচের সারণীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের একটি হিসেব দেওয়া হল। বলা বাহুল্য যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতিই যেদেশে পরিযানের মূল কারণ।

| সাল | ইউরোপ থেকে মোট অভিবাসন (হাজার জন) | প্রধান অঞ্চল/দাতা দেশসমূহ (হাজার জন) |
|---|---|---|
| 1821-1830 | 144 | আয়ারল্যান্ড-15, গ্রেট ব্রিটেন-25 জার্মানি এবং অন্যান্য দেশ থেকে বাকি অংশ। |
| 1871-1880 | 2,272 | জার্মানি-718, গ্রেট ব্রিটেন-584 আয়ারল্যান্ড-437, সুইডেন-116 এবং অন্যান্য। |
| 1901-1910 | 8,136 | অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী-2,145, ইতালি-204, রাশিয়া-1,597, গ্রেট ব্রিটেন-526 এবং অন্যান্য। |
| 1961-1970 | 1,134 | দক্ষিণ ইউরোপ-421, উত্তর-পূর্ব ইউরোপ-39, মধ্য ইউরোপ-93, জার্মানী-211 এবং অন্যান্য। |

*সূত্র ঃ Brock and Webb, Geography of Mankind, 1978*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পর পরই পশ্চিমজাত বড়মাপের আন্তর্জাতিক পরিযান ঘটে গেল। এই সময় প্রায় 1,200,000 উদ্বাস্তুও এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করল। নীচের সারণিতে 1945-1952 সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিযানের চিত্রটি তুলে ধরা হল—

**সারণি**
**আন্তর্জাতিক পরিযান**

| মহাদেশ | সংখ্যা |
|---|---|
| ইউরোপ থেকে পরিযান | 4,4452,000 |
| ইউরোপে পরিযান | 1,150,000 |
| অন্যান্য আন্তর্মহাদেশীয় পরিযান | 710,000 |
| মোট | 6,312,000 |

Source : Spencer, E et. at, Cultural Geography, 1954

এই সময়কার (1945-1952) বিভিন্ন দেশ থেকে পরিযায়ী জনতা এবং বিভিন্ন দেশে আগত জন্যসংখ্যা নীচের সারণিতে দেখানো হল—

**সারণি**

**ইউরোপ থেকে পরিযান (1945-1952)**

| বহিঃপরিযান | সংখ্যা | অন্তপরিযান | সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|
| গ্রেট ব্রিটেন | 1,107,000 | যুক্তরাষ্ট্র | 1,104,000 | (27%) |
| ইতালি | 741,000 | আর্জেন্টিনা | | |
| | | ব্রাজিল | | |
| | | ভেনেজুয়েলা | 883,000 | (21%) |
| নেদারল্যান্ডস্ | 318,000 | কানাডা | 726,000 | (17%) |
| স্পেন | 272,000 | অস্ট্রেলিয়া | 697,000 | (17%) |
| পর্তুগাল | 1,52,000 | ইজরায়েল | 526,000 | (13%) |
| | | দঃ আফ্রিকা | 125,000 | (3%) |
| | | নিউজিল্যান্ড | 75,000 | (2%) |

Source : পূর্বের ন্যায়

**অন্তর্দেশীয় বা অন্তঃরাজ্য প্রবহমানতা (Inland or Inter-state Migration)**

যখন কোন ব্যক্তি এক রাজ্যের মধ্যেই বা একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন, তখন তাকে আমরা অন্তর্দেশীয় প্রবহমানতা বলি। প্রবহমানতার বিচারে আন্তর্জাতিকতার চেয়ে অন্তর্দেশীয় প্রবহমানতা দীর্ঘস্থায়ী, চিরস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী হতে পারে। ধরা যাক রাশিয়া ও কানাডার মেরু অঞ্চল, কঙ্গো অববাহিকার নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চলের অংশবিশেষ, মধ্য ভারতের দণ্ডকারণ্য ও আন্দামান-নিকোবরের জনহীন, বন্ধ্যা ও অকর্ষিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন। প্রতিটি নতুন ক্ষেত্রেই সরকারি সহায়তায় উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব হয়েছে। কারণ বর্তমান দিনে একক প্রচেষ্টায় প্রতিকূল প্রকৃতিকে বশে আনা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

বর্তমান অন্তর্দেশীয় প্রবহমানতার আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল গ্রাম্য জনশূন্যতা। প্রবহমানতার ফলে খুব বেশি সংখ্যায় জনবল কমে যাওয়ার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। বিচ্ছিন্ন এলাকা ও দেশের শেষ সীমানায় অথবা চরম প্রাকৃতিক অসুবিধাজনক এলাকাতে প্রেরণা উদ্দীপক (Push Stimuli) শক্তি বেশি কাজ করে। স্কটল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম উচ্চভূমি, আল্পস্‌ের উচ্চ পার্বত্য উপত্যকা অঞ্চল, নরওয়ের উপকূল থেকে দূরে অবস্থিত স্কেরী দ্বীপগুলোতে এই ধরনের জনশূন্যতা লক্ষ্য করা গেছে. আগেই বলা হয়েছে যে যুবক-যুবতিরা প্রব্রজনে বেশি রকম অংশ নেন। ফলে জন্মহার কমে যায়। এইসব কারণের ফলে গ্রামে লোকসংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে।

এই অবস্থায় গ্রামবাসীদের একটা বড় অংশ শহরে গিয়ে ভিড় করেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরনের সঞ্চারমানতা সাম্প্রতিককালে দ্রুত নগরায়ণে (urbanisation) সাহায্য করেছে। বড় বড় শহরগুলো আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কয়েকটি শহর ও নগর একত্রিত হয়ে মহানগর সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি দেশের উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। 1925 সালে জাপানে মোট জনসংখ্যার 22 শতাংশ শহরে বাস করতেন। 1970 সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল 72; রাশিয়ায় 1925 সালে শতকরা 18 ভাগ ছিলেন শহরবাসী ; 1973-এ তা গিয়ে দাঁড়াল 57;

ফরাসিদেশে 1921 সালে শতকরা 46 ভাগ ছিলেন শহরবাসী, 1974 সালে তা বেড়ে দাঁড়াল 72 আর ভারতে 1901 সালে শতকরা 11 ভাগ ছিলেন শহরবাসিন্দা, 1991-তে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে 26 ভাগ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে শহরায়নের শেষ সীমা কোথায়? বিভিন্ন শহরের জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা দেখা গেছে যে অনেক শহরেই জনধারণ ক্ষমতা তাদের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, পথে মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় জমির আকাশ ছোঁয়া দাম ও স্বাস্থ্যহানির কারণে অনেক শহরেই বহির্মুখী প্রবাহ (Outward flow of population) লক্ষ্য করা গেছে। ফলে শহরতলী এলাকা ক্রমশই জনাকীর্ণ হচ্ছে। তবে এ ঘটনা এখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ। উপরোক্ত পরিবেশও শহরায়ন প্রক্রিয়া ছাড়াও চাকরির সন্ধানে মানুষ প্রায় স্থায়ীভাবে অন্য জায়গায় গিয়ে বসবাস করেন। আমাদের পুরোনো সমাজব্যবস্থায় দেখা গেছে যে মানুষ বংশ-পরম্পরায় তার পারিবারিক পেশাকে আঁকড়ে রেখেছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টানোর দরুন অনেক পুরোনো পেশার থেকে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই বর্তমান আর্থ-সমাজব্যবস্থায় অনেকেই তাঁদের ধারাবাহিক জীবিকা ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি দিচ্ছেন। এছাড়া নতুন নতুন শিল্পনগরীতে চাকরির আশায় তাঁরা ভিড় করছেন। ফারাক্কায় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হলে অনেকেই সেখানে চাকরি নিয়ে পাকাপাকিভাবে বসবাস করেছেন। নিয়মমাফিক বদলি অনেক চাকরির এক স্বাভাবিক অঙ্গ। রাজ্য সরকারি চাকরিতে বদলি রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে—বিশেষ করে আধিকারিক (অফিসার) পর্যায়ে বদলি ভারতের যে কোনো প্রান্তেই হতে পারে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে অনেকেই দেশের বাইরে থাকেন। বহুক্ষেত্রে এই সঞ্চারমানতা কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, আবার বহুদূরবর্তী দেশেও তা হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ ব্যবসার খাতিরে সুদূর মারোয়ার (রাজস্থান) থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন ও সেইসব স্থানে পাকাপাকিভাবে বসবাস করেছেন। বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে বাস করতে হয়। এটা একটা স্থায়ী অন্তর্দেশীয় প্রবহমানতার উদাহরণ। উপরোক্ত প্রায়-স্থায়ী প্রবহমানতা ছাড়া কিছু স্বল্পমেয়াদী প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন শীতের সময় উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের উঁচু এলাকা থেকে নীচের উপত্যকায় নেমে আসা, আবার শীতের শেষে পুরোনো জায়গায় ফিরে যাওয়া কিংবা জনবহুল অঞ্চলের কৃষিশ্রমিকের চাষের মরসুমে (শস্য বোনা ও কাটা) অপেক্ষাকৃত জনবিরল অঞ্চলে বা সামাজিক উৎসব উপলক্ষ্যে আত্মীয়দের যাওয়া-আসা এই সবই স্বল্পমেয়াদী সঞ্চারমানতার মধ্যে পড়ে। পরে আমরা এই সব স্বল্পমেয়াদী সঞ্চারমানতা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

**মরশুমী পরিযান (Seasonal Migration)**

প্রকৃতিতে যেমন দিনের পর রাত আসে তেমনি শীতের পর আসে গরমকাল, গরমকালের পর শীতকাল। তারই তালে তালে চলে কিছু লোকের জীবিকা সংস্থান। যাযাবর বৃত্তি এমনই এক ঋতুভিত্তিক সঞ্চারমানতার উদাহরণ। প্রকৃত যাযাবররা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য পরিবেশের ওপর নির্ভর করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ান। মধ্য প্রাচ্যে, বিশেষ করে আরবের মরুভূমিতে, ইরাক, জর্ডন ও সিরিয়াতে 30 থেকে 40 লক্ষ যাযাবরের সন্ধান মেলে। অনুমান করা হয় যে সিরিয়ার এ রকম বেদুইনের সংখ্যা কয়েক কোটি, বিরাটাকার আরব মরুভূমিতে সম্ভবত 30 লাখ ইরাক ও জর্ডনে 10 লাখ। স্বাধীনতাপ্রিয় বেদুইনদের মধ্যে এক শ্রেণির পর্যবেক্ষক (স্লইব) থাকেন। তাঁদের কাজ হল বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের খবর দেওয়া। খবর পাওয়া মাত্র তাঁরা অস্থায়ী তাবু তুলে নিয়ে সেই স্থানে যান। তাঁরা একস্থানে বেশিদিন থাকেন না। এছাড়া মরুদ্যান এবং যেখানে উপজাতিদের কুয়ো রয়েছে, অল্প গাছপালা ও ঘাস রয়েছে, সেখানেই তাঁরা উটের পাল নিয়ে হাজির হন। আরবের হায়িল (Hayil) ও রিয়াদে-র (Riadh) মধ্যে প্রায় অধিকাংশই যাযাবর। এঁরা অস্থায়ীভাবে বাস করেন। ইরান ও সিরিয়ার মরৌরা অঞ্চলের তৃণক্ষেত্রে কয়েকটি উপজাতি বাস করেন।

সাহারার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজও কয়েক লাখ যাযাবর বাস করেন। সাহারার উত্তর-পশ্চিমে রিকুইবাটি (Reqitbats) নামে এক যাযাবর জাতি আজও প্রাণশক্তিতে উচ্ছল। সামান্য বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে তাঁরা মরক্কো ও পশ্চিমে আলজিরিয়া ও সাহারায় 300 কিমি থেকে, 1000 কিমি পর্যন্ত পথ পাড়ি দেন। ভেড়ার চেয়ে উট মরুভূমিতে পথ চলার পক্ষে আদর্শ প্রাণী। তাই যে সব বেদুইনদের উট আছে তাঁরা বেশি পথ চলতে পারেন। বহুদিন যাবৎ রিকুবাটরা মরক্কো বাজারে পশু ও নুন বিক্রয় করতেন। আর বিনিময়ে, কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতেন। আস্তে আস্তে এঁরা উন্নত জীবনযাপনের দিকে এগোচ্ছেন—ময়দা, চা ও চিনি কিনছেন। কেউ কেউ শ্রমিকের কাজ বা সেনাবিভাগে যোগ দিচ্ছেন। এতে করে কোন কোন পরিবার সুখের মুখ দেখছেন(Brunhes, 1925)।

সত্যিকারের যাযাবররা বাস করেন সাহারার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে। এদেরকে বলা হয় আহাগ্গার (Ahaggar)। এঁদের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের লক্ষ্য করা যায় যে মোট জনসংখ্যার 33 ভাগ দাস শ্রেণির, 12 ভাগ প্রভু শ্রেণির, আর অবশিষ্ট 55 ভাগ নির্ভরশীল প্রজা। দাস শ্রেণির পশুর পাল নিয়ে খাবারের খোঁজে দক্ষিণ থেকে, 1000 কিমি পর্যন্ত পথ চলেন। তাঁদের পরিবাররা ছাগল, গাধা ইত্যাদি নিয়ে তাঁবুতে বাস করেন। দূরত্ব অনুযায়ী এই সব যাযাবরদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের জিনিসপত্রের আদানপ্রদান এক এক রকম হয়। এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙনের মুখে। আজ উটের স্থান নিয়েছে লরি। চাষিরা সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন। মানুষের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। দোকানেও হরেক রকমের লোভনীয় উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে। মোটের ওপর বলা চলে যে যাযাবরদের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হয়ে পড়ছে। সভ্যতার ছোঁয়া, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ক্রমশই যাযাবরদের পরিব্রাজন এলাকা কমিয়ে দিচ্ছে। তাই যাযাবর বৃত্তি শুধুমাত্র পশুচারণ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। এছাড়া, কিছু কিছু গোষ্ঠীর জনসংখ্যা এত তাড়াতাড়ি বেড়েছে যে তাঁদেরকে যাযাবর বৃত্তির বদলে অন্য জীবিকা অবশ্যই খুঁজে নিতে হবে। মরুভূমিতে খনিজ তেলের আবিষ্কার ও জলসেচের আধুনিক ব্যবস্থাও তাঁদের নতুন জীবিকার প্রতি হাতছানি দিচ্ছে।

**আংশিক যাযাবর বৃত্তি (Semi-Nomadism)**

অনেক রদবদলের মধ্যে দিয়ে যাযাবররা আজ এক ধরনের জীবিকার খোঁজ পেয়েছেন, যা আংশিক যাযাবর বৃত্তি নামে পরিচিত। এই বৃত্তি হয় একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ (যা মরুদ্যান ও বিশাল তৃণক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত), নয় দুই বিপরীত ধরনের জলবায়ু অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

উত্তর সাহারায় আংশিক যাযাবর বৃত্তির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মরুভূমির এই প্রান্তে যাযাবরদের আসা-যাওয়া আছে। অতীতে খুব বেশি রকম আংশিক যাযাবর বৃত্তি চালু থাকলেও বর্তমানে কৃষিকে কেন্দ্র করে কিছু উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। ফলে, এই ধরনের পরিবেশ আংশিক যাযাবর বৃত্তির পক্ষে সহায়ক নয়। উত্তর আফ্রিকার এই সীমান্তে ফরাসি শাসন যাযাবর বৃত্তিকে প্রায় শেষ পর্যায়ে এনে ফেলেছে। আজকের দিনে এই বৃত্তি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির মধ্যে ও কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। এর কারণ হল চাষবাসের উন্নতি, সম্পত্তি আইনের রদবদল, ফসল কাটার নির্দিষ্ট সময়, কুয়ো বানান ও যাতায়াতের পথে চটির ব্যবস্থা।

মধ্যপ্রাচ্যে মেষপালকরা নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রব্রজন করে থাকেন। তাঁরা চাষের কাছাকাছি বাস করেন। শুধুমাত্র পশুদের খাবারের খোঁজে তাঁরা বের হন। আজকাল মোটরগাড়ির দৌলতে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে লরি করে পশুপালকে তৃণক্ষেত্র নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে চিরাচরিত যাযাবর বৃত্তির শেষ সীমায় স্থায়ী বসতির জন্ম হচ্ছে। এই নতুন ধরনের যাযাবররা প্রতিবেশী স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, তা সে সাধারণ পশুচারণ ভূমির (যাযাবর পশুচারণের উদ্দেশ্যে) জন্যই হোক বা সামী (Samme) নামে ভেড়ার দুধ থেকে তৈরি জনপ্রিয় মাখনের (স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে) জন্যই হোক (Beaujeu-Garnier, 1966)।

পৃথিবীর সবখানেই যাযাবর বৃত্তির পরিবর্তন ও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্জন লক্ষ্য করা গেছে। আজকের দিনে অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পশুপালদের নিয়ে দূরে চড়াতে যান। অধিকাংশ যাযাবর স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হচ্ছেন। দক্ষিণ সাহারা ও সুদানে উপনিবেশ স্থাপন, মধ্য এশিয়ায় সরকারি প্রচেষ্টায় সেখানকার বাসিন্দারা যাযাবর বৃত্তির বদলে স্থায়ী কৃষি জীবন বেছে নিচ্ছেন।

একসময়ে উত্তরাঞ্চল (কুমায়ুন ও গাড়োয়াল এলাকায়) 'ভাটিয়া' নামে এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আংশিক যাযাবর বৃত্তি চালু ছিল। কারণ এই সুউচ্চ পার্বত্যাঞ্চলের রুক্ষ ভূমিভাগ, প্রতিকূল আবহাওয়ায় চাষবাসকে জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। পাহাড়ী অঞ্চলে মাটির স্তর খুব পাতলা, ফলে তার ফসল ফলাবার ক্ষমতাও কম। তাই এ অঞ্চলে চাষবাস করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই সব কারণেই তাঁরা ব্যবসাকে জীবনের প্রধান অবলম্বন হিসেবে নিয়েছিলেন। তিব্বতের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। বছরে তাঁরা সেখানে দু'বার করে বাণিজ্য করতে যেতেন। প্রথমবার, জুনের শেষে বা জুলাইয়ের প্রথমে অর্থাৎ ফসল বোনার পর। আর, দ্বিতীয়বার ফসল তোলার পর সেপ্টেম্বর মাসে। তাঁদের মালবহন ও যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন ছিল ঝাব্বু, টাট্টু ঘোড়া, তিব্বতী ঘোড়া ও ভেড়া। এই সব পশুদের চারণভূমি বা বুগিয়ালের খোঁজে এদের ক্রমাগত একস্থান থেকে আরেক স্থানে যেতে হত। ভাটিয়ারা যখন তিব্বতে বাণিজ্য করতে যেতেন, তখন তিব্বতী চারণভূমিতে চরাবার জন্য ভেড়াদেরকে আলওয়াল বা পশুপালকদের অধীনে রেখে যেতেন। তিব্বত থেকে তাঁরা কিছু মাল নিয়ে আসতেন। সেগুলো উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন অংশে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত যে বাণিজ্য মেলা বসত তাতে বিক্রি করা হত। তাঁরা তিব্বত থেকে বোলাক্স বা সোহাগা, নুন, পশম, গুঁড়ো সোনা, টাট্টু ঘোড়া নিয়ে আসতেন। নানারকম ফসল, পশমি জামা, ধাতুর তৈরি জিনিসপত্র নিয়ে তাঁরা তিব্বতে যেতেন। কিন্তু 1962 সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পর থেকে তিব্বতের সঙ্গে এই বাণিজ্যে ভাঁটা পড়েছে (Negi, 1993-94)।

**পার্বত্যাঞ্চলে পশুপালকগোষ্ঠীর ঋতুভিত্তিক সঞ্চারমানতা (Transhumance of Pastoral Herders in Mountain Areas)**

বাইবেলের বিভিন্ন আখ্যানে পশুপালক সমাজের মধ্যে যাযাবরী পশুপালনের উল্লেখ আছে। ভারতে গুজ্জর, গাদ্দি, নিলাং, মার্চিয়া, আনওয়াল, জোহরি উপজাতির লোকজন যাযাবরী পশুপালক সমাজের উদাহরণ।

এই ধরণের প্রব্রজনের বৈশিষ্ট্য হল ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন উচ্চতার পশুপালক গোষ্ঠীর ভ্রাম্যমান জীবন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বহুকাল ধরে এই ধরনের সঞ্চারমানতা চলে আসছে। শীতকালে প্রচন্ড শীতের দরুন পর্বতের খুব উঁচু অঞ্চলের বাসিন্দারা সেই স্থান ত্যাগ করে উপত্যকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই সময় তাঁরা পশুদের আস্তাবলে রেখে দেন। বসন্তকালের বরফ গললে তাঁরা উঁচু এলাকায় উঠে যান। ইউরোপের সমস্ত পার্বত্যাঞ্চলে এক সময় ঋতুগত সঞ্চারমানতা লক্ষ্য করা যেত। পাদ্রী, স্কুলশিক্ষক থেকে শুরু করে সমস্ত গ্রামবাসী এতে অংশ নিতেন। পর্বতের ছালে একটু দূরে দূরে সে সব কাঠের কুঁড়েঘরের (Hutment) চিহ্ন আজও যৌথ-সঞ্চারমানতার কথা মনে করিয়ে দেয়। সমতল ভূমি ও নীচু উপত্যকায় চাষবাসের এলাকা বাড়ার ফলে গ্রামবাসীরা স্থায়ীভাবে পার্বত্যাঞ্চল থেকে আস্তানা গুটিয়েছেন। পক্ষান্তরে, সুফের (Souf) রেবাইয়া-র আংশিক যাযাবর বৃত্তিকে আজও অক্ষত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব উট, ভেড়া ও ছাগল রয়েছে। তাঁদের সুসংবদ্ধ যাযাবর জীবন আজও স্থায়ী ঘর বাঁধতে বাধা দান করছে। শরৎকালে 2 থেকে 4 মাস পর্যন্ত তাঁরা তাল চাষ, খেজুর সংগ্রহ ইত্যাদি করে থাকেন। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত উপজাতিরা চারদিকে ঘাসের খোঁজে বেড়িয়ে পড়েন। কেউ কেউ উত্তর দিকে নেমেঞ্চা (Nemencha) পর্বত পর্যন্ত যান। অন্যরা আর্গ (Erg) পর্যন্ত যান। গবাদি পশুরা আচেব (Acheb) নামে এক ধরনের ঘাস খায় ও প্রচুর দুধ দেয়। (Brunhes, 1952)। মে মাসে তাঁরা মরুদ্যানে ফিরে আসেন। জনহিতকর

কার্য, জলসেচ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি এবং গত কয়েক বছর ধরে সামরিক তৎপরতার দরুন গবাদি পশুর মৃত্যু তাঁদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা হতে বাধ্য করেছে। যেমন ওউরাগলাতে (Ouragla) পুরোনো যাযাবরদের প্রায় অর্ধেকই স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছেন। তবে নতুন জীবনের মধ্যে পুরানো কিছু ছোঁয়া রয়েই গেছে। যেমন প্রাক্তন যাযাবরদের স্ত্রীরা আজও চাষবাসে অংশ নেন যা স্থায়ী বাসিন্দাদের স্ত্রীলোকেরা করেন না। নতুন গ্রাম ঐ পুরোনো তাঁবুর ধারেই তৈরি করা হয়। সুতরাং বাড়িগুলো এক সারিতে থাকে, কিন্তু অনেকখানি জায়গায় ওপর ঘর তোলা হয়।

পূর্ব আফ্রিকায় যাযাবর বৃত্তির প্রবতা আজও রয়েছে। এখানে মরুভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ তো রয়েই গেছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী শতকরা 15 ভাগ লোক যাযাবর, কিন্তু বেসরকারী মতে প্রায় 40 ভাগ। বর্ষার সময় তাঁরা স্থায়ী গ্রামে বাস করেন। সেই সময় তাঁরা ফসল ফলাত, গ্রামের আশেপাশে পশু চরান, তারপর বর্ষার শেষে ডিসেম্বর মাসে পশুদের নিয়ে চরাতে বের হন ও প্রতি রাতে ফিরে আসেন। ফেব্রয়ারি মাসে যখন প্রচন্ড খরা চলে, তখন তাঁরা পশুর পালকে নদীতে বা জলা জায়গায় নিয়ে যান।

সোমালি সাধারণতন্ত্রের তিনভাগ লোক যাযাবর, যাদের একমাত্র কাজই হল পশুদের জন্য তৃণক্ষেত্র ও জলাশয় খুঁজে বেড়ানো।

ট্রান্সহিউম্যান্স বা যাযাবরী পশুপালন ছাড়া ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ঋতুগত পরিব্রাজন লক্ষ্য করা যায়। যেমন—কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, পঞ্চকেদার, অমরনাথ প্রভৃতি ধর্মীয় স্থানগুলোতে পূজা-উপাসনার উদ্দেশ্যে গ্রীষ্মের শুরুতে মন্দির অভিমুখে পরিব্রাজন, আবার শীতের গোড়ায় নেমে আসা হল ধর্মীয় কারণে যাযাবরী উদাহরণ। (চিত্র 2.2)।

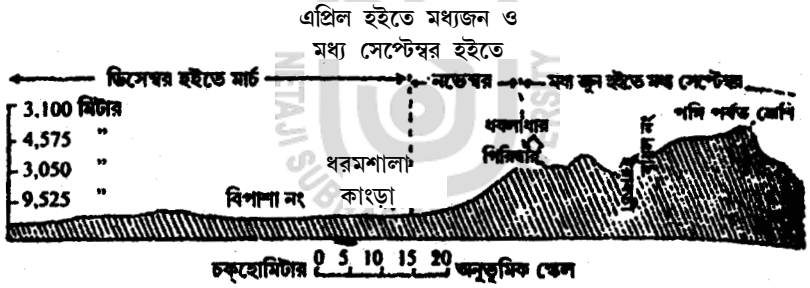


চিত্র 2.2 ঃ কুলু-উপত্যকার গাদ্দিদের ঋতুগত পরিয়ান

**দৈনিক সঞ্চারমানতা (Daily Movement)**

পৃথিবীর সব দেশেই ঋতুগত প্রবহমানতা কমে আসছে, কিন্তু দৈনিক সঞ্চারমানতা বাড়ছে, কী দূরত্বের দিক দিয়ে কী লোকসংখ্যার দিক দিয়ে। এটা সম্ভবপর হয়েছে আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার দৌলতে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এই দৈনিক সঞ্চারমানতা? উত্তর হল কর্মীদের বাসস্থানের কাছে কর্মস্থল নাও থাকতে পারে। সুতরাং কোন শহরে বড় কারখানা বা কয়েকটি কারখানা থাকলে বা অনেক অফিস বা বড় ব্যবসা কেন্দ্র থাকলে সেখানেই শ্রমিক বা চাকুরীজীবীরা চাকুরির খাতিরে আসবেন। সত্যিকারের দৈনিক সঞ্চারমানতা বলতে আমরা বুঝি প্রতিদিন জীবিকার তাগিদে যে জনতা শহরতলী বা গ্রামাঞ্চল থেকে নগরে হাজির হন, আবার কাজের শেষে তাঁদের বাসস্থানে ফিরে যান। এর ফলে দিনের বিশেষ সময় সেই স্থান জনাকীর্ণ হয়, আবার অন্যসময় সেই জায়গা খাঁখাঁ করতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে কলকাতার ডালহৌসি অঞ্চলের কথা বলা যেতে পারে। এখানে অফিসের সময় সকাল 9-30 মিঃ থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত দৈনিক যাত্রীদের (commuter) সমাবেশ দেখা যায়। তারপরই এই অঞ্চল ফাঁকা হয়ে পড়ে। আজ বৈদ্যুতিক ট্রেনের দৌলতে প্রায় 200 কিমি দূর থেকেও কলকাতা শহরে প্রায়

কয়েক লাখ দৈনিক যাত্রীর সমাবেশ ঘটে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে এই দৈনিক সঞ্চারমানতার দূরত্ব নির্ভর করে কোন শহরের আকর্ষণ শক্তির উপর। সন্দেহ নেই যে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি এই দৈনিক সঞ্চারমানতায় সাহায্য করছে। অবশ্য এটাও সত্যি যে মানুষ শহরের কোলাহল থেকে দূরে থাকতে চান।

একথা ঠিক যে পৃথিবীর বড় বড় নগরে দৈনিক যাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। ধরা যাক কলকাতা শহরের কথা। এখানে গত কয়েক বছরে যাতায়াতের ব্যবস্থা মিনিবাস, স্পেশাল চার্টার্ড বাস, মেট্রোরেল ইত্যাদি যোগ হয়েছে। এছাড়াও বেসরকারি বাসের অনেক রূট চালু হয়েছে। তবুও দৈনিক যাত্রীদের যাতায়াত-সমস্যা মেটেনি। এই দৈনিক যাত্রীদের সংখ্যা বাড়ার কারণই হল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ, ব্যক্তিগত অভিরুচি,পূর্বতন পরিকল্পনাবিদ্‌দের দূরদৃষ্টির অভাব অর্থাৎ বিভিন্ন এলাকায় অফিস, বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার বদলে মহানগরীর একটি স্থানে সমস্ত কিছুর কেন্দ্রীকরণ। ইদানিংকালে কলকাতার কেন্দ্রবিন্দু (ডালহৌসি বা 'বিবাদীবাগ') থেকে কিছু অফিস সল্টলেক উপনগরীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

কোথায় বাস করবেন এটা কর্মীরা নিজে থেকে ঠিক করেন অথবা ঠিক করতে বাধ্য হন। কর্মস্থলে গৃহসমস্যা থাকতেই পারে আবারনিজ জন্মস্থানের বা পরিচিত স্থানের প্রতি মমত্ববোধও এক্ষেত্রে কর্মীকে কর্মস্থল থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে। এছাড়া, পৈতৃক বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকা যায়। ভালো বাড়ি ভাড়া পাওয়া একটি সমস্যা। বাসস্থান থেকে কর্মস্থলে যাতায়াত করতে দিনের অধিকাংশ সময়ই কেটে যায়। তবুও অনেকটা বাধ্য হয়েই অল্প ও মাঝারি আয়ের ব্যক্তিরা বহু দূর-দূরান্ত থেকে কর্মস্থলে আসতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে পশ্চিমি দেশগুলোর কথা আলোচনা করা যেতে পারে। সেখানে শহরে কেন্দ্রস্থলগুলো হল পুরানো ও ঘিঞ্জি এলাকা, সেখানে কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাই উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ধোঁয়া ধূলো এড়াতে শহর থেকে দূরে প্রশস্ত সবুজ অঞ্চল বেছে নেন বাসস্থান হিসেবে। সব শেষে বলা যায় শহরে বেশি আয়ের সুযোগই অনেককে কোন গ্রাম বা ছোট শহর থেকে নগরে যাতায়াত করতে বাধ্য করেন।

**অবসর ও প্রবহমানতা (Leisure and Movement)**

বিশ্রাম কাজেরই অঙ্গ, এক সূত্রে গাঁথা। দৈনিক একঘেয়মি কাজে ক্লান্তি আসে। তাই মানুষ কাজের ফাঁকে ফাঁকে চায় বিশ্রাম। প্রতিদিন কাজের শেষে মানুষ বাড়ি ফিরে রাতে বিশ্রাম করেন, আর বিশ্রামই তাকে পরদিন কাজে স্পৃহা যোগায়। দৈনিক বিশ্রাম ছাড়াও মানুষ সপ্তাহে দেড় দিন বা ক্ষেত্রবিশেষে দু'দিন ছুটি পান। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বৈচিত্র্য-পিয়াসী মানুষ সুযোগে কাছাকাছি কোথাও দু'একদিনের জন্য ঘুরে আসেন। পশ্চিমি দেশগুলোতে এই সপ্তাহ ভ্রমণ (Week end) খুবই জনপ্রিয়। এতো গেল সপ্তাহের দু'দিন ছুটির ব্যাপার। একটানা লম্বা ছুটি পাওয়া যায় বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে। আর তখনই ভ্রমণপিয়াসী মানুষ দীর্ঘপথ-পরিক্রমায় বের হন। একএক অঞ্চলে এক এক ঋতুতে কাজে ফুরসত মেলে। যেমন, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কর্মীরা শীতকালে কর্মক্ষেত্রে অবসর পান, আর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কৃষিজীবীরা গরমকালে। পশ্চিমি দেশগুলোর স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা গরমকালের সুন্দর আবহাওয়ায় ছুটি উপভোগ করতে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বাৎসরিক ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ছুটি পান। বলতে গেলে তারাই সবচেয়ে বেশি অবসরভোগী। ছুটি হয়ে গেলে মা- বাবারা বাড়ি থেকে দূরে তাঁদের অন্য পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বা বিশেষ শিবিরে পাঠিয়ে দেন। বছরের কয়েকবার তাঁরা এই ধরণের ভ্রমণে অংশ নেন। কোন কোনও সময় মায়েরা তাঁদের সঙ্গে যান ও বাবার বাৎসরিক অফিস ছুটিতে ঐ অস্থায়ী বাসস্থানে মিলিত হন। এ ভাবেই ভ্রমনের মধ্যে দিয়ে কর্ম ও আনন্দ দু'য়েরই খোরাক মেলে। এই ধরণের অবসরকালীন ভ্রমণ ক্রমশ বাড়ছে, আর তা সম্ভব হয়েছে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির ফলে। তাই দেখা যায় একশ বছর আগেও মাত্র কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই ধরনের ভ্রমণে অংশ নিতেন। কিন্তু আজ অনেক দেশেই শ্রমজীবী মানুষ স্বল্পকালীন ভ্রমনে অংশ নেন।

## কৃষিগত পরিযান (Agricultural Migration)

কৃষিতে সব সময় সমান সংখ্যক শ্রমিকদের দরকার হয় না। জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে এক এক দেশে এক এক সময়ে চাষবাস হয়। অন্য সময় চাষিদের হাতে কাজ থাকেনা। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে জনসংখ্যা খুব কম, আবার কিছু এলাকা আছে যা আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী। উভয় অঞ্চলেই ক্ষেতমজুরের অভাব থাকা স্বাভাবিক। এই কারণে জনাকীর্ণ অঞ্চল থেকে ঐ দুই অঞ্চলে চাষবাসের সময় কৃষিশ্রমিক জীবিকার তাড়নায় ছুটে আসেন। উন্নতশীল দেশগুলোতে কৃষিকাজে যন্ত্র প্রচলনের আগে এই ধরনের পরিযান খুব লক্ষ্য করা যেত। তবে আজও এই ধারা সেখানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইটালীয়রা শরৎকালে আর্জেন্টিনায় ফসল কাটতে যান ও গরমকালে উপার্জিত অর্থ নিয়ে নিজের দেশে ফিরে আসেন। বিভিন্ন স্থানে কৃষিতে আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও যে কারণের জন্য কোন অঞ্চলে মরসুমী কৃষিশ্রমিকের প্রয়োজন হয় তা হল ঐ স্থানে কম জনসংখ্যা। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতেই মরশুমী কৃষিশ্রমিকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি হয়। আগন্তুক মরশুমী শ্রমিকেরা, যাদের বেশিরভাগ মেক্সিকোবাসী, নিজের দেশে ফসল কাটা হয়ে গেলেই এখানে চলে আসেন ও নিজ নিজ পরিবারের সঙ্গে তাঁবুতে বাস করেন। জানুয়ারীতে ইম্পেরিয়াল ভ্যালি (Imperial) Valley)-তে লেটুস ফল তোলার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের সঞ্চারমানতা শুরু হয়। এরপর আরো উত্তরে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় অম্লজাতীয় ফল, লস এঞ্জেলস অঞ্চলের সব্জি কেউ কেউ আরও উত্তরে এগিয়ে ফ্রেসনো (Fresno)-তে প্রাক্-শরৎকালের শুরুতেই আঙুর তোলেন। শীতকালে ফসল হয় না। সেই সময় তাঁরা দক্ষিণে নিজেদের পুরোনো ডেরায় ফিরে যান। এইভাবে 3,000 কিলোমিটারের এক লম্বা কৃষিগত পরিযান চক্র শেষ হয়। শুধু মেক্সিকোবাসীরাই নয়, বৃহৎ সমভূমি (Great Plains) অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা ফসল কাটার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় যান। মেক্সিকোবাসীদের মত ইম্পেরিয়াল ভ্যালি থেকে এঁর যাত্রা শুরু করেন। সেখানে থেকে পিচ ফল সংগ্রহ করতে সাক্রামেন্টো (Sacramento) উপত্যকায় যান। এর পর তাঁরা দক্ষিণে তুলো তুলতে ফিরে যান। এই তুলো তোলার কাজটায় এখনও যন্ত্রীকরণ সম্ভব হয়নি। কৃষিতে মোটামুটি আংশিক যন্ত্রীকরণ সত্ত্বেও ফ্রান্সের প্রায় নব্বইভাগ কৃষি শ্রমিক বিদেশ থেকে আসেন যাদের মধ্যে অধিকাংশই স্পেনীয়। 1970 সাল থেকে পোর্তুগিজরা ও উত্তর আফ্রিকার মরক্কোবাসীরা মরশুমী কৃষিশ্রমিক হিসেবে ফ্রান্সে আসছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সব কৃষি শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশই হলেন নারী শ্রমিক।

ঝুমচাষও এক ধরনের ভ্রাম্যমান পরিযানের উদাহরণ। এই প্রথায় কোন জমির গাছপালা কেটে তাকে পরিষ্কার করে কাজে লাগান হয়। গাছের ডালপালা জমির ওপরই ফেলা হয়। ফলে সাময়িকভাবে জমির উর্বরতা বাড়ে। 3/4 বছর পর জমির উর্বরতা কমে গেলে পুনরায় অন্য জমিতে চাষ করা হয়। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা আবারপুরোনো জমিতে ফিরে আসেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে আজও এই প্রথা চলে আসছে। এবার কৃষিগত পরিযান সম্পর্কে দুই ভিন্ন অর্থনীতির দেশ থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক।

### (1) উন্নয়নশীল দেশ (Developed Country)

ভারতে বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ফসল তোলা ও কাটার সময় সমৃদ্ধিশীল অঞ্চলে কাজ করতে যান। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কথাই ধরা যাক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাগড়ী (গঙ্গার পূর্ব পাড়) অঞ্চল থেকে কৃষি শ্রমিকরা গঙ্গার অপর (পশ্চিম) পাড়ে অবস্থিত কৃষি সমৃদ্ধ রাঢ় অঞ্চলে প্রতি বছর ফসল বোনা ও কাটার সময় যেতেন।আজ অবশ্য এই ধারা ক্রমশ কমতির দিকে। আজ সারা পশ্চিমবঙ্গেই (খরাপ্রবণ পশ্চিম বাদে) কৃষিতে আগের তুলনায় গতি সঞ্চার হয়েছে। বলতে গেলে সারা বছর ধরেই চাষিরা ক্ষেতখামার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তা সত্ত্বেও এখানকার (বাগড়ী) প্রচুর সংখ্যক ভূমিহীন ক্ষেতমজুর প্রত্যেকদিন মুর্শিদাবাদের লাগোয়া নদীয়া জেলায় জনমজুর (মুনিষ) খাটতে যান। বিশেষ করে নদীয়া জেলার গোয়ালা ও তাঁতিয়া তাঁদের জমিতে এঁদেরকে রোজ-ভিত্তিক মুনিষ হিসেবে খাটান (Sen, 1988)।

**(2) অনুন্নত দেশ (Undeveloped Country)**

আফ্রিকায় কিছু কিছু ফসল আছে যা তুলতে অতিরিক্ত শ্রমিকদের দরকার হয়। কারণ ঐ সব অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম। তাছাড়া, চাষবাসে যন্ত্রীকরণও খুব কম। যেমন সেনেগালের বাদাম চাষ, ঘানা এবং পশ্চিম নাইজেরিয়ায় কোকো চাষ, সুদানে তুলোর চাষ। উত্তরের জনবহুল অঞ্চল থেকে ক্ষেত মজুরেরা ওই সব দেশে কাজ করতে আসেন।

মরশুমী কৃষি শ্রমিকদের সবারই একই লক্ষ্য থাকে। তা হল, আয় থেকে বাঁচিয়ে যত বেশি সম্ভব টাকা বাড়ি আনা। তাই দেখা যায় যে কর্মস্থলে অস্বাস্থ্যকর ও গিঞ্জি পরিবেশের মধ্যেই তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন। মনিবরা তাঁদেরকে তাঁবু বা বারাকে থাকার ব্যবস্থা করেন। খাবার ব্যবস্থা যদি মনিব না করেন, তবে অনেক সময় শ্রমিকরা খুব অল্প খেয়ে কাটিয়া দেন। এইভাবে তাঁরা নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেন।

**অন্যান্য ঋতু প্রব্রজমানতা (Other Seasonal Migrations)**

উপরোক্ত পরিযান ছাড়াও আর কতকগুলো প্রব্রজমানতা আছে যেগুলো হয় ঋতুভিত্তিক কাজকর্মের ওপর নির্ভর করে, নয়তো বছরের কোন বিশেষ বিশেষ সময়ে সাময়িক কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। চিনিশিল্প প্রথমটির, আর বাড়ি তৈরি, খনি সংক্রান্ত বা জনহিতকর কাজকর্ম দ্বিতীয়টির উদাহরণ। চিনিশিল্পের বছরের 6 মাস কাজ হয়, অন্য সময়ে কাজ বন্ধ থাকে। তাই বছরের ঐ ক'টি মাস (নভেম্বর থেকে মার্চ/এপ্রিল) আশেপাশের এলাকা থেকে শ্রমিকরা এই শিল্পে কাজ করতে আসেন। ইউরোপে পার্বত্যাঞ্চলে কাঠকল (saw mill) শীতকালে বন্ধ থাকে, কারণ সেই সময় গাছগুলো বরফে ঢেকে যায়, দ্বিতীয়ত এই সময় নদীর জল বরফে পরিণত হয়ে যায় বলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফ্রেঞ্চ আল্পসের উত্তরাংশে উৎপন্ন জলবিদুৎ প্রধানত গরমকালে মাঝারি মাপের শিল্পে (যেমন, কার্বাইড অ্যালুমিনিয়াম) ব্যবহার করা হয়। এই সব শিল্পে উত্তর আফ্রিকা থেকে শ্রমিক আসেন। তাঁরা বসন্তের শেষে এখানে আসেন। কারণ, তাঁদের চাষবাসের কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর তাঁরা শরৎকালে দেশে ফিরে গাছ থেকে জলপাই তোলেন।

## 5.5 প্রব্রজন ও মানুষ

মানুষই প্রব্রজন করে এটা ধ্রুবসত্য। কিন্তু সব মানুষের প্রব্রজনে আগ্রহ নেই, আবার প্রব্রজনকারী একই ধরনের বিচরণ (Movement) করেন না। কেউ এক শহরে থেকে অন্য শহরে যান, বা গ্রাম থেকে শহরে যান, আবার কেউ বা দূরান্তরে যান। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ঃ (i) প্রব্রজনে আগ্রহী ও প্রব্রজনে অনাগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে তফাৎ দেখা যায় যার তার মাত্রাই বা কতখানি? (ii) ভিন্ন ভিন্ন বিচলনকারীদের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে দেখা যায় আর তাদের মিল বা অমিল কতখানি (মজুমদার), 1991) ?

এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের প্রব্রজনকারীদের জৈবিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। নীচে প্রব্রজনকারীদের ঐ তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হল—

(i) অন্তর্দেশীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের প্রব্রজনকারীদের মধ্যে বয়ঃবৃদ্ধদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। বেশির ভাগ প্রব্রজনকারীদের বয়স15-35 বৎসরের মধ্যে। প্রধানত উচ্চশিক্ষা এই সময়কার প্রব্রজনের অন্যতম প্রধান কারণ। অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে বাবা মার স্থানান্তরে গমন ও বিয়ে (মেয়েদের ক্ষেত্রে)। 20-30 বৎসর বয়সের প্রব্রজনকারীদের বেশির ভাগই চাকরি বা পেশার প্রয়োজনে স্থানান্তরে গমন করেন। 30 বা তার বেশি অনেকেই

বিয়ের পর নতুন বাসস্থানের খোঁজ করেন। বয়স যখন কম থাকে সংসারের দায়দায়িত্ব কম থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানান দায়দায়িত্বে মানুষ আটকে পড়ে। প্রব্রজনে আগ্রহ থাকলেও তখন উপায় থাকে না। একই সাথে ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা কমে যায়।

(1) **স্ত্রী-পুরুষভেদ (Sex difference) ঃ** দূর প্রব্রজনকারীদের মধ্যে পুরুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজনকারী মহিলাদের আনুপাতিক হার কমতে থাকে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রব্রজনেও পুরুষেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। চাকুরি বা পেশাগত কারণেই দূর প্রব্রজনের প্রধান কারণ। মহিলাদের মধ্যে বিয়েই প্রব্রজনের অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের মত সমাজে স্ত্রীকে ঘর বাঁধতে স্বামীর বাড়ি যেতে হয়। এছাড়া পরিবারের কর্তা যদি স্থানান্তরে যাওয়া মনস্থ করেন তাহলে তাঁর ওপর নির্ভরশীল অন্যান্যদের স্থানান্তরে যেতেই হয়। মেয়েদের স্বল্প দূরত্বে প্রব্রজনের আধিক্য দেখা যায়।

(2) **জাতিগত ভেদ (Racial Difference) ঃ** শ্বেতকায় ইউরোপীয়রা পৃথিবীর দূর দূরান্তে যত সহজে ছড়িয়ে পড়েছেন অশ্বেতকায়রা তেমনভাবে কখনই ছড়িয়ে পড়েনি। ভারতীয়দের মধ্যে মাড়োয়ারি ও পাঞ্জাবিদের মধ্যে স্থানান্তরে যাওয়ার যে সহজ প্রবণতা দেখা যায়, অন্যান্যদের মধ্যে তা দেখা যায় না।

(3) **বোধশক্তির তারতম্য ঃ** সাধারণভাবে শিক্ষিত ও স্মার্টরা দূর প্রব্রজনে অংশ নেন, কারণ অপরিচিত পরিবেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এঁদের বেশি। কম দূরত্বের বিচরণে, বিশেষ করে গ্রাম থেকে গ্রামে বা গ্রাম থেকে শহরে বিচরণকারীদের মধ্যে অল্প বুদ্ধি লোকদেরই প্রাধান্য।

(4) **শারীরিক সক্ষমতা ঃ** প্রব্রজনকারীরা প্রায়শই শারীরিক দিক থেকে সুস্থ ও সব ও অনেক বেশি কর্মঠ হন। দুর্বল মানুষেরা স্থানান্তরে ধকল সহ্য করতে চান না।

**প্রব্রজনকারীর সামাজিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

প্রব্রজনের, বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে, অন্যতম প্রধান কারণই হল অন্যত্র চাকুরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধে। এটা দেখা গেছে যে নতুন বাসস্থানে স্থিতিলাভ করবার আগে প্রব্রজনকারীদের সংখ্যা কম ছিল। বেকার বা আধা বেকারদের মধ্যে প্রব্রজন প্রবণতা তুলনামূলক ভাবে বেশি (মজুমদার, 1991)।

বুদ্ধিজীবী ও পেশাদারী ব্যক্তিদের মধ্যেই পরিযানের অনুপাত বেশি। অতীতে জার্মানি, রাশিয়া থেকে বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছেন। ভারতবর্ষ থেকেও মস্তিষ্ক চালান ঘটনা প্রচুর পরিমাণে ঘটে। এর কারণ হল বিদেশে উন্নততর গবেষণাগার, শিক্ষার পরিবেশ, গবেষণার নানান সুযোগ সুবিধে ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য।

গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার প্রধান উদ্দেশ্য জীবিকার পরিবর্তন—কৃষি থেকে অকৃষি জীবিকা।

ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত কারণেও প্রব্রজন ঘটে থাকে। এই ধরণের ঘটনা সাধারণত দলগতভাবে ঘটে থাকে। ধর্মীয় বা সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণে কোনো গোষ্ঠীর উপর অত্যাচার হবার ঘটনা ঘটলে ঐ বিশেষ গোষ্ঠীর লোকরা এক স্থান থেকে অপর স্থানে চলে যান। ইহুদিদের দলে দলে জার্মানি ত্যাগ ও ইস্রায়েলে গমন, যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের দক্ষিণাঞ্চলে সরে যাওয়া, হিন্দু ও মুসলমানদের ভারত ভাগের পর দেশত্যাগ, আসামে 'বাঙালী খেদাও' আন্দোলনের ফলে দলে দলে বাঙালীদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা—এই ধরনের প্রব্রজনের ভালো উদাহরণ।

বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিতদের মধ্যে পরিযানের সংখ্যা বেশি। সংসার বড় হয়ে গেলে দায়দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়, ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা কমে যায়।

প্রব্রজনকারীদের মধ্যে বিচলন প্রবনতা তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ একবার যে দেশ ছেড়েছে তার পক্ষে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থবার দেশ-পাল্টানো খুব সহজ ব্যাপার।

প্রব্রজনকারীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব বেশি। এরা নানা বিষয়ে বিশেষ বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত হন।

**প্রব্রজনকারীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ঃ**

- প্রব্রজনকারীরা প্রায়শ উচ্চাভিলাষী ও উদ্যমী হন।
- উচ্চ রুচিসম্পন্ন ও গতিময় জীবন এরা পছন্দ করেন।
- প্রব্রজনকারীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মানসিক ভারসাম্যহীনতা কম। সেই কারণে মানসিক অসুস্থতার ঘটনাও এঁদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি (মজুমদার, 1991)।

অনেক সময় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে দূরে যাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। পরিচিত মুখ ও পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পরিবেশে যেতে স্বভাবতই আমাদের দ্বিধা হয়। দূরত্ব মানেই যোগাযোগের সূত্রটি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, আত্মিক বন্ধন শিথিল হওয়া। অবশ্য যখন স্থানান্তরে গিয়েও নিজের লোক পাওয়া যায়, তখন বিচলনে অনাগ্রহের জোরটা কম হয়। সেই কারণেই স্বল্প দূরত্বের প্রব্রজনের ঘটনা তুলনামূলকভাবে বেশি। ছোটোনাগপুর অঞ্চলে খনি শ্রমিক বা আসাম-দার্জিলিঙের চা বাগানের শ্রমিক কিংবা কয়লাখনি, ইটভাটা শ্রমিকদের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখা যায়। উচ্চাভিলাষীরা সাধারণত দূর দূরান্তেই যান কেননা মধ্যবর্তী পরিসরে প্রায়ই তাঁদের আকাঙ্খার উপযুক্ত কাজ ও পরিবেশ দেখা যায় না।

প্রব্রজনের কারণগুলো এতই জটিল ও ব্যক্তি নির্ভর যে প্রতিটি কার্যকারণের সম্পর্কের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

## 5.6 পরিযানের সূত্রসমূহ (Theories of Migration)

পরিব্রাজনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা কিছু মতবাদ খাড়া করানোর দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। জনসংখ্যা ভূগোলে ( Population Geography) তত্ত্ব (Theory) বাতলানো মুশকিল, কারণ স্থান ও কালভেদে মানুষের আচার-আচরণ পাল্টায়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষের আচার-আচরণকে একটি নিয়মের সূত্রে বাঁধা শক্ত কাজ। এ প্রসঙ্গে Humphery মন্তব্য করেছেন যে পরিযানের তত্ত্ব খাড়া করানো শক্ত। তবু সাম্প্রতিককালে এ সম্পর্কে কিছু মডেল Model ভিত্তিক আলোচনা উল্লেখের দাবি রাখে।

### 5.6.1 Ravenstein-এর মতবাদ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে Ravenstein(1889)-এর প্রচেষ্টাকে শুরু হিসেবে ধরলে পরিযান তত্ত্বের সময়কাল 100 বছরেরও বেশি বলে ধরতে হবে। Ravensteinঊনবিংশ শতাব্দীতে জনগণনা (Census) থেকে সেখানকার অধিবাসীদের জন্মস্থান সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে তাদের অন্তর্দেশীয় পরিযান সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হল।

**(1) পরিযান ও দূরত্ব (Migration & Distance) :** প্রবাসীদের একটা বড় অংশ কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে পরিব্রাজন করেন। এ ধরণের পরিযান সব দেশের জনগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে 'পরিযান ঢেউ' (Currents of migration) তৈরি হয়, যার লক্ষ্য থাকে বড় বড় বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। উপরের আলোচনা থেকে আমরা কতকগুলো সিদ্ধান্তে আসতে পারি। তা হল ঃ (i) দূরত্বের সঙ্গে পরিযানের সম্পর্ক আছে। (ii) অনেক দূরের প্রবাসীরা পরিযানের ক্ষেত্রে বড় বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রে যাওয়া পছন্দ করেন।

Ravenstein দেখিয়েছেন যে (iii) অধিকাংশ প্রব্রজনকারীরা কম দূরত্বে পরিযান করেন এবং অল্প সংখ্যক মানুষ দূরে যান। এই মনোভাবকে Ravenstein "distance decay" বলেছেন **(চিত্র 2.3)**।

চিত্র 2.3 পরিযান ঃ Distance-Decay মডেল

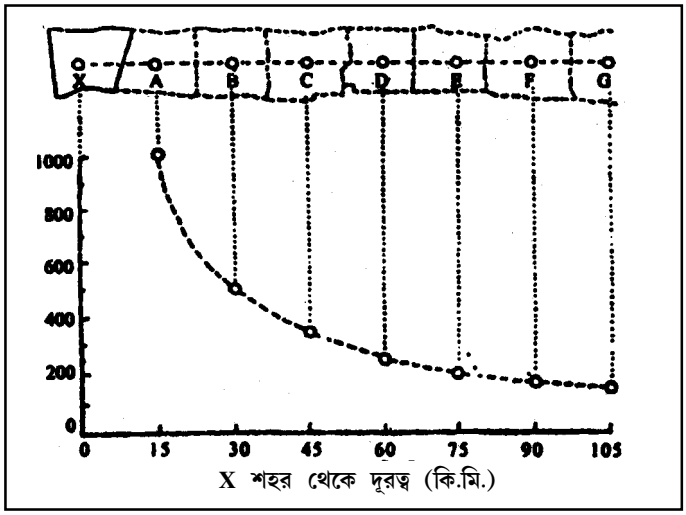


(A) x -নগরের কাছে জেলাসমূহের অবস্থান

(b) x - নগরের থেকে দূরত্বের সম্পর্ক ও x-নগরের পরিযায়ী ব্যয় সংখ্যা

**X-নগর থেকে পরিযায়ীদের বিচলন (কিমি-তে)**

| জেলার নাম | শহর থেকে দূরত্ব কিমি | পরিযায়ী ব্যক্তিদের সংখ্যা (প্রতি বছর) |
|---|---|---|
| A | 15 | 1000 |
| B | 30 | 500 |
| C | 45 | 350 |
| D | 60 | 250 |
| E | 75 | 200 |
| F | 90 | 175 |
| G | 105 | 150 |

**(2) পর্যায়ক্রমে পরিযান (Migration by Stages) :** দ্রুত বিকাশশীল শহরের আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা ঐ শহরে এসে জড়ো হন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে যে জনশূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা আরও দূরের প্রবাসীদের অভিবাসনের (immigration) ফলে পূর্ণ হয়। এই পরিযান ততক্ষণ চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোনো দ্রুত বিকাশশীল শহরের প্রভাব ধাপে ধাপে দেশের সবচেয়ে দূরবর্তী প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়। (চিত্র 2.4)

**(3) ঢেউ ও বিপরীত ঢেউ (Current & Counter-Stream) ঃ** প্রব্রজনের প্রতিটি ঢেউ (current)-এর পরিপূরক (compensating) হিসাবে বিপরীত ঢেউ (counter current) সৃষ্টি হয়।

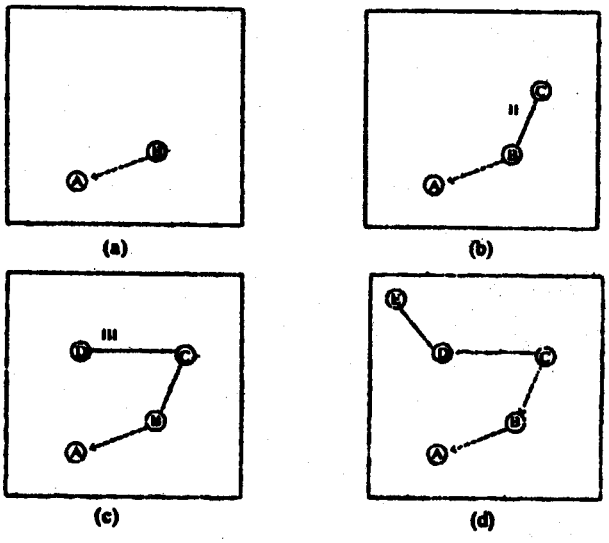


চিত্র 2.4 পর্যায়ক্রমে পরিযান

(4) **গ্রাম-শহরের পার্থক্য** ঃ গ্রামবাসীদের তুলনায় বাসিন্দাদের মধ্যে পরিযান প্রবণতা কম।

(5) **মহিলাদের প্রাধান্য** ঃ কম দূরত্বের পরিযানের ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্যই বেশি।

(6) **কারিগরিবিদ্যা ও পরিযান** ঃ কারিগরি অগ্রগতির সাথে সাথে প্রব্রজনের মাত্রা বাড়ে।

(7) **পরিযানের পেছনে উদ্দেশ্য** ঃ প্রধানত অর্থনৈতিক কারণ পরিযানের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পরবর্তীকালের আলোচনায় দেখা গেছে Ravenstein-এর সাধারণ নীতিসূত্রগুলো নীতিগতভাবে ঠিক। তাঁর অনেক ধারণা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

## 5.6.2. Lee-র মতবাদ

Lee (Everette Lee)-র মতবাদকে কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছেন। তিনি অবশ্য তিনটি মতবাদের ওপর জোর দিয়েছেন। এগুলো হল (1) প্রব্রজনের আয়তন সম্পর্কিত মতবাদ, (2) প্রব্রজন প্রবাহ ও (3) প্রব্রজনকারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নীচে বিস্তারিতভাবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল।

**(1) প্রব্রজনের আয়তন সম্পর্কিত মতবাদ (Hypothesis Related to Volume of Migration) ঃ**

(a) কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে প্রব্রজনের মাত্রা ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্যের (diversity of areas) ওপর নির্ভরশীল।

(b) প্রব্রজনের আয়তন জনসাধারণের বৈচিত্র্য (diversity of people) ওপর নির্ভরশীল।

(c) প্রব্রজনের আয়তন বিচলনে বাধাদানকারী শক্তিগুলির কার্যকারিতার ওপর নির্ভরশীল।

(d) আর্থিক অস্থিরতার সাথে পরিযানের প্রব্রজনের আয়তন নির্ভরশীল।

(e) কঠোর বাধা নিষেধ না থাকলে সময়ের সাথে সাথে প্রব্রজনের আয়তন ও হার বাড়ার প্রবণতা দেখা যায়।

(f) কোনো দেশ বা অঞ্চলের সমৃদ্ধির গতি প্রকৃতির ওপর প্রব্রজনের আয়তন ও হার নির্ভরশীল।

**প্রবাহ ও বিপরীত প্রবাহ সম্পর্কিত মতবাদ (Hypothesis Related to Stream and Counter-Stream of Migration) ঃ**

(a) সুনির্দিষ্ট প্রবাহগুলোর মধ্যেই বেশিরভাগ বিচলন ঘটে থাকে।

(b) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহেই একটি বিপরীত প্রবাহ (counter) তৈরি হয়।

(c) প্রব্রজন প্রবাহের উৎপত্তির কারণসমূহ যখন উৎসস্থলের ঋণাত্মক ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তখনই ঐ প্রব্রজন প্রবাহের উচ্চ কার্যকারিতা দেখা দেয়।

(d) উৎস ও গন্তব্যস্থলের মধ্যে সাদৃশ্য যত বেশি হবে প্রব্রজন প্রবাহ ও তার বিপরীত প্রবাহ ততই দুর্বল হবে।

(e) মধ্যস্থতাকারী বাধাসমূহ (intervening obstacles) যতই প্রবল হবে প্রব্রজন প্রবাহের কার্যকারিতা ততই বাড়বে।

(f) প্রব্রজন প্রবাহের কার্যকারিতা অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার তুলনায় অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের সময় প্রব্রজন প্রবাহের কার্যকারিতা বেশি।

**প্রব্রজনকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে প্রব্রজনের আয়তন সম্পর্কিত মতবাদ (Hypothesis Related to the Characteristics of Migrants) ঃ**

(a) প্রব্রজন ব্যক্তি-নির্ভর।

(b) গন্তব্যস্থলের ধনাত্মক প্রভাবে যাঁরা প্রভাবিত হন তাঁরা যথার্থই নির্বাচিত প্রব্রজনকারী।

(c) উৎসস্থলের ঋণাত্মক প্রবাবে যাঁরা প্রভাবিত হন তাঁরা নঞর্থক প্রব্রজনকারী। উৎসস্থলের ঋণাত্মক প্রভাব যদি খুব প্রবল ও ব্যাপক হয় তাহলে কে যে বিচলন করবে, কে করবে না তা নির্ধারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(d) সমস্ত প্রব্রজনকারীকে হিসাবের মধ্যে ধরলে নির্বাচিত প্রব্রজনকারীদের বিন্যাস bi-model হবে।

(e) মধ্যস্থতাকারী বাধাসমূহ যত বেশি হবে প্রব্রজনকারীরাও তত সুনির্দিষ্ট হবে। (চিত্র 2.5)

(f) জীবনের একটি বিশেষ সময়ে প্রব্রজনের মাত্রা সব থেকে বেশি এবং ঐ বয়সের নিরিখেই প্রব্রজন নির্ধারিত হবে।

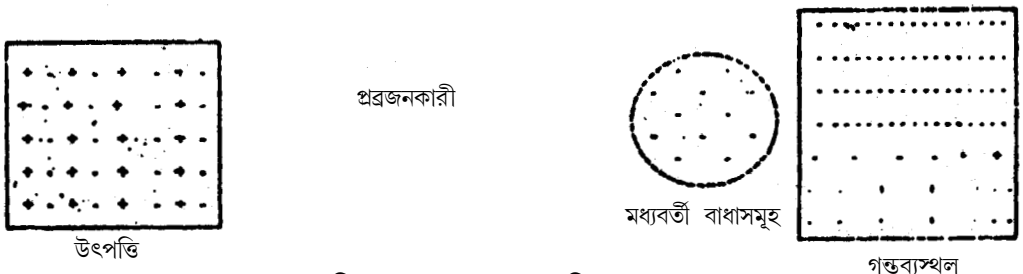


চিত্র 2.5 ঃ Lee-র পরিযান মডেল।

### 5.6.3 Zelinsky-র মডেল

Zelisky 1971 সালে পরিযান সম্বন্ধে এক সুন্দর মত দিয়েছিলেন, যা Mobility Transition Model নামে খ্যাত। তাঁর এই মডেল জনমিতি পরিবর্তন (Demographic Transition) মডেলের সাথে সম্পর্কিত। এই মডেলে Zelinsky যে চার প্রকার পরিযানের (আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে শহর) কথা বলেছেন তা ঐ জনমিতি পরিবর্তন মডেলের সাথে সম্পর্কিত।

এই মডেলের প্রথম পর্যায়ে যখন জনবৃদ্ধি কম ছিল (কারণ মৃতুহার ছিল খুব বেশি) তখন পরিযানও খুব কম ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 1931সালে ভারতবর্ষে মাত্র 10 শতাংশ মানুষ তাঁদের জন্মভিটার বাইরে বাস করতেন। এই সময় বাইরে খবরাখবর মিলত কম এবং অধিকাংশ মানুষ তাঁদের জন্মভিটাতেই জীবন কাটিয়ে দিতেন। এই সময় মানুষ কাজের জন্য চাষের ক্ষেতে যেতেন এবং কশ্চিৎ বাজার ও উৎসবের জন্য বাইরে যেতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মৃত্যুহার কমে যাওয়ায় জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। উচ্চ জন্মহার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। জমির ওপর অত্যধিক চাপ, আরও ভালো পরিবহনের সুযোগ, দেশ আবিষ্কার, বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অন্যান্য স্থান সম্পর্কে আরো তথ্য মানুষকে বহির্মুখী করে তুলল। মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিযান করল (চিত্র 2.6)। বসত এলাকা ছেড়ে নতুন দিগন্তের পথে পাড়ি জমাল (চিত্র 2.6)। গ্রাম থেকে বিকাশশীল শহরের দিকে (চিত্র c) এবং শহর থেকে নগরের দিকে (চিত্র d) পাড়ি জমাল। ইউরোপ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রমুখী মানুষের ঢল এই ধরনের নতুন বসত এলাকায় বসবাসের জন্য পরিব্রাজনকে বোঝায়।

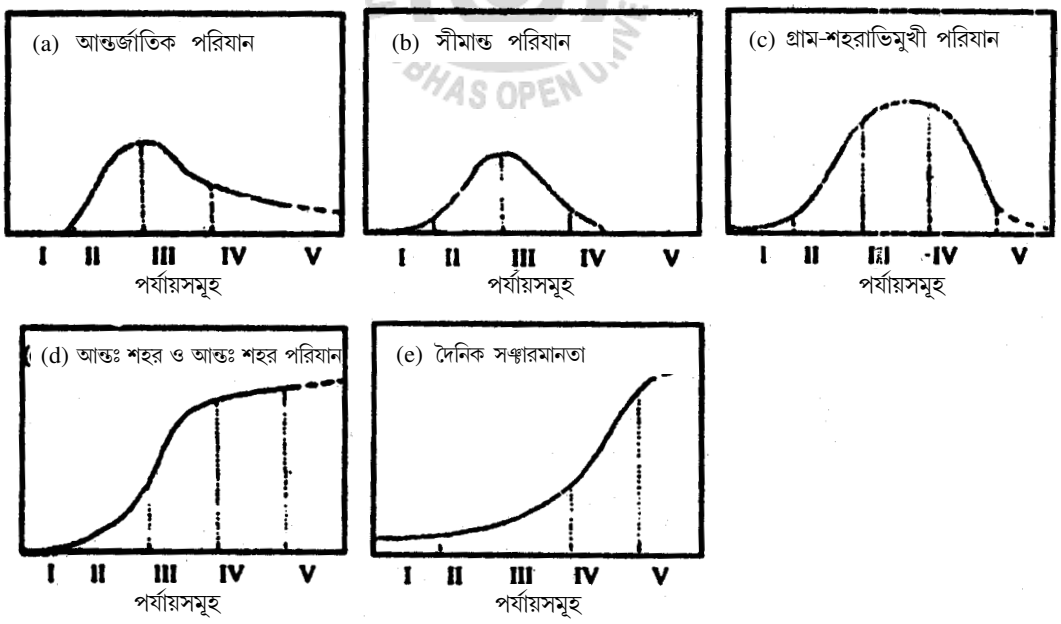


চিত্র 2.6 ঃ Zelinsky-র প্রচলন পরিবর্তন মডেল

Zelinsky -র তৃতীয় পর্যায় পরিবর্তনশীল। এটি জনমিতি পরিবর্তনশীল মডেলের তৃতীয় পর্যায়ের সাথে খাপ খায়। এই সময় জন্মহার কমে গেছে। সেই সঙ্গে জনবৃদ্ধিও। আন্তর্জাতিক পরিযানের সংখ্যা কমে গেছে। নতুন কৃষি জমি পাবার আশাও কম। (যেমনটি যুক্তরাষ্ট্রে 1930 সালে ঘটেছিল)। কিন্তু একই সাথে গ্রাম থেকে শহরে পরিযান এবং বিভিন্ন শহরের মধ্যে ও দুই শহরের মধ্যে পরিযান ঘটে চলল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড বাড়ার সাথে সাথে বিশেষ ধরণের বৃত্তির (ডাক্তারী, অধ্যাপনা) খোঁজে মানুষ বেরিয়ে পড়ল।

চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে কম জন্ম ও মৃত্যুহার নতুন উন্নত সমাজে জনবৃদ্ধি ঘটাল। এই সময় দুই শহরের মধ্যে ও আন্তঃশহর পরিযান প্রাধান্য লাভ করেছিল। কম উন্নত দেশ থেকে বেশি উন্নত দেশে দক্ষ শ্রমিকের পরিযান ঘটল।

সমাজ যখন আধুনিক হল তখন দৈনিক সঞ্চারমানতা (চিত্র e) বাড়ল। ব্যক্তিগত মোটরযানের দৌলতে মানুষ সহজেই এক ঘন্টার মধ্যে বহু দূরে যেতে পারে এবং এটাই বর্তমানে ঘটে চলেছে।।

## 5.7 পরিযানের বিভিন্ন কারণসমূহ (Various causes of Migration)

পরিযানের প্রধান কারণ তিনটি—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক। নীচে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল—

**(1) রাজনৈতিক কারণ (Political Factor) ঃ** রাজনৈতিক কারণে যে সব ব্যক্তি এক দেশ থেকে অন্যদেশে বাস করতে বাধ্য হন তাঁদের 'বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি' (Refugee) বলে। বর্তমান দিনে এই ধরণের ব্যক্তি সংখ্যা বাড়তির দিকে, তা কমিউনিস্ট হোক বা সামরিক শাসনভুক্ত দেশ হোক। কমিউনিস্ট দেশগুলোতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না, স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ থাকে না, তাই কিছু স্বাধীনচেতনা মানুষ অন্য দেশে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। ইদানিং সারা পৃথিবীতেই কমিউনিস্ট আন্দোলন এক চ্যালেঞ্জের মুখে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো, এমনকি খোদ রাশিয়ার দিকে তাকালেই এ কথা পরিষ্কার হয়। খুব সাম্প্রতিককালে কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনের বহির্প্রকাশ ঘটেছিল পূর্ব জার্মানীতে, যার ফলে দুই জার্মানীর মিলন ঘটেছে।

অন্যত্র দেখা গেছে 1970 -এর দশকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়ায় (কাম্বোডিয়া) কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ ঐ দুই দেশ ত্যাগ করেছেন। কিছু ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে আর বেশিরভাগই থাইল্যান্ডে অস্থায়ী ছাউনিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

যুদ্ধের ফলেও অনেক সময় মানুষ বাস্তুচ্যুত হন। যুদ্ধের সময় শত্রুসেনার ভয়ে (যেমনটি হয়েছিল1970 সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়) বা যুদ্ধ বিরতির পর দেশের সীমানা পরিবর্তিত হলেও কোনও দেশের অধিবাসীরা সেই দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। চীন কর্তৃক তিব্বত আক্রমণের ফলে লামা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। খুব সাম্প্রতিককালে শ্রীলঙ্কায় অভ্যন্তরীণ গন্ডগোলের দরুন বেশ কিছু সিংহলী জাফনা থেকে মাদ্রাজে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। আবার দেশ বিভাগের পর হিন্দুস্থান (ভারত) থেকে এদেশের সংখ্যালঘু মুসলিমরা ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম) গিয়ে ঘর বেঁধেছেন। অন্যদিকে, মুসলিমপ্রধান পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম) থেকে বহুসংখ্যাক হিন্দু ভারতে এসে পাকাপাকিভাবে ডেরা বেঁধেছেন (Heer, et al,1994)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুদের স্রোতের ধারা আজও অব্যাহত আছে। শুধু হিন্দু কেন, ইদানীংকালে অর্থনৈতিক কারণেও বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু মুসলিম পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে বসবাস শুরু করেছেন।

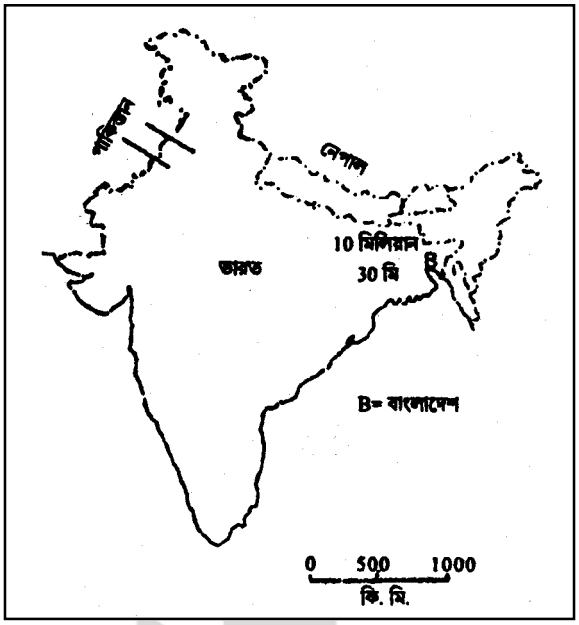


চিত্র 2.7 ঃ ভারতীয় মহাদেশে বাধ্যতামূলক পরিযান (1974)

এ তো গেল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগ। যেমন কয়েক বছর আগে অসমের রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন বেশ কিছু বাঙালি পরিবার পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে ডাঙ্গি শিবিরে এসে পাকাপাকিভাবে আশ্রয় নিয়েছেন। দার্জিলিং-এ গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের ফলে কয়েকটি বাঙালি পরিবার তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে সমতলে চলে এসেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি চাকুরিরত বাঙালিকেও সমতলে বদলি করে আনা হয়েছে। হাল আমলে পাঞ্জাবে খালিস্তানপন্থীদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী জনিত কারণে সেখানে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড কিংবা কাশ্মীর উপত্যকায় রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন উভয়রাজ্য থেকেই বেশ কিছু শরণার্থী দিল্লির আশেপাশে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছেন। মোট কথা, কোন স্থানে রাজনৈতিক গন্ডগোল কখন পাকাপাকিভাবে, কখন সাময়িকভাবে কিছু লোককে সেই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

**(2) অর্থনৈতিক কারণ (Economic Factor) ঃ** (i) **কাজের সুযোগ (Employment Opportunities)** –অর্থনৈতিক কারণ অনেক সময় কোনো দেশের বাসিন্দাদের বাস্তুত্যাগী করে তোলে। বেঁচে থাকতে গেলে অন্নের প্রয়োজন। আর অন্নের সংস্থানে টান পড়লেই লোক-রুজি-রোজগারের তাগিদে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবেন*। ঠিক এমনটি ঘটেছিল আয়ারল্যান্ডে 1845 থেকে 1851 সালের মধ্যে। ঐ সময়ে আয়ারল্যান্ডের প্রধান খাদ্য আলুতে মড়ক

অরণ্যের কবি ভবতোষ শতপথীর কবিতায় এই দুঃখী মানুষের যন্ত্রণার কথা বর্ণিত হয়েছে—

এমন ঘরে জন্ম দিলি, কেন আমার মা,
সারা জীবন ঘুরে ঘুরেও শান্তি পেলাম না।
অনেক দুঃখে রাতারাতি হলাম দেশান্তর
রইল পড়ে বাস্তুভিটে, করুণ কুঁড়ে ঘর'।

লেগেছিল। আর দেশের অধিকাংশ জমি ছিল অনাবাসী ব্রিটিশের হাতে, জমির ভালোমন্দের দিকে তাঁদের কোন রকম নজর ছিল না। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে অক্ষম কয়েক লক্ষ আইরিশ ভালো কাজের সন্ধানে দেশ ত্যাগ করেছিলেন।

বেকাররা চাকরি বা কাজের আশায় কোন বড় শহর, খনি এলাকা, এমন কি বিদেশেও পাড়ি জমান। ঊনবিংশ শতাব্দিতে নতুন আবিষ্কৃত দেশগুলোতে যে সব প্রবাসী বসবাস করতে যেতেন তাঁরা ছিলেন গ্রামবাসী। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার অধিকাংশ প্রবাসী হলেন শহরবাসী। (চিত্র 2.8) কলকাতা শহরই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এই শহরের বয়স তিনশ হলেও এখানে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। আর তার মূলে রয়েছে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে এখানে হরেক রকম রুজি-রোজগারের উপায়। যে সব দেশে পারিশ্রমিক বেশি, সেখানে মানুষজন ভিড় করেন। যেমন বর্তমান দিনে উপসাগরীয় দেশগুলোতে (Gulf countries) ভারত থেকে অনেক লোক গেছেন। সাম্প্রতিককালে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম শহর শিলিগুড়িতে রুজি-রোজগারের প্রচুর সুযোগ থাকায় বহুদূরের গ্রাম, এমন কি আশেপাশের ছোটোখাটো শহর থেকে প্রচুর লোকজন আসছেন।

**(ii) জমি পাওয়ার সুযোগ (Availability of Land) ঃ**

জমির অভাব বা জমি খুব অনুর্বর বলে যে সব চাষি পরিবার নিজের জমিটুকু দিয়ে চালাতে পারেন না, তাঁরা যদি অন্য দেশে সুবিধে মত বেশি জমি পান তবে সেখানে বসবাস করতে যান। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে এই ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। অতীতে এই ধরনের ঘটনা বেশি। কারণ তখন লোকজন ছিল কম। জমি অনাবাদী থাকত। অতীতে দেখা গেছে যে ইউরোপীয়রা যুক্তরাষ্ট্রে, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই সব প্রবাসীদের অধিকাংশই ছিলেন হয় ভূমিহীন, নয় কম জমির মালিক। বিংশ শতকের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে এখানে জমি ছিল অপর্যাপ্ত, মানুষ ছিল কম। কারণ ম্যালেরিয়া প্রকোপে ফি-বছর অনেক লোক মারা যেতেন। ফলে জমি পতিত থাকত। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার বহু গ্রাম সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে অনেক জমিদার তাঁদের এলাকায় বসবাসের জন্য বিনে পয়সায় জমি দিতেন। এমন কি, যতদিন না পর্যন্ত জমি ফসল উৎপাদনের উপযোগী হত ততদিন পর্যন্ত কর মুকুব করে দিতেন। অনেকটা একই কারণের জন্য দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-কবলিত মেদিনীপুর ময়না থানা মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা-কবলিত কালান্তর অঞ্চলে (নওদা থানা), উর্বর জমির টানে আশপাশের এলাকা থেকে লোকজন এসে বসবাস করছেন। (Sen,1988; Sen and Sen, 1989)।

খুব একটা অসচ্ছল অবস্থায় না থাকলেও মেক্সিকোর কিছু সংখ্যক চাষি তাঁদের ভাগ্য ফেরাতে যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছেন। সচরাচর এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন দু'দেশের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের আকাশ পাতাল পার্থক্য দরিদ্র দেশের অধিবাসীদের সচ্ছল দেশের প্রতি আকর্ষণ করে, যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে উচ্চ বেতনের লোভে অনেক ভারতবাসী, বিশেষ করে কেরলবাসীদের সেখানে আকর্ষণ করেছে।

**(iii) সম্পদের আশায় (Lure of Wealth) ঃ**

অনেক বাস্তুত্যাগী ভাবেন যে বিদেশে গেলে তাঁদের আয় বাড়বে, সংসারেরও স্বচ্ছলতা আসবে। কিন্তু কেউ কেউ রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। কোন জায়গায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হলে বহু দেশ থেকে লোকজন সেখানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। এজন্য তাঁরা প্রতিকূল পরিবেশে চরম দুঃখ-কষ্ট পর্যন্ত স্বীকার করেন। ষষ্ঠদশ সপ্তদশ শতাব্দীতে মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় সোনার খনি আবিষ্কার পোর্তুগিজ ও স্পেনীয়দের সে দেশে টেনে এনেছিল। তবে মজার ব্যাপার হল যে সোনা ফুরিয়ে গেলে খনিভিত্তিক এই সব শহর খুব তাড়াতাড়ি জনশূন্য হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে এই রকম অনেক 'ভুতড়ে শহর' (Ghost town) দেখতে পাওয়া যায়।

## অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী জনপ্রবাহ

| | | ভারত ঃ পরিযানের কারণ, **1981** (শতকরা হিসেবে) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কারণ | মোট পরিযানের % হার | গ্রামীন | | | শহর এলাকা | | |
| | | মোট | পুরুষ | স্ত্রী | মোট | পুরুষ | স্ত্রী |
| বিবাহ | 51.51 | 58.18 | 4.87 | 79.46 | 28.61 | 1.05 | 46.78 |
| পরিবারের অন্যত্র চলে যাওয়া | 19.23 | 16.17 | 33.23 | 9.61 | 30.47 | 26.89 | 32.07 |
| চাকরি | 10.67 | 9.11 | 20.07 | 1.28 | 18.15 | 43.10 | 4.24 |
| শিক্ষা | 2.23 | 2.08 | 4.06 | 0.47 | 3.13 | 6.81 | 2.40 |
| অন্যান্য | 16.23 | 14.46 | 37.77 | 9.18 | 19.64 | 22.15 | 14.51 |
| মোট | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Source : Census of India, 1981, Geographical Distribution of Internal Migration

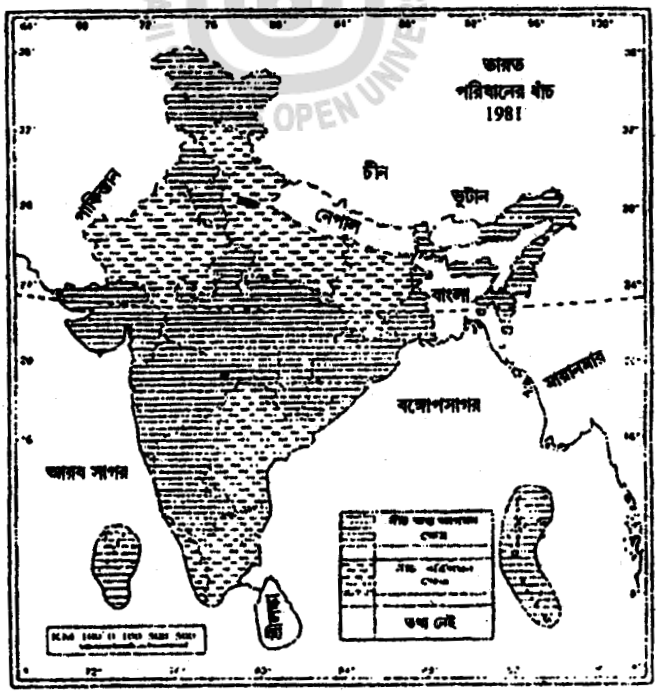


চিত্র 2.8

**(3) প্রাকৃতিক কারণ (Physical Factor) ঃ**

যে সব প্রাকৃতিক কারণের জন্য মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন, তার মধ্যে আছে বন্যা, নদীজনিত ভূমিক্ষয় ও খরা। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে পৃথিবীর শতকরা 40 ভাগ ও 20 ভাগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাক্রমে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় থেকে ঘটে থাকে—(i) বন্যা-কবলিত এলাকা থেকে মানুষ সরে আসতে বাধ্য হন, তবে সব সময় বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস যে মানুষের ক্ষতি করে তা নয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মার চর এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। তা সত্ত্বেও চর এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের ডেরা ছেড়ে যান না। অবশ্য উল্লেখ করতে হয়যে এখানকার ঘরবাড়িগুলো খুবই অস্থায়ী ধরনের। বন্যার জল বাড়লে তা সরিয়ে নেওয়া হয় (Sen and Sen, 1989)। বন্যার পর পলি পড়ার দরুণ এখানকার জমি উর্বর হয়ে ওঠে। 'চাঁই মন্ডল" নামে তপশিলি সম্প্রদায়ের এক শ্রেণির লোক এখানে বাস করেন যাদের প্রধান কাজই হল মাছধরা। বাংলাদেশের সন্দীপ বা ভোলা দ্বীপে কোন কোন বছর প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে। আর তাতে করে হাজার মানুষ মারা যান। তবুও অর্থনৈতিক কারণেই এখানকার বাসিন্দারা এই দ্বীপগুলোতে বাস করেন। (ii) অন্যদিকে, নদীর ভাঙনে কোন গ্রাম ধ্বংস হতে বসলে তবেই গ্রামবাসীরা সে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। বাঙলায় 'রামায়ণ' রচয়িতা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ভাগীরথীতীরস্থ ফুলিয়া এমনি এক গ্রাম (Sen and Sen, 1978)। (iii) নদীর গতিপথ ক্রমাগত পরিবর্তনের জন্যও অধিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। গঙ্গা বা পদ্মা পশ্চিমবঙ্গের এমনি এক নদী। এর গতিপথ বার বার পরিবর্তনের ফলে বহুলোকের অনেক কীর্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই একে 'কীর্তিনাশা' বলা হয়। (iv) বন্যার মত আর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় হল খরা। প্রচন্ড উত্তাপে ও অনাবৃষ্টি থেকে যেমন খরা হতে পারে তেমনি আবার পর পর কয়েক বছরের অনাবৃষ্টি থেকেও খরা হতে পারে। উত্তর আফ্রিকার 'সাহেল' অঞ্চলে শেষোক্ত কারণে খরা দেখা দিয়েছিল। এখানে জমি খুব একটা উর্বর নয়, তদুপরি খরার কারণে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। শত শত বাসিন্দা—যাদের অধিকাংশই হলেন যাযাবর— তারা ঐ অঞ্চল ছেড়ে তাঁবুতে কিংবা শহরে আশ্রয় নিলেন। 1930 -এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে খরার দরুণ অনেকে ওকালাহামা ও তার লাগোয়া সমতল রাজ্যগুলো থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গিয়েছিলেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশের বদান্যতা মানুষকে সেখানে ঘর বাঁধতে হাতছানি দেয়। কিছু দিন আগেও দেখা যেত যে আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা প্রকৃতির নির্মল ও স্নিগ্ধ পরিবেশ উপভোগ করার জন্য শহরের কোলাহল থেকে দূরে অথচ শহরের উপকণ্ঠে বাগানবাড়ি বানাচ্ছেন। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে মোটর গাড়ি থাকার সুবিধের জন্য লোকে শহর থেকে দূরে বসবাস করেন।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু মানুষকে বেশি টানে। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল ভূমধ্যসাগরীয় তীরস্থ স্পেন ও ফ্রান্স, কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের মনোরম জলবায়ু সেখানে লোকসমাবেশ ঘটিয়েছে।

আজ থেকে 100 বছর আগেও দার্জিলিং (শহর) ছিল অখ্যাত এক গ্রাম। কিন্তু এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ ব্রিটিশদেরকে এখানে টেনেছিল। তাঁরাই একে পরবর্তীকালে বাংলার গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন। সেই থেকেই এই শহরে বাড়বাড়ন্ত।

পূর্ববর্তী কারণগুলো মানুষকে যেমন ঘর ছাড়তে বাধ্য করে, তেমনি এর বিপরীত অবস্থা কোন স্থানে সমাগম ঘটায়। কোন জায়গায় সুবিধেজনক শর্তে জমি পাওয়া, কাজের সুযোগ এবং প্রবাসীদের অবস্থা ফেরানোর আকাঙ্খা মানুষকে সেই স্থানে ঘর বাঁধতে হাতছানি দেয়। এ ছাড়াও কোন দেশে একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা সেই সম্প্রদায়ের লোকদের অন্য দেশে যেতে বাধ্য করে। এই সব স্বতস্ফূর্ত কারণ ছাড়াও মানুষ অনেক সময় অন্যখানে যেতে বাধ্য হন। পরে বিস্তারিতভাবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**(4) সামাজিক কারণ ঃ**

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা (Religious Tolerance) ঃ কোন কোন দেশে বিশেষ ধর্মের প্রতি আনুগত্যকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। আবার কোন দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্দ্বিধায় তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারেননা। সেই সব ক্ষেত্রে ঐ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা যেখানে বা যে সব দেশে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশি বাস করেন, সেখানে চলে যান। যেমন ইহুদিদের জার্মানি থেকে ইজরায়েলে চলে আসা কিংবা স্বাধীনতার পর হিন্দুদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে পরিযান বা বিপরীতভাবে মুসলিমদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিযান ধর্মীয় কারণের জন্যেই ঘটেছে।

**(5) বাধ্যতামূলক পরিযান (Forced Migration) ঃ** (চিত্র 2.9)

যদিও অধিকাংশ পরিযানই স্বেচ্ছা প্রণোদিত অর্থাৎ পরিযায়ী ব্যক্তি তাঁর ভাগ্য ফেরানোর উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়েন, তবুও এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে অন্যদের স্বার্থে কিছু ব্যক্তিকে পরিযানে বাধ্য করা হয়। (i) অতীতে দেখা গেছে যে অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশ স্থাপন করতে বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে রাশিয়াতে বন্দীদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। (ii) ক্রীতদাসদের বন্দী করে অন্য দেশে পাঠানোও বাধ্যতামূলক পরিযানের মধ্যে পড়ে। অনেক দেশে কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র, লাতিন আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাগিচা চাষের প্রয়োজনে দাসেদের (slaves) আনা হয়েছিল। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের এত বেশি সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রে আনা হয়েছিল যে বর্তমানে তাঁরা সেখানকার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ জুড়ে আছেন। (iii) বাধ্যতামূলক পরিযানের আর একদিকে দেখা যায় যে কোনো দেশে কিছু কিছু ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অবাঞ্ছিত মনে করা হয় ও তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। কোন দেশ থেকে বিদেশি কূটনৈতিকদের বিতাড়ন এই পর্যায়ে পড়ে। কোনও দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বন্ধ হলে সেই দেশের কূটনৈতিকদের বিতাড়ন এই পর্যায়ে পড়ে। কোনও দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বন্ধ হলে সেই দেশের কূটনৈতিকদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। (iv) অতি সাম্প্রতিককালে পল পটের ((Pol Pot) শাসনকালে কাম্পুচিয়ার শহরবাসীদের গ্রামে অভিভাসন, কিংবা (v) উগান্ডা থেকে এশিয়বাসীদের নির্বাসনও বাধ্যতামূলক পরিযানের আওতায় আসে।

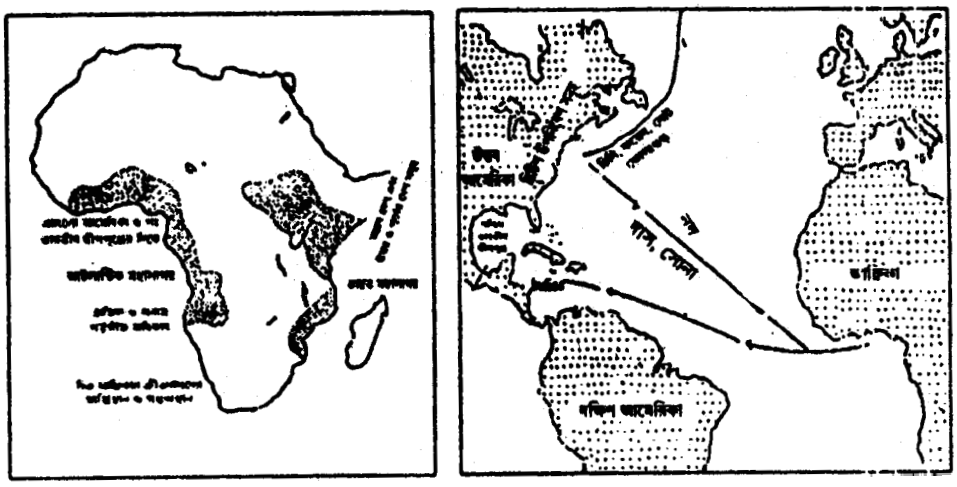

চিত্র 2.9 ঃ বাধ্যতামূলক পরিযান

## 5.8 পরিযানে প্রয়াস-আকর্ষণ মতবাদ

একথা ঠিক যে বিভিন্ন প্রকার অসাম্যই হল পরিযানের প্রাথমিক কারণ। এ রকম একটা ধারণা থেকে 'প্রয়াস-আকর্ষণ' (Push) মতবাদ জন্ম নিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিযানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ মতবাদ প্রয়োগ করা হয়। 'প্রয়াস' উপাদানগুলো হলো সেইসব প্রভাব যা পরিযান সৃষ্টি করে। এগুলো হল এইসব প্রতিকূল অবস্থা যা কোনও ব্যক্তির অন্য কোন স্থানে গিয়ে বাস করার কারণ। এগুলোর মধ্যে আছে কম বেতন, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, বেকারি, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। 'আকর্ষণ' উপাদানগুলো হল গন্তব্যস্থলের (আকাঙ্ক্ষিত স্থানের) প্রতি প্রলোভন, তা সে বাস্তব হোক বা কাল্পনিক হোক। এগুলোর মধ্যে আছে উচ্চ বেতন, সস্তায় জমি, বসবাসের পক্ষে কাম্য আকর্ষণীয় অবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ-সুবিধে নীচে আমরা সেগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

প্রব্রজনে প্রয়াস উপাদান (Push Factors of Migration)

**পরিযানের প্রয়াসজনিত উপাদানগুলো নিম্নরূপ ঃ**

(1) লোকসংখ্যা দ্রুত স্বাভাবিক বৃদ্ধির দরুণ প্রাকৃতিক সহায় সম্পদের ওপর অসম্ভব চাপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ ও চাষযোগ্য জমির মধ্যে যে স্বাভাবিক অনুপাত, তা ব্যাহত হওয়ার দরুণ শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার আর সম্ভবপর হয় না। উদ্বৃত্ত এই শ্রমিকদের বিকল্প কোনো শ্রমের ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা জীবিকান্বেষণে স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হন। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল বা শিল্পাঞ্চলে দলে দলে লোক চলে আসার এটি একটি অন্যতম কারণ। সাধারণত অদক্ষ শ্রমিকরাই এতে বেশি অংশ নেন।

(2) প্রাকৃতিক সহায় সম্পদের দ্রুত অবলুপ্তি। বন্যা, ধ্বংস, ভূমিক্ষয়, বনজ ও খনিজ সম্পদ ইত্যাদি নষ্ট হবার ফলে জীবনধারণ অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

(3) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বছর বছর বন্যার তান্ডব, উপর্যুপরি খরা বা আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তন।

(4) সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় জীবনে গভীর অস্থিরতা।

(5) ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কাজের অভাব।

**প্রব্রজনে আকর্ষণ / বিকর্ষণ উপাদান**

নীচের আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে কিছু কিছু উপাদান আছে যা একদিকে মানুষকে তার স্বদেশ ছাড়তে ইন্ধন জোগায়, তেমনি কিছু কিছু কারণ আছে যা মানুষকে কোন কোন স্থানে বসতি স্থাপনে হাতছানি দেয় সেইসব উপাদানগুলো হল—

(1) উন্নত ধরণের প্রযুক্তি ও শিল্প শহরাঞ্চলে বহু লোককে যেমন টেনে আনে, তেমনি চাষবাসে ট্রাকটার বা পাওয়ার টিলারের ব্যবহার বহু কৃষি শ্রমিককে অন্যত্র কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য করে।

(2) কিছু কিছু সরকারি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। চাষের জমির ঊর্দ্ধসীমা নির্ধারণের ফলে বহু লোক যেমন চাষবাসের বিকল্প সন্ধান করছে, তেমনি উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের ফলে অনেকেই চাষবাসের উৎসাহী হন।

(3) আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবের উপস্থিতি যেমন অনেকে বাসস্থান নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, তেমনি অনেকেই আবার নিকট আত্মীয়দের থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করেন।

**প্রব্রজনে আপেক্ষিক পছন্দ অপছন্দের ভূমিকা (Role of Relative Desirability in migration)**

প্রব্রজনের কার্যকরণ বিশ্লেষণে আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রকল্পের চেয়ে আপেক্ষিক পছন্দ-অপছন্দের ভূমিকা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। আপেক্ষিক পছন্দ-অপছন্দের ধারণায় কোন এক স্থানের আকর্ষণ বিষয়গুলোর সাথে অন্য অনেকস্থানের (নিজ বাসস্থানেরও) আকর্ষণীয় বিষয়গুলোর তুলনামূলক বিচার করা হয়ে থাকে। পরিযাত্রীরা এরপর যে স্থান তার কাছে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয় সেখানেই বসবাস করবার জন্য যাবেন, অন্যথায় তিনি বাসস্থান পরিবর্তন করবেন না।

প্রব্রজনে আগ্রহী ব্যক্তির সামনে পথ খোলা থাকে। একাধিক স্থান তাঁকে একই সঙ্গে প্রব্রজনে হাতছানি দেয়। প্রতিটি স্থানেই স্থিতিশীল হবার পক্ষে কিছু কিছু অনাকর্ষণীয় দিক থাকবেই। সেই সঙ্গে কিছু কিছু আকর্ষণীয় দিকও থাকে।

## 5.9 প্রবাহমানতার ফলাফল (Consequences of Migration)

প্রবাহমানতার ফলে মানুষে মানুষে যে মিলন ঘটে তার বহুবিধ ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। নীচে তা আলোচনা করা হল ঃ

**আয়তন ও সংখ্যাগত ফলাফল (Effects on Size and No. of Population) ঃ**

**ভৌগোলিকেরা প্রব্রজনমানতার ফলাফল নিয়ে খুব বেশি আগ্রহী।**

(১) গ্রহীতা (Reception) কেন্দ্র, তা সে গ্রাম হোক আর শহরই হোক, অভিবাসীদের আগমনজনিত কারণে উভয়েরই জনসংখ্যা বাড়বে। ফলে চাষের জন্য নতুন জমির খোঁজ চলবে। অন্যদিকে, বাস্তুত্যাগের ফলে ঐ উৎস অঞ্চলে জনসংখ্যা কমে যাবে (Leong, et.al. 1982)। চাষের জমি পতিত থেকে যাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের জেলাগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বহু লোক মারা যেতেন। এর থেকে মুক্তি পেতে ও হুগলি শিল্পাঞ্চলের কলকারখানায় চাকরির লোভে বহু লোক গ্রাম ত্যাগ করে যথাক্রমে স্বাস্থ্যকর পশ্চিম ভারত ও হুগলি শিল্পাঞ্চলে চলে যান, ফলে গ্রামগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এজন্য বহু চাষের জমি পতিত থাকে। এই অভাব পূরণের জন্য পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিরা চাষবাসের জন্য এই অঞ্চলে আসতে আরম্ভ করলেন, যদিও তাদের চাষবাসের মান ছিল অনুন্নত (Mukherjee 1983) । এতো গেল অন্তদেশীয় পরিযানের ফলে সৃষ্ট জনসমস্যার একটি দিক।

(২) এবার আন্তর্জাতিক পটভূমিতে প্রবাহমানতার ফলাফল নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। যুক্তরাষ্ট্র ও আয়ারল্যান্ডের কথা ধরা যাক। 1819 সালে যুক্তরাষ্ট্রে 58 লক্ষ লোক বসবাস করতেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 76মিলিয়ন, 1975 সালে তা হল 261 মিলিয়ন আর 2000 সালে 84 মিলিয়ন। যুক্তরাষ্ট্রের এই জনস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা হ্রাস পেল। যেমন 1820 থেকে 1947 সালের মধ্যে সুইজারল্যান্ড ও ইটালীতে মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে 2ও 11 শতাংশ লোক কমে গিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল আয়ারল্যান্ডে। এখানে 1841-51, 1851-61, 1861-71, 1871-1881, 1881-1891, 1891 - 1901, শতাংশ জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, ঐ বিপুলসংখ্যক জনতা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে ঘর বেঁধেছেন। প্রবহমানতার আর একটা ফল সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তা হল গত 100 বৎসর যাবৎ শহরের অস্বাভাবিক জনস্ফীতির, আর তার বিপরীত চিত্রে রয়েছে গ্রামীণ জনশূন্যতা।

(৩) স্বভাবতই গ্রাম ও শহরের জনবন্টনে এক বিরাট ফারাক সৃষ্টি হয়েছে।

**পরিব্রাজনের স্থানিক প্রভাব**

পরিব্রাজনের ফলে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে একাধিক ক্ষুদ্রতর ভৌগোলিক এলাকার সৃষ্টি হয়। প্রায়র (Pryor : Laws of Migration? The Experience of Malaysia and other Countries 1969) -এর মতে পরিব্রাজনের জন্য মোট চার ধরনের ভৌগোলিক ক্ষেত্র (Geographical space) সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ

(i) **অপ্রত্যক্ষ সংযোগ এলাকা (Indirect contact space) ঃ**

পরিব্রাজনের সাথে সামাজিক প্রভাব এই এলাকায় সবচেয়ে কম অনুভূত হয়। অনেক সময় পরিব্রাজনের ফলে নতুন আসা লোকজনের সাথে ঐ এলাকার পুরনো লোকজনের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ তৈরি হয় না। এই কারণে পরিব্রাজনের সামাজিক প্রভাবও সরাসরি বোঝা যায় না। অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ সংযোগ এই এলাকার বৈশিষ্ট্য।

(ii) **আকাঙ্ক্ষিত অঞ্চল (Aspiration space) ঃ**

যে অঞ্চলে যাওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে সব সময় ইচ্ছা বা চেষ্টা রয়েছে। যেমন, তৃতীয় বিশ্বের লোকজনের কাছে ইংল্যান্ড বা আমেরিকার মতো দেশ।

(iii) **কর্মব্যস্ত অঞ্চল (Activity space) ঃ**

যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সবসময় মানুষ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা যাতায়াত করছেন। নেপাল থেকে ভারতে আসার জন্য শিলিগড়ি এলাকা বা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার জন্য বনগাঁ, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার সীমান্ত।

(iv) **অনুসন্ধান অঞ্চল (Search space) ঃ**

যেখানে শিক্ষা বা কর্মসংস্থান বা বসবাসের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থান খোঁজার চেষ্টা চলে, পঞ্চাশের দশকে দন্ডকারণ্য অঞ্চল।

**চিত্র 2.10 পরিব্রাজনের প্রভাবে সাংস্কৃতিক ব্যাপন (Cultural diffusion)-এর প্রকৃতি।**

1. 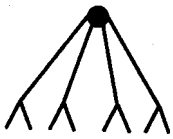

সমাজের উচ্চতম স্তর থেকে মধ্যম স্তরে ছড়িয়ে পড়া সাংস্কৃতিক পড়া সাংস্কৃতিক প্রভাব।
(যেমন—ডেভিড হেয়ার-এর প্রচেষ্টায় কলকাতার শিক্ষা বিস্তার)

2. 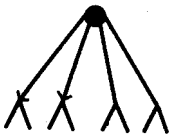

সমাজের মধ্যম স্তর থেকে উচ্চ ও নিম্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়া সাংস্কৃতিক প্রভাব।
(যেমন—পরিব্রাজনের কারণে চলে আসা ডাক্তার, শিক্ষকদের নতুন এলাকার জনগণের মধ্যে সেবামূলক কাজের বিস্তার)

3. 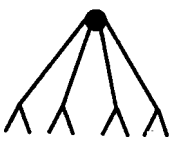

সমাজের নিম্ন স্তর থেকে মধ্যম ও উচ্চতম স্তরে ছড়িয়ে পড়া সাংস্কৃতিক প্রভাব।
(যেমন—আসামের চা-বাগানে বা আমেরিকায় তুলা ক্ষেতে কাজ করা পরিব্রাজক শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও দেশীয় অর্থনীতির উন্নতি) (চট্টোপাধ্যায়, 2001 অবলম্বনে)

**সাংস্কৃতিক প্রভাব ঃ**

পরিব্রাজনের প্রভাবে সংস্কৃতিক ব্যাপন (Cultural diffusion) এর হেরফের ঘটে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কোন পিছিয়ে পড়া এলাকা পরিব্রাজনের প্রভাবে দ্রুত উন্নতি করতে পারে। আমেরিকায় আফ্রো-এশীয় এবং ইউরোপীয় মানুষজনের প্রভাবে মার্কিন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে, পরিব্রাজনের প্রভাবে কোনও এলাকার সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনও হতে পারে। যেমন, মধ্যযুগে ভারতে মুসলমান রাজত্বে মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথা চালু হয়। তার আগে ভারতীয় মহিলারা পর্দানসীন ছিল না। আবার, ইংরাজরা ভারতে আসার পর জোর করে নীল চাষ শুরু করেন। ধানের জমিতে নীল চাষ করার ফলে ধানের উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে বাংলার অর্থনীতি ভেঙে পড়ে।

**সামাজিক ফলাফল (Consequences) ঃ**

আমরা আগেই দেখেছি যে পুরুষরা নারীদের তুলনায় বেশি পরিব্রাজনশীল, আবার এটাও লক্ষ করা গেছে যে পুরুষরা যখন কার্যোপলক্ষ্যে শহরে গিয়ে বসবাস করেন, তখন তাঁদের পরিবারদের বাড়িতেই রেখে আসতে বাধ্য হন। কারণ কর্মস্থানে বাসা পাওয়া, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, পৈতৃক বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, বাবা-মাকে কর্মস্থানে নিয়ে যাওয়া ও সর্বোপরি আর্থিক অসুবিধের দিকটা রয়েছে। তাই দেখা যায় 1910 সালে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যক্তি অভিবাসন (Immigration) করেছিলেন। এই সময় সেখানে প্রতি 100 জন নারী পিছু পুরুষের সংখ্যা ছিল 129 জন। ঐ দেশে কিছু কিছু প্রবাসীদের ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ অনুপাত (sex composition) চোখে পড়ার মতন। যেমন 1940 সালে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রতি 100 জন নারীতে পুরুষের সংখ্যা ছিল 393 জন। 1950 সালে চীনাদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ছিল 190 জন ও ফিলিপিনদের ক্ষেত্রে 297 জন। 1950 সাল পর্যন্ত অবস্থাটা এই রকম চলছিল, অর্থাৎ নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা সব সময়েই বেশি ছিল, কিন্তু এর পর থেকে পরিস্থিতি পালটে গেছে। 1960 সালে যুক্তরাষ্ট্রে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি 100 জন নারীতে পুরুষের সংখ্যা ছিল 98 জন। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে অভিবাসনের ঘটনা কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, ইদানিংকালে পুরুষেরা তাদের পরিবারকে নিয়ে এদেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসছেন। এছাড়া 1941ও 1950 সালের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যেসব তরুণ-তরুণীরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন, তাদের মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল 100:68।

প্রবহমানতার ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলে নারী-পুরষ অনুপাতের হেরফের সব দেশেই লক্ষ্যণীয়। অবশ্য কারিগরি ও আর্থিকগ্রগতির ওপর এটা নির্ভর করে। অনুন্নত দেশ আফ্রিকার কথাই ধরা যাক। সেখানকার পুরুষরা স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে প্রায় চিরদিনের মতই গ্রামত্যাগ করেন। গ্রামে পুরুষের অভাবে চাষবাস ভাল হয় না। আর শহরে স্ত্রীলোকের অভাব পুরুষদের মধ্যে অনেক কু-অভ্যাসের জন্ম দেয়। বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশ্যাবৃত্তিও। ভারতের কেরালাতে অনেকটা একই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখানকার মুসলিম পুরুষেরা মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির সন্ধানে চলে গেছেন। তাই অনেক গ্রামেই বেশিসংখ্যক মহিলার উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। পুরুষরা বাড়িতে না থাকায় এক ধরনের সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এবার সামাজিক সমস্যার একটু ভিন্ন দিক দেখা যাক। আফ্রিকার নিগ্রো-অধ্যুষিত শহর ব্রাজ্জাভিলে (Brazzavilla) প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হলেন পুরুষ মানুষ, শিশুদের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কম। আর বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। এখানকার নারীদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি প্রজনন ক্ষমতাহীন। শহরেও স্ত্রীলোকদের বাচ্চা হয় খুব কম। এমন অবস্থায় বংশরক্ষা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খনি ও অরণ্য বসতিতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। সেখানে নারীদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা 2 থেকে 3 গুণ। সাধারণভাবে বলা চলে শহরের বয়স যত নবীন হবে নারী পুরুষের সমহারে (sex composition) তত পার্থক্য হবে। কারণ নতুন শহরে প্রথমাবস্থায় মানুষের বসবাসের সুযোগসুবিধাগুলো কম থাকে। ফলে অনেকেই পরিবারকে বাড়িতে রেখে আসেন। এই প্রসঙ্গে বিজু গার্ণিয়ার (Beajeu Garnier) লিখেছেন যে শহরের গুরুত্ব যত বেশি হবে, জীবনযাত্রার মানও তত পরিবর্তন হবে, নারীর সংখ্যাও তত কম হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি লিখেছেন 1934

সালে ভারতবর্ষের 50,000-1,00,000 অধিবাসী অধ্যুষিত শহরে 100 জন নারীপিছু পুরুষের সংখ্যা ছিল 120 জন, আর পাঁচ লাখ অধিবাসী অধ্যুষিত শহরগুলোতে 161 জন (নারী), কিন্তু 1951 সালে কলকাতায় প্রতি 100 জন নারী পিছু পুরুষের সংখ্যা ছিল 175 জন, হাওড়ায় 163 জন, আমেদাবাদে 130 জন। এছাড়া, সমস্ত বড় বাণিজ্যিক ও শিল্প শহরে একই ধরনের বৈষম্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উন্নত দেশগুলোর পরিস্থিতি একটু অন্যরকমের। এখানে নারী পুরুষ একসঙ্গে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন। গ্রামে যাঁরা পড়ে থাকেন তাঁরা খুব বয়স্ক। আবার আয়ারল্যান্ড বা ফ্রান্সের কিছু কিছু অংশে দেখা যায় যে যুবতিরা গ্রামে থাকতে চান না। তাঁরা চাকরি খুঁজতে শহরে আসেন। প্রবহমানতার বহু সমীক্ষা ঘেঁটে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে ভাগ্যান্বেষণে যাঁরা জন্মস্থান ছেড়ে আসেন, তাঁদের গড় বয়স 30-এর নীচে।

**জৈবিক ফলাফল (Biological Consequence) ঃ**

প্রবহমানতার জৈবিক ফলাফল আরও গভীর। নবাগতরা এক অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েন, যা তাঁর নিজের দেশের তুলনায় একটু অন্যরকম। প্রবহমানতার কিছু ভাল দিকও দেশত্যাগীদের মধ্যে দেখা যায়। তাদের পুরোনো গোষ্ঠী জীবন ভেঙে যায় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মিলন ঘটে। আর তার প্রতিক্রিয়া আগামী বংশধরদের মধ্যে পড়ে।

নতুন পরিবেশে ধাতস্থ হওয়া সব সময় সুখের হয় না। শহরে আগন্তুক গ্রামবাসীরা আলো, বাতাস, স্থানাভাব, ধুলো ও ধোঁয়ার অস্বস্তিকর পরিবেশে ভোগেন।

**সংযোগজনিত সমস্যা (Communication Problem)**:

এই সমস্যা জাতিগত, ধর্মগত ও ভাষাগত পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ঘটে। প্রথমেই ধরা যাক জাতিগত সমস্যার কথা। অনুন্নত দেশগুলো গত দুশ বছর যাবৎ বিদেশি শাসনাধীনে ছিল, ফলে এই সব দেশে কম-বেশি জাতিগত সমস্যা দেখা যায়। বর্তমান দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সেখানকার প্রাক্তন শ্বেতাঙ্গ সরকার স্থানীয় কৃষ্ণকায় জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করার বিরোধী বলে বর্ণবৈষম্য নীতি জিইয়ে রেখেছিলেন। আবার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে শ্বেতকায়-অশ্বেতকায় সমস্যা সমাধান হওয়া মুশকিল।

**ভাষার ব্যবধানও** সমস্যা সৃষ্টি করে। বহুদিন ধরে একসঙ্গে বসবাস করলেও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষরা তাঁদের নিজস্ব ভাষা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। যেমন, কানাডায় বসবাসকারী ইংরেজ ও ফরাসিরা, দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ইংরেজ ও বুয়ররা। অধিকাংশ প্রবাসীর ক্ষেত্রে তাঁর জীবদ্দশাতে ভাষার পরিবর্তন ঘটে না, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে, কারণ তাঁরা অধিকাংশ সময় বাড়িতে থাকেন। কিন্তু পুরুষরা বাড়ির বাইরে কাজ করতে গিয়ে অন্য ভাষা শিখতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে, বিদেশি শাসকরা তাদের উপনিবেশগুলোতে ইউরোপীয় ভাষা চালু করে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। যেমন ইংরেজরা এদেশে ইংরেজি ভাষা চালু করেছিলেন। এছাড়া প্রবাসীদের বিভিন্ন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়।

দীর্ঘদিন এক জায়গায় বাস করার ফলে পরস্পরের মধ্যে একটা **ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে**। এছাড়া বিভিন্ন জাতির মিলন তাদের পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃতির উন্নতি ঘটায়। প্রবহমানতার অর্থনৈতিক ফলাফল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুভব করা যায়। প্রবাসীরা তাঁদের পুরোনো দেশকে তাড়াতাড়ি ভুলতে পারেন না। সেখানকার ফেলে আসা আত্মীয় স্বজনদের প্রতি তাঁদের মমত্ববোধ থেকে যায়। তাই সময় পেলে তাঁরা সেখানে যান। প্রয়োজনবোধে তাঁদের টাকা পাঠান।

এটা পরিষ্কার যে **প্রবহমানতা এক ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার**। বিগত শতাব্দীতে যখন প্রবহমানতা ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার, তখন মানুষের মৃত্যু ও কষ্টভোগের মাধ্যমে এই নেশার মূল্য দিতে হত। বর্তমান দুনিয়াতে প্রাণ দিতে হয়

না বটে, কিন্তু প্রবহমানতা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাতায়াতের খরচ ছাড়াও নতুন জায়গায় জমি কেনা ও বাড়ি তৈরি করা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই দিকগুলো ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলো দিক আছে। যেমন যে অঞ্চল থেকে লোক গ্রাম ত্যাগ করেছেন সে অঞ্চলে প্রবহমানতার ফলাফল বিশেষ লক্ষ্যণীয়। কারণ, এইসব অঞ্চল তার সম্ভবনাপূর্ণ ব্যক্তিদের অভাববোধ করেন (Leong, et, al, 1982), বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের। এই অভাববোধ আরও বেশি করে ফুটে ওঠে যখন দেখা যায় কোন দেশ তার তরুণদের উন্নতির জন্য যা কিছু করা দরকার সবই করেছে, কিন্তু বিদেশে ভালো সুযোগ পেয়ে সেইসব তরুণ অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে। যেমন আমাদের দেশের অনেক প্রতিভাবান তরুণ বিদেশে ভাল সুযোগ পেয়ে সেখানেই পাকাপাকিভাবে আস্তানা গড়েছেন। ফলে এতদিন ধরে তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য যে খরচ তার সুফল থেকে দেশ বঞ্চিত হল। সত্যি কথা বলতে কি, মস্তিষ্ক চালান (Brain drain) উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিব্রাজনের ফলে অদূর ভবিষ্যতে আর্থিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। উন্নয়নশীল দেশ ভারতের কথায় আসা যাক। দেশবিভাগজনিত সমস্যার বহির্প্রকাশ রূপে দেখা দিয়েছে আর্থিক সমস্যা। পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আগত শরণার্থীদের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্ভব হয়নি। এর ওপর প্রতিদিন-ই বাংলাদেশ থেকে শুধু হিন্দুই নয়, মুসলিমরাও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের জেলাগুলোতে এসে ডেরা বাঁধছেন। এছাড়া অসম থেকে আগত শরণার্থীরাও আছেন। এত বিপুলসংখ্যক জনতার চাপ ছোট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সহ্য করা আগামী দিনে কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ চাষের জমির সীমাবদ্ধ আর চাকরীর সংস্থানও সীমিত। আবার বেকার যুবকরা যদি কোন উপায় না পেয়ে ব্যবসায় নামেন, তাহলে ব্যবসার এত বাজার সৃষ্টি হবে কী করে। উন্নত দেশে আজ না হলেও আগামী 50 বছরে পরিযানের প্রভাব পড়তে বাধ্য। এক সময় অভিবাসনের (immigration) দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ছিল শীর্ষ। কিন্তু সম্প্রতি সে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, আর তার ঢেউ গোটা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সবশেষে এটুকু বলা চলে যে স্বতঃস্ফূর্ত পরিযান সেই সব দেশের পক্ষে খুব সন্তোষজনক যাদের (1) অর্থনীতি খুব চাঙ্গা। (2) নবাগতরা যখন উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাস করতে আসেন।

## 5.10 অনুশীলনী

**রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি ঃ**

(১) পরিযানের সংজ্ঞা দিন। বিভিন্ন ধরনের পরিযান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) পরিযানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্ণয়কগুলি কী কী ? বিশ্লেষণ করুন।

(৩) রাভেনস্টাইন-এর পরিযানের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(৪) পরিযানের ফলাফল ব্যাখ্যা করুন।

**মাঝারি প্রশ্নাবলি ঃ**

**নীচের বিষয়গুলির উপর টীকা লিখুন ঃ-**

(১) আন্তর্জাতিক পরিযান

(২) আন্তর্দেশীয় পরিযান

(৩) বাধ্যতামূলক পরিযান

৪। যুদ্ধ ও পরিযান

৫। লী-র পরিযান মডেল

৬। জেলেনস্কি-র পরিযান মডেল

৭। ঋতুগত যাযাবর বৃত্তি

৮। মরশুমী পরিযান

৯। গ্রাম থেকে শহরে কেন নিয়মিতভাবে পরিযান ঘটে?

**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ**

নীচের বিষয়গুলি কী?

১। ঋতুগত যাযাবরবৃত্তি

২। অভিবাসন

৩। বহির্গমন

৪। বাধ্যতামূলক পরিযান

৫। অবৈধ অভিবাসন

৬। পরিযানে আকর্ষক উপাদান

৭। পরিযানে বিকর্ষক উপাদান

৮। ভারতে বলপূর্বক অভিবাসন।

[পাঠোপকরণে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়/একক থেকে উত্তরগুলি সংগ্রহ করুন।]

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

# একক 6 ❑ভারতের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও বন্টন (Population of India : Characteristic & Distribution)

গঠন


**6.1** প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

**6.2** ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি

**6.2.1** ভারতের জনবৃদ্ধির সমস্যা

**6.3** ভারতের নারী-পুরুষ অনুপাত

**6.4** শিক্ষা

**6.4.1** বয়স পিরামিডের পরিবর্তন **(1971-91)**

**6.5** ভারতের জনবসতি বন্টন

**6.5.1** অসম জনবন্টনের কারণসমূহ

**(a)** প্রাকৃতিক কারণসমূহ

**(b)** সাংস্কৃতিক কারণসমূহ

**6.6** জনসংখ্যার ঘনত্ব

**6.6.1** বেশি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ

**6.6.2** মাঝারি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ

**6.6.3** কম ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ

**6.7** অনুশীলনী

**6.8** গ্রন্থপঞ্জি


## 6.1 প্রস্তাবনা

পৃথিবীর 3 (তিন) শতাংশের কম স্থান জুড়ে থাকা ভারতবর্ষে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 16 (ষোলো) শতাংশ লোক বাস করেন। বিশ্বে জনসংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় এই দেশ আগামী দিনে প্রথম স্থানাধিকারী হবে। ভারতের জনসংখ্যা আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি কথা মনে আসে। যেমন ভারতে বিবাহ প্রথা খুব ব্যাপক। এদেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিয়ে হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যাপকহারে হয় না। আবার হিন্দু সমাজে বিধবা বিয়ের প্রচলন খুব একটা চল নেই। তাই বেশ কিছু মহিলা প্রজননক্ষম অবস্থাতে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেন। পুত্র সন্তানের ওপর এদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা বেশি। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে একাধিক কন্যাসন্তানের জন্মও হয়। ভ্রূণ হত্যা বিবাহিত মহিলারা বড়

একটা চান না। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার খুব একটা হয়নি। গরিব মানুষের মধ্যে শিশুর ভবিষ্যত গড়ে তোলার ধারণা তেমন গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় সামাজিক বিবর্তন না ঘটলে জন্মহার খুব একটা কমবে না। যদিও পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশেই প্রথম পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

এদিকে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে, কারণ কৃষিতে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্তের মত রোগ দূর হয়েছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এতো গেল জনসংখ্যার এক দিক। ভারতের জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত ও জনসংখ্যার বণ্টন সর্বত্র সমহারে নেই। বয়স কাঠামোতেও রয়েছে অসমতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনসংখ্যার বিশেষ স্বকীয়তার দাবি রাখে।

**উদ্দেশ্য ঃ**

আপনারা এই এককটি পড়ে জানতে পারবেন—

- গত একশ বছরে (1901-2001) এদেশের জনবৃদ্ধির হারটি কিরূপ?
- জনবৃদ্ধির হার অনুযায়ী বৃদ্ধিকে ক'ভাগে ভাগ করা যায়।
- তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের লিঙ্গ অনুপাতের বণ্টন কীরূপ?
- বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গ অনুপাতের বণ্টন কীরূপ?
- কী কী কারণ এখানকার জনবণ্টনকে প্রভাবিত করেছে?
- এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনবণ্টনের ধাঁচটি কীরূপ?

## 6.2 ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Growth of India's Population)

বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা তিনগুণের বেশি বেড়েছে। চলতি শতাব্দীর ভারতের জনমিতি ইতিহাসকে তিনটি সুনির্দিষ্ট সময়ে ভাগ করা যায়। (1) নিশ্চল (Stagnant), (2) ধীর বৃদ্ধি ও (3) দ্রুত বৃদ্ধির যুগ। 1901 থেকে 1921 সাল পর্যন্ত সময়কে নিশ্চল যুগ বলা চলে। এই সময় জনসংখ্যা মাত্র 12 মিলিয়ান বেড়েছে (236 থেকে 248 মিলিয়ান)। (চিত্র 3.1) এই সময় মৃত্যুহার জন্মহারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মহামারী, দুর্ভিক্ষ খাদ্যসংকট বেশি মৃত্যুহারের জন্য দায়ী ছিল। এই সময় জন্ম ও মৃত্যু হারই ছিল প্রতি হাজারে 40-র বেশি। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ ছিল কম।

1921-কে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুচনা বলা যেতে পারে। কারণ এর পর থেকে জনসংখ্যা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 1921 থেকে 1951 সালের মধ্যে জনসংখ্যা 112 মিলিয়ান বেড়েছিল। (248 থেকে 360 মিলিয়ান, সারণি 3.1)। ভারতের জনমিতি চিত্রে এই সময় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল, কারণ এই সময় মহামারী, দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর ওপর সরকারের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে বণ্টনব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতিকে খাদ্য উৎপাদনের উন্নতির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতিকে খাদ্য উৎপাদনের উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুহার কমিয়ে আনার জন্য পয়ঃপ্রণালী ও চিকিৎসা পরিষেবার প্রচুর উন্নত ঘটানো হয়েছিল। সারণি 3.2 থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে 1921 সালে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল 47 আর 1951 সালে তা কমে হল 27। দ্রুত মৃত্যুহার কমার দরুন 1921 থেকে 1951 সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার ধীর বৃদ্ধি ঘটেছিল, কিন্তু জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে 40 জন (চিত্র 3.2)।

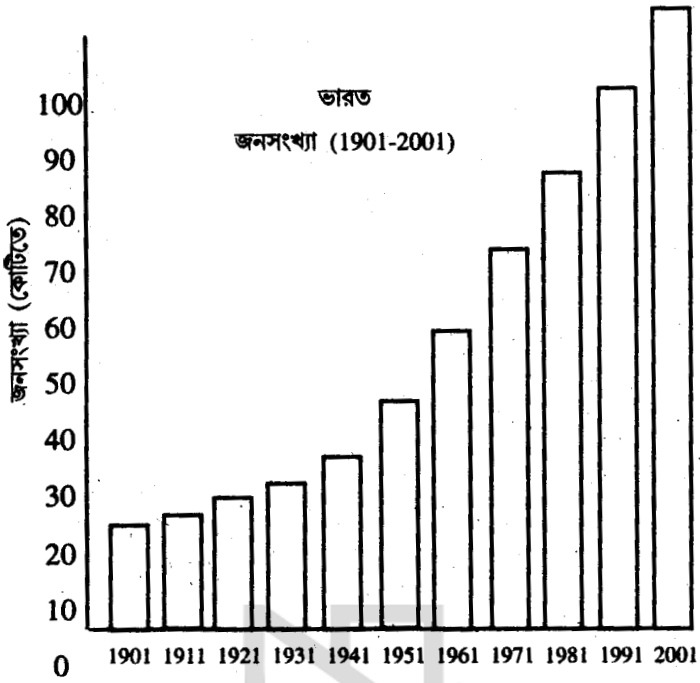
ভারত
জনসংখ্যা (1901-2001)
জনসংখ্যা (কোটিতে)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

চিত্র 3.1

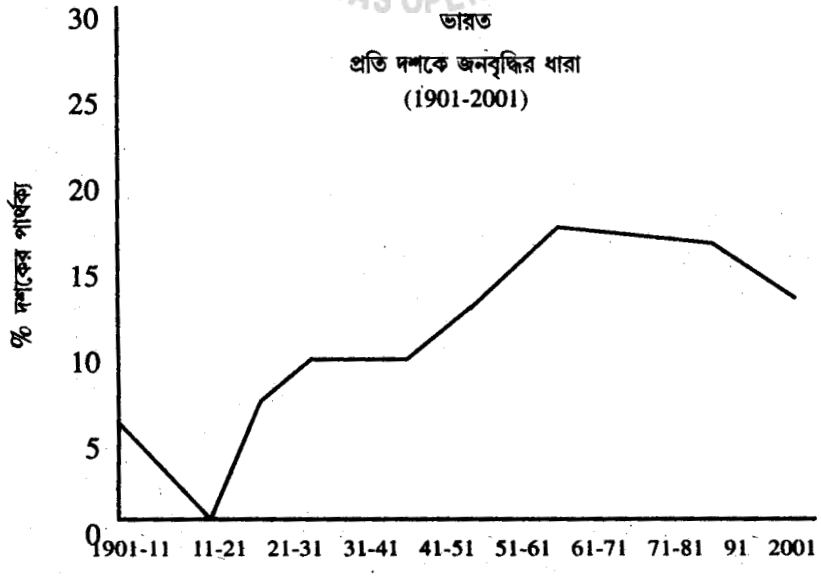
ভারত
প্রতি দশকে জনবৃদ্ধির ধারা
(1901-2001)
% দশকের পার্থক্য
30
25
20
15
10
5
0
1901-11 11-21 21-31 31-41 41-51 51-61 61-71 71-81 91 2001

চিত্র 3.2

**সারণি 3.1**

**ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (1901-2001)**

| বছর | জনসংখ্যা (মিলিয়ান) | পূর্ববর্তী দশকে % বৃদ্ধি | বছর | জনসংখ্যা (মিলিয়ান) | পূর্ববর্তী দশকে % বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 236 | | 1951 | 360 | +13.3 |
| 1911 | 249 | +5.7 | 1961 | 439 | +21.5 |
| 1921 | 248 | –0.3 | 1971 | 548 | +24.8 |
| 1931 | 276 | +11.0 | 1981 | 685 | +24.7 |
| 1941 | 315 | +14.2 | 1991 | 844 | +23.5 |
| | | | 2001 | 1027 | +21.7 |

**সারণি 3.2**

**ভারতের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (1901-2001)**

| বছর | প্রতি হাজারে জন্ম হার | প্রতি হাজারে মৃত্যুহার | স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার | বছর | প্রতি হাজারে জন্মহার | প্রতি হাজারে মৃত্যুহার | স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 49 | 43 | 6 | 1961 | 42 | 23 | 19 |
| 1921 | 48 | 47 | 1 | 1971 | 37 | 15 | 22 |
| 1931 | 46 | 36 | 10 | 1981 | 34 | 12 | 22 |
| 1941 | 45 | 31 | 14 | 1991 | 31 | 11 | 20 |
| 1951 | 40 | 27 | 13 | 2001 | 25 | 8 | 17 |

1951 সালকে ভারতের জনমিতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যেতে পারে। কারণ 1951-র পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা অভাবিত হারে বেড়েছে। 1951 থেকে 2001 সালের মধ্যে জনসংখ্যা তিন গুণের বেশি বেড়েছে (360 থেকে 1027 মিলিয়ান চিত্র 3.3)। গড়ে প্রতি বছর বৃদ্ধির হার হল শতকরা দু-ভাগ। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু উন্নয়নমূলক কার্যসূচী, পর্যাপ্ত খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার দরুন মৃত্যুহার কমে গিয়ে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় মৃত্যুহার প্রতি হাজারের 27 থেকে কমে 11 হল। এই সময়করে জনমিতি ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল জন্মহার ধীরে ধীরে কমে ছিল, কিন্তু মৃত্যুহার দ্রুততালে কমে গিয়েছিল, ফলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারও বেশি ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার কমে যাওয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধির কিছু ফল লক্ষ করা যায়। ভারতের জনসংখ্যায় তরুণ জনতার হার বাড়ছে। এ দেশের শতকরা 36.0 ভাগ জনসংখ্যার বয়স 15 বছরের কম। জন্মহার বেশি ও আয়ুষ্কাল বাড়ায় পুনরুৎপাদন বয়সপুঞ্জে জনসংখ্যার শতকরা হার বাড়ছে, যার পরোক্ষ ফল হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সর্বোপরি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

## জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

| ক্রম 2001 | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল* | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার* 1991-01 | 1981-91 | ক্রম 1991 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | কেরালা | 9.42 | 14.32 | 1 |
| 2 | তামিলনাড়ু | 11.19 | 15.39 | 2 |
| 3 | অন্ধ্রপ্রদেশ | 13.86 | 24.20 | 11 |
| 4 | গোয়া | 14.89 | 16.08 | 3 |
| 5 | ত্রিপুরা | 15.74 | 34.30 | 29 |
| 6 | ওড়িশা | 15.94 | 20.06 | 4 |
| 7 | লাক্ষাদ্বীপ* | 17.19 | 28.47 | 21 |
| 8 | কর্ণাটক | 17.25 | 21.12 | 7 |
| 9 | হিমাচল প্রদেশ | 17.53 | 20.79 | 5 |
| 10 | পশ্চিমবঙ্গ | 17.84 | 24.73 | 14 |
| 11 | ছত্তিশগড় | 18.06 | 25..73 | 16 |
| 12 | অসম | 18.85 | 24.24 | 13 |
| 13 | উত্তরাঞ্চল | 19.20 | 24.23 | 12 |
| 14 | পাঞ্জাব | 19.76 | 20.81 | 6 |
| 15 | পণ্ডিচেরী* | 20.56 | 33.64 | 28 |
| 16 | গুজরাত | 22.48 | 21.19 | 8 |
| 17 | মহারাষ্ট্র | 22.57 | 25.73 | 17 |
| 18 | ঝাড়খণ্ড | 23.19 | 24.03 | 10 |
| 19 | মধ্যপ্রদেশ | 24.34 | 27.24 | 18 |
| 20 | উত্তরপ্রদেশ | 25.80 | 25.55 | 15 |
| 21 | অরুণাচল প্রদেশ | 26.21 | 36.83 | 30 |
| 22 | আন্দামান ও নিকোবর* | 26.94 | 48.70 | 33 |
| 23 | হরিয়ানা | 28.06 | 27.41 | 19 |
| 24 | রাজস্থান | 28.33 | 28.44 | 20 |
| 25 | বিহার | 28.43 | 23.38 | 9 |
| 26 | জম্মু ও কাশ্মীর | 29.04 | 30.34 | 25 |
| 27 | মিজোরাম | 29.18 | 39.70 | 31 |
| 28 | মেঘালয় | 29.94 | 32.86 | 26 |
| 29 | মণিপুর | 30.02 | 29.29 | 24 |
| 30 | সিকিম | 32.98 | 28.47 | 22 |
| 31 | চণ্ডীগড়* | 40.33 | 42.16 | 32 |
| 32 | দিল্লি* | 46.31 | 51.45 | 34 |
| 33 | দমন ও দিউ* | 55.59 | 28.62 | 23 |
| 34 | দাদরা ও নগর হাভেলি* | 59.20 | 33.57 | 27 |
| 35 | নাগাল্যান্ড | 64.41 | 56.08 | 35 |
| | ভারত | 21.34 | 23.86 | |

* প্রতি দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতাংশ

ভারতে জনসংখ্যা গণনার সময় পাক ও চীন অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের অংশগুলিকে ধরা হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে গুজরাত ও হিমাচল প্রদেশের কয়েকটি জেলায় জনগণনার কাজ করা সম্ভব হয়নি।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

এ দেশের গ্রাম ও শহর এলাকায় জনবৃদ্ধি হারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যদিও সাধারণভাবে এ দেশে জনবৃদ্ধির হার বেশি, তবুও শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধির হার কম। 1971-81-র দশকে গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে 19 ও 46 শতাংশ। যেহেতু ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হল গ্রামবাসী, তাই জনসংখ্যার নিরিখে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি গ্রামাঞ্চলেই ঘটেছে। গ্রাম্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের ভূমি সম্পদের ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। গ্রামে বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। যদি না গ্রামে শিল্পায়নের দ্বারা অর্থনীতির উন্নতি না ঘটানো যায়, তবে সেখানকার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

পক্ষান্তরে, শহর এলাকা, বিশেষ করে বড় শিল্পকেন্দ্র ও জেলা-সদর শহরে বাইরে থেকে প্রচুর লোকজন এসে বসবাস করছেন। ফলে ঐ সব স্থানের জনবৃদ্ধি দ্রুততালে ঘটছে। দেশের উর্বর কৃষিজমির ওপর এই লাগাম-ছাড়া নগরায়ন ঘটে চলেছে। শহরে বস্তির সৃষ্টি হচ্ছে, সামাজিক সুযোগ-সুবিধের ঘাটতি ঘটছে, দূষণের জন্য পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তারতম্য রয়েছে। যদিও সাধারণভাবে ভারতবর্ষ জনমিতি পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে, তবুও দেশের বিভিন্ন অংশ দ্বিতীয় পর্যায়ের একই ধাপে নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে কেরালার মৃত্যুহার হল প্রতি হাজারে 5.9 কিন্তু জন্মহার 19.8। এই রাজ্যটি জনমিতি পরিবৃত্তকালের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তু বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশ (পূর্ব) দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দিকে রয়েছে।

সারণি 3.3 থেকে আমরা গত দু'দশকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি চিত্র পাচ্ছি (i) স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার (1981-91) জনবৃদ্ধির হার কম ঘটল। 1971-81-র দশকে দেশের জনবৃদ্ধি ছিল 24.66 শতাংশ, 1981-91 -র দসকে তা গিয়ে দাঁড়াল 23.5 : (ii) দেশের বিভিন্ন অংশে জনবৃদ্ধির হার সমান নয়। নাগাল্যান্ডে গত দু'দশকে যেখানে জনবৃদ্ধি ঘটেছে + 6.8 শতাংশ, সেখানে সিকিমে –23.2 শতাংশ, আর কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড়ে বৃদ্ধির হার হল –33.6 শতাংশ। (iii) ভারতবর্ষের 25টি রাজ্যের মধ্যে 17টি রাজ্যের বৃদ্ধির হার নেতিবাচক (negative)। অন্যান্য রাজ্যে বৃদ্ধির হার খুব একটা বেশি নয়। চারটি রাজ্যের (বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ) জনবৃদ্ধির হার সমান নয়। রাজস্থানের বৃদ্ধির হার (–4.9%) জাতীয় গড়ের (–1.2%) চেয়ে অনেক কম, পক্ষান্তরে বিহার (–0.6%) ও উত্তরপ্রদেশের (–0.3%) বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে কিছু কম, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বৃদ্ধির হার + 1.5।

সাধারণত কেন্দ্রশাসিত এলাকাসমূহ হল শহরাঞ্চল। স্বভাবতই গ্রাম থেকে লোকজন এখানে এসে বসবাস করেন। ফলে এখানে জনবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু 1981-91-র দশকে সাতটির মধ্যে চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে চণ্ডীগড় সব থেকে শিক্ষিত স্থান। চণ্ডীগড়ের জনধারণ ক্ষমতা তার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। এর পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে পাঁচকুলা ও মেহেলী উপনগরী সৃষ্টি হয়েছে। এইসব কারণের জন্য চণ্ডীগড়ের জনবৃদ্ধি কমেছে।

জেলাস্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশের মোট জেলার 10 শতাংশের (45টি জেলা) বৃদ্ধির হার (1981-91] 15 শতাংশের কম। এক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর 14টি জেলা দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এগিয়ে আছে। এর পরের স্থান হল কেরালা (7), কর্ণাটক (6), মহারাষ্ট্র (4), গুজরাট (4), উত্তরপ্রদেশ (3), পাঞ্জাব (2), হিমাচল প্রদেশ (2), বিহার, গোয়া ও পশ্চিমবঙ্গের (প্রতিটির 1টি করে জেলা)।

যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারতই প্রথম 1951-52 সালে জনসংখ্যা সংক্রান্ত-নীতি গ্রহণ করেছে তবুও পৃথিবীর মধ্যে জনবৃদ্ধি ঘটাতে এই দেশের অবদান সবচেয়ে বেশি। এর কারণ আমাদের জনসংখ্যা নীতি দেশের জনগণের মানসিকতার ওপর গভীর ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও নীতি নির্ধারকদের (Policy-maker) যুক্তির মধ্যে বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। তাই যাদের জন্য পরিকল্পনা, তাদের এ ব্যাপারে জড়াতে না পারলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, জনগণের জন্য তৃণমূল স্তর থেকে

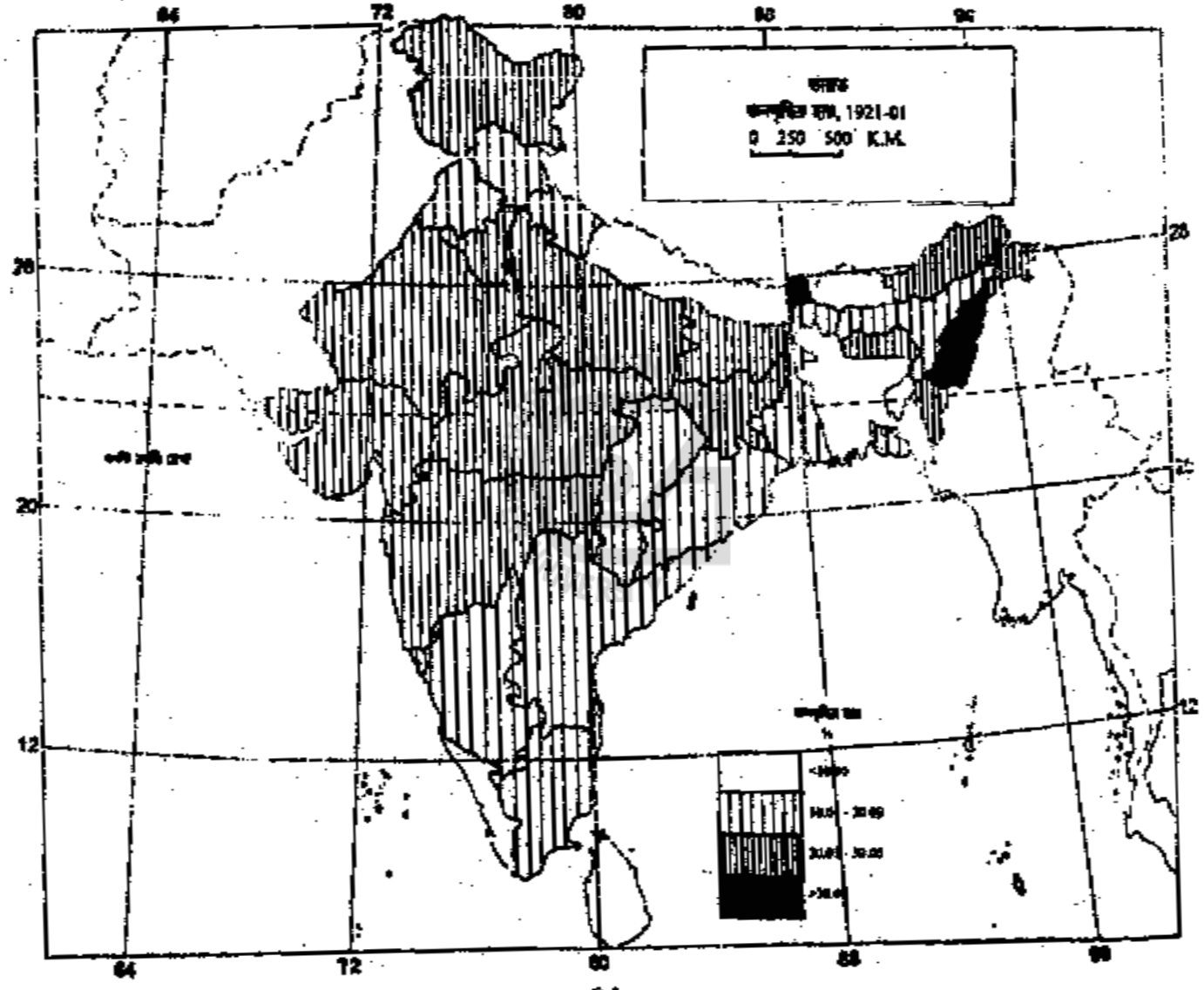


चित्र 3.3

পরিকল্পনা হাতে নিলে তা সফল হবে। তাই দেখা যায় পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, ক্রমশ তা বেড়েই চলেছে। বস্তুত, গত 40 বছরের (1951-91) মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা দু'গুণেরও বেশি বেড়েছে। ম্যালথাসের মতে প্রতিটি দেশের জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে 30-35 বছরের মধ্যে দু'গুণ হওয়ার প্রবণতা থাকে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকেই সমর্থন করে।

## 6.2.1 ভারতে জনবৃদ্ধির সমস্যা (Problems of Population Growth in India)

এখানে স্থলভাগের পরিমাণ পৃথিবীর মোট স্থলভাগের 2.4 শতাংশ, অথচ এখানে বাস করেন পৃথিবীর 16 শতাংশ মানুষ। 1964-65 সাল থেকে 1982-83 সালের মধ্যে এদেশে কৃষির উপযোগী স্থায়ী চাষের জমি বেড়েছে 55 শতাংশ, কিন্তু তৃণভূমি ও পশুচারণ ক্ষেত্র কমেছে 5 থেকে 4 শতাংশ। মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ কমেছে 0.33 হেক্টর। (1995) থেকে 0.29 হেক্টর (1971), 2000 খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে 0.14 হেক্টরে। অথচ কৃষিসমৃদ্ধ নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি (Lower Gangetic Plain) থেকে বছরে 132.5 মিলিয়ান টনের মত মাটি ধুয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত সেচ, অত্যধিক পশুচারণ, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস, একই জমিতে বারবার ফসল ফলানো ইত্যাদি কারণে বহু জমি অনুর্বর হয়ে পড়ছে, ফলে পতিত জমি বাড়ছে। ভারতে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা 300 মিলিয়ান—পৃথিবীর 13 শতাংশ—অথচ পশুচারণ ক্ষেত্র সে তুলনায় খুবই কম, মাত্র 13 মিলিয়ান হেক্টর।

লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে 2000 খ্রিস্টাব্দে চাষের জন্য প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত 10 মিলিয়ান হেক্টর জমি, জ্বালানি কাঠের জন্য 40 মিলিয়ান হেক্টর জমি আর পশুখাদ্যের জন্য 10 মিলিয়ান হেক্টর জমি। ক্ষয়প্রাপ্ত জমি উদ্ধার ও জমির অপব্যবহার রোধ প্রভৃতির জন্য সুষ্ঠু নীতি রচনা করা গেলে তবেই এই অতিরিক্ত চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। এখানে মাথাপিছু গড় পানীয় জলের পরিমাণ খুবই কম। এখানকার 3,121টি শহরে বাস করেন 100 মিলিয়ান মানুষ এদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি লোক জল-সরবরাহ ব্যবস্থায় উপকৃত হন। বাকিরা বছরের পর বছর পানীয় জলের অভাবে ভোগেন। তামিলনাড়ু ছাড়া ভারতের প্রায় 30,000 গ্রামে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থাই নেই। 1986 সালের 13ই মে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন নিয়ে এক জাতীয় সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছিলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধিই ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা, আর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা।

এবার আবাসন সমস্যার দিকে তাকান যাক। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী আব্দুল গফরের মতে আমাদের দেশে এই মুহূর্তে 24 কোটি হাউসিং ইউনিট তৈরি করা প্রয়োজন। এর মধ্যে 18 কোটি দরকার গ্রামাঞ্চলে। আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরমুখী যে স্রোত চলে আসছে তার ধাক্কায় জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঝুপড়ি বস্তিতে ভরে যাচ্ছে কলকাতা—মুম্বাই-দিল্লির মতো মেট্রোপলিটন শহর। বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়া কলকাতার উন্নয়ন প্রশ্নে বলেছিলেন এইসব মানুষের জীবিকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে শহরকে সুন্দর করে গড়ে তোলা যাবে না।

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব আছে। শিল্পের কাঠামো এখনও অনুন্নত। শিল্পক্ষেত্রে এখনও ভোগ্যপণ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ভারী শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। দেশে নানা প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আর তা ব্যবহারের জন্য যত মূলধন প্রয়োজন তা পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অভাবে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

সংক্ষেপে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব দাঁড়ায় নিম্নরূপ। ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ দ্রুত করা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে ভারতে অগ্রগতির হার খুবই কম। দ্বিতীয়ত, ভারতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বেশির ভাগ যেহেতু অপ্রাপ্তবয়স্ক, সেজন্য এরা শ্রমের যোগান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না, পক্ষান্তরে এরা দেশের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়াচ্ছে। ফলে দেশের আয় মূলধন গঠনের কাজে না লেগে উৎপাদন বাড়াতে সরাসরি ভোগের জন্য ব্যায়িত হচ্ছে। ফলে বিনিয়োগের হার বাড়ছে না। তৃতীয়ত, যেহেতু ভারতের জনসংখ্যার 73 ভাগই কৃষির সঙ্গে যুক্ত, তাই কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপে বাড়ছে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে ক্রমশঃ বেশি পরিমাণ সার ব্যবহার করা হচ্ছে ; অন্যদিকে, তেমনি কৃষকদের মধ্যে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বাড়ছে। চতুর্থত, ক্রমবর্ধমান জনতার চাহিদা মেটাতে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হচ্ছে। অন্যদিকে, কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। পঞ্চমত, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সমস্যাকে ভয়াবহ করে তুলেছে। বেকার সমস্যা অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করে। ষষ্ঠত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ ভারতে শিক্ষার সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে, যার সমাধানে প্রচুর বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। এজন্য অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিনিয়োগ করা যাচ্ছে না। এখন যদি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে, তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভবপর হবে। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। পণ্ডিত নেহেরুর (1959) কথা দিয়ে জনসংখ্যা সমস্যার কথা আবার স্মরণ করছি। তাঁর মতে—"Population control will not solve all problems, but other problems will not be solved without it."

## 6.3 ভারতের নারী-পুরুষ অনুপাত (Sex Ratio in India)

1991 সালের লোকগণনানুযায়ী ভারতে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল 929 (চিত্র 6.1)। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতেও 0-4 বছর বয়সপুঞ্জে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের অনুপাত বেশি। ভারতের প্রতি বছর 1,000 জন পুত্রসন্তান পিছু কমবেশি 937 জন কন্যাসন্তান জন্মায়। বাচ্চা ছেলেদের ছোটবেলায় (4 বছরের কাছাকাছি সময়ে) মৃত্যুর হার নারী-পুরুষ অনুপাতে একটা সমতা আনে। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। এখানে খুব ছোটবেলায় বাচ্চা মেয়েদের মৃত্যুর হার বেশি। এখনও বিহারের পূর্বদিকের কয়েকটি জেলায় কন্যাসন্তান জন্মালে তাকে আঁতুড়ঘরেই মেরে ফেলা হয়। ভাবতেও অবাক লাগে একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেশে এই কুৎসিৎ প্রথা এখনও চলছে। 1991 সালে গ্রামীণ এলাকায় প্রতি হাজার কন্যাসন্তানের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল যেখানে 29.8, সেখানে পুত্রসন্তানের মৃত্যুর হার হল 28.5। শহর এলাকায় এই হার (0-4 বয়সের পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে) 15.2 এবং কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে 16.8। অবহেলা, অনাদরে আমাদের দেশে বাচ্চা মেয়েরা শিশুপুত্রের তুলনায় বেশি হারে মারা যায়। এ দেশে মেয়েদের প্রতি এই উপেক্ষা, অনাদর বা বৈষম্য তাদের শেষ জীবন পর্যন্ত চলে বললে ভুল বলা হয় না। সাধারণত ভারতে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা এখনও খুব একটা উঁচুতে নয়। তার প্রমাণ তাঁদের মধ্যে শিক্ষার নিম্নমান, তাঁদের জন্য স্বায়ত্তশাসনের অভাব। বাল্যবিবাহ, অনেক সন্তানসন্ততির জন্মদান, প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি, সাক্ষরতার নিম্নমান ইত্যাদি এদেশের মহিলাদের নিম্ন সামাজিক অবস্থাকে বোঝায়। 1992-1993 সালের এক হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে ছ'বছরের মেয়েরা যারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে তাদের হার হল 28.1, অথচ পুরুষদের মধ্যে এই হার হল 48.6 শতাংশ।

অতীতে ভারতে "সতীদাহ" ও "শিশুকন্যা হত্যা" প্রথার জন্য এদেশে মহিলার সংখ্যা কম ছিল। এছাড়া ফি-বছর মহামারীও এদেশে মহিলাদের সংখ্যাকে বাড়তে দেয়নি। একে তো বহু সন্তানের জন্মদানের ফলে শারীরিক ধকল,

তার ওপরে দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা—দু'য়ে মিলে নারীমৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিত। এই কারণে নারী-পুরুষ অনুপাতে একটা অসাম্য ছিল, যার ছাপ আজও রয়ে গেছে।*

শহর ও গ্রাম, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য ভারতের নারী-পুরুষ অনুপাতের একটা বৈশিষ্ট্য। ভারতের গ্রাম ও পৌর জনসংখ্যার নারী-পুরুষ অনুপাতের যে চিত্র আমরা পাই, তা পশ্চিমী দেশগুলোর ঠিক উল্টো। ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা 951 ও শহরাঞ্চলে মাত্র 880 (1991 সাল)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এদেশের শহরবাসীদের মধ্যে নারীর অভাব রয়েছে। এর কারণ হল মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশিসংখ্যায় শহরে চলে আসেন। গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাব ও সীমিত জমির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ, আবার অন্যদিকে শহরের আকর্ষণ ক্ষমতার জন্য গ্রাম থেকে পুরুষেরা শহরে চলে আসেন। কিন্তু শহরে জীবনযাত্রার জন্য বেশি খরচ ও সমস্যার দরুন পুরুষেরা তাদের পরিবারকে গ্রামে রেখে আসতে বাধ্য হন। গ্রামের যৌথ পরিবার প্রথাও পুরুষদেরকে পরিখানে সাহায্য করে। যৌথ পরিবারের সঙ্গে বাস করার দরুন পুরুষেরা নিশ্চিন্ত মনে শহরে পাড়ি জমাতে পারেন। এদিকে পরিবার ছাড়া শহরে আসার জন্য একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলে নারীর সংখ্যা বেড়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি শহরে সেই অনুপাতে নারীর সংখ্যা কমে যায়। অর্থাৎ, গ্রাম ও শহরের নারী-পুরুষ অনুপাতে একটা ফারাক থেকে যায়। অনুরূপভাবে, ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাতে পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাত সবচেয়ে বেশি, শিখদের মধ্যে সব থেকে কম, প্রতি হাজারে যথাক্রমে 980 ও 860 জন নারী (1971- র লোকগণনা)। ঐ লোকগণনা থেকে আরও দেখা যাচ্ছে মুসলিমদের মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাত হল 922, হিন্দুদের মধ্যে 930, অর্থাৎ জাতীয় গড়ের (930) সমান। শিখদের মধ্যে কম হার কন্যাসন্তানের জন্ম, খ্রীষ্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম হারে মহিলাদের মৃত্যু ও মুসলিমদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি হারে স্ত্রীলোকের মৃত্যু উক্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীদের মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাতের পার্থক্যের জন্য দায়ী।

এবার তপসিলী উপজাতিদের কথায় আসা যাক। মজার ব্যাপার হল যে সাধারণ জনগোষ্ঠীর চেয়ে উপজাতিদের মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাত বেশি। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা হল 982 জন। তবে কিছু উপজাতিদের মধ্যে পুরুষ-মৃত্যুর হার বেশি। কারণ তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেন। দরকার হলে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কাজ করেন। অন্যদিকে উপজাতিদের মধ্যে ব্যাপকহারে খ্রিষ্টধর্মের প্রসারের ফলে নারী-মৃত্যুর হার কমে এসেছে। পক্ষান্তরে, তপসিলী জাতিদের মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাত হল প্রতি হাজার পুরুষে 932 জন (নারী)। এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি নারী-মৃত্যু ঘটায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম।

এবার প্রদেশভিত্তিক নারী-পুরুষ অনুপাতের কথায় আসা যাক। এখানেও দেখা যাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নারী-পুরুষ অনুপাতের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। ভারতের মধ্যে কেরালা-ই একমাত্র রাজ্য যেখানে পুরুষদের তুলনায় মহিলার সংখ্যা বেশি, প্রতি হাজার পুরুষে 1032 জন মহিলা (1981 লোকগণনা)।** এর বিপরীতে রয়েছে সিকিম,

---

*অধ্যাপক অমর্ত্য সেন (1397 বঙ্গাব্দ) তাঁর জীবনযাত্রা ও অর্থনীতিতে বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, "অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে ভারতীয় নারী ও পুরুষের অবস্থার উন্নতি হলেও তুলনামূলকভাবে ভারতীয় নারীরা পিছনে পড়ে আছেই বলে মনে হয়।.....দেখা গিয়েছে, সাধারণভাবে আয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটলেও নারীদের বিরুদ্ধে লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য প্রত্যেক আয়স্তরেই রয়েছে।" (পৃঃ 178-79)

** 1991-র লোকগণনায় কেরালায় এই অনুপাত হল 1,040। এর পরের স্থান হিমাচল প্রদেশের 996। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে 950 বা তার বেশি অনুপাতকে মহিলাদের পক্ষে অনুকূল বলে ধরা হয়। এই হিসেবে কেরালা ও হিমাচল প্রদেশ ছাড়া দেশের যে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই অনুপাত মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সেগুলো হল অন্ধ্রপ্রদেশ (972), গোয়া (969), কর্ণাটক (960), মণিপুর (961), ওড়িশা (972), তামিলনাড়ু (982) প্রভৃতি। এই জনগণনায় আরও দেখা যাচ্ছে রাজ্যগুলোর মধ্যে অরুণাচলে (861) এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে ভারতের অন্যতম আধুনিক শহর চণ্ডীগড়ে (793) সবচেয়ে কম নারী-পুরুষ অনুপাত লক্ষ্য করা যায়। আরও উল্লেখ্য যে 1981-র তুলনায় উপরোক্ত রাজ্যগুলোতে নারী-পুরুষ অনুপাত কমেছে। সেই তুলনায় হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কেরালা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, পাঞ্জাব, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গে অনুপাত বেড়েছে।

যেখানে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা 835 জন। এর পরের স্থান হল অরুণাচল (862), নাগাল্যান্ড (863), হরিয়ানা (870), পাঞ্জাব (879), উত্তরপ্রদেশ (885), জম্মু ও কাশ্মীর (892), অসম (901), পশ্চিমবঙ্গ (911), রাজস্থান ও মিজোরাম (919), মহারাষ্ট্র (937), মধ্যপ্রদেশ (941), ত্রিপুরা ও বিহার (946), মেঘালয় (954), গুজরাট (959), কর্ণাটক (963), মণিপুর (971), হিমাচল প্রদেশ ( 973), অন্ধ্র প্রদেশ (975), তামিলনাড়ু (977), ওড়িশা ও গোয়া (981)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতের মধ্যে কেরালা ও গোয়ায় নারী-পুরুষ অনুপাত সবচেয়ে বেশি। এখানকার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হলেন খ্রীষ্টান। উভয় রাজ্যেই জন্ম ও মৃত্যু বেশ কম। এ ব্যাপারে তাদেরকে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করা চলে। এখানে মহিলা মৃত্যুর হার কম। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করতে হয় যে কেরালা থেকে পুরুষেরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায়—এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে—পরিযান করেন। সেই কারণে এই রাজ্যে পুরুষদের সংখ্যা কম। সেই তুলনায় সিকিম ও কেন্দ্রশাসিত আন্দামান ও নিকোবর অন্য রাজ্য থেকে পরিযানের সংখ্যা কম। অবশ্য সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে দুই জায়গায় সামরিক বাহিনীর কর্মীদের সংখ্যা বাড়তির দিকে।

এবার ভারতের জেলাভিত্তিক (1981সাল) গ্রাম ও শহরের নারী-পুরুষ অনুপাত নিয়ে একটু আলোচনায় আসা যাক। গ্রামীণ নারী-পুরুষ অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে (i) উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারত এ ব্যাপারে এগিয়ে আছে। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় গ্রামীণ নারী-পুরুষ অনুপাত বেশি (1,261)। সামগ্রিকভাবে কেরালার নারী-পুরুষ অনুপাত বেশি। কিন্তু জেলাভিত্তিক গ্রামীণ নারী-পুরুষ অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই রাজ্যের কয়েকটি জেলাতে মহিলার সংখ্যা হাজারের নীচে আছে। আবার উত্তর প্রদেশের কয়েকটি পাহাড়ী জেলা যেমন চামেলী (1090), পিথোরগড় (1,034), আলমেনেট(1,037), টেহরীগাড়োয়াল (1,119) ও গাড়োয়লে (1,147) নারীদের সংখ্যা বেশি। এই সব অঞ্চলে নারীদের সামাজিক মর্যাদাও বেশি। আবার এখানকার আজমগড় (1,033), জৈনপুর (1,018) এবং বিহারের সরণ, সিবান (1,097), গোপালগঞ্জ (1,011), নাওদা (1,008) ও বৈশালীর (1,001) মত কৃষিপ্রধান জেলায় পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা বেশি (ii) মধ্যপ্রদেশের উপজাতি প্রধান এলাকায় যেমন বাস্তার (1,008), রায়পুর (1,024), দ্রুগ (1,028), রাজনন্দগাঁও (1,031), রায়গড় (1,015), বালাঘাট (1,015), মাণ্ডালা (1,009), বিলাসপুরে (1,005)— পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা বেশি (iii) পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ (পশ্চিম), রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিরাট এলাকায় নারীর সংখ্যা কম (চিত্র 6.1)। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি হারে জন্ম ও চাকরীর জন্য পুরুষদের পরিযান এর জন্যে দায়ী। (iv) আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল, নাগাল্যান্ড রাজ্যে নারীর সংখ্যা কম। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে অন্য রাজ্য থেকে প্রচুর সংখ্যক পুরুষেরা কর্মের খাতিরে এসেছেন, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর লোকেরা। ফলে নারী-পুরুষ অনুপাতে একটা ফারাক চোখে পড়ে।

এবার জেলাভিত্তিক শহরের নারী-পুরুষ অনুপাত (1981 সাল) নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। (i) ত্রিপুরা ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর পৌর নারী-পুরুষ অনুপাত কম। এখানকার সিকিমের নর্থ ডিস্ট্রিক্ট জেলায় নারী-পুরুষ অনুপাত সবচেয়ে কম। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা 523 জন। এর আগের স্থান অরুণাচলের ওয়েস্ট সিয়াং জেলা (543 জন), নাগাল্যান্ডের মন জেলা (577 জন)। উত্তর প্রদেশের দুটি পাহাড়ী জেলা উত্তর কাশী (571) ও টেহরী গাড়েয়াল (555), হিমাচল প্রদেশের কুলু (713), লাহুল ও স্পিটি (766), সোলান (782),

জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখ (732), কারগিল (758) ইত্যাদি পাহাড়ি জেলাগুলোতে নারীর সংখ্যা কম। আবার রাজস্থানের রুক্ষ মরুভূমিতে অবস্থিত জয়শলমীর জেলাশহরেও নারীর সংখ্যা কম (745)। সম্ভবত মরুভূমির কষ্টকর জীবনযাত্রা এর জন্যে দায়ী। (ii) ভারতে প্রায় প্রতি জেলাশহরেই নারীর সংখ্যা কম। এমন কি, পূর্বোক্ত উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের জেলাশহরগুলোতেও নারীর সংখ্যা কম। এদের মধ্যে টেহরী গাড়োয়ালের কথা আগেই বলা হয়েছে। গ্রাম্য নারী-পুরুষ অনুপাতের মতন পৌর নারী-পুরুষ অনুপাতের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারতের জেলাশহরগুলো এ ব্যাপারে এগিয়ে আছে, অর্থাৎ এখানকার জেলা শহরগুলোতে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। (iii) অবশ্য কেরালার জেলাশহর ছাড়া দক্ষিণ ভারতের মাত্র তিনটে জেলায় নারীর সংখ্যা 1,000-র বেশি ঃ তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলী (1,016), অন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর (1,015) ও কর্ণাটকের দক্ষিণ কান্নাড় (1,013)। (iv) উত্তর ভারতের মধ্যে একমাত্র ফারাক্কাবাদেই (উত্তরপ্রদেশ) মহিলার সংখ্যা বেশি (1,178)। (v) আবার, কলকাতা (712), হাওড়া (787), বৃহত্তর মুম্বাইয়ের (772) মতন মহানগরী কিংবা হরিয়ানার শিল্পভিত্তিক ফরিদাবাদ (762) বা বিহারের শিল্প ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ শহর ধানবাদ (742) ও হাজারীবাগ (767)।

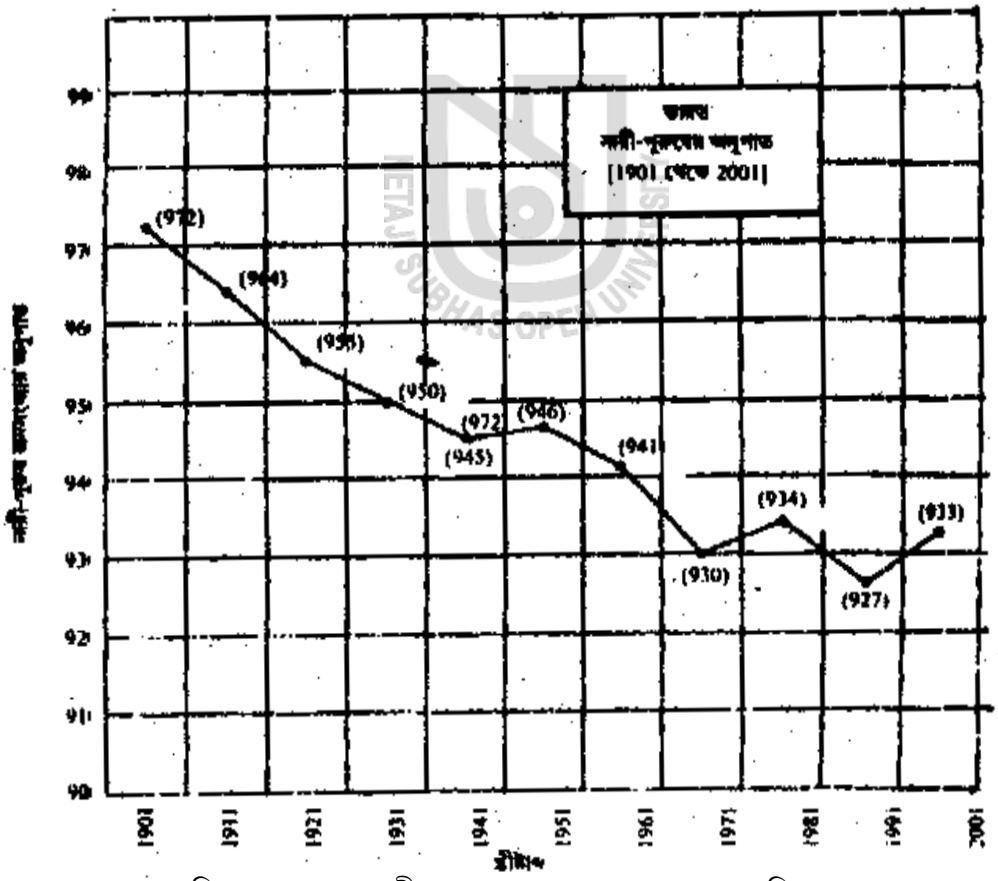

চিত্র 3.4 ভারতের স্ত্রী-পুরুষ জনসংখ্যার অনুপাতের লেখচিত্র

## বিশেষ আলোচনা

### লিঙ্গ অনুপাত

| ক্রম 2001 | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল* | 2001 | লিঙ্গ অনুপাত* 1991 | ক্রম 1991 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | কেরালা | 1, 058 | 1,036 | 1 |
| 2 | চণ্ডীগড়* | 1,001 | 979 | 3 |
| 3 | ছত্তিশগড় | 990 | 985 | 2 |
| 4 | তামিলনাড়ু | 986 | 974 | 5 |
| 5 | মণিপুর | 978 | 958 | 11 |
| 6 | অন্ধ্রপ্রদেশ | 978 | 972 | 8 |
| 7 | মেঘালয় | 975 | 957 | 13 |
| 8 | ওড়িশা | 972 | 971 | 4 |
| 9 | হিমাচলপ্রদেশ | 970 | 976 | 4 |
| 10 | উত্তরাঞ্চল | 964 | 936 | 17 |
| 11 | কর্ণাটক | 964 | 960 | 10 |
| 12 | গোয়া | 960 | 967 | 9 |
| 13 | ত্রিপুরা | 950 | 945 | 15 |
| 14 | লাক্ষাদ্বীপ* | 947 | 943 | 16 |
| 15 | ঝাড়খণ্ড | 941 | 922 | 21 |
| 16 | মিজোরাম | 938 | 921 | 22 |
| 17 | পশ্চিমবঙ্গ | 934 | 917 | 23 |
| 18 | অসম | 932 | 923 | 20 |
| 19 | রাজস্থান | 922 | 910 | 25 |
| 20 | মহারাষ্ট্র | 922 | 934 | 19 |
| 21 | বিহার | 921 | 907 | 26 |
| 22 | গুজরাত | 921 | 934 | 18 |
| 23 | মধ্যপ্রদেশ | 920 | 912 | 24 |
| 24 | নাগাল্যান্ড | 909 | 886 | 27 |
| 25 | অরুণাচল প্রদেশ | 901 | 859 | 32 |
| 26 | জম্মু ও কাশ্মীর | 900 | 896 | 12 |
| 27 | উত্তরপ্রদেশ | 898 | 876 | 30 |
| 28 | সিকিম | 875 | 878 | 29 |
| 29 | পাঞ্জাব | 874 | 882 | 28 |
| 30 | হরিয়ানা | 861 | 865 | 31 |
| 31 | আন্দামান ও নিকোবর* | 846 | 818 | 34 |
| 32 | দিল্লি* | 821 | 827 | 33 |
| 33 | দাদরা ও নগর হাভেলি* | 811 | 952 | 14 |
| 34 | চণ্ডীগড়* | 773 | 790 | 35 |
| 35 | দমন ও দিউ* | 709 | 969 | 8 |
| | ভারত | 933 | 927 | |

* প্রতি হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা

ভারতের জনসংখ্যা জনগণনার সময় পাক ও চীন অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের অংশগুলিকে ধরা হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে গুজরাত ও হিমাচল প্রদেশের কয়েকটি জেলায় জনগণনার কাজ করা সম্ভব হয়নি।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই নারী-পুরুষ অনুপাত বেড়েছে। ব্যতিক্রম হল গোয়া, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, সিকিম, পাঞ্জাব, হরিয়ানা। কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলোর সব কটিতেই (আন্দামান ছাড়া) লিঙ্গ অনুপাত বেশ কমেছে। এইগুলি অধিকাংশই নগর যেখানে কাজের সন্ধানে পুরুষরা চলে এসেছেন। পরিবার গ্রামেই রয়ে গেছেন।

এবার জাতীয় লিঙ্গ অনুপাতের গড় (933) যদি চিন্তা করা হয়, তবে দেখা যাবে ভারতের অর্ধেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে লিঙ্গ অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি, বাকি অর্ধেক কম।

বাড়ি ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শহরে আগন্তুক পুরুষ কর্মীরা তাদের পরিবারবর্গকে গ্রামে রেখে আসেন। রুটি-রোজগারের তাগিদে আসা এইসব লোকের অনেকেরই মাথার ওপর ছাদ থাকে না। ফুটপাতে, স্টেশনে বা নোংরা বস্তিতে এরা কোনওরকমে দিন কাটান। এদের মধ্যে একটু অবস্থাপন্নরা কাছাকাছি হলে সপ্তাহে একবার, দূরে হলে মাসে একবার বা বছরে দু/এক মাসের ছুটি নিয়ে গ্রামে গিয়ে এদের পরিবারকে দেখে আসেন।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম নারীর সংখ্যা হল আন্দামানে (720 জন)। এর পরের স্থান চণ্ডীগড়ের (775)। নারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হল দিউ-এ (1204)। এর পরের স্থান হল মাহে (1,144), কারাইকাল (1,040) ও দমনের (1,024)।

পৌর নারী-পুরুষ অনুপাত আলোচনায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে ঃ () কয়েকটি জেলা শহর ছাড়া বাকিগুলোতে নারীর সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি নয়। (2) জেলাভিত্তিক আলোচনায় আরও দেখা যায় যে প্রায় প্রতি জেলা শহরে নারীর সংখ্যা গ্রামীণ নারীসংখ্যার চেয়ে বেশ কম, (3) কেন্দ্রশাসিত অধিকাংশ অঞ্চলেই নারীর সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি।

## 2001 সালের লিঙ্গ অনুপাত

2001 সালের জনগণনায় দেখা গেছে কেরালা এবারও তাদের স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। (চিত্র 3.5) অর্থাৎ লিঙ্গ অনুপাতের তালিকায় কেরালা প্রথম স্থানটি ধরে রেখেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই অনুপাত আরো বেড়েছে। 1991 সালে যেখানে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল 1036 (সারণি), .....2001 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1058, এটি একটি সামাজিক দিক আছে। ঐ রাজ্যে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা উচ্চে। সম্ভবত ঐ রাজ্যে যদিও পুরুষ ও নারীর মৃত্যুহারের কোনো পৃথক পৃথক পরিসংখ্যান নেই, তবুও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ঐ রাজ্যে মহিলা মৃত্যুর হার কম ছিল, পুরুষদের থেকেও কম হতে পারে "may be lower than that of the male (Chandna, 2002)। যা হোক, এটাও ঠিক যে কেরালা থেকে অনেক পুরুষ কর্মোপলক্ষে দেশের বিভিন্ন অংশে, এমন কি মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে গেছেন। এটিও লিঙ্গ অনুপাতের ক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যাধিক্য হবার কারণ। তবে লিঙ্গ অনুপাতে মহিলাদের সংখ্যাধিক্যের একটি কুফল দিকও আছে। তা হল অনেক "মহিলা"র অনূঢ়া (unmarried) থাকার সম্ভাবনা। লিঙ্গ অনুপাত যদি সমান সমান হত (যেমনটি হয়েছে পন্ডিচেরীর ক্ষেত্রে, প্রতি হাজার পুরুষে 1001 জন মহিলা) তবে সমাজে একটা ভারসাম্য বজায় থাকত।

2001 সালের জনগণনায় দেখা গেছে যে দেশে লিঙ্গ অনুপাতের গড় হল 933 (1991 সালে ছিল 927)। গড় অনুপাতের চেয়ে যথেষ্ট বেশি (960 ও তার বেশি) লিঙ্গ অনুপাতের রাজ্যগুলো হল—ছত্তিশগড় (990), তামিলনাড়ু (986), মণিপুর ও অন্ধ্রপ্রদেশ (978), মেঘালয় (975), ওড়িশা (972), হিমাচল প্রদেশ (970) ও উত্তরাঞ্চল (964)। ছত্তিশগড়ে মহিলা সংখ্যাধিক্যের কারণ হল এখানকার উপজাতির পুরুষদের অধিক মৃত্যুহার। কারণ এখানকার পুরুষরা বিপদসংকুল কাজ করে থাকেন, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, গোয়া প্রভৃতি দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বেশি। হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি পাহাড়ী রাজ্যগুলোতে মহিলা আধিক্যের কারণ হল ("male selective outer migration and relative better status granted to the females in the hill

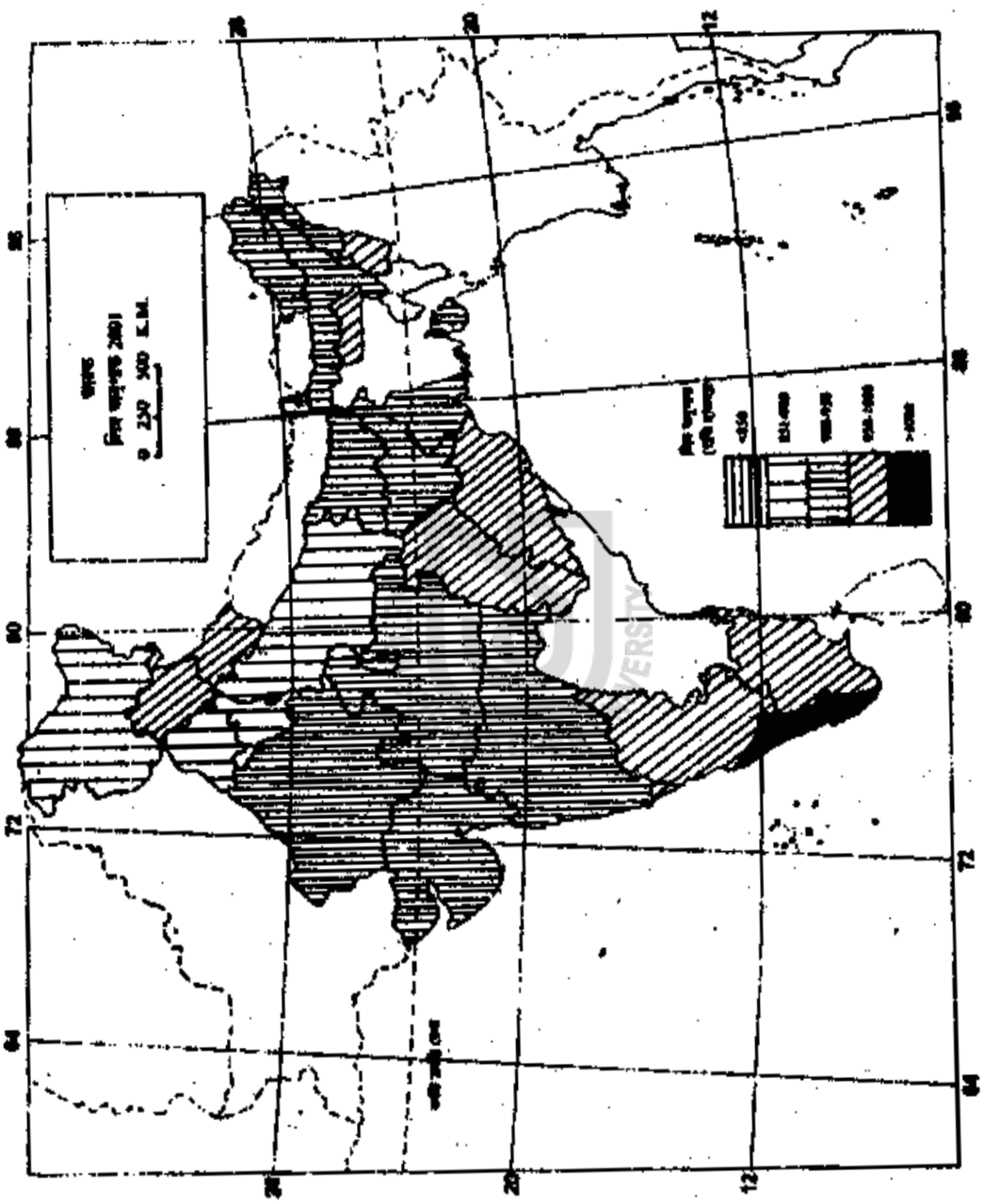

চিত্র 3.5

চিত্র : 3.5

socities") (Chandna, 2000)। উপরোক্ত দুটো রাজ্যের ন্যায় মণিপুর ও মেঘালয়েও মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বেশি। ঐ দুটি রাজ্য হল মাতৃতান্ত্রিক। এখানে বিয়ের পর পুরুষেরা শ্বশুরবাড়িতে চলে যান এবং মহিলারা সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা প্রাপ্ত হন।

জাতীয় গড়ের (933) কাছাকাছি রাজ্যগুলো হল—পশ্চিমবঙ্গ (939), মিজোরাম (938), ঝাড়খণ্ড (941), ত্রিপুরা (950), গোয়া (960) ও কর্ণাটক (964)।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল দমন ও দিউ, 709 পূর্বে দমন ও দিউ গোয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তখন তার লিঙ্গ অনুপাত ছিল গোয়ার কাছাকাছি 969। আধুনিক শহর চণ্ডীগড় ও দিল্লিতে নারী-পুরুষের পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। এই দুটি বড় শহরে বাইরে থেকে মানুষরা (পুরুষ) কাজের সন্ধানে আসেন। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হওয়ায় ঐ সব পরিযায়ী ব্যক্তি তাদের পরিবারকে দেশের বাড়িতে রেখে আসতে বাধ্য হন। চণ্ডীগড় ও দিল্লী হল উন্নয়নশীল দেশের পৌরায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যেখানে পুরুষরা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের গ্রামে রেখে শহরে চলে আসেন।

সবশেষে বলতে হয় গোটা দেশেই লিঙ্গ অনুপাত বেড়েছে (ব্যতিক্রম হল হিমাচলপ্রদেশ, গোয়া, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, সিকিম, পাঞ্জাব, হরিয়ানা) শিল্পোন্নত মহারাষ্ট্র এবং কৃষিসমৃদ্ধ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে বহু পুরুষ কাজের সন্ধানে এসেছেন। সম্ভবত সিকিমে সামরিক ব্যক্তিরা আরো বেশি সংখ্যায় এসেছেন। হিমাচলপ্রদেশে নারীর সংখ্যা চিরকালই কম। তবে 1991-র জনগণনায় জাতীয় গড়ের চেয়ে নারীর আধিক্য ছিল চোখে পড়ার মতন। দিল্লি ও চণ্ডীগড়ের অবস্থা আগের থেকে খারাপ হয়েছে। এই দুটি শহরে আরও বহুসংখ্যক পুরুষ কর্মীর সমাবেশ নারীর সংখ্যা হ্রাস হওয়ার কারণ D. Ghosh তাঁর Pressure of Population and Economic Efficieney in India গ্রন্থে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ভারতের মহিলারা সংখ্যালঘু কেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—আদমসুমারিতে মহিলাদের দেশগুলোর তুলনায় ভারতের মহিলারা সংখ্যালঘু কেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—আদমসুমারিতে মহিলাদের গণনায় ঘাটতি এই যুক্তি সম্পূর্ণ সত্যি নয়। 1921 সাল থেকে লোকগণনা সংস্থার কার্যকারিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও নারীর সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পেয়েছে।

**সারনি 3.3 ঃ ভারতের গত একুশ বছরের লিঙ্গ অনুপাত (1901-2001)**

| জনগণনা বছর | লিঙ্গ অনুপাত | জনগণনা বছর | লিঙ্গ অনুপাত |
|---|---|---|---|
| 1901 | 1020 | 1961 | 106.3 |
| 1911 | 103.8 | 1971 | 107.5 |
| 1921 | 104.7 | 1981 | 107.1 |
| 1931 | 105.3 | –– | –– |
| 1941 | 105.8 | 1991 | 107.2 |
| 1951 | 105.7 | 2001 | 107.2 |

শিশুকন্যা মৃত্যু ও হত্যা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন 1921 সালে মুম্বাই-এর Census Commissionar Mr. Sedgwick। ভারতীয় মহিলাদের সংখ্যাল্পতা সম্বন্ধে জীব-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। আনুপাতিক বৈষম্যের ব্যাখ্যা হিসেবে Hutton (1931) স্ত্রী ও পুরুষের বয়স নির্দিষ্ট মৃত্যুহারের পার্থক্যের ওপর জোর দেন। আমাদের দেশের মেয়েদের উন্নত দেশের মেয়েদের চেয়ে পরিশ্রম করতে হয় অনেক বেশি। তুলনায় তারা পর্যাপ্ত পরিমান ক্যালোরি পায় মেয়েদের উন্নত দেশের মেয়েদের চেয়ে পরিশ্রম করতে হয় অনেক বেশি। তুলনায় তারা পর্যাপ্ত পরিমান ক্যালোরি পায় না (মাত্র 1718 ক্যালোরি)। রামায়ণে জনক রাজা লাঙ্গল চাষ করতে গিয়ে সীতাকে মাটি থেকে পেয়েছিলেন। কন্যা-সন্তান বলেই কি মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল সীতাকে? সর্বংসহা, চিরদুঃখিনী, চিরবিরহিনী সীতা নিজের সেই ভাগ্যকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। পাতাল প্রবেশ করেছিল সীতা। কিন্তু আজকের মায়েরা তো

বসুন্ধরার মতো নির্বাক নন। নিজেদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সরব হয়েছেন, নিজের কন্যা-সন্তানটির ভাগ্য জয়ে সেই নারী কেন সবলা হয়ে উঠবে না?

সুখের কথা, স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন যথা আধুনিক চিকিৎসার প্রবর্তন, রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা, মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি।

## 6.4 শিক্ষা (Education)

যে কোনও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা হল হাতিয়ার। তাই ভারতের প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ভারতীয় জনগণনা দপ্তরের মতে যদি কোনও ব্যক্তি যে-কোনো ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারে তাকে সাক্ষর (literate) বলা যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও পরিকল্পনা কমিশন ঠিক করেছে যে 7 বছর ও তার বেশি বয়সীদের সাক্ষর হিসেবে গণ্য করতে হবে। সাক্ষরতার হার নির্ণয় করতে আগেকার লোকগণনায় সমস্ত বয়সের জনতার সংখ্যা চিন্তা করা হত।

1991 সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা উত্তর কালে সাক্ষরতার হার যথেষ্ট বেড়েছে (সারণি 3.4)। স্বাধীনতার সময় (1951) প্রতি 5 জনের মধ্যে একজন (18.3 শতাংশ) লিখতে ও পড়তে পারত। স্ত্রীলোকদের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। প্রতি এগারো জনের মধ্যে একজন (8.8 শতাংশ) মাত্র স্বাক্ষর ছিল।

**সারণি 3.3 ঃ**
**স্বাক্ষরতার অগ্রগতি (1901-91)**

| জনগণনা বছর | লিঙ্গ অনুপাত | পুরুষ শিক্ষার হার | স্ত্রি শিক্ষার হার |
|---|---|---|---|
| 1901 | 5.35 | 9.83 | 0.60 |
| 1911 | 5.92 | 10.56 | 1.05 |
| 1921 | 7.16 | 12.21 | 1.81 |
| 1931 | 9.50 | 15.59 | 2.93 |
| 1941 | 16.10 | 24.90 | 7.30 |
| 1951 | 16.67 | 24.95 | 7.93 |
| 1961 | 24.02 | 34.44 | 12.95 |
| 1971 | 29.45 | 39.45 | 18.69 |
| 1981 | 36.17 | 46.74 | 24.88 |
| 1991 | 52.11 | 63.86 | 33.42 |

ভারতে সাক্ষরতার হার কম, কারণ প্রাচীন ঐতিহ্য। বর্ণবৈষম্য প্রথানুযায়ী সমাজের উচ্চবর্ণের লোকদেরই শুধুমাত্র শিক্ষার অধিকার ছিল, ফলস্বরূপ বৃত্তির প্রয়োজনে শিক্ষাগ্রহণ করা হত। যা হোক, আজও আমাদের দেশে শিক্ষার হার কম হওয়ার কারণ হল বর্ণভিত্তিক সমাজ, প্রধানত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি যেখানে কলাকৌশলের প্রয়োগ কম, নারীদের পরিযান (migration), শিক্ষা ও চাকুরির বিরুদ্ধে কুসংস্কার, দারিদ্র্য, শিক্ষার প্রচুর খরচ, স্কুলের সীমিত সুযোগ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও তাদের শিক্ষা।

শুধুমাত্র অঞ্চলভিত্তিক সাক্ষরতার হারে পার্থক্য নয়, নারী ও পুরুষ গ্রাম ও শহর এবং বর্ণভিত্তিক উপরিভাগের মধ্যে পার্থক্যও ভারতের সাক্ষরতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের পার্থক্যের হেতু হল উক্ত অঞ্চল বা জনতার আর্থ-সামাজিক পটভূমিকা। 1991 সালের লোকগণনায় শিক্ষাহারে নিম্নোক্ত আঞ্চলিক পার্থক্য চোখে পড়ে (সারণি 3.5)। ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে কেরালায় শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি। এর পরের স্থান হল মিজোরাম, গোয়া, তামিলনাড়ু,

হিমাচলপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, গুজরাট ও ত্রিপুরার। এ থেকে বলা যেতে পারে যে ভারতের পঁচিশটি রাজ্যের মধ্যে দশটির 60 শতাংশের বেশি লোক সাক্ষর। এই সব রাজ্যগুলোর কয়েকটিতে বেশ কিছু খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তি রয়েছেন, যেমন মিজোরাম (83.8 শতাংশ), নাগাল্যান্ড (80.0), মণিপুর (29.7), গোয়া (29.1), কেরালা (20.7)। এই সব রাজ্যগুলোর বেশির ভাগই জাতীয় গড়ের চেয়ে শিক্ষাখাতে অনেক বেশি ব্যয় করে। কেরালায় উচ্চ শিক্ষা হারের মূলে রয়েছে সেখানকার প্রশাসনের দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা, এক বৃহৎ-সংখ্যক জনতার অ-কৃষিকার্যে নিয়োগ ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কম এমন সব রাজ্যে উচ্চশিক্ষার হার বেশি, কারণ হল সেখানকার শিল্প পরিকাঠামো, কারিগরী ও প্রশাসনিক দক্ষতা।

**সাক্ষরতার হার**

| ক্রম | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত | % | | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | অঞ্চল* | 2001 | 1991 | 1991 |
| 1 | কেরালা | 90.92 | 89.81 | 1 |
| 2 | মিজোরাম | 88.49 | 82.27 | 2 |
| 3 | লাক্ষাদ্বীপ* | 87.52 | 81.78 | 3 |
| 4 | গোয়া | 82.32 | 75.51 | 5 |
| 5 | দিল্লি | 81.82 | 75.29 | 6 |
| 6 | চণ্ডীগড় | 81.76 | 77.81 | 4 |
| 7 | পণ্ডিচেরী | 81.49 | 74.74 | 7 |
| 8 | আন্দামান ও নিকোবর | 81.18 | 73.02 | 8 |
| 9 | দমন ও দিউ | 81.09 | 71.20 | 9 |
| 10 | মহারাষ্ট্র | 77.17 | 64.87 | 10 |
| 11 | হিমাচল প্রদেশ | 77.13 | 63.86 | 11 |
| 12 | ত্রিপুরা | 73.66 | 60.44 | 15 |
| 13 | তামিলনাড়ু | 73.47 | 62.66 | 12 |
| 14 | উত্তরাঞ্চল | 72.28 | 57.75 | 18 |
| 15 | গুজরাট | 69.97 | 61.29 | 14 |
| 16 | পাঞ্জাব | 69.95 | 58.51 | 17 |
| 17 | সিকিম | 69.68 | 56.94 | 20 |
| 18 | পশ্চিমবঙ্গ | 69.22 | 57.70 | 19 |
| 19 | মণিপুর | 68.87 | 59.89 | 16 |
| 20 | হরিয়ানা | 68.59 | 55.85 | 22 |
| 21 | নাগাল্যান্ড | 67.11 | 61.65 | 13 |
| 22 | কর্ণাটক | 67.04 | 56.04 | 21 |
| 23 | ছত্তিশগড় | 65.18 | 42.91 | 28 |
| 24 | অসম | 64.28 | 52.89 | 23 |
| 25 | মধ্যপ্রদেশ | 64.11 | 44.20 | 26 |

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

| ক্রম | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত | % | | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | অঞ্চল* | 2001 | 1991 | 1991 |
| 26 | ওড়িশা | 63.61 | 49.09 | 25 |
| 27 | মেঘালয় | 63.31 | 49.10 | 24 |
| 28 | অন্ধ্রপ্রদেশ | 61.11 | 44.09 | 27 |
| 29 | রাজস্থান | 61.03 | 38.55 | 33 |
| 30 | দাদরা ও নগর হাভেলি* | 60.03 | 40.71 | 32 |
| 31 | উত্তর প্রদেশ | 57.36 | 41.6 | 29 |
| 32 | অরুণাচল প্রদেশ | 54.74 | 41.59 | 30 |
| 33 | জম্মু ও কাশ্মীর | 54.46 | পাওয়া যায়নি | –– |
| 34 | ঝাড়খণ্ড | 54.13 | 41.39 | 31 |
| 35 | বিহার | 47.53 | 38.48 | 34 |
| | ভারত | 65.49 | 52.20 | |

*ভারতের জনসংখ্যা গণনার সময় পাক ও চীন অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের অংশগুলিকে ধরা হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে গুজরাত ও হিমাচল প্রদেশের কয়েকটি জেলায় জনগণনার কাজ করা সম্ভব হয়নি।*

পাঞ্জাব রাজ্যে মাথাপিছু আয় অনেক বেশি অথচ সেখানকার শিক্ষার হার 57.1 শতাংশ। এর কারণ হল এই রাজ্যে কৃষির উন্নতির জন্য খাল, টিউওয়েল, রাস্তা, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এই রাজ্য থেকে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের অন্যান্য রাজ্য, এমনকি বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই রাজ্যে প্রবেশ করছেন।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহে শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক। দাদরা ও নগর হাভেলীতে শিক্ষার হার সবচেয়ে কম (39.4 শতাংশ)। এটি গ্রামীণ এলাকা, অন্যান্য অঞ্চলগুলো পৌর এলাকা, স্বভাবতই ওইসব স্থানে শিক্ষার হার বেশি। আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে এই লোকগণনায় চণ্ডীগড়ের তুলনায় লাক্ষাদ্বীপে শিক্ষার হার বেশি হয়েছে। যেহেতু লাক্ষাদ্বীপ সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এখানে সামরিকবাহিনীর লোকজন এসেছেন। এরা শিক্ষিত। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলটি ছোটো, তাই এখানে কিছু লোকের আগমন শিক্ষার হারে (%) বড় রকম রদবদল ঘটিয়েছে। পক্ষান্তরে, চণ্ডীগড়ে অদক্ষ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য কয়েকটি শিবির তৈরি করা হয়েছে এজন্য এই লোকগণনায় চণ্ডীগড় শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষে শিক্ষার হার (i) উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে, (ii) দেশের অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষা উপকূল এলাকা, (iii) পূর্বতন সনদ রাজ্য অপেক্ষা ব্রিটিশ শাসিত এলাকা, (iv) হিন্দী ভাষাভাষী এলাকা অপেক্ষা অ-হিন্দি ভাষাভাষী এলাকা, (v) অ-খ্রিস্টধর্মাবলম্বী উপজাতি এলাকা অপেক্ষা খ্রিস্টধর্মাবলম্বী উপজাতি এলাকা, (vi) স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি এলাকা অপেক্ষা বাণিজ্যিক কৃষি অর্থনীতি এলাকা, (vii) মাথাপিছু কম আয় অপেক্ষা বেশি আয় এলাকা এবং (vii) মুসলিম এলাকা অপেক্ষা অ-মুসলিম এলাকায় বেশি।

ভারতের সাক্ষরতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে পুরুষদের নারীরা শিক্ষার দিক দিকে অনেক পিছিয়ে আছে। 1991-এর জনগণনায় পুরুষ-শিক্ষার হার যেখানে ছিল 63.86 শতাংশ নারীশিক্ষার হার সেখানে 33.42 শতাংশ।

**সারণি 3.5**

**ভারতবর্ষে শিক্ষার হার (7 বছরের নীচের জনসংখ্যা বাদে) [1981-91]**

| রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | 1981 | | | 1991 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা |
| ভারত | 43.6 | 56.4 | 29.8 | 52.1 | 63.9 | 39.4 |
| কেরালা | 81.6 | 87.7 | 75.7 | 90.6 | 94.5 | 86.9 |
| মিজোরাম | 74.3 | 79.4 | 68.6 | 81.2 | 84.1 | 78.1 |
| গোয়া | 65.7 | 76.0 | 55.2 | 77.0 | 85.5 | 68.2 |
| তামিলনাড়ু | 54.4 | 68.1 | 40.4 | 63.7 | 74.9 | 52.3 |
| হিমাচলপ্রদেশ | 51.2 | 64.3 | 37.7 | 63.5 | 74.6 | 52.5 |
| মহারাষ্ট্র | 55.8 | 69.7 | 41.0 | 63.1 | 74.9 | 50.5 |
| নাগাল্যান্ড | 50.2 | 58.5 | 40.3 | 61.3 | 66.1 | 55.7 |
| মণিপুর | 49.6 | 64.1 | 34.6 | 61.0 | 73.0 | 48.6 |
| গুজরাট | 52.2 | 65.1 | 38.5 | 60.9 | 72.5 | 48.5 |
| ত্রিপুরা | 50.1 | 61.5 | 38.0 | 60.4 | 70.1 | 50.0 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 48.6 | 59.9 | 36.1 | 57.7 | 67.2 | 47.2 |
| পাঞ্জাব | 48.1 | 55.5 | 39.6 | 57.1 | 63.7 | 49.7 |
| সিকিম | 41.6 | 53.0 | 27.4 | 56.5 | 64.3 | 47.2 |
| কর্ণাটক | 46.2 | 58.7 | 33.2 | 56.0 | 67.3 | 44.3 |
| হরিয়ানা | 43.9 | 58.5 | 26.9 | 55.3 | 67.9 | 40.9 |
| অসম | N. A. | N.A | N.A | 53.4 | 62.3 | 43.7 |
| ওড়িশা | 41.0 | 56.5 | 25.1 | 48.6 | 62.4 | 34.4 |
| মেঘালয় | 42.0 | 46.6 | 37.2 | 48.3 | 51.6 | 44.8 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | 35.7 | 46.8 | 24.2 | 45.1 | 56.2 | 33.7 |
| উত্তরপ্রদেশ | 35.3 | 47.4 | 17.2 | 41.7 | 55.4 | 26.0 |
| অরুণাচলপ্রদেশ | 25.5 | 35.1 | 14.0 | 41.2 | 51.4 | 29.4 |
| রাজস্থান | 30.1 | 44.8 | 14.0 | 38.8 | 55.1 | 20.8 |
| বিহার | 32.0 | 46.6 | 16.5 | 38.5 | 52.6 | 23.1 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 32.7 | 44.2 | 19.6 | N.A. | N.A | N.A. |
| লাক্ষাদ্বীপ | 68.4 | 81.2 | 55.3 | 79.2 | 87.1 | 70.9 |
| চণ্ডীগড় | 74.8 | 78.9 | 69.3 | 78.7 | 82.7 | 73.6 |
| দিল্লি | 71.9 | 79.3 | 62.6 | 76.1 | 82.6 | 68.0 |
| পণ্ডিচেরী | 65.1 | 77.1 | 53.0 | 74.9 | 83.9 | 65.8 |
| আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 63.2 | 70.3 | 53.2 | 73.7 | 79.7 | 66.2 |
| দমন ও দিউ | 59.9 | 74.5 | 46.5 | 73.6 | 85.7 | 61.4 |
| দাদরা ও নগর হাভেলী | 32.7 | 44.7 | 20.4 | 39.5 | 52.1 | 26.1 |

N.A. = পাওয়া যায়নি।

সূত্র ঃ Census of India, 1991. Provisional Population, Paper I of 1991. p.67.

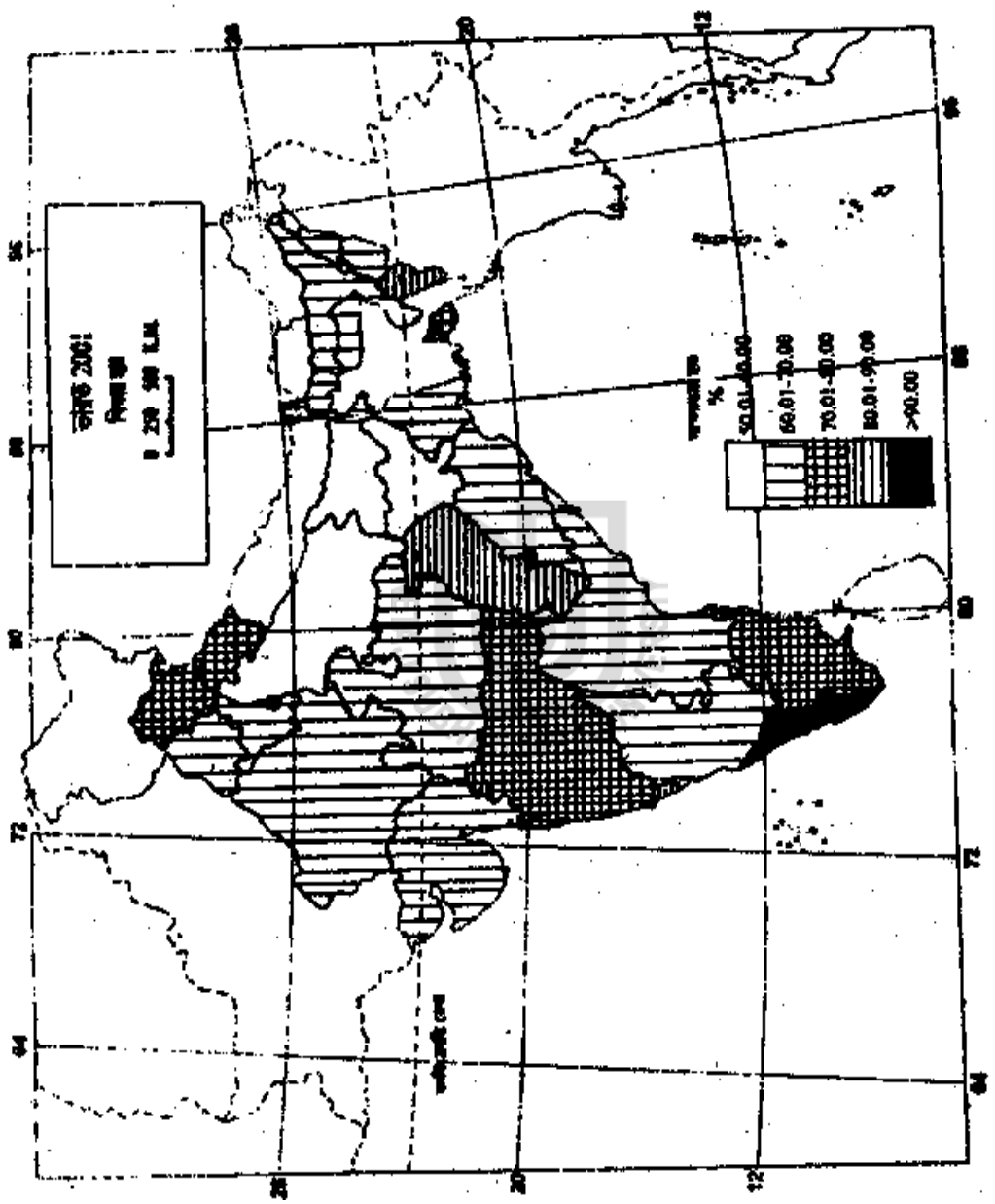

चित्र 3.6

আমাদের দেশের মহিলারা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে সংসারের কর্তব্য পালন করে। পরিবারের অর্থনৈতিক সংগ্রামে তাদের ভূমিকা কম। এছাড়া রয়েছে দারিদ্র্য, সমাজে নারীর নিম্নস্থান, কম বয়সে বিয়ে হওয়া তাদের পরিযান নিয়ে কুসংস্কার। আর্থ-সামাজিক সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও বিবাহিত জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় নারী-পুরুষদের মধ্যে শিক্ষা হারের পার্থক্য ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

এবার ভারতের গ্রাম ও শহরের শিক্ষাহারের (চিত্র 3.6) তুলনা করলে দেখা যাবে যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার হার শহরের শিক্ষাহারের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এর কারণ হল উভয় এলাকার নীতি, সামাজিক জীবন ও অভিবাসনের ধরনের পার্থক্য। যেহেতু পৌর অর্থনীতির ভিত্তি হল অ-কৃষিকাজ, তাই স্বভাবতই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাদ দেওয়া যায় না। শহরের সমাজ ব্যবস্থা এমনই যে প্রত্যেক নাগরিকই তার শিশুদের শিক্ষা দান করতে বাধ্য হন। আর শহরে তারা রুজি-রোজগারের সন্ধানে আসেন, তাঁদের অধিকাংশই শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত পুরুষ ও নারী।

পৌর শিক্ষার হারের দিক দিয়ে মিজোরাম কেরালাকে ছাড়িয়ে গেছে। আরও লক্ষণীয় যে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের শহরাঞ্চলে শিক্ষার হার 70 শতাংশের কম। অন্যান্য রাজ্যগুলোতে 70 শতাংশের বেশি। অরুণাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, পাঞ্জাব রাজ্য জাতীয় গড়ের (73.0) তুলনায় পিছিয়ে আছে। কেন্দ্রশাসিত সব ক'টি অঞ্চলে পৌর শিক্ষিতের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। গ্রামীণ শিক্ষাহারের ক্ষেত্রে কেরালা সবার আগে রয়েছে। এর পরের স্থান হল মিজোরামের। আরও লক্ষণীয় যে অরুণাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয়, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ভারতের জতীয় গড়ের (44.7%) ছেড়ে পিছিয়ে আছে। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হারে পার্থক্য রয়েছে।

2001 সালের জনগণনায় ভারতে শিক্ষার হার সামান্য বেড়েছে।

## 6.5 ভারতের জনবসতির বণ্টন (Distribution of Population in India)

### 6.5.1 অসম জনবন্টনের কারণসমূহ

2001 সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা হল 102.7 কোটি। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক জনতা ভারতের সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নেই। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে লোকসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি, আবার কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ বা উত্তরপূর্ব পার্বত্য রাজ্যসমূহে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক কম। স্বভাবত, মানুষ জীবনধারণের উপযোগী সুযোগ-সুবিধে যেখানে বেশি পায়, সেখানেই লোকবসতি ঘন হয় এবং যেখানে জীবনধারণের সুযোগ কম, সেখানে লোকসংখ্যাও কম। ভারতের তাই বিভিন্ন অংশে জনসংখ্যার তারতম্য রয়েছে। এই তারতম্য প্রধানত দু'টি কারণের জন্য হয়ে থাকে। (এক) প্রাকৃতিক, (দুই) সাংস্কৃতিক। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে আবার কতকগুলো উপ-বিভাগ রয়েছে। যথা—(i) ভূপ্রকৃতি, (ii) জলবায়ু, (iii) নদ-নদী,খনিজ সম্পদ, (iv) স্বাভাবিক উদ্ভিদ, (v) অবস্থান।

সাংস্কৃতিক কারণগুলোর মধ্যে কয়েকটি উপবিভাগ আছে। যথা—(ক) কৃষি, (খ) শিল্প ও বাণিজ্য ; (গ) যোগাযোগ ব্যবস্থা ; (ঘ) ধর্মীয় কারণ ; (ঙ) ঐতিহাসিক কারণ ; (চ) রাজনৈতিক কারণ ; (ছ) সরকারি নীতি।

**(a) প্রাকৃতিক কারণসমূহ ঃ**

**(1) ভূ-প্রকৃতি ঃ** ভূ-প্রকৃতি লোকসংখ্যার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ভূ-প্রকৃতি কোথাও পর্বতসংকুল, কোথাও মালভূমি, আবার কোথাও বা সমভূমি। পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধাস্বরূপ। বন্ধুর ও শিলাময়

হওয়ায় এরকম ভূখণ্ডে কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। যাতায়াতের জন্য পথ তৈরি কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এসব কারণে পার্বত্য অঞ্চলে মানুষের জীবনধারনের সুযোগ-সুবিধে খুবই সীমিত। ফলে পর্বতসংকুল অরুণাচল, গাড়োয়াল, সিকিম বা লাডাক অঞ্চলে লোকসংখ্যা খুবই কম (প্রতি বর্গ কিমি-তে 51 - 100 জন) পার্বত্যাঞ্চলে দিকের চেয়ে দক্ষিণ দিকে (ঢালে) বসতি বেশি গড়ে ওঠে। কারণ দক্ষিণ ঢালে সূর্যালোক বেশি পায় যেমন নৈনিতাল, কুমায়ুন হিমালয় (চিত্র ঃ 3.7)। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলের উঁচু নীচু অনুর্বর এলাকায় কৃষিকাজ বা অন্যান্য জীবিকা অর্জনের সুযোগ না থাকার দরুন লোকবসতি বেশ কম (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 51 থেকে 100 জন)। আবার যেসব জায়গায় ভূমি উর্বর, পলিময় ও সমতল সেখানে কৃষিকাজ ও যাতায়াত সুবিধেজনক, ফলে সেখানে সহজেই ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে। জীবনধারণ সহজ হওয়ায় এবং জীবিকা অর্জনের সুযোগ-সুবিধে থাকার ফলে সমভূমি অঞ্চলে জনবসতি অত্যন্ত ঘন হয়। ভারতের সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের উর্বর সমভূমি অঞ্চলে কৃষিকাজ, পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ থাকার দরুন সেখানে লোকবসতির ঘনত্ব খুব বেশি। অবশ্য জনবসতির জন্য মালভূমির বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি সমভূমির মতন ততটা সুবিধেজনক নয়, আবার পার্বত্য অঞ্চলের ন্যায় খুব বেশি অসুবিধেজনক নয়। ভারতের মালভূমি অঞ্চলে মাঝারি ধরনের জনবসতির ঘনত্ব দেখা যায়।

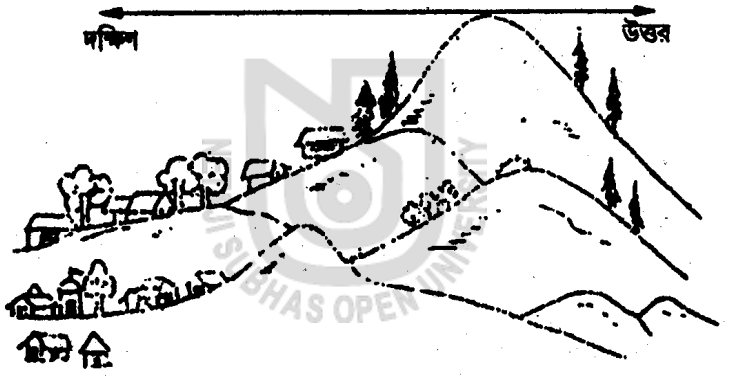


**চিত্র 3. 7**

**(2) জলবায়ু ঃ** ভারতের জলবায়ু কোথাও লোকবসতির অনুকূল আবার কোথাও বা প্রতিকূল। অধিক বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতা সুবিধাজনক হওয়ায় গাঙ্গেয় সমভূমি, মালাবার উপকূল বা মহানদী ব-দ্বীপ কৃষিকার্যে উন্নতি লাভ করেছে, ফলে এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা বেশি। পক্ষান্তরে প্রায় বৃষ্টিহীন উষ্ণ মরুস্থলী অঞ্চল অথবা শীতল লাডাক অঞ্চলে লোকবসতি কম।

**(3) নদী ঃ** নাব্য নদী পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। এই সুবিধের জন্যেই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলো নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল। নদী থেকে জলসেচের সুবিধা থাকে। ফলে ভারতে, বিশেষত গঙ্গা নদীর তীরবর্তী অংশে, লোকবসতি খুবই ঘন এবং এই অংশে অসংখ্য ছোট ও বড় শহর দেখা যায়।

**(4) খনিজ সম্পদ ঃ** জলবায়ু প্রতিকূল এবং মৃত্তিকা অনুর্বর হওয়া সত্ত্বেও খনিজ সম্পদের অবস্থান হেতু লোকবসতি গড়ে ওঠে। এই কারণেই বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে অন্যান্য অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও খনিসমূহের আশেপাশে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে। যেমন গিরিডি অঞ্চল কয়লাখনির জন্য, দ্রুগ, কেওনঝড় অঞ্চল আকরিক লোহার জন্য, লোহারডাগা অঞ্চল বক্সাইটের জন্যে অধিক ঘন জনবসতি যুক্ত হয়েছে।

**(5) স্বাভাবিক উদ্ভিদ ঃ** বৃক্ষ, গুল্ম, তৃণ প্রভৃতি জনবসতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের আদি অধিবাসী,

যথা—সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, কোল, ভীল প্রভৃতি অরণ্য অঞ্চলে বসবাস করে। তৃণভূমি মেষ পালনে সহায়তা করে। হিমাচল প্রদেশের গাদ্দি সম্প্রদায়ের লোকদের মেষ পালন প্রধান জীবিকা। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তৃণ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তন হয় বলে হিমালয়ের কোনও কোনও অঞ্চলে Transhumance পদ্ধতি চালু আছে। শীতকালে মেষ পালকগণ দলে দলে হিমালয়ের উত্তরাংশে নেমে আসে।

**(6) অবস্থান ঃ** ব্যবসা-বাণিজ্য পথের সংযোগস্থলে এবং বড় দেশের বহির্গমনের পথের ওপর অবস্থিত এলাকায় লোকবসতি বেশি হয়। এই কারণেই শিলিগুড়ি শহরটির জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশমুখে অবস্থিত হওয়ায় তথা ভৌগোলিক অবস্থানের (বাংলাদেশ, সিকিম, ভূটান ও নেপালের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং যাতায়াতের সুবিধের জন্য) দরুন শহরটি দ্রুতহারে বেড়েছে।

**(b) সাংস্কৃতিক কারণসমূহ ঃ**

**(ক) কৃষি ঃ** অধিকাংশ ভারতীয়দের উপজীবিকা কৃষি। উর্বর কৃষিভূমি অঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ দেখা যায়। কৃষিতে জীবিকা অর্জন সহজলভ্য বলে ভারতের 72.2 ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন।

**(খ) শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ**

**শিল্পোন্নয়ন ঃ** শিল্পে অগ্রগতি মানুষের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ দেয়। ফলে কোন অংশে শিল্পোন্নয়ন ঘটলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কলকাতা-হুগলি শিল্পাঞ্চল, মুম্বাই শিল্পাঞ্চল, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে লোকসংখ্যা শিল্পে অনুন্নত অঞ্চলগুলি অপেক্ষা বেশি।

**যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ** বসতি বিস্তারের অন্যতম কারণ হল যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ দুর্গমতার জন্য পাহাড়ী এলাকাগুলোতে জনঘনত্ব খুব কম। পক্ষান্তরে রাজধানী নগর থেকে সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ ও বিমানপথ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তৃত থাকে বলে ঐ সব নগরগুলোতে জনবসতি স্বভাবতই বেশি।

**(গ) ধর্মীয় কারণ ঃ** তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে। পুরী, বারাণসী এরকমই শহর।

**(ঘ) ঐতিহাসিক কারণ ঃ** এই কারণের জন্য আগ্রায় ঘন বসতিপূর্ণ শহর গড়ে উঠেছে। ভারতের অনেক শহরের উৎপত্তির ইতিহাস এটাই। দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাসের দরুণ এই সব শহরগুলো ঘনবসতিপূর্ণ।

**(ঙ) রাজনৈতিক কারণ ঃ** রাজনৈতিক কারণের জন্য বাংলার রাজধানী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে—ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা এবং সবশেষে দিল্লিতে (ইংরাজ আমলে ভারতের রাজধানী)। স্বাধীনতা লাভের পর দেশভাগজনিত কারণে এদেশ থেকে অনেক মুসলিম পরিবার পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমানে পাকিস্তান) চলে গেছেন। ফলে অনেক মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়েছিল, আবার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক হিন্দু পরিবার এদেশে চলে আসায় অনেক গ্রামে জনবসতি যথেষ্ট বেড়েছে। রাতারাতি অনেক গ্রামও গজিয়ে উঠেছিল। এসব ঘটনা জনবসতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

**(চ) সরকারি নীতি ঃ** সরকারি পরিকল্পনার সুবাদে অনেক শহর গড়ে ওঠে। যেমন দূর্গাপুর শহর। একসময় জঙ্গালাকীর্ণ এই স্থানটিতে সরকারি উদ্যোগে ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠায় দুর্গাপুর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ শহরে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে, ভাক্‌রা নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণ করে ইন্দিরা গান্ধী নাহার (রাজস্থান খাল) প্রকল্পের মাধ্যমে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে সেচের সুবিধে হয়েছে ফলে কৃষিকাজ ও বসতি স্থাপনের সুবিধে হয়েছে। সরকারি পরিচালনা ও নির্দেশের বলে চণ্ডীগড় ও বিধাননগর প্রতিষ্ঠা করে জনবসতি গড়ে তোলা হয়েছে।

উপরোক্ত কারণগুলো থেকে দেখা যায় যে ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলে লোকসংখ্যা ঘনত্বের তারতম্যের কারণ বহুবিধ। শুধুমাত্র কৃষির অগ্রগতির জন্যেই গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল ঘনবসতিযুক্ত নয়, জলপথে ও স্থলপথে পরিবহনের সুবিধেও এই অঞ্চলে যথেষ্ট। আবার খনিজ সম্পদের অবস্থান,পরিবহনের সুব্যবস্থা ও শিল্পোন্নয়নের ফলে জামশেদপুর দুর্গাপুর, ভিলাই বা রৌরকেল্লা শহর গড়ে উঠেছে।

**ভারতের জনসংখ্যা বন্টন ও জনঘনত্ব (Distribution and Density of Population in India)**

স্বাধীনতার আগে ভারতের জনসংখ্যা নিয়ে খুব একটা গবেষণা হয়নি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে Ahmed (1941) ও Geddess (1942)-এর বিশ্লেষণ উল্লেখের দাবি রাখে। স্বাধীনতার পর 1951 সালের লোকগণনাকে ভিত্তি করে অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জী (1962) জাতীয় স্তরে ভারতের জনসংখ্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলেন। আঞ্চলিক স্তরে কুরিয়ান (1938), ভার্মা (1956), সিন্‌হা (1958), চ্যাটার্জী (1961), কুষাণ (1968), ঘোষ (1970), প্রকাশ (1970), ও মেহেতাব (1970) বিশ্লেষণ ছিল যথাক্রমে কেরালা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান ভিত্তিক। 1969 থেকে 1972 সাল পর্যন্ত গবেষণামূলক তথ্যাদির ভিত্তিতে দেশের জনসংখ্যা বন্টন ও ঘনত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গোসাল ও চাঁদনা (Gosal & Ghandna) জনগণনা প্রতিবেদনের (census report) ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

**জনসংখ্যার বন্টন (Distribution of Population)**

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভারতের জনসংখ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ঃ

1. বিপুল জনসংখ্যা
2. বহুসংখ্যক প্রজাতি (Ethnic multiplicity)
3. প্রধানত গ্রামীণ জনসংখ্যা ও তার অসম বন্টন।

কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis, 1951) তাঁর এক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে দারিদ্র্য ও প্রজাতির বৈচিত্র্যের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র আয়তনের কথা বিবেচনা করলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এই দেশের উন্নতির সম্ভাবনা আছে। বহুবিধ জাতি এদেশের একটি সমস্যা। সাম্প্রতিক কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক সংকীর্ণতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তার ফলে দেশের ঐক্য যেমন একদিকে বিপন্ন হতে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুস্থিরতা নষ্ট হতে চলেছে। ভারতের তিন-চতুর্থাংশের বেশি লোকসংখ্যা (76.6 শতাংশ) গ্রামে বাস করেন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বহুসংখ্যক গ্রামে (5 লাখের বেশি) এই জনতার বসবাস। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এটি একটি বিরাট বাধা, কারণ প্রতিটি বসতিতে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক উন্নয়ন, সুষম বন্টনব্যবস্থা, স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিকাঠামো তৈরি করতে প্রচুর ব্যয় হবে।

জনবন্টনের অসমতা ভারতের জনসংখ্যার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামে বাস করেন, বাকি অর্ধেক সংঘবদ্ধ গ্রামে। বিক্ষিপ্ত জনবসতি দেশের মধ্যভাগ ও হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায়, আর ঘন জনবসতি পলিময় সমভূমি অঞ্চলে। জনসংখ্যার এই অসম বন্টন আবার ঘন জনবসতি ও বিরল জনবসতি অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমানায় আরও বেড়েছে।

## 6.6 জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)

প্রতি বর্গকিমিতে 324 (জন) জনঘনত্ব হিসেবে ভারত পথিবীর ঘনবসতিযুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে। পঃ বঙ্গ (প্রতি বর্গকিমিতে 904 জন) সবচেয়ে ঘনবসতিযুক্ত রাজ্য, আর জাতীয় রাজধানী (National Capital) দিল্লি (6,319) সবচেয়ে ঘন বসতিযুক্ত অঞ্চল (territory)। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অসমেও ঘনজনবসতি দেখা যায় (সারণি 7.7)। অবশিষ্ট রাজ্যগুলোর জনঘনত্ব জাতীয় গড় (267 প্রতি বর্গকিমি) থেকে কম। অসম বাদে অন্যান্য রাজ্যগুলোতে বর্তমান শতকের শুরু থেকেই (চিত্র 3.8) জনবসতির হার বেশি ছিল।

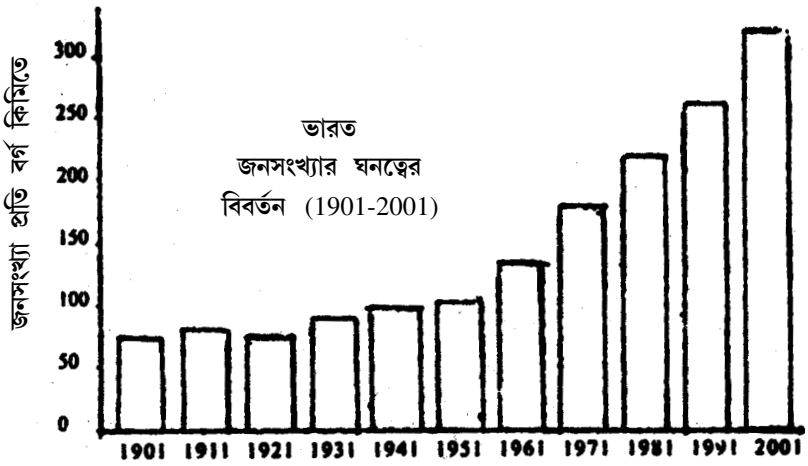


চিত্র 3.8

**সারণি 7.7**

**জনসংখ্যার ঘনত্ব**

| ক্রম 2001 | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল* | জনসংখ্যার ঘনত্ব* 2001 | 1991 | ক্রম 1991 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | দিল্লি* | 9.294 | 6.352 | 1 |
| 2 | চণ্ডীগড়* | 7.903 | 5,632 | 2 |
| 3 | পন্ডিচেরী* | 2.029 | 1.683 | 3 |
| 4 | লাক্ষাদ্বীপ* | 1,894 | 1.616 | 4 |
| 5 | দমন ও দিউ* | 1,411 | 907 | 5 |
| 6 | পশ্চিমবঙ্গ | 904 | 767 | 6 |
| 7 | বিহার | 880 | 685 | 8 |
| 8 | কেরালা | 819 | 749 | 7 |
| 9 | উত্তরপ্রদেশ | 689 | 548 | 9 |
| 10 | পাঞ্জাব | 482 | 403 | 11 |
| 11 | তামিলনাড়ু | 478 | 429 | 10 |
| 12 | হরিয়ানা | 477 | 372 | 12 |
| 13 | দাদরা ও নগর হ্যভেলি* | 449 | 282 | 15 |
| 14 | গোয়া | 363 | 316 | 13 |
| 15 | অসম | 340 | 286 | 14 |
| 16 | ঝাড়খণ্ড | 338 | 274 | 16 |
| 17 | মহারাষ্ট্র | 314 | 257 | 18 |
| 18 | ত্রিপুরা | 304 | 263 | 17 |
| 19 | অন্ধ্রপ্রদেশ | 275 | 242 | 19 |
| 20 | কর্ণাটক | 275 | 235 | 20 |
| 21 | গুজরাত | 258 | 211 | 21 |
| 22 | ওড়িশা | 236 | 203 | 22 |

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

| ক্রম 2001 | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল* | জনসংখ্যার ঘনত্ব* 2001 | 1991 | ক্রম 1991 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | মধ্যপ্রদেশ | 196 | 158 | 23 |
| 24 | রাজস্থান | 165 | 129 | 26 |
| 25 | উত্তরাঞ্চল | 159 | 133 | 24 |
| 26 | ছত্তিশগড় | 154 | 130 | 25 |
| 27 | নাগাল্যান্ড | 120 | 73 | 31 |
| 28 | হিমাচল প্রদেশ | 109 | 93 | 27 |
| 29 | মণিপুর | 107 | 82 | 28 |
| 30 | মেঘালয় | 103 | 79 | 29 |
| 31 | জম্মু ও কাশ্মীর | 99 | 77 | 30 |
| 32 | সিকিম | 76 | 57 | 32 |
| 33 | আন্দামান ও নিকোবর* | 43 | 34 | 33 |
| 34 | মিজোরাম | 42 | 33 | 34 |
| 35 | অরুণাচল প্রদেশ | 13 | 10 | 35 |
| | ভারত | 324 | 267 | |

**প্রতি বর্গ কিমিতে জনসংখ্যা*

*ভারতের জনসংখ্যা গণনার সময় পাক ও চীন অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের অংশগুলিকে ধরা হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে গুজরাত ও হিমাচল প্রদেশের কয়েকটি জেলায় জনগণনার কাজ করা সম্ভব হয়নি।*

(Census of India, 1981)। গড় ঘনত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (চিত্র 2.9) ঃ

**A. বেশি ঘনত্বযুক্ত আঞ্চল ঃ** 350 জনের বেশি লোক।
**B. মাঝারি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল ঃ** 150-350 জনের বেশি লোক।
**C. কম ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল ঃ** 150 জনের বেশি লোক।

### 6.6.1 বেশি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ (High Density Region)

1981 সালের জনগণনানুযায়ী ভারতের 20%-এর বেশি জেলায় প্রতি বর্গকিমিতে 350 জনেরও বেশি লোক বাস করতেন। হিন্দিভাষী অঞ্চলে—বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ, বিহার রাজ্য, পশ্চিমে হরিয়ানা রাজ্য এবং পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গে—জনঘনত্ব বেশি। মোটামুটিভাবে এই বলয়টিতে গড়ে প্রতি বর্গকিমিতে 500 লোক বাস করেন, যদিও এই বলয়ের কোথাও কোথাও এর বেশি লোক বাস করেন। এই জনবসতি মূলত গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে উঠেছে, যদিও পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে শিল্প বিকাশের ফলে ব্যাপক জনসমাবেশ হয়েছে।

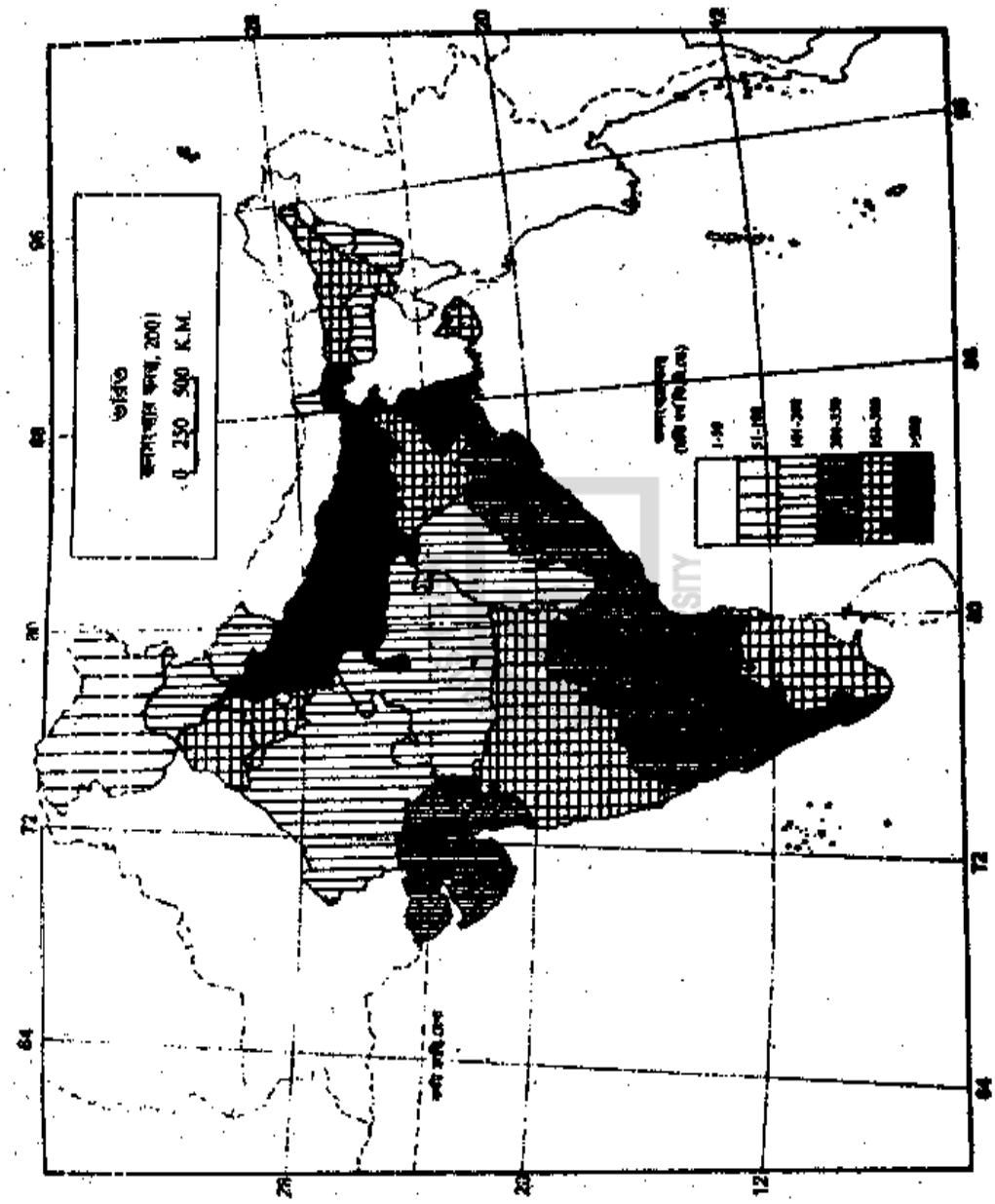

চিত্র 3.9

জনবসতির দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায় যে উর্বর পলিমাটিতে গড়ে ওঠা কৃষিকাজই এখানকার অর্থনীতির মূল উৎস। এই বলয়ের অধিকাংশ অঞ্চলেই কৃষিকাজ আবার সেকেলে ধরনের। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এখানে ভালো চাষবাসের সুযোগ (সমতল জমি, পলিমাটি, সেচের জন্য জল) থাকলেও এখানকার কৃষিব্যবস্থা সেকেলে ধরনের। অনুন্নত জলসংরক্ষণ ব্যবস্থা এই বলয়ের চাষবাস-এ পিছিয়ে থাকার একটা কারণ। সস্তায় প্রচুর শ্রমিক (লোকসংখ্যা বেশি বলে) ও কম পরিমাণ জমি উন্নতমানের চাষবাস চালু করার পথে আর এক বাধা। এর স্বাভাবিক ফল হল—(i) এখানকার বিরাট এলাকা জুড়ে গ্রাম্য জনতার ভীড়। (ii) উত্তর বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বদিক থেকে ভূমিহীন চাষিদের স্বদেশত্যাগ। এদের গন্তব্যস্থল হল চাষবাসে উন্নত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও অসম রাজ্য। কিন্তু বহিঃপ্রবণতা সত্ত্বেও এখানে ঘনত্ব খুব বেশি। যাহোক, বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে (ইক্ষুশিল্প) ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকায় (পাটশিল্প) গ্রামীণ শিল্পায়ণ জনসংখ্যার গ্রহণ ক্ষমতা বাড়িয়েছে। ভারতের এই দুই প্রান্তে অন্যান্য অংশের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ বেশি।

জনঘনত্বের দিক দিয়ে এর পরের স্থান হল মালাবার উপকূল ও তামিলনাড়ু উচ্চভূমির। এই অঞ্চলের মধ্যে মালাবার এলাকা ও পৌর জেলা মাদ্রাজের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তামিলনাড়ুর উচ্চভূমিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে প্রায় 350 জন। মালাবার উপকূল অঞ্চলে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 1,000 জন বা তারও বেশি। নিবিড় কৃষিভিত্তিক ধানচাষ এখানকার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। দেশের মধ্যেকারজেলাগুলোতে বাগিচা চাষ (চা, রবার, কফি) এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্প এখানে জনঘনত্ব বেশ বাড়িয়েছে। চাষবাসে উন্নতি ও বেশ কয়েকটি শহরে কুটির শিল্পের বিকাশ কাবেরী বদ্বীপ ও তার লাগোয়া উত্তর-পূর্ব তামিলনাড়ুর উচ্চভূমিতে বেশি জনঘনত্বের কারণ। যদিও কিছু লোক এখান থেকে বাইরে চলে গেছেন, তবুও ভারতের এ অংশে অধিক নগরায়ন জনঘনত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। এখানকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল কেন্দ্র হল মাদ্রাজ (চেন্নাই)। বাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটোর, মাদুরাই, টুটিকোরিন ও মাদ্রাজ এই অঞ্চলের পুরনো শহর।

এসব প্রধান ঘনবসতি অঞ্চলগুলো ছাড়াও চাষবাসে উন্নত মহানদী বদ্বীপ, গোদাবরী বদ্বীপ, বারী (Bair) ও বিতস্তা দোয়াব ও অত্যাধুনিক বৃহত্তর বোম্বাই (মুম্বাই), হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, খেদা (Kheada), ইন্দোর, দিল্লি ও চণ্ডীগড়ে ঘন জনবসতি লক্ষণীয়। অ-কৃষি পেশা নির্ভর লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জেও জনবসতি বেশ ঘন।

## 6.6.2 মাঝারি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ (Medium density regions)

1981 সালের লোকগণনাতে ভারতের 130টি জেলায় মাঝারি ধরনের জনবসতি লক্ষ্য করা যায়। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে সবচেয়ে কম জনবসতি ছিল (প্রতি বর্গকিমিতে 151 জন)। যা হোক, দক্ষিণ ভারতের মাঝারি ধরনের জনবসতি বেশ লক্ষ্যণীয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গোটা মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় এলাকার একটা বড় অংশে মাঝারি ধরনের জনবসতি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণে তামিলনাড়ুর কিছু অংশে, কর্ণাটকের দক্ষিণভাগ, অন্ধ্রপ্রদেশের রায়লসীমার কিছু অংশে মাঝারি জনবসতি দেখা যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সেখানকার অসমান ভূপ্রকৃতি চাষবাস ও সেচের জল সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নগরায়ন ও শিল্পোন্নতির জন্য এখানে মাঝারি ধরনের জনঘনত্ব দেখা যায়। ছোটনাগপুরের সম্ভাব্য সম্পদ এখনও

অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। সেখানে একই মানের জনঘনত্ব রয়েছে। বলা যেতে পারে যে দেশের এই অংশে বর্তমানে খনিজ ও শিল্পের বিকাশ একদিকে যেমন সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি এর পশ্চাদপদ এলাকার উন্নতি ঘটিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে মাঝারি জনঘনত্ব সৃষ্টি করেছে।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সমভূমি ও রাজস্থানের উত্তরাংশ মিলিয়ে একটি মাঝারি মাপের জনবসতি বলয় দেখা যায়। স্বাধীনতার পর জাতীয় রাজধানী দিল্লির সান্নিধ্য, পাঞ্জাবের পুনর্গঠনের ফল (1966) এবং সর্বোপরি সবুজ বিপ্লবকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে পৌর শিল্পবসতি গড়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে স্বাধীনতার সময় পাঞ্জাব, (বর্তমানে পাকিস্তান) থেকে নিরাশ্রয় মানুষদের এদেশে আগমনের ফলে ভারতের এই অংশে শহরায়ণ দ্রুততালে ঘটেছে। সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে।

### 6.6.3 কম ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ (Low density regions)

পাকিস্তান, চীন ও ব্রহ্মদেশের (মায়ানমার) সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে প্রতি বর্গকিমিতে 50 জনেরও কম লোক বাস করেন। এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে কিছু প্রাকৃতিক বাধা রয়েছে। যেমন গুজরাটের কচ্ছের রণে জল জমে থাকা, রাজস্থানের মরুভূমি ও অন্যান্য জেলাগুলোর পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি। যে সব জায়গায় এই এসব বাধা নেই সেখানে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, যেমন রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলা, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর, অমৃতসর ও ফিরোজপুর জেলা। তাই দেখা যায় যে সীমান্তবর্তী অবস্থান ও তার সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা এই জেলাগুলোর জনঘনত্বকে কমিয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চল বাদে মধ্য প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে গোণ্ড আদিবাসী অধ্যুষিত বস্তার জেলায় জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 50 জনের কম।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও জনঘনত্বও কম (50 থেকে 150 জন)। কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যাংশেও কম জনবসতি দেখা যায়। এর কারণ হল প্রাকৃতিক বাধা ও জলকষ্ট। তার ফলে এই অঞ্চল দুটো চাষবাসের দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে। তাছাড়া, কোথাও কোথাও ব্যাপক ভূমিক্ষয়, আবার কোথাও গভীর বনভূমি চাষবাসের উন্নতির পক্ষে প্রধান বাধা। এর ফলে এখানে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে উঠেছে। বর্তমানে কৃষিসম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় একই শ্রেণিভূক্ত অন্যান্য অংশের তুলনায় এই অঞ্চলে জনঘনত্ব সামান্য বেড়েছে। কতকগুলো অংশে যেমন দণ্ডকারণ্য, চম্বল উপত্যকায়—( i) আদিবাসী-অধুষ্যিত অঞ্চলে অর্থনৈতিক মান উন্নয়ণ, (ii) অবহেলিত অ-খ্রিস্টীয় আদিবাসী এলাকায় সমাজ জীবনের মান উন্নয়ন, (iii) উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং (iv) প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ইত্যাদি সামনে রেখে কৃষি উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

## 6.7 অনুশীলনী

**রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি ঃ**

১। 1901 সাল থেকে আজ অবধি ভারতে জনবৃদ্ধির চিত্রটি কীরূপ?

২। ভারতে জনবৃদ্ধিজনিত সমস্যাগুলি আলোচনা করো।

৩। ভারতের নারী-পুরুষ অনুপাত সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

৪। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তথ্য গ্রাম ও শহরের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাতের যে পার্থক্য রয়েছে তা লিখুন।

৫। কি কি কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনঘনত্বের পার্থক্য ঘটে।

**মাঝারি প্রশ্নাবলি ঃ**

১। 2001 সালের ভারতের লিঙ্গ অনুপাতের চিত্রটি কীরূপ?

২। ভারতের পাহাড়ী রাজ্যগুলোতে জনঘনত্ব কম কেন?

৩। ভারতের তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত কীরূপ।

৪। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত কীরূপ?

৫। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে জনঘনত্ব বেশি এবং কেন?

৬। 1901 থেকে ভারতে জনবৃদ্ধি কীরূপ ঘটেছে?

৭। 1901 থেকে 2001 সাল পর্যন্ত জনবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায় এবং কী কী?

**অতিরিক্ত প্রশ্নাবলি ঃ**

১। ভারতের জনঘনত্ব কত?

২। ভারতবর্ষের কোন্ রাজ্যে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং কেন?

৩। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন্‌টির জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং কেন?

৪। ভারতের শতকরা কতজন 'বয়স্ক' (Adult) জনতা?

৫। ভারতে জমির উর্বরতা হ্রাসের (Fertility) প্রধান কারণ কী কী?

৬। ভারতের পৌর ও গ্রামীণ অবস্থার বয়স কাঠামো।

[ পাঠেপকরণের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়/একক থেকে উত্তরগুলি সংগ্রহ করুন।]

## 6.8 গ্রন্থপঞ্জি


1. চট্টোপাধ্যায়, অনীশ, ২০০০ : অর্থনৈতিক ভূগোল ও সম্পদ শাস্ত্রের পরিচয়, টি.ডি. পাবলিকশেসনস্, কলকাতা।
2. পাল, অরুণশংকর, ২০০০ : সম্পদ সমীক্ষা, নিউ সেন্ট্রাল, কলকাতা।
3. সেন, জ্যোতির্ম্ময়, ১৯৯৯ : জনসংখ্যা ভূগোল, নিউ সেন্ট্রাল, কলকাতা।
4. গুহ, সবিতা, ১৯৮৭ : জনসংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকা), পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
5. মজুমদার, প্রভাতকুমার, ১৯৯১ : জনসংখ্যাতত্ত্বের গোড়ার কথা : প্রথম পর্ব পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
6. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, ১৯৮৮ : আর্থনীতিক ভূগোল ঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
7. বাকী, মোঃ আবদুল ১৯৯৪ : গ্রামীণ বসতি, ভৌগোলিক পরিচয়, কাশবন, ঢাকা বাংলাদেশ।
8. বাসার, এম. এস., ১৯৮৫ : অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।
9. ভট্টাচার্য, অনিমা ও ভট্টাচার্য, বিমলেন্দু, ১৯৭৭ : সমাজ বিজ্ঞানীয় ভূগোল ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।
10. সরখেল, জয়দেব, ১৯৯৪ : উন্নয়নের অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বুক সিন্ডিকেট, কলিকাতা।
11. সেন, অমর্ত্য, ১৩৯৭ B. S. : জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি—অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৭, আনন্দ, কলিকাতা।
12. হক, মহম্মদ জিয়াউল, : উন্নয়নের অর্থনীতি ও পরিকল্পনা, তৃতীয় সংস্করণ, বুক সোসাইটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।
13. Ahamd, Kazi S., 1941 : Environment and the Distribution of Pollution in India.
**Indian Geographical Journal. vol 10.**
14. Baker, O. E., 1928 : Population, Food Supply and American Agriculture,
**Geographical Review, Vol. 18.**
15. Baia, R. 1986 : **Trends of Urbanisation in India,** Rawat Pub. Jaipur.
16. Beauje-Garnier, J., 1966 : Geography of Pupulation, Longman, Londan.

17. Benjamin, B., 1970 : The Population Census, Heinemann, London.
18. Bhande, Asha and Tara, Kanitkar, 1985 : Principles of Population Studies, 2nd edn. Himlayan Pub. Co., Bombay.
19. Blache, P. Vidal de la., 1926 : **Principles of Human Geography, Constable & Co.,** London.
20. Brunhes. J., 1952 : **Human Geography, Rand Mcnally & Co. New York.**
21. Chandna, R. C., 1970 : **Changes in the Demographic Characteristics of Rohtak and Gurgaon Districts (1951-61) : A Geographical Analysis** (Unpublished Ph. D. Thes is), Punjab University, Chandigarh.
22. —, 1992 : **A Geography of Population : Concepts, Determinants and Patterns,** 2nd edn. Kalyani pub., New Delhi.
23. —— . and : Introduction to Pupulation Geography, Kalyani Pub.,
24. M. S. Sidhu, 1980 : New Delhi.
25. Chandna, R. C. and : Distribution and Density of Population is **Asian Profile,**
26. Knat, Surya, **Vol. 13 No. 4,** Hong Kong.
27. Chatterjee, S. P., 1961 : Physical Features and Population Distribution in West Bengal, **Calcutta Geog. Review. Vol. 23. Calcutta.**
28. ——, 1962 : Regional Pattern of Density and Distribution of Population in Inda, **Geog. Rev. of India. Vol. 24.**
29. Clarke, John I. 1965 : **Population Geography, 1st edn.. pergamon Press, Oxford.**
30. ——, 1972 **: op. cit... 2nd edn.**
31. ——, 1971 : Population Geography and Developing countries, Pergamon Press, Oxford.

32. Cressey, George B., 1963 : **Asia's Lands and Peoples. A Geography of One-third of the Earth and Two-thirds of its people,** 3rd edn., McGraw Hill. New York.

33. Demko, G. J. et. al., 1970 : **Population Geography :** A Reader, McGraw Hill, New York.

34. Dicken, S. and Pitt. FR, 1963 : **Introduction of Human Geography,** Blaisdell Pub. Co., London.

35. Doubleday, Thomas, 1847 : **The True Law of Population Shown to be connected with Food of People.** 2nd edn., George Pierce, London.

36. Finch, V. C., and : **Elements of Geography, Physical and Cultural.**

37. G. T. Trewartha., 1957 : McGraw Hill, New York.

38. Fitzerald, Walter., 1967 : **Africa,** Tenth edn., Methuen, London.

39. Franklin, S. H. 1965 : The Pattern of Sex Ratio in New Zealand, Economic Geography, Vol. 32.

40. Geddess. Arthur. 1942 : The Population of India, Variability of change as a Regional Demographic Index. **Geographical Review, Vol, 32.**

41. Ghosh, S., 1970 : Physicaal and Economic Factors in the population Distribution of Bihar. **The National Geographical Journal of India, Vol. 16**

42. Gosal, G. S., 1956 : **A Geographyical Analysis of India's Population.** (Unpublished Ph. D. Thesis). University of Wisconsin, Wisconsin, U. S. A.

43. Heer, David M. and Grigsby, J. S., 1994 : **Society and Population,** 3rd edn., Prentice-Hall of India, New Delhi.

44. Huntington, E and Shaw, E. B., 1956 : **Principles of Human Geography,** Modern Asia Edn., John Wiley, New York.

45. James, Preston, E., and Jones, C. F., 1954 : Geographic Study of Population in **American Geography : Inventory and Prospects,** University Press, Syracuse.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

46. Kellong. C. E. 1950 : Food, Soil and People, The Manhattan Pub. Co., New York.

47. Kirk, Dudley, 1968 : The Field of Demography in **International Encyclopedia of Social Sciences. Vol.** XII. Macmullan and Free Press, London.

48. Knowles, R., and Wareing G., 1976 : **Economic and Social Geography, Made Simple,** W. H. Allen, London.

49. Krishan. Gopal, 1968 : Distribution and Density of Population in Orissa, **The National Geotraphical Journal of India, Vol. 14.**

50. ——, 1968 : **Changes in the Demographic Character of Punjab's Border Districts of Amritsar and Gurdaspur. 1951-61** (Unpublished Ph. D. Thesis, Punjab University, Chandigarh.

51. Kurtyan, George, 1938 : Population and its Distribution in Kerala, Communal of Maeras Geographers Assen., Vol. 13.

52. Lee, E. S., 1970 : The Theory of Migration in **Population Geography, A Reader,** ed. by Demko, G. J. E McGraw Hill. New York.

53. Leong, Goh Cheng and Morgan, G. C., 1982 : **Human and Economic Geography,** 2nd edn., Oxford University Press Oxford.

54. Lowry, J. H. 1976 : **World Population and Food Supply,** Edward Arnold, London.

55. Marx, K. 1929 : **Capital, Vol,** I, International Publishers, New York.

56. Mehta, B. C., 1973 : Spatial Distribution of Population in Rajasthan. **The National Geographical Jour. of India, Vol. 19.**

57. Mehta, G., 1967 : **Some Aspects of Changes in the Demographic characteristics of Bist Doab, 1951-61 (Unpublished Ph. D. Thesis),** Punjab University, Chandigarh.

58. Mukhrejee, R. K., 1948 : **The Changing Face of Bengal. A Study in Riverine Economy,** Calcutta University, Calcutta.

59. Negi, B. S., 1993-94 : **Human Geography, An Ecological Approach.** Seventh Edn., Kedar Nath Ram Nath, Meerut.

60. Prakash, O., 1970 : Pattern of Population in Uttar Pradesh. The National **Geographical Jour. of India. Vol. 16.**

61. Ravenstein, E. 1889 : The Laws of Migration, Journal Royal Statistical Society Vol. 49.

62. Ricardo, David, 1951 : **Principles of Political Economy,** Cambridge University Press London.

63. Rubenstein, James M. and Bacon, Robert, 1990 : **The Cultural Landscape, An introduction to Human Geography,** Prentice-Hall of India, New Delhi.

64. Sen. S and J. Sen, 1989 : **Evolution of Rural Settlements in West Bengal, 1850-1985 (A case study).** Daya Pub. House, Delhi.

65. ———. : Phulia, A study in Settlement Geography, **Landscape systems, Vol. I.** No 1 & 2.

66. Shaw. E. B., 1955 : **World Economic Geography,** John Wiley, New York.

67. Sinha, B. N., 1958 : Population Analysis of Orissa. **The National Geographical Jour. of India. Vol. 4.**

68. Shryock, H.S., et. al, 1976 : **The Methods and Materials of Demography,** Academic press, New York.

69. Spencer, Herbert, 1867-68 : **The Principles of Biology, Vol. 2,** D. Appleton & Co., New York.

70. Stamp, L.D., 1950 : **Our Developing World.** Faber & Faber, London.

71. Stazeswski, J. 1957 : Vertical Distribution of World Population, Polish Academy of Sciences, **Geographical Studies, No. 14.**

72. Taylor, Griffith., 1959 : **Australia, A Study of Warm Environment and their effect on British Settlement.** 7th edn. Methuen. London.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

73. Trewartha, G. T., 1953 : A case of Population Geography. **Annals of the Assen. of American Geographers. Vol. 43.**

74. ———. 1969 : **A Geography of Population :** World Patterns, John Wiley, New York.

75. United Nations 1951 : Priciples and Recommendations for National Population Censuses, **Statistical papers, Series M, No. 27.**

76. Verma, S. D., 1956 : Density and Pattern of Population in Punjab, **The National Geographical Joun. of India, Vol. 2.**

77. Webb & Book, 1978 : A Geography of Mankind, Megraw hill USA.

78. Wegner, P.L., 1964 : **The Human Use of the Earth.** The Free Press of Glence, New York.

79. Woods, Robert, 1979 : **Population Analysis in Geography,** Longman, London.

80. Zelinsky, Wilbur, 1966 : **A Prologue to Population Geography,** Prentice Hall, N. J.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY